বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীত শিল্পীদের অবদান

পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মহসিনা আক্তার খানম
সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোস্তারী আহমেদ
সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সঙ্গীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীত শিল্পীদের অবদান

পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মোস্তারী আহমেদ
সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সঙ্গীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

প্রত্যায়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোস্তারী আহমেদ উপস্থাপিত "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীত শিল্পীদের অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি তাঁর নিজস্ব গবেষণালব্ধ মৌলিক কাজ। আমার জানা মতে এটি বা এর কোন অংশ অন্য কোথাও কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি বা প্রকাশিত হয়নি। আমি এ গাবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে জমাদানের জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মহসিনা আক্তার খানম)
সহযোগী অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত “বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীত শিল্পীদের অবদান” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একটি মৌলিক কর্ম। এটি বা এর কোনো অংশ কোনো ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য অন্যত্র কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে আমি দাখিল করি নাই।

গবেষক

(মোস্তারী আহমেদ)
সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীত শিল্পীদের অবদান' শিরোনামে আমার পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে যারা আমাকে মূল্যবান সময়, পরামর্শ আর শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝে কাজটি করতে হয়েছে, তাই এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে যেতে পারে, যার দায়িত্ব সম্পূর্ণটুকুই আমার। তবে গবেষক হিসেবে আমার শ্রম, নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সামান্যতম ঘাটতি ছিল না। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবো আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)-এর কথা—যিনি শত ব্যস্ততার মাঝে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অভিসন্দর্ভটি তত্ত্বাবধান করে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন।

মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী আর সঙ্গীত শিল্পীদের সকলেই আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে। দুঃখজনক হলেও বলতে হয় অনেকেই ব্যস্ততার অজুহাতে সাক্ষাৎকার না দিয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন, বারংবার তাদের সাথে যোগাযোগ করেও সহযোগিতা পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই। আমার সহকর্মীদের উৎসাহ নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছে। পরিবার, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন তাদের আন্তরিক সহযোগিতা কাজটি সম্পন্ন করতে মনোবল যুগিয়েছে। গবেষণা কাজের জন্য অনেক মূল্যবান বই এবং উৎসের সন্ধান দিয়ে ব্যাপক সহযোগিতা করেছেন জেসমিন। তাছাড়া আরো যাদের সহযোগিতাকে স্মরণ করবো তাদের মধ্যে আলমগীর, জামাল, রবীন, সোহাগসহ অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্যায়ে কম্পোজ ও গেটআপ-মেকআপ-এর কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন বাংলা একাডেমির গবেষণা সহকারী জনাব মোহাম্মদ মীর হোসেন। যত্ন করে কাজটি শেষ করতে তিনি আমাকে ব্যস্ততার মাঝেও সময় দিয়েছেন। বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গণগ্রন্থাগার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির কর্মকর্তাবৃন্দ আমাকে গ্রন্থ পাঠে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে এ গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীত শিল্পীদের ভূমিকা কতটা ব্যাপক আকারে ছিল তা উন্মোচনে কিছুটা সক্ষম হলেও আমার ত্যাগ ও পরিশ্রম সার্থক হবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এভাবে প্রতিটি শ্রেণি ও পেশার মানুষের অবদান ও ত্যাগের স্বীকৃতির মধ্যদিয়ে একদিন রচিত হবে বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ মুক্তির ইতিহাস।

মোস্তারী আহমেদ
সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

আবহমানকালের বাঙালি জীবনের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে সঙ্গীত। প্রকৃতিগতভাবে বাঙালি একটি সঙ্গীতপ্রাণ জাতি। বাঙালি সবাই গায়ক না হলেও সকলে গানের মুগ্ধ শ্রোতা। বাঙালি সুখে গান গায়, আনন্দে গান গায়, দুঃখে গান গায়, কষ্টে গান গায়, কর্মে গান গায়, অবসরে গান গায়, সঙ্গে গান গায়, নিঃসঙ্গে গান গায়। বাঙালির নিত্য আচরিত গান। জীবনের প্রতিটি পর্বে গান। সন্তান জন্মে গান গায়, সন্তান লালন-পালনে, বিয়েতে গান, বিদায়ে গান, বরণে গান। যে কোনো উৎসব পরিপূর্ণতা পায় বাঙালির গানের মধ্য দিয়ে।

বাঙালির সঙ্গীত স্বত্তা তৈরি করেছে বাংলার প্রকৃতি। মা প্রকৃতি নিজ হাতে লালন করে বাঙালিকে। স্নেহ, ভালোবাসার পরশে, আলিঙ্গনে যেমন প্রেমে পূর্ণ করে দেয় বাঙালি হৃদয় আবার বিরূপ প্রকৃতির আঘাত মোকাবিলা করার মতো ধৈর্য্য, সাহস ও শক্তিও যোগায় এই প্রকৃতি। বাংলার পলিমাটির শীতল পরশ, নির্মল আকাশের উদারতা, বিশাল প্রান্তরের খোলা হাওয়া, নদীর কলতান, ঝর্ণার উচ্ছলতা, হাজারো পাখির কিচিরমিচির কাকলি, মাটির উর্বরতা, প্রকৃতির নাতিশীতোষ্ণতা বাঙালি জীবনকে করেছে সহজ, সরল, নির্মল, সুখী ও পরিপূর্ণ। বাঙালি জীবনে এর বেশি কিছু চাওয়া নেই। কর্মের অবসরে শীতল পাটিতে চোখ বন্ধ করে বাঙালিকণ্ঠ গেয়ে ওঠে জীবনের পূর্ণতার গান। দ্বীজেন্দ্র লাল রায় বাঙালির সে অনুভূতিকে প্রকাশ করেন-

‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।’

-নির্মল প্রাপ্তির সুখে বাঙালি হৃদয় অনুরণিত হয়। অতি সাধারণ হৃদয়ের অতল আবেগ থেকে উঠে আসা সুরের ও গানের স্রষ্টা বাঙালি। বাঙালির সে আবেগকে ধারণ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—

‘কি শোভা কি ছায়াগো কি স্নেহ কি মায়াগো
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।’

আবার ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশে বিরূপ প্রকৃতি প্রচণ্ড উন্মত্ততা নিয়ে ভেঙ্গে চুড়ে তছনছ করে দেয় বাঙালির স্বপ্ন, সাধ, আশা-আকাঙ্খা, মাটির ঘর, ফসলের ভরা ক্ষেত, গোলার ধান, গোয়ালের গরু, পুকুর ভরা মাছ ভাসিয়ে নিয়ে যায় কালবৈশাখীর রুদ্র ঝড়। দুঃসময়ের সে কঠিন

Dhaka University Institutional Repository

প্রহড় বাঙালি ততোধিক সাহস ও শক্তি নিয়ে বিরূপ প্রকৃতির প্রচণ্ডতাকে বুক চিতিয়ে মোকাবিলা করে। ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাওয়া বাড়ি-ঘর, লণ্ডভণ্ড ফসলের বিড়ান মাঠ, সব হারানো বাঙালি নদীর বুকে জেগে ওঠা চড়ে নতুন বসতি গড়ে, নতুন করে ফসল ফলায় সুন্দর আগামীর স্বপ্ন প্রত্যাশায়। ভাঙ্গা-গড়ার এই খেলা বাঙালির আজন্ম সঙ্গী। বিস্ময়কর সত্য যে ভাঙ্গাগড়ার এ খেলায় বাঙালির নিত্য সঙ্গী গান। গান গেয়ে বাঙালি ভুলে যায় তার কষ্ট আর নির্মম বাস্তবতাকে। বাঙালির মনোবল ফিরিয়ে আনে গান। শিল্পী আপেল মাহমুদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বাঙালির সাহসী প্রত্যয় 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে।' সাধন গুহ রচিত গান বাঙালির সাহস ও শৌর্যের চিরন্তন রূপটিই ফুটিয়ে তোলে, 'ওরে বিষম দরিয়ার ঢেউ উথাল পাথাল করে, নাও আজি বাঁচে কিনা বাঁচেরে, ও মাঝি এই ঝড়ে (২) বাদাম উড়াইয়া দাও সাগরে।' বাংলার ষড়ঋতুর কোমল আর কঠিন রূপটি তুলে ধরেছেন অপূর্ব কথার গানের মধ্য দিয়ে গীতিকার আবদুল ওমরাহ মোঃ ফখরুদ্দীন—

'ও আমার বাংলা মা তোর আকুল করা রূপের সুধায়
হৃদয় আমার যায় জুড়িয়ে, যায় জুড়িয়ে,
ও আমার বাংলা মাগো।'

বাঙালির মানবিকতা, আবেগ, সরলতা, প্রাণ প্রাচুর্য যেমন প্রকৃতি প্রদত্ত আবার বাঙালির প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রতিবাদ তাও পুরোটাই প্রকৃতির কাছ থেকেই পাওয়া। প্রকৃতি অকৃপণ হাতে বাঙালি জীবনকে যেমন ভরিয়ে দেয়- স্বয়ংসম্পূর্ণ করে, আবার নিমেষেই বাঙালিকে নিঃস্ব সর্বস্বহারা করে দেয়, প্রকৃতির খেয়াল-খুশি বাঙালি জীবনকে সঞ্চারিত করে গভীরভাবে।

বাঙালি উৎসবমুখর জাতি। বাঙালির বারো মাসে তের পার্বন। কোনো অনুষ্ঠানই গান ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না। স্বভাব গায়ক বাঙালি তার সুরেলা গলায় তাল ছন্দে গেয়ে যায় গান। সে গানে মুগ্ধ হয় সবাই। একাত্ম হয়ে গানের সুরে সকলেই গলা মেলায়। প্রত্যেকের মাঝে সঞ্চারিত হয় সুরের অনুরণন।

বাংলাদেশের অঞ্চল ভেদে রয়েছে গানের ভিন্নতা। কোথাও ভাওয়াইয়া, কোথাও ভাটিয়ালী, কোথাও বাউল, কোথাও চট্‌কা, কোথাও জাড়ি, কোথাও সারি গান। বাঙালির সঙ্গীত প্রীতির কারণে বাংলাদেশে যত ধরনের গান লক্ষ করা যায় পৃথিবীর কোনো দেশে এত ধরনের গান খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বাঙালি জীবনের দৈনন্দিন হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা, ভাবনা-কল্পনা, আবেগ-অনুভূতি নিয়ে রচিত হয় সে গান। বাঙালির গ্রামীণ লোকগীতি থেকে যার প্রমাণ মেলে। বাংলার কবি-গায়কদের প্রাণ-প্রাচুর্যের ব্যাপ্তী কতটা ছিল তার প্রমাণ এ সকল গান। গান শুধু বাঙালির ব্যক্তিগত আচরিত বিষয়ই নয়। বাঙালির সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিটি

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়েই গান অত্যাবশ্যক অনুসঙ্গ হয়ে জড়িয়ে আছে। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গণতন্ত্রহীনতায়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, প্রগতিশীলতায়-মানবিকতার জয়গান বাঙালির কণ্ঠে উচ্চস্বরে ধ্বনিত হয়েছে গানে গানে।

বাঙালি জাতি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার দ্বারা পরিপুষ্ট। বঙ্গভূমির বাঙালির হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে বাংলা ভাষা। বাঙালির মনের ভাব প্রকাশের বাহন হলো বাংলা গান। অসাম্প্রদায়িক বাঙালির মনের আবেগ-অনুভূতির বিস্তার ঘটে বাংলা গানের মাধ্যমে। আমাদের অসাম্প্রদায়িক জাতিসত্তার সাথে অনুরণিত হয় আমাদের অন্তরের অনুরণন, যা ব্যক্ত হয় গানের মধ্য দিয়ে। গৌরী প্রসন্ন মজুমদার বাঙালির সে আবেগকে তুলে এনেছেন তার সঙ্গীতে- 'বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি।'

বাঙালি জাতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও ভাবপ্রবণ। বাঙালির হৃদয় অনুভূতি সবকিছুতেই দ্রুত আক্রান্ত হয়। আর তা যদি গানে গানে প্রকাশ পায় দ্রুতই তা বাঙালি হৃদয়কে স্পর্শ করে। রাজনীতির মতো কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সঙ্গীত ও শিল্পীদের একাত্মতা বহু যুগ ধরেই। বাঙালির পরাধীনতার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। পরাধীন শৃঙ্খলিত জীবনে বাঙালি অনেক কিছু হারিয়েও অত্যন্ত সন্তর্পনে তার সঙ্গীত সত্তাটিকে লালন করেছে। সংকটের প্রতিটি পর্যায়েই শিল্পীদের অবস্থান ছিল রাজনীতিবিদদের সমান্তরাল। সাধারণ বাঙালিও এতেই অভ্যস্ত। আনন্দ, উৎসব, পার্বনে সঙ্গীত যেমন বাঙালির অত্যাবশ্যকীয় অনুসঙ্গ তেমনি সংকটে সংগ্রামের কঠিন সময়েও সঙ্গীত বাঙালির নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। সঙ্গীত শক্তি-সাহস হয়ে বাঙালিকে পথ দেখিয়েছে আর শিল্পীরা সঙ্গীতকে কণ্ঠে তুলে নিয়ে শত্রুর শক্ত ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। অন্যায়-দুঃশাসনের কঠিন সময়ে শিল্পীরা তাদের সচেতন অবস্থান থেকে বাঙালির দুঃসময়ের আলোকবর্তীকা হিসেবে কাজ করেছে।

বাঙালি অল্পতেই আত্মতুষ্ট জাতি। নিজের সবটুকু নিয়ে সে পরিতৃপ্ত। ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না বাঙালি কারো সম্পদের প্রতি নজর দিয়েছে, পার্শ্ববর্তী কোনো রাষ্ট্রের ক্ষতির কারণ হয়েছে, কারো সম্পদ কেড়ে নিয়েছে বা কারো সাথে শত্রুতা করেছে। তথাপি শান্তিপ্রিয় বাঙালি নিজ নিভৃত জীবনে পরিপূর্ণ সুখী হওয়ার সুযোগ পায় নাই। বাংলার সম্পদের প্রাচুর্য যুগে যুগে বাংলাকে বিদেশি শাসকের লোভের ক্ষেত্রবস্তুতে পরিণত করেছে। ফলশ্রুতিতে বাঙালিকে বরণ করতে হয়েছে পরাধীন জীবন। ঔপনিবেশিক শাসনকালেও পরাধীন বাঙালি নিজের মাঝে শান্তিতে যাপন করতে চেয়েছে তার অতি সাধারণ জীবন। সুলতানী আমল, ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমলে শত প্রতিকূলতা ও বাঁধার মাঝেও বাঙালি নিজ স্বতন্ত্র অবস্থান ধরে রাখে। বাঙালি অসাম্প্রদায়িক, মানবিক, উদার ও সহিষ্ণু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সহঅবস্থান করেছে

Dhaka University Institutional Repository

যুগের পর যুগ। কিন্তু যখন বাঙালির চিরন্তন স্বত্তাকে বিদেশি শক্তি অপমান, অসম্মান করার সুযোগ নিয়েছে তখনই বাঙালি প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। সাহসী স্বত্তা নিয়ে মোকাবিলা করতে ভয় পায় নাই। প্রতিটা অন্যায়কে জবাব দিয়েছে স্বভাবজাত প্রতিবাদের ভাষায়। বাঙালি চরিত্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে কতটা প্রতিবাদী হতে পারে, কতটা বরাভয় হতে পারে তা লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম-

‘এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবোরে বিকল।’

শত মানবিক মনীষির জন্ম দিয়ে ধন্য হয়েছে এ দেশের মাটি। তাদের সৃষ্ট মানবতাবাদী, কাব্য গাথা আর সঙ্গীতে পূন্য হয়েছে এ বাংলা। অসম্প্রদায়িক, উদারপন্থী মুনী-ঋষীদের ভাবনা সংক্রমিত হয়ে বংশ পরম্পরায় বাঙালি জাতিকে পরিপুষ্ট করেছে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ চিন্তা কখনো এখানে শেকড় বিস্তার করতে সক্ষম হয় নাই। প্রাণবন্ত সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বাঙালি। বাঙালির অসাম্প্রদায়িক, মানবিক চেতনার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে বাঙলা গান। আর গান শত, হাজার কন্ঠে গেয়েছে বাঙালি শিল্পীরা, গানে গানে ধ্বনিত হয়েছে বাঙালির জয়গান, বাংলার জয়গান। পরাধীন বাঙালির শত, হাজার বছরের শৃঙ্খল মুক্তির গান গেয়েছেন শিল্পীরা। গীতিকার, সুরকার, শিল্পীদের সে প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ স্বার্থক হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। গানে গানে শিল্পীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে নিজেদের কণ্ঠকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের সেই দেশ-প্রেম, দায়িত্ববোধ, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও সততার সাহসী অবস্থান মুক্তিযুদ্ধকে গভীরভাবে ঋদ্ধ করেছে। মুক্তিযুদ্ধকে এক নান্দনিক সৌন্দর্যের মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল শিল্পী কণ্ঠের গান।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

ছালেহ মোহাম্মদ আরিফ (মেজভাইয়া)
শাবাবা আদনীন মুনলীন (কন্যা)
মাসাবা আদনীন সানলীন (কন্যা)
যাদের নিরন্তর ভালোবাসা, উৎসাহ, সহযোগীতা
আমাকে শক্তি ও সাহস যোগায়
আমার পথ চলাকে সহজ করে দেয়—

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নম্বর
ভূমিকা	১
প্রথম অধ্যায় : গবেষণার তাত্ত্বিক বিন্যাস	৭
ক) প্রকল্প প্রণয়ন ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ	৭
খ) গবেষণা পদ্ধতি ও উৎস	২৩
গ) গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত	২৩
ঘ) গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২৪
দ্বিতীয় অধ্যায় : বাঙালি জাতিসত্তা ও সঙ্গীত	২৫
তৃতীয় অধ্যায় : বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে সঙ্গীত ও শিল্পীদের অবস্থান	৩৫
চতুর্থ অধ্যায় : অবরুদ্ধ বাংলাদেশে শিল্পী, সুরকার, গীতিকারদের ভূমিকা	৯৩
পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলা বেতার ও শিল্পী, সুরকার, গীতিকারদের ভূমিকা	১২১
ষষ্ঠ অধ্যায় : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী সুহৃদদের ভূমিকা	১৬০
ক) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভারতের সঙ্গীত শিল্পীদের ভূমিকা	১৬০
খ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদের ভূমিকা	১৭০
সপ্তম অধ্যায় : বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও শিল্পীদের গান	১৭৯
উপসংহার	১৮৯
তথ্যপুঞ্জি	১৯২
পরিশিষ্ট-১: সাক্ষাৎকার	১৯৮
পরিশিষ্ট-২: বাঙালির মুক্তির গান ও মুক্তিযুদ্ধের গান	২৭৬

Abstruct/ভাবসত্তা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীত শিল্পীদের অবদান

মোস্তারী আহমেদ
সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির শত, হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গেছিল, মুক্তি পেয়েছিল বাঙালি জাতিসত্ত্বা। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস সকল শ্রেণি পেশার বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকবাহিনী নিধনে। সকল ধর্ম, বর্ণ, অবস্থান নির্বিশেষে সাত কোটি বাঙালির প্রতিরোধে বাংলার মাটি শত্রুমুক্ত হয়। বাঙালি জাতি প্রথমবারের মতো নিজেদের শক্তিতে স্বাধীনতার স্বাদ পায়।

সঙ্গীত বাঙালি জাতিসত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাধারণ বাঙালির হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট সব পর্যায়েই সঙ্গীত মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। একাধিক জাতি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সাধারণ বাঙালি সত্তা বৈশিষ্টগত দিক থেকে মানবিক, উদার, অসাম্প্রদায়িক ও পরমতসহিষ্ণু। ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালি বাংলার মাটিতে মিলেমিশে আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ। শ্রেণী বিভেদ বাঙালির মাঝে দেখা যায় অতি সামান্য। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান মিলেমিশে অবস্থান করে পাশাপাশি। ধর্মীয় আচার পালন করে তারা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই স্থানে। যুগ যুগ ধরে বাঙালির এই বন্ধন অটুট রয়েছে যার নিদর্শন এখনও কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি বাঙালি একইসাথে মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, হিন্দু ঐতিহ্যের অধিকারী।

বাঙালি চরিত্র বাঙলার আলো, হাওয়া, প্রকৃতি, নিসর্গ, জলবায়ু দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। প্রকৃতির উপকরণ নিয়ে বাঙালি নিজেদের দুঃখ-কষ্ট-হাসি-আনন্দকে উপজীব্য করে গানের সুর তোলে। গানের সেই সুর বাঙালিকে সুখী করে আবার দুঃখ ভারাক্রান্ত করে। বাঙালি মনের সব অনুভূতির প্রকাশ ঘটে সঙ্গীতের সুরে সুরে। আলোহীন নিস্তরঙ্গ সেই জীবনে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল একমাত্র বিনোদন। আর সেই গানেরও রয়েছে একাধিক রকমফের। অসংখ্য নামের গান সৃষ্টি করেছে বাঙালি। যেমন ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, মারফতি, বাউল, তর্জা, ধামাইল, ধুয়া, জারি, সারি, ভজন, পদ্মপুরাণ, কীর্তন, চটকা, সুরেশ্বরী, মাইজভান্ডারি, সন্ন্যাস, পাহাড়ি, সাওঁতালি, মনিপুরি, বারোমাসি, পাঁচালি, বিচ্ছেদি, গম্ভীরা ইত্যাদি। এছাড়াও আছে

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের গান, ঘাটুর গান, নৌকাবাইচের গান, ছাদপেটানোর গান, কৌতুক গান, গাজির গান, ফসলকাটার গান, পালকিওয়ালাদের গান, জেলেদের গান, শ্রমিকদের গান, বেদেদের গান, কাঠুরিয়াদের গান, হাতি খেদা গান, জুম গান, আদিবাসীদের গান, গাড়োয়ানদের গান, তাঁতিদের গান, ঘরামিদের গান, কুমোরদের গান, বৃষ্টি নামানোর গান, রোগ তাড়ানোর গান, শীতলা দেবীর গান, গাজনের গান, নাম কীর্তন, পদাবলী, মরমী, ফকিরদের গান ইত্যাদি অসংখ্য নামের গান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচে। গানগুলোর রচয়িতাদের নাম খুঁজে পাওয়া না গেলেও বংশ পরম্পরায় বাঙালির মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আছে।

গান বাঙালি জাতির ভাব প্রকাশের আদি মাধ্যম। বাংলায় যা কিছু লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় তার সবটাই গানে ও কাব্যে। এতে বুঝা যায় যে বাঙালির ভাবপ্রকাশের প্রধান ভাষা ছিল গান।

বাংলা গান প্রাচীনকাল থেকেই ছিল ভক্তিরসে সমৃদ্ধ। মুসলমানদের আগমনের পরে বাংলা সংস্কৃতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। উচ্চমার্গের কথা ও সুরে সৃষ্ট লালন গীতি পূর্বের গ্রাম্যতা পরিহার করে লোকঐতিহ্যের ধারাকে ধরে রেখেই বাংলা গানে আধুনিক রূপে ফিরে আসে। বিচিত্র সুর, ছন্দ ও লয়ে প্রকাশ হতে থাকে লালন সৃষ্ট সঙ্গীত যা সুধীজন ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন লোকসমাজে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। আধ্যাত্মচেতনা, মানবধর্ম, মানবপ্রেম আর অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে লালন গান পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে শিল্পীদের প্রতিবাদের সূচনা হয়েছিল বাউল, ফকির, সন্ন্যাসীদের গানে গানে। বাঙালির হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য আস্তে আস্তে সচেতনতা জাগানোর প্রথম কাজটি হয়েছিল শিল্পীদের সচেতন প্রয়াসে। তৈরি হতে থাকে স্বদেশ চেতনার গান। পঞ্চকবির গান এক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন অসংখ্য স্বদেশী গান। মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে সে সকল গানে। পরাধীন দেশের প্রতি ভালোবাসা আর বৃটিশদের দুঃশাসনে বাংলার মানুষের হতাশা, গ্লাণী, ক্ষেদ প্রকাশ পেয়েছে।

যেমন : ১। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি,

২। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।

৩। বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান।

৪। ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে।

তাঁর লিখা গান বাঙালিকে স্বদেশী আন্দোলনে শক্তি যুগিয়েছিল।

পরবর্তীতে আন্দোলন সংগ্রামের গতি প্রবলভাবে সঞ্চারিত হলে গানের কথা ও সুরেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নজরুল আবির্ভূত হন এই পর্যায়ে। তিনি তাঁর লিখা গানে, সুরে, বক্তৃতা-বিবৃতিতে বৃটিশদের আক্রমণ করেন সরাসরি। এর খেসারতও দিতে হয় তাকে। হয়েছিলেন বৃটিশের শত্রুতালিকার প্রথম সারির একজন। জেল খেটেছেন, পালিয়ে বেড়িয়েছেন, কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদ সংগ্রাম থেকে বিরত হন নাই। জেলে বসে হুংকার দিয়েছেন ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাষক এর দুঃশাসনকে। যেমন :

১। এই শিকল পরা ছল মোদের এই...

২। কারার ঐ লৌহ কপাট,

৩। জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত,

৪। দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে।

রাজনীতি সচেতন, সোচ্চার কবি নজরুল বাঙালির শৃংখল মুক্তির লক্ষ্যে লিখেছেন এবং গেয়েছেন বাঙালির মুক্তির গান। চণ্ডিদাসের ‘শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’ কথাটির প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল নজরুল ভীতিহীন কণ্ঠে সোচ্চার হয়েছিলেন বাঙালির মুক্তির দাবিতে। এর সাথে ছিল গণসঙ্গীত। অসংখ্য গণসঙ্গীতের সৃষ্টি হয় বৃটিশ বিতারণের ক্ষেত্র তৈরিতে। ১৯৪৭ সালে মুক্ত হয় ভারতবর্ষ। দুইভাগে বিভক্ত করে ভারতবর্ষকে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি অংশে ভাগ করে অসাম্প্রদায়িক বাংলা ও বাঙালি চরিত্রে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে চিরদিনে মতো শত্রুতার বীজ বপন করে বৃটিশ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

বাঙালি শিল্পীদের প্রতিবাদ শুরু হয় পাকিস্তান জন্মের সূচনা লগ্নেই। বাঙালির প্রতিবাদী, সংগ্রামী শক্তির উপর ভর করে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্ম নিলেও কুচক্রি পাকিস্তানি বিজাতীয় শাসকদের কুটচলের বিরুদ্ধে বাঙালি প্রতিবাদী শক্তিতে প্রতিরোধ গরেছিল। প্রথম প্রতিরোধের সূচনাকালেই শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের সোচ্চার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলা গর্জে উঠেছিল। দীর্ঘ প্রায় চব্বিশ বছরের প্রতিবাদী আন্দোলনের অগ্রসেনাদের মাঝে শিল্পীদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তারা স্বতন্ত্র ধারায় বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে গানে গানে পূর্ব বাংলার বাঙালির মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিল। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসকের ষড়যন্ত্র পরিকল্পনার নীলনকশা বাঙালি জানতে পেরেছিল শিল্পীদের প্রতিবাদী গানের মধ্য দিয়ে। গীতিকার, সুরকারদের অসাধারণ কথার গানে শিল্পীরা তাদের গায়কীর মধ্য দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করেছিল। একজন শিল্পীর গানে বাঙালি যতটা দ্রুত আকৃষ্ট হয় অন্য কোন কিছুর মধ্য দিয়ে তা সম্ভব না। রাজনীতিবিদদের পাশপাশি শিল্পীদের সচেতন অবস্থান বাঙালির প্রতি শাষকের বঞ্চনা আর শোষণের চিত্র সাধারণ বাঙালিকে প্রতিবাদী করেছিল।

শিল্পীদের এই সংগ্রাম শুধু শহরকেন্দ্রীক ছিল না। গ্রাম জনপদেও শিল্পীরা বিজাতীয় শোষকের নিপীড়ন, অত্যাচারকে গানে গানে, সুরে সুরে তুলে ধরেছেন। সাধারণ মানুষ গানের মধ্য দিয়ে সচেতন হয়েছে, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসকাল শিল্পীরা প্রবল ঘৃণায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সুরের আওয়াজ তুলেছে। দীর্ঘ প্রায় চব্বিশ বছরের অন্যায় শাসন, শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে গীতিকারের কলমে লিখা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে বাঙালির প্রতি বঞ্চনা আর ক্ষোভের কথা, দেশপ্রেমের কথা। সুরকার তার সুরের যাদুতে তুলে দিয়েছেন সে সকল গান শিল্পীর কণ্ঠে। শিল্পীদের অন্তর নিঃসৃত ভালোবাসায় সে সকল গান হয়ে উঠেছিল সাতকোটি বাঙালির মনের অব্যক্ত কথা। শহিদুল ইসলাামের লেখা ও সরদার আলাউদ্দীনের সুরে তেমন একটি গান :

জগতবাসী একবার আসিয়া বাংলাদেশকে যাও দেখিয়ারে।
সোনার বাংলা করলো শ্মশানরে
ওরে পাকিস্তানের বর্বর ইয়াহিয়ারে
মেশিনগান আর বুলেট বেয়নেট দিয়া॥...
মায়ের রক্ত বোনের রক্ত ভাইয়ের রক্ততে
ওরে মুক্ত করতে মুজিবরের বঙ্গভূমিকে
বাঙালি তুই দাঁড়া অস্ত্র নিয়া॥

সাধারণ বাঙালির আবেগ নিয়ে লিখা হয়েছে অসংখ্য গান। সে সকল গানে বাঙালি একাত্ম হয়েছে খুব সহজেই। তেমনি একটি গান লিখেছেন হরলাল রায়।

ও বগিলারে
কেনবা আলু বাংলাদেশে মাছের আশা নিয়া।
শিয়াল কান্দে, কুত্তা কান্দে, কান্দে ইয়াহিয়া
দুপুর রাইতে ডুপুর কান্দে ভুট্টু বড় মিয়া কান্দে, ও বগিলারে।

এমন সাধারণ কথার অসাধারণ গানে বাঙালি প্রাণবন্ত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস। জীবনের ঘোর অমানিশার সেই অন্ধকার সময়ে শিল্পীদের গানই ছিল বাঙালির একমাত্র ভারসার স্থল যা বাঙালিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর করেছে। নতুন করে জেগে উঠতে সাহায্য করেছে, প্রতিরোধ আর সংগ্রাম যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছে। মুক্তিযোদ্ধা, অবরুদ্ধ দেশের বাঙালি এবং বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবাসী বাঙালি শিল্পীদের গানের সুরে পেয়েছিল উদ্দীপনা আর শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার সাহস। এই সময়কার শিল্পী, সুরকার ও গীতিকারদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাদের মধ্যে মোঃ আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, রবীন্দ্রনাথ রায়, কল্যাণী ঘোষ, শাহীন সামাদ, রফিকুল আলম, কাদেরী কিবরিয়া, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, বিপুল ভট্টাচার্য, ডালিয়া নওশীন, সনজিদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক, মালা খুররম, রূপা ফরহাদ, তীমির নন্দী, নমিতা ঘোষ, অরূপ রতন চৌধুরীসহ অনেক শিল্পী। সুরকারদের মধ্যে ছিলেন সুজেয় শ্যাম, অজিত রায়, সমর দাস, মান্না হক, লাকী আকন্দ, অনুপ ভট্টাচার্য প্রমুখগণ। আর গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল লতিফ, হরলাল রায়, গাজী মাজাহারুল আনোয়ার, নঈম গওহর, শহিদুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক, মোস্তাফিজুর রহমান, শেখ লুতফর রহমান, আলতাফ

Dhaka University Institutional Repository

মাহমুদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আবদুল গণি বোখারী। যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুবল দত্ত, অবিনাশ শীল, ঝুমু খান, বাবুল দত্ত, তড়িৎ হোসেন খান, দিলীপ ঘোষ প্রমুখ। প্রচারিত গানের কিছু লিখা হয় পূর্ববাংলায় আর কিছু শরনার্থী জীবনে।

ভারতীয় শিল্পী, গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, গোবিন্দ হালদার, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, অংশুমান রায়সহ অন্যান্য বিদেশী শিল্পীদের পরিবেশনাও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

জনপ্রিয় শিল্পীদের গানের পাশাপাশি বাংলার নিভৃত পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিল্পী, সুরকার ও গীতিকারদের গানে, সুরে মুক্তিযুদ্ধ প্রাণ পেয়েছিল। অসাধারণ কথার সে সকল গান মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতার অসামান্য চিত্র তুলে ধরেছিল। অসহায় বাঙালির প্রাণে আশা আর প্রেরণা যুগিয়েছিল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও কিছুকাল বাঙালি একই আবেগ ও অনুভূতি নিয়ে অসংখ্য গান রচনা করেছে। সে সকল গান স্বাধীনতার গান হিসেবেই পরিচিত। তবে সেই অবস্থা বেশীদিন অব্যাহত ছিল না। বাঙালির আবেগ, অনুভূতির মাঝে ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে বাঙালি হারিয়ে ফেলতে থাকে তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির শ্রেষ্ঠ সময়কাল। বাঙালির গৌরবের, শৌর্য্য ও সাহসের পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের কাল। পরাধীন জীবনের শৃঙ্খল ও গ্লানী মোচনের কঠিন সে সময়কাল বাঙালির জীবনে একবারই এসেছিল। সে যুদ্ধে বাঙালি অংশ নিয়েছ স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বাঙালির ত্যাগে, সংগ্রামে, জীবনদানে মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব গাথা যেমন তৈরি হয়েছিল, পাশাপাশি ছিল নিরীহ, অসহায়, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ, অগণিত শিশুর আত্মাহুতি ও স্বজন, সম্পদ হারানোর এক করুণ নৃশংস ইতিহাস। বাঙালি আত্মপরিচয় রক্ষার কঠিন সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে পেয়েছিল স্বাধীনতা।

পরাধীন জীবনের দীর্ঘ সংগ্রামী অধ্যায় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিকে সাহসী প্রেরণা যুগিয়েছিল। পাকিস্তানের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈন্যবাহিনী ও তাদের উন্নত সমরাস্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালি লড়েছিল স্বল্প সংখ্যক হালকা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত এক বাহিনী নিয়ে। শক্তিশালী, সুদক্ষ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার বিকল্প কিছু ছিল না বাঙালির সামনে। বাঙালিকে জয়ী হতেই হবে। এ বিশ্বাস আর প্রত্যয় নিয়ে বাঙালি লড়েছে নয়টি মাস। অস্তিত্ব রক্ষায় বাঙালি জাতি লড়েছিল তার সর্বস্ব দিয়ে। সাত কোটি প্রাণবান বাঙালির মুক্তির চেতনা বাঙালিকে শক্তি যুগিয়েছিল।

আত্মপ্রত্যয়ী, অধিকার সচেতন বাঙালির অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ পরিণত হয়েছিল জনযুদ্ধে। অবরুদ্ধ বাংলার সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ, যুবক, কিশোর এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সকলে ঝাঁপিয়ে পরেছিল মাতৃভূমির সম্ভ্রম রক্ষার সে যুদ্ধে। হাজারো মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাঙালির স্বাধীন ভূ-খণ্ডের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়েছিল, ৩০ লাখ জীবনের বিনিময়ে বাংলার মাটি পুত-পবিত্র হয়েছিল। বিস্তির্ণ সবুজ মাঠ রক্তে লাল হয়ে পূর্ব-বাংলা স্বাধীন হয়েছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হওয়ার অসংখ্য ইতিহাস রয়েছে। দু'পক্ষের সমান ক্ষমতার লড়াইয়ে বীরত্ব আর শক্তি-সাহসে একপক্ষ অপর পক্ষকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। অথবা দূর্বলের উপর সবল যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে রাজ্য জয় করে, দুর্বল পালিয়ে জীবন বাঁচায়, হারায় তার ভূ-খণ্ডের অধিকার। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ সেই অর্থে সৃষ্টি করেছিল নতুন ইতিহাস।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল অসম এক যুদ্ধ যার একপক্ষ ছিল প্রবল পরাক্রমশালী, আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী, তাদের প্রতিপক্ষ ছিল নিরস্ত্র, দীর্ঘদিনের অধিকার বঞ্চিত পূর্ব বাংলার বাঙালি। দীর্ঘ প্রায় ২৪ বছরের শোষণ-শাসনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী যাদের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশে পরিণত করার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। তাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ভুলিয়ে দিয়ে নব্য পাকিস্তানি বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। সর্বস্ব হারানো বাঙালি

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে পালায় নাই, সে প্রতিবাদ করেছে, প্রতিহত করেছে, সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়েছে স্বৈরাচারী সেনাশাসনের বিরুদ্ধে। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্যময় বৈশিষ্ট্য এটাই। চেতনার লড়াইয়ে, মানবতা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে, অস্তিত্ব বাঁচানোর সেই লড়াইয়ে বাঙালি বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল। বিশ্বের পরাশক্তিকে পাশে নিয়ে পাকিস্তান নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল পূর্ব বাংলার বাঙালিকে। অস্তিত্ব মুছে দিতে চেয়েছিল বাংলার মাটি থেকে। সব হিসাব মিথ্যা প্রমাণ করে বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন আর সাহায্যে বাঙালি পরাজিত করেছিল শক্তিশালী পাকিস্তান বাহিনীকে। জয় হয়েছে বাংলার, জয় হয়েছে বাঙালির, জয় হয়েছে নির্যাতিত বিশ্ব মানবতার। বাঙালি তার শুদ্ধতা নিয়ে আত্ম-পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বের মানচিত্রে।

প্রতিটি শ্রেণি-পেশার বাঙালির অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ বেগবান হয়েছিল। ধনী-গরীব, আমলা, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র পেশাজীবী, কৃষক, শ্রমিক, মুটে-মজুর একাত্ম হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। অবরুদ্ধ দেশের বাঙালি, শরণার্থী বাঙালি, প্রবাসী বাঙালি নিজ নিজ অবস্থান থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছে। ১১টি সেক্টর সরাসরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছে। তারা বীর মুক্তিযোদ্ধা।

মুক্তিযুদ্ধে নয়টি মাস শরণার্থী মুক্তিযোদ্ধারা ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় নিজেদের তৈরি করে মুখোমুখি হয়েছে পাক-সেনাদের বিরুদ্ধে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবাসী বাঙালিরা সোচ্চার হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। তারা প্রচারণা চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনসচেতনতা তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন।

ভারত প্রত্যক্ষ সহায়তা না দিলে মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি কোনো পর্যায়ে যেতো তা কল্পনাতীত। তাদের অকৃত্রিম সাহায্য-সহযোগিতা বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে সফল পরিণতি দিতে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। প্রায় এক কোটি বাঙালি শরণার্থীর খাওয়া, পড়া, বাসস্থান, চিকিৎসা সুবিধাসহ ন্যূনতম মৌলিক চাহিদার সুবিধা গ্রহণ করেছিল ভারত সরকারের কাছ থেকে।

অবরুদ্ধ বাংলার কোটি কোটি বাঙালি প্রতিটা মুহূর্ত মৃত্যুর আশংকায় থেকেও তারা ভিটা-মাটি ছেড়ে যায় নাই। তারা সামনাসামনি প্রতিরোধ গড়তে না পারলেও মনে মনে পাক সেনাকে ঘৃণা করেছে আর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গোপনে সম্ভব সবকিছুই করেছে। কঠিন সেই ভয়ংকর দুঃসময়ে সকল বাঙালি দেশের মাটি ছেড়ে পালালে পাক সেনাশাসকের প্রত্যাশাই পূরণ হতো। কয়েক কোটি বাঙালি কৌশলে সহঅবস্থান করেছে অবরুদ্ধ বাংলায়। তারা পাকিস্তানিদের প্রকাশ্যে বিরোধীতা করার সুযোগ না পেলেও সর্বান্তকরণে ছিল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। জীবন আর পরিজনকে নিয়ে বাঁচার জন্য তাদের পাক প্রশাসনের অধীনে চাকুরি করতে হয়েছে, অনেকেরই পালিয়ে যাবার কোনো সুযোগ ছিল না। গোপন তৎপরতায় তারা চালিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাহায্য সহযোগিতা। মা-বোন, দাদী, নানী, ফেরিওয়ালা, রিক্সাওয়ালা এমনকি পথের ভিখারীও তার জমানো পয়সা দিয়ে বা তথ্য প্রদান করে বাঙালির সেই দুর্দিনে দেশের পক্ষে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তৎপর ছিলেন। অবরুদ্ধ বাংলাদেশে তাদের অবস্থানের কারণেই বাঙালির সাথে মাটির

Dhaka University Institutional Repository

বিচ্ছিন্নতা ঘটাতে পারে নাই পাক সেনাবাহিনী। হাতে গোনা কিছু বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান যারা রাজাকার, আলবদর, আলসামস নামে পাকবাহিনীকে সহযোগিতা করেছে। নিজের মা-মাটি আর মানুষের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে তারা মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল নিঃসন্দেহে। তাদের প্রতি জাতির ঘৃণার উদগিরন হবে যতদিন তাদের নাম উচ্চারিত হবে এই বাংলায়।

অন্যান্য শ্রেণিপেশার মানুষের মতো মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীত শিল্পীদের ছিল বিরাট ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে যুদ্ধের প্রাণ সঞ্চার করেছিল। একইসাথে যুক্ত করেছিল ভিন্নমাত্রা। শিল্পীদের পরিবেশিত গান মুক্তিযোদ্ধা, শরণার্থী বাঙালি এবং অবরুদ্ধ বাংলার মানুষকে সাহসী করতো। পাক সৈন্যদের জন্য শিল্পীদের গান ছিল যুদ্ধাস্ত্রের মতো। গীতিকারের লেখা গান, সুরকারের সুর আর শিল্পীদের গায়কী নয় মাস বাঙালিকে যুগিয়েছে প্রাণস্পন্দন। তারা তাদের দেশপ্রেম, সততা, দায়বদ্ধতা আর জীবনের স্বাভাবিকতা বিসর্জন দিয়ে ত্যাগে-নিষ্ঠায়, সোচ্চার কণ্ঠে গান গেয়েছেন। তারা একাধারে মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক আবার মুক্তিযোদ্ধা ও বাঙালির প্রেরণার উৎস। শিল্পীদের কণ্ঠও যুদ্ধক্ষেত্রের হাতিয়ার হতে পারে, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে দেখেছে তা বিশ্ব। খ্যাত-অখ্যাত শিল্পীদের পাশাপাশি দেশের প্রত্যন্ত জনপদের শিল্পীরাও গান লিখেছেন, সুর করেছেন, গেয়েছেন উত্তাল সে দিনে। গানে গানে শিল্পীরা বাঙালির দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তুলেছেন। গানের ভাষা, সুরে আর গায়কীতে ছিল যুদ্ধ জয়ের প্রত্যয় আর সেনাশাসক ইয়াহিয়ার প্রতি ক্ষোভ, ক্রোধ, ঘৃণা আর হুংকার। গানের ছন্দ মিলের জন্য ইয়াহিয়াকে কখনও বলা হয়েছে 'এহিয়া।'

মকসুদ আলী সাঁই লিখেছেন–

'সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের শ্মশান করেছে কে! কে! কে! কে!
এহিয়া তোমায় আসামীর মতো জবাব দিতে হবে'

আপেল মাহমুদ এর কথা ও সুরে- 'রক্তের প্রতিশোধ রক্তেই নেব আমরা'; আবুল কাশেম সন্দ্বীপ লিখেছেন–'হুশিয়ার হুশিয়ার হুশিয়ার'; সুজেয় শ্যামের সুরে 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম, মুক্তি ছাড়া তুচ্ছ মোদের এই জীবনের দাম'; গফুর হালি লিখেছেন– 'শহীদের মা কান্দেল্যে বটগাছ তলে বই'; ফনী বড়ুয়া লিখেছেন–'ফজল কাদের কণ্ডে আছে জাননি খবর।' গানের কথা আর সুরে বাঙালির সাহস, তেজ, ক্ষিপ্রতা ফুটে উঠেছে। শিল্পীদের কণ্ঠে গানগুলো প্রাণ পেয়ে সাধারণ বাঙালির অসহায়ত্ব দূর করেছে। শুধু প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সুরকারদের গানই গীত হয় নাই মুক্তিযুদ্ধে। বাঙলার প্রত্যন্ত জনপদের বাউল, কবিয়ালদের কণ্ঠও ধ্বনিত হয়েছিল। তাদের লিখা ও সুর করা গানে যেমন ছিল দেশপ্রেম তেমন ছিল গ্রামীণ বাংলার লোক সংস্কৃতির সঞ্জীবনী সুধা। মাঠের কবিয়াল, বয়াতী, জারি-সারি গানের রচয়িতাগণ মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তারা লিখেছেন অসংখ্য গান। তাদের কিছু গান সংগ্রামের উত্তাল সেই দিনগুলিতে গাওয়া হয়েছে একাধিকবার। গানগুলি কিছু রেকর্ড হয়েছে কিছু হয় নাই। রেকর্ড করা গানগুলো বাংলার গ্রামে-গঞ্জে প্রকাশ্যে বাজানোর কোনো সুযোগ ছিল

Dhaka University Institutional Repository

না। অনেক শিল্পী, সুরকার, গীতিকার সীমান্ত অতিক্রম করেন। তাদের গানগুলো বেজেছে স্বাধীন বাংলা বেতারে। সেই সূত্রে বাঙালিরা গানগুলি আবার শুনতে পেয়েছিল। সীমান্ত অতিক্রম করা শিল্পীরা গানগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে, মুক্তাঞ্চলে, শরণার্থী শিবিরে, ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রমে ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানে গাইতেন। অনেকে দেশের মধ্যে অবস্থান করে শত্রুর প্রত্যক্ষ নজরদারীর মধ্যে থেকেও গান লিখেছেন, সুর করেছেন। শিল্পীদের দিয়ে গোপনে সেই গান রেকর্ড করে পাঠিয়েছিলেন সীমান্তের ওপারে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। অসংখ্যবার সে গান বেজেছে যুদ্ধের নয়টি মাস। সে গান শুনে বিশ্বময় বাঙালি পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। অসহায় প্রহরে শক্তি যুগিয়েছে সেই গান। গ্রামীণ জনপদের স্বভাব গায়ক, আউল-বাউলদের রচিত গানও মানুষ শুনেছে অধীর আগ্রহে। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের প্রবাদ পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে লিখা হয়েছে অসংখ্য গান। শিল্পীদের কণ্ঠে প্রাণপ্রিয় নেতার প্রতি ভালোবাসা আর আবেগ ফুটে উঠেছে সেসকল গানে। সে সকল গানে আরো ছিল পাক হায়েনা শাষকের নিষ্ঠুরতার প্রতি ঘৃনা, ক্ষোভ আর ইয়াহিয়ার দম্ভের প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক কৌতুক। গানে গানে শিল্পীরা বাঙলার দামাল ছেলে, বুড়ো, কৃষক, শ্রমিক, নারী-পুরুষ সকলের প্রতি জানিয়েছেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরার আহ্বান।

শুধু বাঙালি শিল্পীরাই নয় দেশের বাইরে মানবতার পক্ষের শিল্পীরা আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ছিলেন বাঙালির প্রতি পাকিস্তানি হায়েনা শাষকের নিষ্ঠুর নিমর্মতার বিরুদ্ধে। তাদের উদাত্তকণ্ঠের আহ্বানে বিশ্ববরেণ্য শিল্পী সাহিত্যিকসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের মানবতা তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃতি ও গভীরতা মহাসাগর তুল্য। যার গভীরতা খুঁজে পাওয়া বা কুল কিনারা পর্যন্ত পৌঁছানো এক জীবনেও সম্ভবপর বলে ভাবা কঠিন। তথাপি একান্ত ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার কৌতুহল নিয়ে এম.ফিল অভিসন্দর্ভে বেছে নিয়েছিলাম "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' এর ভূমিকা" মুক্তিযুদ্ধের পরিণতির জন্য যে ঘটনাটিকে অন্যতম বলে চিহ্নিত করা যায়। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' ছিল তেমনি এক ঘটনা যার মধ্য দিয়ে বাঙালি জানতে পেরেছিল পাকিস্তানি অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনার প্রতিবাদে প্রথম সশস্ত্র পরিকল্পনার কথা। আলোড়ন সৃষ্টি করা ঐ ঘটনার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন অভিযুক্ত বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিচারের নামে সেনা-শাসকের প্রহসনের খেলা বাঙালির দিব্যচোখ খুলে দেয়। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন শেখ মুজিবুর রহমান। প্রচণ্ড গণআন্দোলন গড়ে তোলে বাঙালি অভিযুক্তদের মুক্তির লক্ষ্যে। আন্দোলনের ব্যাপকতা গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়ে শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য করে প্রবল পরাক্রমশালী এক নায়ক আইয়ুবের অন্যায়-শৃঙ্খল থেকে। শেখ মুজিব অভিষিক্ত হন গণমানুষের ভালোবাসার উপাধি 'বঙ্গবন্ধু'তে। অনুল্লেখ্য ও অনালোচিত বিশাল তাৎপর্যময় ঘটনাটিকে জানার গভীর আগ্রহ থেকে আমি কাজটি করেছি। পরবর্তীতে পিএইচ.ডি করার সুযোগ পেলে মুক্তিযুদ্ধের বিশাল ঘটনাবহুল মহাসমুদ্র থেকে বেছে নেই সঙ্গীত

শিল্পীদের মুক্তিযুদ্ধকালের কর্ম তৎপরতাকে। সাত কোটি বাঙালির ত্যাগে-সংগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ ছিল বিশাল এক জনযুদ্ধ। শিল্পী, সুরকার, গীতিকারদের সেই সময়কার দেশপ্রেম, দায়বদ্ধতা, ত্যাগের ঘটনাবহুল অধ্যায়টিকে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীদের অবদান' কর্ম মোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : এই অধ্যায়ে গবেষণার তাত্ত্বিক বিন্যাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ক) প্রকল্প প্রণয়ন ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ

খ) গবেষণা পদ্ধতি ও উৎস

গ) গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত

গ) গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় অধ্যায় : এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বাঙালি জাতিসত্তার সাথে সঙ্গীতের যোগসূত্র। সঙ্গীতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বাঙালির জীবনাচারে যুগ যুগ ধরে আচরিত অনুসঙ্গ হয়ে একাকার হয়ে আছে। বাঙালির হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, উৎসব পার্বন, মঙ্গলে-অমঙ্গলে সর্বত্র আচরনীয় সঙ্গীত। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়টিতে।

তৃতীয় অধ্যায় : বাঙালির সামাজিক জীবনের পাশাপাশি রাজনৈতিক জীবনেও সঙ্গীতের ভূমিকা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। পরাধীন জীবনের শৃঙ্খল মুক্তিতে শিল্পীদের গান অপরিহার্যতা প্রমাণ করেছে নিজ শক্তিতে। প্রতিটি সংকটে, সংগ্রামে, প্রতিবাদে, আন্দোলনে শিল্পীরা রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি অবস্থান নিয়ে মানুষকে শক্তি দিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন, প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। সচেতন শিল্পীরা অসাম্প্রদায়িক মানবিক আদর্শে প্রাণীত করেছেন বাঙালিকে। প্রগতীর পথে এগিয়ে নিয়েছেন বাঙালির অগ্রযাত্রাকে। সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের শেকড়ের সাথে বাঙালির অচ্ছেদ্য বন্ধনকে সুদৃঢ় ঐক্যে বেঁধে রেখেছেন শিল্পীরা। বাঙালির দীর্ঘদিনের মুক্তির সংগ্রামে শিল্পীদের অবস্থান এবং তাদের গানের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। বাঙালির হাজার বছরের পরাধীনতার ইতিহাসে সঙ্গীত শিল্পীদের গান বাঙালিকে স্বস্থি দিয়েছে, প্রশান্তি দিয়েছে, সুন্দর আগামীর স্বপ্ন দেখিয়েছে। বাঙালির সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে আকড়ে থাকার প্রেরণা দিয়েছে। বাঙালির মানবিক, অসাম্প্রদায়িক, উদার আর প্রগতীশীলতার মহান বাণী শিল্পীরা গানে গানে ছড়িয়েছেন গোটা বাঙলায়, ধাপে ধাপে প্রতিটি সংগ্রামের বন্ধুর পথে গানের সুরের আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে শিল্পীরা বাঙালিকে পথ দেখিয়েছেন–তা তুলে ধরা হয়েছে। সকল অমঙ্গল, হতাশা, ব্যর্থতাকে দূর করে শিল্পীরা বাঙালিকে যুগে যুগে শুনিয়েছেন সাম্য, ভ্রাতৃত্ব আর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মূলমন্ত্র। সঙ্গীতের আলোকে বাঙালি পথ চিনেছে ঘোর অমানিশায়।

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকে দুইভাগে আলোচনা করা হয়েছে। এক অংশে (চতুর্থ অধ্যায়) অবরুদ্ধ বাংলাদেশে অবস্থানরত শিল্পীরা তাদের গানের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন, গানে সুর দিয়েছেন এবং গান গেয়েছেন তা তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এখানকার তৈরি করা গান গোপনে পাঠানো হতো সীমান্তের ওপারে। শ্বাসরুদ্ধকর, আতঙ্কিত সেই পরিস্থিতিতে শিল্পীদের দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা, কর্মতৎপরতা নিষ্ঠা—যা ছিল বিস্ময়কর। অবরুদ্ধ বাংলাদেশে শিল্পীদের রচিত গান আর তাদের সংগ্রামমুখর সেদিনের কর্মকাণ্ড আলোচনা হয়েছে এ অংশে।

পঞ্চম অধ্যায় : এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে আক্রমনের মুখে সাধারণ বাঙালি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে সবাই আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে সীমান্ত অতিক্রম করে। সীমান্ত অতিক্রম করা বাঙালিদের মধ্যে শিল্পীদের বড় একটা অংশ ছিল। ভারতের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তারা গানে গানে সাংস্কৃতিক তৎপরতা চালিয়েছেন, তা আলোচনা করা হয়েছে। একই সাথে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধে একটি সেক্টরের সমান দায়িত্ব পালন করেছিল। স্বাধীন বাংলা বেতারের গানের বিভাগটি পুরো নয় মাসকাল শিল্পীদের সংগ্রামী গানে মুখর হয়েছিল। সে গান অবরুদ্ধ বাংলাদেশের বাঙালির কাছে ছিল সব হারানোর মাঝে একটু স্বস্তি, একটু প্রেরণা। অসামান্য আবেগে ভাসিয়েছিল বাঙালিকে শিল্পীদের গান। যদিও প্রকাশ্যে সে গান শোনার সুযোগ ছিল না। অসংখ্য গান রচনা হয়েছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তখন। সে সকল গান শিল্পীদের কণ্ঠে ছড়িয়ে পরে গোটা বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরে। গান বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। সে গান মুক্তি পাগল বাঙালিকে যেমন প্রেরণা যুগিয়েছে, ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের যেমন শত্রুর গোলার মুখে বুকটান করে দাঁড়াতে শক্তি যুগিয়েছে আবার শরণার্থী শিবিরের অসহায় উদ্বাস্তু বাঙালিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় গান যুদ্ধের সিগন্যাল হিসেবেও ব্যবহার হয়েছে। কোন্ গান কখন বাজবে তার উপর নির্ভর করে মুক্তিযোদ্ধারা গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করতো। মূলত ভারতে শরণার্থী শিল্পীদের কর্ম তৎপরতা তুলে ধরা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভারত সরকার, ভারতের শিল্পীদের সহযোগীতা এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বের বরেন্য শিল্পীদের সহযোগীতা ও অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

সপ্তম অধ্যায় : বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে শিল্পীদের গানের গুরুত্ব কতটুকু ছিল সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। তারপর উপসংহার সংযোজন করা হয়েছে। এরপর তথ্যপুঞ্জি। সর্বশেষে পরিশিষ্ট–(১) এ শিল্পী, সুরকার, গীতিকার, মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবীদের সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট (২) এ বাঙালির মুক্তির গান ও মুক্তিযুদ্ধের গান সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়
গবেষণার তাত্ত্বিক বিন্যাস

ক) প্রকল্প প্রণয়ন ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ

বাঙালি ইতিহাসের উত্থান-পতন, দখল-বেদখল, সংগ্রাম, বীরত্বের অসংখ্য ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কিন্তু কোনো ঘটনাই ১৯৭১ এর নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের সমতুল্য নয়। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ শুধু সশস্ত্র যুদ্ধই ছিল না। এই যুদ্ধ ছিল অন্যায়, অন্যায্যতার বিরুদ্ধে মানবিক বাঙালির শৌর্য ও সাহসের বীরত্বগাঁথা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির সর্বোচ্চ অর্জন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কাল বাঙালির শুদ্ধতম সময়কাল। পৃথিবীতে যে কয়টি দেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। এ যুদ্ধ ছিল আমাদের জাতিসত্তা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আত্মানুসন্ধানের লড়াই। এ লড়াই ও সংগ্রাম ছিল অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াই। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভুত ক্ষোভ ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। মুক্তির আকাঙ্খার বিস্ফোরণ ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধে, যা ছিল ধারাবাহিক স্বাধীনতার সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদী চেতনার ফসল।

দীর্ঘ ২৩ বছরের অধিককাল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির অধিকার কেড়ে নেয়ার সকল বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরুতেই শাসকগোষ্ঠীর চাপিয়ে দেয়া অন্যায় সিদ্ধান্ত ছাত্র, শিক্ষক, প্রগতিশীল চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিজনদের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে প্রতিহত করার সুদৃঢ় অবস্থান দেখেও তারা তাদের ষড়যন্ত্রের পথ থেকে বেড়িয়ে আসে নাই। একটা দেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে পারলে সে জাতিকে খুব সহজেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া সম্ভব। তাই, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই আঘাত করেছিল বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যের অংশ বাংলা ভাষাকে।

ভাষা আন্দোলন

শত শত বছর পূর্ব থেকে বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রাচীনকাল থেকে রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। আর ভাষা দিয়েই চেনা যায় একটি দেশের সংস্কৃতির রূপ। একটি জাতির মননশীলতা তৈরি হয় ভাষা দিয়েই। আর সমৃদ্ধ সেই বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিষিদ্ধ করার পায়তারা করে। বাঙালির বাঙালিত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে নতুন করে পাকিস্তানি বানানোর দুঃসাহস দেখানোর চেষ্টা করে।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী আর সংস্কৃতিজনরা প্রবল প্রতিবাদে তাদের ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছিল। শতকরা ৫৬% অধিবাসীর ভাষার ন্যায্য অধিকার অন্যায় আদেশে বাঙালিকে মানাতে তারা বাধ্য করতে পারে নাই। সমৃদ্ধ বাংলা ভাষার প্রাচীন ঐতিহ্য যাতে লিখা হয়েছে হাজার বছরেরও পুরানো প্রাচীন ইতিহাস, বাঙালির জাতিসত্তার সাথে এর অন্তর্লিনতা আর গভীরতা কোনো কিছুই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বুঝতে না চেয়ে বিভেদের দেয়াল তৈরি করেছিল। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দুই প্রান্তের জনগণের মাঝের দুরত্ব পরবর্তীতে কোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন পাকিস্তানি শাসকই ঘুচানোর চেষ্টা করে নাই। দীর্ঘ তেইশ বছরের অধিককালের শাসন কার্যক্রম দ্বারা দিন দিন বাড়িয়েছে। যার পরিণতিতে সৃষ্টি হয়েছে বৈষম্যের পাহাড়। যার বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে দুই পক্ষকেই।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা করেছে সংস্কৃতি কর্মীরা। আর তরুণ যুবকদের রক্ত আর প্রাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে রাষ্ট্রভাষার অধিকার। প্রাণের বিনিময়ে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয় পূর্ব বাংলায়, তার পথ ধরেই পরবর্তী পর্যায়ে সংঘঠিত হয় একের পর এক আন্দোলন সংগ্রাম। ভাষার জন্য বাঙালির রক্ত দান পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালিকে সম্মানিত করেছে। পৃথিবীতে ভাষার জন্য রক্ত দেয়ার একমাত্র ঘটনা ঘটেছিল পূর্ববাংলায় **১৯৫২** সালের **২১** ফেব্রুয়ারি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন "বাঙালি বাংলাদেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙালি তা নয়। বাংলা ভাষার ভেতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙালি।"[১]

বাংলা ভাষার জন্য রক্ত দিয়ে বাঙালি রাজপথ রঞ্জিত করেছিল, আদায় করেছিল মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার। হুমকি, ধামকি, টিয়ার শেল আর বন্দুকের গুলিতে তাদের সেই দাবি থেকে সরাতে পারে নাই পাক সেনাশাসক। দ্বি-জাতিতত্ত্বের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পাকিস্তানের উর্দুভাষী শাসকের অন্যায় ষড়যন্ত্রের শিকার সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে অবস্থান নিয়ে বাঙালি যে ভুলের পথে পা দিয়েছিল সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়েছে পুনরায় বুকের রক্তের বিনিময়ে বাঙালিকে। বাঙালির অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের হাজার বছরের ইতিহাসকে ফিরিয়ে এনে বাঙালি ফিরেছিল তার আপন ঘরে। একুশের রক্তাক্ত সেই অধ্যায়ে বাঙালির চিরন্তন প্রতিবাদী সত্ত্বা উচ্চকিত হয়েছিল। পথভ্রষ্ট বাঙালি সম্ভিত ফিরে আপন আলোয় পথ চিনেছিল নতুন করে। ফিরেছিল বাঙালি নিজ ঘরে। বাঙালির এই ফেরাকে বদরুদ্দীন ওমর যথার্থই বলেছেন 'বাঙালির ঘরে ফেরা।'[২]

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন: ১৯৫৪ সাল

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলায় প্রথম নির্বাচন। বাঙালিদের কাছে এই নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ক্ষমতাসীন সরকার নিজেদের ভরাডুবির আশংকায় নির্বাচন

---

১. সেলিনা হোসেন, নিজেরে করো জয়, সাহিত্য বিলাস, ২০১৩, পৃ. ৫৪

২. অনুপম সেন, আদি অন্ত বাঙালি, হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত বঙ্গ বাংলা বাংলাদেশ, সময় প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ২৮

বিলম্বিত করে। ১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের পরাজয় আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধিপত্যের বিরুদ্ধে জয়লাভের কৌশল হিসাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

পূর্ব বাংলায় শোষিত নিপীড়িত মানুষের নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, শহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানী যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসেবে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে নেতৃত্ব দেন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার জনগণের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সর্বস্তরের জনগণ নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর জন্য পূর্ব বাংলার শহর-বন্দর সর্বত্র উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করে।

সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত প্রচার কার্যক্রমে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার শংকিত হয়। তারা যুক্তফ্রন্ট সমর্থকদের ব্যাপক ধরপাকরসহ নির্যাতন নিপীড়ন করে আতংক তৈরি করে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের অপকর্ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সম্পদ লুট, বাংলার প্রতি অবজ্ঞা আর উদাসীনতা তুলে ধরে প্রচারণা চালায়। শাসকপক্ষ প্রচারণায় সরকারি সব সুবিধা কাজে লাগিয়েও নিজেদের পতন ঠেকাতে পারে নাই। বিপুল ভোটের ব্যবধানে যুক্তফ্রন্ট বিজয় লাভ করে যা ছিল পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ব্যালট বিপ্লব।

যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে সারা বাংলা আনন্দের জোয়ারে ভাসতে থাকে। মুসলিম লীগের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় তৈরি হয় এক নতুন ইতিহাস। মুসলিম লীগ পাকিস্তানের পরবর্তী সময়কালে আর কোনো দিন বিজয়ী হয়ে নতুন ইতিহাস তৈরি করতে পারে নাই পূর্ব বাংলায়।

নির্বাচনী ফলাফল সরকারকে খুশি করতে পারে নাই। তারা ফলাফল মেনে না নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ষড়যন্ত্রের কারণে বাঙালিদের এ বিজয় বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই।

ছয়দফা কর্মসূচি

১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার অসহায়ত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধী করে পূর্ব বাংলার বাঙালি। ভারতের আক্রমনের মুখে বাঙালির প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো কোনো অবস্থাই ছিল না। সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পরে পূর্ব বাংলা।

যুদ্ধের ১৭ দিন পূর্ব পাকিস্তান শুধু দেশের পশ্চিমঅংশ থেকেই বিচ্ছিন্ন ছিল না। সমগ্র বিশ্ব থেকে যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে বাঙালিরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। পশ্চিম পাকিস্তান বলে আসছিল পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা দেয়ার সার্বিক দায়িত্ব পশ্চিম পাকিস্তানের। যে কোনো জরুরী প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তান তাদের পাশে সার্বিক সহযোগীতা নিয়ে অবস্থান করবে। বাস্তবে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার বিষয়টি কখনই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে নাই। পূর্ব-বাংলাকে অরক্ষিত রাখা ও গুরুত্বহীন ভাবার কারণেই তারা সেটা করেছিল। ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হয়েছিল।[৩]

৩. ড. হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০১, পৃ. ২৫২

Dhaka University Institutional Repository

এমনি এক পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দ নতুন করে পূর্ববাংলাকে নিয়ে এবং পূর্ব বাংলার বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর উত্থাপিত স্বায়ত্তশাসনের দাবি ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর নতুন করে উচ্চারিত হতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশনে আওয়ামী লীগের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান 'বাঙালির বাঁচার দাবি' 'ঐতিহাসিক ছয়দফা' কর্মসূচি উত্থাপন করেন। কর্মসূচিটি উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই শাসক মহল ও রাজনৈতিক মহলে তা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে।

দেশ বিভাগের পর থেকেই বাঙালি জাতিসত্তাকে হেয় করা, অপমানিত করার ঘৃন্য কৌশল পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী অবলম্বন করে আসছিল। তারা দুই অঞ্চলের মানুষকে কখনোই সমমর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে নাই। এই ধরনের ঔপনিবেশিক আচরণ থেকে পূর্ব বাঙলাকে মুক্ত করাই ছিল ৬ দফার প্রধান লক্ষ্য। ছয় দফা ঘোষণা হবার পর বাঙালি তাকে মুক্তির সনদ হিসাবে গ্রহণ করে। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, পেশা নির্বিশেষে সকলকে মুক্তির লক্ষ্যে উজ্জীবিত করেছিল ছয় দফা। আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ছয় দফা প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে শেখ মুজিব এর সমর্থনে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা শহরে প্রচারণা চালান। প্রচারণা চলাকালীন প্রায় প্রত্যেক জায়গায় তিনি গ্রেপ্তার হন, জামিনে ছাড়া পান আবার গ্রেপ্তার হন, আবার জামিন পান। এই কর্মসূচির প্রচার চলাকালীন প্রথম তিন মাসেই শেখ মুজিবর রহমান আটবার গ্রেপ্তার হন।[৪] আইয়ুব সরকার ছয় দফা কর্মসূচির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। অস্ত্রের ভাষায় এর জবাব দেয়ার ঘোষণা দেয়। পাকিস্তান সরকারের শেখ মুজিবের ওপর দমন নিপীড়ন তাকে আরও জনপ্রিয় করার সাথে সাথে ছয়দফা কর্মসূচিকেও জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করেছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে প্রচার কাজে বাধা দিয়ে বিঘ্ন ঘটাতে থাকে পাকিস্তান সরকার। জেল, জুলুম, হত্যা নির্যাতন কোনো কিছু দিয়েই প্রচার কার্যক্রম ব্যাহত করতে সক্ষম হয় নাই। ছয় দফা কর্মসূচি সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য:

> ৬ দফা বাংলার শ্রমিক কৃষক, মজুর মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ, ৬ দফা শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার, ৬ দফা মুসলিম, হিন্দু, খৃষ্টান-বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙালি জাতির স্বকীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ আর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি—৬ দফার সংগ্রাম আমাদের জীবন মরণের সংগ্রাম।[৫]

শেখ মুজিব এবং তার সহকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ছয় দফা কর্মসূচি ব্যাপক সমর্থন পায় আর অতি সাধারন বাঙালি ছয় দফার মধ্যে তাদের বাঁচার স্বপ্ন খুঁজে পায়। Professor Rounak Jahan বলেন, "Six point movement whose main thrust was the demand of

---

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২-৬৩

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

autonomy for East Pakistan is regarded as the turning point in Mujibs rise to Charismatic leadership."[৬]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা যে বৈষম্যের শিকার হচ্ছিল, একই সাথে অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের দ্বারা ক্রমাগত পিষ্ঠ হচ্ছিল সাধারণ বাঙালি এ ব্যাপারে প্রথমদিকে ততটা সচেতন ছিল না। আস্তে আস্তে সাধারণ বাঙালি, রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, ব্যবসায়ী, সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা যতটা তীব্রভাবে এ বৈষম্যমূলক আচরণ ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিল, সাধারন মানুষ ততটা ছিল না। এ প্রসঙ্গে মামলায় অভিযুক্ত ৩৫ নং অভিযুক্ত আবদুর রউফ লিখেছেন, "আমরা যারা সামরিক বাহিনীর চাকুরিতে স্বল্প সংখ্যক বাঙালি সদস্য আছি, আমরা যত তীব্রভাবে পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ এবং বিমাতাসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে, সাধারন মানুষ কিন্তু ততটা বিক্ষুব্ধ কিংবা আহত নয়। কারণ আমাদের মতো প্রত্যক্ষভাবে তাদের আত্মসম্মানে ঘা লাগার মতো ঘটনা সচরাচর ঘটতো না। এটা অবশ্য তাদের দোষ বা দূর্বলতা নয়, পশ্চিম পাকিস্তান ছিল সাধারন মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরের ব্যাপার। শোষনের চিত্রও তাদের সামনে জ্বল জ্বল করে না। ফলে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে আমাদের অনুভূতি যত তীব্র সাধারন মানুষের তেমন ছিল না।"[৭] তাই "পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক বাঙালি সেনা ও অফিসার ট্রাইব্যুনালের মামলা শুরু হওয়ার বারো বছর পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই প্রস্তুতি ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের। মধ্য ষাট পর্যন্ত এই সামরিক বিদ্রোহের আয়োজনের সাথে প্রথমদিকে কোনো রাজনৈতিক নেতা বা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে শেখ মুজিব, মাওলানা ভাষাণীসহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি রাজনৈতিক নেতা ও কর্নেল (অব:) ওসমানী এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাথে পরবর্তী পর্যায়ে তাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।"[৮]

বাংলার স্বাধীনতা কিভাবে কোন পথে আসতে পারে তা নিয়ে দেশ প্রেমিক বাঙালিরা এক সময় ভাবতে শুরু করে। সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালিরা চিন্তা করেছিল সশস্ত্র পন্থাই হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার একমাত্র পথ, শুধুমাত্র সশস্ত্র পন্থায় আগালে তা লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হতে পারে সে চিন্তাও তাদের মধ্যে কাজ করে। তাই তারা একজন রাজনৈতিক বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, যে নেতৃত্বের গুণে বাঙালিরা স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে।

বাঙালিদের দৃষ্টি তখন শেখ মুজিবের দিকে। তিনি ইতিমধ্যে নিজেকে বাঙালির আশা আকঙ্খার মূর্ত প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই স্বাধীনতার চিন্তার সাথে মুজিবের নামটি

---

৬. Bangladesh Politics Problems and Issues, UPL, Dhaka 1980, p. 27

৭. আবদুর রউফ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন, প্যাপীরাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩১

৮. ফয়েজ আহমদ, 'আগরতলা মামলা', শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। পরিকল্পনাকারীরা সশস্ত্র পরিকল্পনার বিস্তারিত শেখ মুজিবকে অবগত করেছিলেন। শেখ মুজিব তাদের পরিকল্পনায় সম্মতি দিয়েছিলেন।[৯]

বঙ্গবন্ধুর সম্মতি নিয়েই এই সশস্ত্র পরিকল্পনা এগিয়ে যায়। পরিকল্পনাটি অত্যন্ত গোপনীয় রাখার জন্য পরিকল্পনাকারীরা কারা তাদের সাথে জড়িত আছে তাও তারা জানতেন না। নিজ নিজ করণীয়টুকু জানা ছাড়া তাদের পক্ষে পূর্ণ পরিকল্পনা জানার সুযোগ ছিল না, কারণ কোনো বিশেষ ব্যক্তির মাধ্যমে সরকারের কাছে বিদ্রোহ প্রচেষ্টার সমস্ত খবর ফাঁস হয়ে যেতে পারে সেই সতর্কতা অবলম্বনের জন্য।

বিদ্রোহের স্বাভাবিক নিয়মেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল।[১০] গোপনীয়তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ৩ নং সাক্ষী আমীর হোসেন (এয়ার ফোর্সের প্রাক্তন কর্পোরাল) এর মাধ্যমে সশস্ত্র পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। তিনি ছিলেন মামলার ২নং অভিযুক্ত মোয়াজ্জেম হোসেনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও কাছের মানুষ। বিদ্রোহ পরিকল্পনার সকল ঘটনা ছিল তাঁর নখ দর্পনে। মূলতঃ তিনি ছিলেন সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী। সরকারপক্ষ অভিযোগ প্রমানের জন্য তার উপর নির্ভর করেছিল। তিনি সরকারের পক্ষ হয়ে তার সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিশ্বস্ততার সাথে তা রক্ষা করেছিলেন। তিনি ছিলেন খুব চতুর, ডিফেন্স টিম শত জেরা করেও তাকে কাবু করতে সক্ষম হয় নাই। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে করাচি, ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় তিনি বিপ্লবীদের পক্ষে যা কিছু করেছিলেন সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে ফাঁস করে দেন। সরকারি অভিযোগ নামায় লিপিবদ্ধ প্রায় সকল অভিযোগ তাঁকে দিয়ে সরকার পক্ষ আদালতে প্রমাণ করে।[১১] একই সাথে পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার কাছে বিভিন্ন উৎস থেকে বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়।[১২]

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কতিপয় সিএস পি অফিসার সামরিক বাহিনীর কয়েকজন কর্মরত এবং প্রাক্তন কর্মকর্তা,কর্মচারী এবং বেসামরিক নাগরিকের গ্রেপ্তার সম্পর্কে ব্যাপক কানাঘুষা চলতে থাকে। ঐ মাসের শেষার্ধে গ্রেপ্তারকৃত কামালউদ্দীন আহমেদ ও সুলতান উদ্দীন আহমেদ নামক দুইজন সাবেক সামরিক কর্মচারীর পক্ষ হতে অমানুষিক নির্যাতনের অভিযোগ করে ঢাকা হাইকোর্টে রীট পেশ করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট আটক ব্যক্তিদ্বয়কে অবিলম্বে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তর এবং তাদের উপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ পরীক্ষা করার জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেন।

---

৯. অভিযোগ নামা, Armed Quest for Independense, Colonel Shawkat Ali, আগামী প্রকাশন,২০০১, P. 135-171

১০. বিস্তারিত কর্নেল শওকত আলী, Armed Quest for Independence. আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, আরো স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রস্তুতি, আগরতলা মামলার অপ্রকাশিত জবানবন্দী, মুহাম্মদ শামসুল হক, বলাকা, মোমিন রোড চট্টগ্রাম, ২০০৯, পৃ. ১৮

১১. কর্নেল শওকত আলী, প্রাগুক্ত, P. 99-100, আরো মুহাম্মদ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১২. মুহাম্মদ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২৩

০১-০১-১৯৬৮ তারিখে সর্ব প্রথম আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার একটি প্রেসনোটের মাধ্যমে কয়েক জনকে গ্রেফতারের সংবাদ পরিবেশন করে। সংবাদটি ০২-০১-১৯৬৮ তারিখের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১৩] ৬ জানুয়ারি ১৯৬৮ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে প্রকাশিত এক প্রেসনোটে[১৪] এ কথা বলা হয় যে, ডিসেম্বর ১৯৬৭, পূর্ব পাকিস্তানে উদঘাটিত জাতীয় স্বার্থ বিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে দুইজন সি এস পি অফিসারসহ ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৮ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র দফতরের অন্য একটি প্রেসনোটে[১৫] কথিত এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের জড়িত থাকার অভিযোগ করা হয়। অতঃপর পূর্বে দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তারকৃত এই সব সামরিক ও বেসামরিক লোকদের দেশরক্ষা আইনের পরিবর্তে ১৮ জানুয়ারি ১৯৬৮ তারিখে আর্মি নেভী অ্যান্ড এয়ার ফোর্স আইনে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।[১৬] মোট ১০০ অনুচ্ছেদ সম্বলিত মামলাটি তৈরি করতে সরকার দীর্ঘ সময় নেয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য কাগজপত্র, দলিলপত্র, নথিপত্র এবং যেকোন রকমের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য গোপনে সরকারি অফিসারদের নির্দেশ দেয়া হয়। জানুয়ারি মাসে সরকার এ ব্যাপারে প্রথম বিবৃতি দেয়ার আগে অভিযুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তিকেই আটক করা হয়। কয়েকজন ছাড়া বাকি সবার উপর স্বীকারোক্তি আদায় এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য আদায়ের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে অশেষ নির্যাতন চালানো হয়। প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবার পরিজনদের পেছনে সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন লাগানো হয় যাতে তারা যত বেশি সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। সাদা পোশাকের গোয়েন্দারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বাড়িতে গিয়ে অভিযোগমূলক তথ্য সংগ্রহে দিনের পর দিন কাজ করেন। সময়, অর্থ, জনবল এতবেশী বরাদ্ধ করেছিল সরকার যার পক্ষে মওদুদ আহমেদ লিখেছেন, "কেবল এই মামলার ভিত্তি প্রস্তুত করতে পাকিস্তান সরকারের ব্যয় হয় দশ লক্ষাধিক রূপী।"[১৭]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রথম থেকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি যেমন ISI (ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টিলিজেন্স) এবং CIB (সেন্ট্রাল ইন্টিলিজেন্স ব্যুরো) মামলার তদন্ত কাজ পরিচালনা করে। ISI ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীনস্থ সংস্থা এবং CIB ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অধীনস্থ। মামলার অভিযোগ প্রনয়নের দায়িত্ব দেয়া হয় সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের JAG (জাজ এডভোকেট জেনারেল) ব্রাঞ্চকে। তারাই আনুসাঙ্গিক কাগজপত্র এবং

---

১৩. Colonel Shawkat Ali, Armed Quest for Independence, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, p. 107. আরো Daily Azad ০২.০১.১৯৬৮, ন্যাশনাল আর্কাইভস, বাংলাদেশ।

১৪. প্রাগুক্ত, pp. 108-111, আরো বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ২৯৮-৩০০

১৫. Colonel Shawkat Ali, প্রাগুক্ত, P. 112, আরো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০১

১৬. Colonel Shawkat Ali, প্রাগুক্ত, P. 112

১৭. মওদুদ আহমেদ, বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, অনুবাদ-জগলুল আহমদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯২, পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষ্য প্রমাণ তৈরি করেছিল। যা পরবর্তীতে সরকার পক্ষ ট্রাইব্যুনালে হাজির করেছিল। শুরুতে একটি মিলিটারী ট্রাইব্যুনাল গঠন করে সকল আসামীদের বিচার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু তা করতে হলে প্রচলিত আইনের অনেক সংশোধন প্রয়োজন হতো। কারণ প্রচলিত আইনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের এবং বেসরকারি লোকদের একসঙ্গে বিচার করা সম্ভব ছিল না। আইউব খান তাই মিলিটারী ট্রাইব্যুনাল গঠন করে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিল। এতে করে আইউব খানের অসৎ উদ্দেশ্য বাঙালিদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে ভেবে মিলিটারি ট্রাইব্যুনালের প্রস্তাব বাতিল করা হয়। পরে তিন জন বেসামরিক বিচারক দিয়ে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়।[১৮]

১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) ১৯৬৮ (অর্ডিন্যান্স নং ৫-১৯৬৮) বলে সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের নেতৃত্বে ও বিচারপতি জনার মুজিবুর রহমান খান ও বিচারপতি জনাব মুকসুমুল হাকিমকে নিয়ে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন।[১৯] আইউব খান ঝুঁকি নিতে চাননি, তাই শাস্তি নিশ্চিত করতে তিনি ফৌজদারী কার্যবিধিতে এবং সাক্ষ্য আইনের অনেকগুলি সংশোধনী এনে বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ঠ আইন মোতাবেক এই ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কোনো সুযোগ ছিল না। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মাধ্যমে শেখ মুজিবসহ যে ৩৫ জনকে মামলার আসামী করা হয় তারা ছাড়া মোট ১১ জন রাজসাক্ষী হতে রাজি হওয়ায় তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে এমন ক্ষমতা দেয়া হয় যাতে মামলার সাক্ষী থাকুক আর না থাকুক শাস্তি যেন নিশ্চিত হয়। ট্রাইব্যুনালের রেজিষ্ট্রারকে লাহোর হাইকোর্ট থেকে আনা হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও রেজিষ্ট্রার ২ জনই ছিলেন পাঞ্জাবি।[২০]

বিশেষ ট্রাইবুন্যাল যদিও একটি বেসামরিক কোর্ট ছিল কিন্তু এর যাবতীয় পরিবেশ ছিল সামরিক আদলের। এর আদালত কক্ষ স্থাপন করা হয়েছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। সেনাবাহিনীর বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কাজ করতো। অভিযুক্তদের এবং বেশ কয়েকজন সাক্ষীকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক হেফাজতে রাখা হয়েছিল। এসব আয়োজন দেখে মনে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, বিচারের নামে একটি প্রহসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিচারকার্য পরিচালনা করে বাঙালিদের বিপক্ষে রায় দেয়ার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছে।[২১] ফলে অভিযুক্তরা ন্যায়বিচার পাবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। দেশের উভয় অংশের বার এসোসিয়েশনে এ সমস্ত বিধান ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি করে এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে এই বিধান সংশোধনের পক্ষে প্রস্তাব

---

১৮. Colonel Shawkat Ali, প্রাগুক্ত, pp, 88-90

১৯. প্রাগুক্ত, P. 90

২০. প্রাগুক্ত, pp, 88-90

২১. প্রাগুক্ত, P. 90-91

গ্রহণ করা হয়। পিটার হ্যাজেল হার্স্ট ঢাকা থেকে এই আইনের সমালোচনামূলক প্রতিবেদন লন্ডনের "দি টাইমস" পত্রিকায় প্রকাশ করলে তা প্রথমবারের মতো বর্হিবিশ্বের গোচরে আসে। এ ছাড়াও অধ্যাদেশের আরো কতগুলো বিধান ছিল, যা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত আইন ও পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র ধরনের। যেমন জামিনের অধিকার, আপীল, জুরী কর্তৃক বিচার পক্ষ বিচ্ছিন্নতা, ইত্যাদি। এ সমস্ত বিধানের সমালোচনা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তা জনগণের নজরে আসে।[২২]

আগরতলা মামলা ঘিরে সরকারের যে উদ্দেশ্য ছিল তাকে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের পক্ষে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অভিযুক্ত সকলেই তাদের আইনজীবীদের অদৃশ্য অভিন্ন কৌশল অবলম্বনের কারণে বলিষ্ঠভাবে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেন। অবশ্য অভিযুক্তদের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, জনগণকে সঠিক ঘটনা জানানোর প্রয়োজন রয়েছে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে অভিযুক্তদের দেশপ্রেমমুলক বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানানো উচিৎ। লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেন সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁর অনুগত কয়েকজন নিয়ে তিনি স্বীকার করবেন, "আমরা দোষী বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করেছি। সুযোগ পেলে ভবিষ্যতেও করবো।"[২৩]

অভিযুক্তরা যদিও নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেছে, তথাপি মূল ঘটনা তখন কারোই অজানা ছিল না, পূর্ব বাংলার জনগণ বুঝেছিল দেশপ্রেমিক বাঙালিরা প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র পরিকল্পনা গ্রহণ করছিল। তথাপি অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরা অত্যন্ত কৌশলে মামলাটিকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন এবং সরকারের অসৎ উদ্দেশ্য পত্রিকাসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার করেন। তাছাড়া সরকারের হাতে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণাদিও ছিল না। মওদুদ আহমদের ভাষ্যমতে, "উপমহাদেশের ফৌজদারী আইন এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন যে কোনো লোকের পক্ষে এটা বলা কঠিন হবে না যে, উল্লিখিত অভিযোগগুলি দিয়ে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা কঠিন। জনরব এবং পরোক্ষ প্রমাণ ভালো প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হয় না এবং জনশ্রুতির উপর রেকর্ডকৃত বিবৃতি আইনের দৃষ্টিতে ষড়যন্ত্র হিসেবে অচল বলে ধরে নেয়া হয়।"[২৪] উক্ত বইতে আরো লিখা হয়েছে, "মাসের পর মাস প্রতিদিন সংবাদ পত্রে এই ষড়যন্ত্র মামলার ধারা বিবরণী প্রকাশিত হয়। মামলার আরজি এবং সাক্ষীদের সওয়াল জবাব পাঠকেরা প্রতিদিন আগ্রহ সহকারে পাঠ করতে থাকেন। জনসাধারণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে থাকে যে কতিপয় লোক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থে কিছু তৎপরতা চালাতে গিয়ে মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন। তারা জানতে পারেন কিভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে মুক্ত

২২. মওদুদ আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

২৩. মোস্তাক আহমেদ, লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা, প্রকাশক মোস্তাক আহমেদ ৫/এ নিউ সার্কুলার রোড, সিদ্দেশ্বরী রোড, ঢাকা ২৪-০৩-১৯৮০, পৃ. ০৮

২৪. মওদুদ আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

করতে চেয়েছিলেন। একটি সশস্ত্র বিপ্লব এবং অস্ত্র শস্ত্র গোলাবারুদ সংগ্রহে কী পরিমাণ ঝুঁকি তারা নিয়েছিলেন। প্রতিদিন তারা তাদের উপর আরোপিত অবিচার ও শোষণের ঘটনা এবং তা নিরসনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার বিস্তৃত বিবরণ জানতে উন্মুখ হয়ে থাকতেন।"[২৫]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আইউব সরকারের উদ্দেশ্য পূরণতো করেই নাই বরং তা বুমেরাং হয়ে আইউবের ভরাডুবি ঘটাতে এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে নির্লজ্জের মতো পালাতে বাধ্য করে। রাও ফরমান আলী খান লিখেছেন, "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আইউব সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হলেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, অন্য যে কোনো কিছুর চাইতে এই মামলা পাকিস্তানের সংহতির ব্যাপারে অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হয়েছিল। উদঘাটিত ষড়যন্ত্রের আলোকে মামলাটি সাজানো হয়েছিল।"[২৬]

মামলার অভিযোগ নামায় অনেক অসংলগ্নতা থাকায় এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয় যে, অনেক অভিযোগই ছিল বানোয়াট এবং পরস্পর বিরোধী। যদিও সরকার পক্ষ মামলা তৈরি করতে দীর্ঘ সময় নেয়, তারপরও অভিযোগ নামায় সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলার জনগণের কাছে। তথ্যাদির বিবেচনায় অভিযোগনামা খুব একটা জোরদার ছিল না। মিথ্যা, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি ছিল মামলাটিতে খুব বেশি। অভিযোগকারীরা মামলার গভীরতা অনুধাবন করতে না পেরে মিথ্যা তথ্য সংযুক্ত করে মামলাটিকে প্রহসনে পরিনত করে। আর মামলার প্রচারণায় সরকার এত বেশি অর্থ ব্যয় করে যে, পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে তা অতিরঞ্জন হিসেবেই প্রতিভাত হয়।[২৭] শেখ মুজিবের ব্যক্তি ইমেজ আর ছয়দফার জনপ্রিয়তা আর গ্রহণযোগ্যতাকে নস্যাত করার পাকিস্তান শাসক শ্রেণির উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত ষড়যন্ত্র ছিল আগরতলা মামলা।

১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট গণআন্দোলন থেকে যে গণঅভ্যুত্থান ঘটে সেই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন বাংলা ও বাঙালির মুক্তিদাতা আর আইউব খান হারান তার এক দশকের ক্ষমতা। পূর্ব বাংলার পরিবেশকে অস্থির করে তুলেছিল মামলাটি। ছাত্র জনতা আইউব খানের দুরভিসন্ধি উপলব্ধি করতে পেরে তাঁর মুখোশ উম্মোচন করার শপথ নেয়। পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। আইউবের মসনদের ভিত্তি কেঁপে ওঠে। মামলা শেষ না হতেই গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। শেখ মুজিব বুঝেছিলেন যে, ভাষাণীর মত প্রথম শ্রেণির গণসম্পৃক্ত কোনো নেতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা না নিলে জনগণের আন্দোলন অগ্নিমুখী হয়ে গণঅভ্যুত্থানে পরিনত হবে না। শেখ মুজিবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মওলানা ভাষাণী গণআন্দোলনে অসামান্য ভূমিকা রাখেন। পুরো

---

২৫. মওদুদ আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০

২৬. রাও ফরমান আলী খান, বাংলাদেশের জন্ম, ভূমিকা: মুনতাসির মামুন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২১

২৭. মওদুদ আহমেদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩, ৯০

আন্দোলনকালীন সময়ে তিনি প্রতিবাদী জনতার সাথে একাত্ম হয়ে ছিলেন। তার সেই অবস্থানের কারণেই প্রচণ্ড গণআন্দোলন দ্রুতই গণঅভ্যুত্থানে পরিনত হয়েছিল। তিনি তাঁর বিখ্যাত ঘেরাও আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে ব্যতিব্যাস্ত করে তোলেন।

আন্দোলন সমগ্র পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পরে বিস্ফোরনোন্মুখ হয়ে ওঠে। নভেম্বর-ডিসেম্বরের প্রতিটি দিনের প্রতিটি ঘটনা ঘটেছিল ব্যাপক ধ্বংস্তাত্বক আকারে। নেতৃত্ব পর্যায়ের অটল অবস্থানের কারণে প্রতিদিন গণআন্দোলনে সমর্থন বাড়তেই থাকে। ডিসেম্বর মাস জুড়ে যা কিছু প্রতিবাদ প্রতিরোধ, আন্দোলন সংগ্রাম পরিবেশ পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল সরকার তা কোনোভাবেই অনুধাবন করতে পারে নাই।

তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিক সংগঠন ডাক গণঅভ্যুত্থানে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ রাজনৈতিক কর্মী সকলে একাত্ব হয়েছিল। এই সময় নতুন নতুন স্লোগান তৈরি হয়েছিল যা বাঙালির লক্ষ্যকে সুনির্দিষ্ট পথের দিকে ধাবিত করে। সকল বাধা নিষেধ ভেঙ্গে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে রাজপথ প্রকম্পিত করে উচ্চারিত হয়েছিল 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব।'

রাজপথ কাঁপানো সেই মিছিলে ক্রোধে উন্মত্ত সরকারি নির্দেশ প্রাপ্ত পুলিশ গুলি চালায়। ২০ জানুয়ারি নিহত হয় ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান(আসাদ)। ২৪ জানুয়ারি ঢাকা শহরে ঘটে অভূতপূর্ব ঘটনা। এ দিনটিকে পরবর্তীতে গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মানুষের ঢল নেমেছিল রাস্তায়। গুলিতে নিহত হন মতিউর রহমান।

ঢাকা শহরের উত্তপ্ত পরিস্থিতি নাগালের বাইরে গেলেও আইউব খান নমনীয় হয় নাই। উপরন্তু কারাগারের সুরক্ষিত নিরাপত্তার মাঝে ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক নিরাপত্তা রক্ষিদের হাতে গুলিবিদ্ধ হন। এই হত্যাকাণ্ড পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রনের বাইরে নিয়ে যায়।

১৭ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের রিডার ড. শামুসুজ্জোহা ছাত্রদের বুঝিয়ে শান্ত করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে পাকিস্তানি সেনারা তাকে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। মুহূর্তে ঘটনাটি ঢাকাসহ সর্বত্র প্রচার হয়ে যায়। সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে জনতার ঢল নামে রাস্তায়। ছিন্নমূল মানুষ কারফিউ ভঙ্গ করে সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে যায়। আক্রমনের ভয়ে তাৎক্ষনিক আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে সরকার।

২০ ফেব্রুয়ারি সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হয়। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি। ১৯৬৯ সালে আক্ষরিক অর্থেই শহিদ দিবস হয়েছিল ২১ ফেব্রুয়ারি। ঐ ২১ ফেব্রুয়ারি সপ্তাহ জুড়ে সারা বাংলায় মিছিল প্রতিবাদ বিক্ষোভে শহিদ হয়েছিল নাম না জানা অনেক বাঙালি। গণআন্দোলনের মুখে সরকার ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে।

Dhaka University Institutional Repository

২২ ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্টের দিকে হাজার হাজার মানুষের মিছিল নেমেছিল রাস্তায় মুজিবকে ছাড়িয়ে আনতে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খবর আসে সেনাবাহিনী শেখ মুজিব ও অন্যান্য বন্দীদের ছেড়ে দিয়েছে, অর্থাৎ দিতে বাধ্য হয়েছে।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে আসাদ, মতিউর, রুস্তম, মকবুল এবং পরে সার্জেন্ট জহুর, ডঃ জোহা, আনোয়ারসহ অনেকের রক্তের বিনিময়ে বাঙালির প্রিয় নেতাকে সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে ২২ ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত করা হয়।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনা দেয়। ১০ লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ডাকসুর ভিপি ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ বাংলার জনগণের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

শেখ মুজিব ২৩ ফেব্রুয়ারি সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের দশ লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে দেওয়া সংবর্ধনার জবাবে বলেছিলেন, "তোমরা যারা রক্ত দিয়ে,জীবন দিয়ে কারাগার থেকে আমাকে মুক্ত করেছ, যদি কোনো দিন পারি নিজের রক্ত দিয়ে তোমাদের সেই রক্তের ঋণ শোধ করব।"[২৮]

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

পাকিস্তানের ২৩ বছরের জীবনকালে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল অবিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম ও শেষ নির্বাচন। আইউব খান ক্ষমতা গ্রহণ করেই জনগণের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। সারাদেশে সামরিক শাসন জারি করেন, কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ শাসন করবেন বলে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার আর যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির এ নির্বাচনে ৫ অক্টোবর ১৯৭০ জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের নির্বাচন ঝড়ের কারণে তা পিছিয়ে ১৭ জানুয়ারি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।[২৯]

২ লক্ষ লোকের প্রাণহানি,জনজীবন মারাত্মকভাবে আক্রান্ত আর সম্পদের ধ্বংস্তুপের মাঝেই বঙ্গবন্ধু তার নির্বাচনী প্রচারণা চালান। বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের প্রচারণায় ৬ দফা এবং জাতীয় মুক্তির বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। ন্যাপ ভাষাণী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও পূর্ব বাংলার বন্যা উপদ্রুত এলাকায় ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্বহীন ভূমিকা নিয়ে সাধারণ জনগণের মাঝে প্রচারণা চালান। শাসক গোষ্ঠীর মুখোশ উন্মোচনে তার প্রচারণা পুরোটাই আওয়ামি লীগ ও তার ছয় দফার পক্ষে কাজ করেছে।[৩০]

---

২৮. তোফায়েল আহমেদ, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু উজ্জ্বল স্মৃতি, দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট সংখ্যা, ২০০৩
২৯. ড. হারুন অর রশিদ, ঐ, পৃ. ২৮০
৩০. আহমদ রফিক, বাঙালির স্বাধীনতা, অন্য প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ৫৫

সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের দীর্ঘ তেইশ বছরের স্বৈরাচারী শাসক আর সামরিকতন্ত্রের দুঃশাসন পূর্ব বাংলায় বাঙালির বিজয়ের ক্ষেত্র রচনা করেছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্ত পরিনতি লাভ করে।

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণায় দেখা যায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয় লাভ করে আওয়ামি লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে পাকিস্তান পিপলস পার্টি স্থান করে নেয়। আওয়ামি লীগ আর পাকিস্তান পিপলস পাটির রায়ের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পকিস্তানের অবস্থানকে মুখোমুখী দাড় করিয়ে দেয়।

দীর্ঘ প্রায় ২৪ বছরের দুঃশাসন, শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিজয়ের লক্ষ্যে সোচ্চার হয়েছিল। ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, নির্বিশেষে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর একনায়ক, স্বৈরাচার, সামরিকতন্ত্রের চিরঅবসান ঘটিয়েছিল। জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে থাকা দুঃসহ জীবনের অবসান ঘটেছিল বাঙালির। ভাষা আন্দোলনের বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে ইতিহাস রচনা করেছিল বাঙালি সেই ইতিহাসের পথ ধরেই একে একে বন্ধুর প্রতিবন্ধকতার পাহাড় পাড়ি দিয়ে বাঙালি পৌঁছেছিল ১৯৭০ এ। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব আর শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তার প্রতি বাঙালি অকুন্ঠ সমর্থন দিয়ে তার পাশে অবস্থান নিয়েছিল। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্য, ইতিহাস, কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দিয়ে দাস বানানোর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছিল ঐক্যবদ্ধ পূর্ব বাংলার বাঙালি। তারা ফলাফলের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তার ইতিহাসকে বিজয়ী করেছিল। অসাম্প্রদায়িক বাঙালিত্বের বিজয় সূচনা করেছিল। বাঙালির অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে মুখোশধারী, লেবাসসর্বশ: পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক চক্রের ইসলামের নামে ভণ্ডামী, আর মুসলমানিত্বের অবমাননার জবাব দিয়েছিল প্রবল ঘৃনায়। অদ্ভুত পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর অস্বাভাবিক খেয়ালের চূড়ান্ত দেখেছে বাঙালি, যাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যই ছিল বাঙালিকে আর বাঙলাকে বিনষ্ট করা।

পশ্চিমা স্বার্থে নিমগ্ন শাসক গোষ্ঠী কস্মিনকালেও ভাবে নাই নির্বাচনের ফলাফল তাদের ছকের বাইরে যাবে। যদি তাই তারা জানতো তাহলে কোনো অপকৌশল প্রয়োগ করতেই তারা ক্ষান্ত হতো না। ইসলামের চূড়ান্ত প্রয়োগেও নিজেদের পক্ষে নিতে পারে নাই ফলাফল। শাসকগোষ্ঠীর হিসাব নিকাশ উল্টে গিয়েছিল তো বটেই একই সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণের ধারনাতেও যা স্থান পায় নাই, তাই ঘটে গিয়েছিল ফলাফলে। পূর্ব বাঙলার সাধারণ মানুষ বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিল অবশ্যই কিন্তু তা ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন পাওয়ার কিন্তু তা যে এতটা ব্যবধানে হবে তেমনটা ভাবে নাই সাধারণ বাঙালিও।

অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১

আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠনের অধিকার পায়। একই সাথে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরবর্তী সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হারানোর

Dhaka University Institutional Repository

ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পরে। শুধু শাসকগোষ্ঠীই নয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামরিক বেসামরিক আমলা কারো পক্ষেই আওয়ামি লীগের বিজয় মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। তারা সকলে মিলে ফলাফল নস্যাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের ষড়যন্ত্রের সাথে হাত মিলান দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো।[৩১]

ইতোমধ্যে **১৯৭১** সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের এক শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আওয়ামি লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ইয়াহিয়া ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বাস্তবিকও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে শেখ মুজিব নিজেকে সে ভাবেই ভাবতে থাকেন এবং তৈরি করতে থাকেন।[৩২] পূর্ব বাংলার মানুষ যখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল ক্ষমতায় যাবার জন্য তেমনি সময়েই **১৩** ফেব্রুয়ারি **১৯৭১** সালে ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো বেঁকে বসেন। ভুট্টো বলেন, ছয়দফা রদবদল না হলে তাঁর দল অধিবেশনে যোগদান করবে না।[৩৩]

খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ২ ও ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল ঘোষণা করেন শেখ মুজিব। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে গণজমায়েতের ঘোষণা দেন।

৭ মার্চ[৩৪] জনতার অপেক্ষার পালা শেষ হয়। দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে বাঙালি। বেলা তিনটা ২০ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমান এসে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন যে, সামরিক বাহিনী, সামরিক আইন প্রত্যাহার না করলে তিনি অধিবেশনে যোগ দিবেন না। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখতে বলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান জানিয়ে সভা শেষ করেন শেখ মুজিব। ৩০ লক্ষ লোকের জনসমাগমে ঢাকা ছাড়াও টঙ্গি, জয়দেবপুর, ডেমরাসহ সারাদেশ থেকে মিছিল করে লাঠি, রড ঘাড়ে করে জনসভাস্থলে উপস্থিত

---

৩১. ড. হারুন অর রশিদ বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসন তান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ২০০১, পৃ. ২৮৬

৩২. কামাল লোহানী, রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলা বেতার, ভূমিকা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭০

৩৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিল পত্র ১৯০৫- ১৯৭১, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা- মাহমুদ উল্লাহ, গতিধারা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৯

৩৪. ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কারণে UNESCO ২০১৭ সালের ৩১শে অক্টোবর রোজ মঙ্গলবার বক্তব্যটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। একই সাথে ৭ মার্চের ভাষণকে Memory of the world ঘোষণা করে World International Register-এ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত হয়। উল্লেখ যে, আন্তর্জাতিক তাৎপর্য রয়েছে এমন বিষয়গুলোকে বিশ্ব ঐতিহ্যের মেমোরিতে বা স্মৃতিসংগ্রহশালায় তালিকাভুক্ত করা হয়। ২৪-২৭ অক্টোবর ২০১৭ সংস্থাটি বৈঠক করে তারা এই সিদ্ধান্ত নেয়। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণকে অন্তর্ভুক্তির মধ্যদিয়ে তালিকাভুক্ত ঐতিহ্যের সংখ্যা দাড়ায় ৪২৭টিতে। এই স্বীকৃতির মধ্যদিয়ে সংস্থাটি দেশে দেশে স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রতি বাঙালি জাতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থন হিসেবে স্বীকৃতিকে অক্ষয় করে রাখলো। সৌজন্যে : এটিএন নিউজ।

হয়েছিল লোকজন। ২৪ ঘণ্টা পায়ে হেঁটে চিড়ামুরি, গুড় সঙ্গে নিয়ে দেশের দূর দূরান্ত থেকে এসেছিল বিরাট মিছিল। অন্ধ ছেলেদের মিছিল এসেছিল মিটিংয়ে শেখ মুজিবের বক্তব্য শুনতে।[৩৫]

শেখ মুজিবের নির্দেশে সারাদেশে চলেছে অসহযোগ আন্দোলন। কেন্দ্রীয় সরকার নানাভাবে অত্যাচার, নির্যাতন চালিয়ে পাড়া-মহল্লা, গ্রামগঞ্জে হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়েই চলছিল। মূল ক্ষমতা তাদের হাতে থাকায় অন্যায় শোষন তখনও চালিয়ে যাবার সাহস পাচ্ছিল তারা। ক্ষমতায় থাকা সত্বেও কেন্দ্রের শাসনকে অগ্রাহ্য করে পূর্ব বাংলার সকল কিছু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলে বাঙালি।[৩৬] অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে শামসুল হুদা লিখেছেন, "ঐটা ছিল একটা নতুন প্রকৃতির অসহযোগ আন্দোলন। সরকার চলছে, স্টেট ব্যাংক চলছে, রেলগাড়ি চলছে। কেবল অসহযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে। ভারতের জে পি নারায়ন বলেছিলেন, 'গান্ধীজি পর্যন্ত ভাবতে পারেন নি যে, অসহযোগ আন্দোলন অত শক্তিশালী হতে পারে। সবকিছু অচল করে দিয়েছে, অথচ সব চলছে।"[৩৭]

এ প্রসঙ্গে ড. কামাল হোসেন বলেন, "প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে ফোন করা হয়, তাদের দৈনন্দিন খরচের টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করার সুযোগ দেয়ার জন্য। তাদের খাবার যোগান না দেয়ার কারণে তারা রুটি খেয়ে থেকেছে। অসহযোগ চলাকালীন সমগ্র পূর্ববাংলা ছিল পূর্ববাংলার জনগণের দখলে।"[৩৮]

২৩ মার্চ প্রতিরোধ দিবস হিসাবে পালনের ডাক দেয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলো। তুমুল উত্তেজনা ও আলোড়ন। এদিন ছিল পাকিস্তান দিবস। পূর্ব বাংলা পাকিস্তান দিবস পালন না করে দিনটিকে স্বাধীন পূর্ব বাংলা দিবস হিসেবে পালন করে। বাংলার ম্যাপ আঁকা পতাকা বাঙলার ঘরে ঘরে উড়েছিল। অফিস আদালত, দোকান, গাড়ি সর্বত্র এই পতাকায় ছেয়ে যায়। জনতা ছিল দারুন উত্তেজিত। জাহানারা ইমাম তার একাত্তরের দিনগুলিতে লিখেছেন, "খুব সকালে বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে ছাদে গিয়ে কালো পতাকার পাশে আরেকটা বাঁশে ওড়ালাম স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা। বুকের মধ্যে শির শির করে উঠল। আনন্দ, উত্তেজনা, প্রত্যাশা, ভয়, অজানা আতঙ্ক সবকিছু মিশে একাকার অনুভূতি।"[৩৯] ঢাকা শহরের মতো জেলা শহরগুলোতেও সেদিন ছাত্রলীগের নেতৃত্ব শহর জুড়ে পাকিস্তানি পতাকার বদলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার নতুন পতাকা উত্তোলন করেছিল, যা ছিল অসামান্য প্রেরণাদায়ক।[৪০] ইয়াহিয়া চক্রের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন প্রায়। চূড়ান্ত ক্ষনটির অপেক্ষায় ছিল তারা।

---

৩৫. সুফিয়া কামাল, একাত্তরের ডায়েরী, হাওলাদার প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃ. ৩৩

৩৬. ড. হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০১, পৃ. ২৮৮

৩৭. শামসুল হুদা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০৮

৩৮. Link: Live@facebook(rajkahon, dbc news 24×7. ৭ মার্চ ঘোষণা হলো না কেন? অতিথি ড. কামাল হোসেন ও কর্ণেল অবসরপ্রাপ্ত শওকত আলী

৩৯. জাহানারা ইমাম, একাত্তরের দিনগুলি, সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৮৬, পৃ. ৩৫

৪০. হোসেন উদ্দীন হোসেন, রনক্ষেত্রে সারাবেলা, রোদেলা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিদিনের মতোই ২৫ মার্চ তারিখ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে যা কিছু ঘটেছে, সবই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিকভাবে যাকে বলে রাষ্ট্রদ্রোহিতা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকালীনও দেশ চলেছে শেখ মুজিবের কথায়। জনতা অফিস আদালত করেছে শেখ মুজিবের কথায়, টিক্কা খানকে কোনো বিচারপতি শপথ গ্রহণ করাতে রাজি না হওয়াতে টিক্কা খানকে শুধু মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে কাজ করতে হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ঢাকায় এসে নামার সময়েও তার বাস ভবনের সামনে বিক্ষোভ হয়েছে। বাঙালির খাবার সেনাবাহিনীর কাছে বিক্রি করা হয় নাই। ডাল রুটি খেতে হয়েছে বেশ কিছুদিন। তারপর প্লেনে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে খাবার আনতে হয়েছে। সব কিছু ইয়াহিয়া সরকার মুখ বুঝে সহ্য করেছে শুধু সময় নেয়ার জন্য। দিনের কোনো এক সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কাউকে না জানিয়ে গোপনে প্লেনে চড়ে পশ্চিম পাকিস্তান চলে গেছে। রাস্তায় ব্যরিকেড দেয়া হচ্ছে। আর্মির গাড়ি নেমে আসে রাস্তায়।[৪১] ২৫ মার্চের সারাদিন ভোর থেকে সন্ধা পর্যন্ত মিছিল চলেছে অনবরত। পানির খালি ট্যাংক ভেতরে ইট ঢুকিয়ে ব্যারিকেড দিচ্ছে মানুষ, বটগাছের মোটা ডাল কেটে এনেও রাস্তার ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছিল।[৪২]

বাঙালির সংগ্রাম মূখর পরাধীন জীবনে শিল্পীদের অবস্থান ছিল মৌলিক। সংবেদনশীল, মানবিক ও সচেতন শিল্পীরা সমস্যার শুরুতেই তাদের গভীর উপলব্ধি দিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। দেশের যে কোনো সংকটে তারা বাঙালির পাশে অবস্থান নিয়েছে। বাঙালির কষ্ট যন্ত্রনাকে তারা অনুভব করেছে সর্বাগ্রে। সাধারণ মানুষের উপলব্ধিতে যখন সমস্যা ততটা গভীরভাবে নাড়া দেয় না তখন শিল্পীদের সুরের আহবান তাদের ইন্দ্রীয়কে নাড়া দেয়। শিল্পীরা খুব সহজে সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরে সমস্যার গভীরতায় সাধারণ মানুষকে পৌঁছে দেয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি সংকটেই শিল্পীরা রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি অবস্থান করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ২৩ বছরের শাসনামলে শিল্পীদের অবস্থান সূচনালগ্নেই দৃশ্যমান হয়েছিল প্রবলভাবে। পাকিস্তান সরকারের অন্যায় আদেশকে প্রতিবাদ করেছে। একইসাথে তারা সাধারণ বাঙালিকে অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে সচেতন করেছে। কাজটি যদিও সহজ ছিল না, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর প্রতি মোহাচ্ছন্ন সাধারণ বাঙালি থেকে শুরু করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যন্ত সবাইকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শিল্পীদের নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। শিল্পীদের সচেতন অবস্থান বাঙালিকে প্রতিবাদী করেছে। বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সুরকার সুর দিয়েছেন, গীতিকার গান লিখেছেন তৎকালীন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে, সেই গানে সুরের ঝড় তুলেছেন শিল্পীরা। গানকে প্রাণবন্ত করে জনগণকে গভীর আবেগে তারা ছুয়েঁছেন। মানুষ তার ভাবনার সাথে গানের আত্মিক মিল ঘটাতে পেরেছিলো বলেই প্রতিবাদের জোয়ারে ভেসেছিল সমগ্র পূর্ব বাংলা। গানে প্রাণবন্ত বাঙালি। প্রতিবাদী সুরের আহবানে অন্যায়-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়েছে। আর এই মেলবন্ধন সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়েছিল পূর্ব বাংলাকে।

---

৪১. জাহানারা ইমাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮

৪২. বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, একাত্তরের স্মৃতি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৪, ৫

শিল্পীদের গান বাঙালির শুধু বিনোদনের উৎসই নয়, বাঙালির পরিপূর্ণ জীবনের সবটা জুড়েই আছে সঙ্গীত। আনন্দ-সংকটে বাঙালির আশ্রয় হয় সঙ্গীতে। সঙ্গীত শিল্পীর কণ্ঠে পরিবেশিত হয়ে সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস শিল্পীদের দেশপ্রেম, সংগ্রামী জীবন, ত্যাগ, অদম্য সাহসিকতা, বিপ্লবী উন্মাদনা সর্বপরি গান গেয়ে বাঙালিকে সাহস যুগিয়ে আর শত্রুকে পরাজিত করে দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। তাদের অসাধারণ, তাৎপর্যময় অবদান বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামকে পূর্ণতা দিয়েছিল। সৃষ্টি করেছিল নতুন ইতিহাস।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শিল্পীদের দেশপ্রেমের, ত্যাগের বিশাল এ ক্ষেত্রটি তেমনভাবে আলোচিত হয় না, যতটা হওয়া প্রয়োজন ছিল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়টি ইতিহাসের অপরিহার্য অংশ হিসেবে গণ্য হবার দাবি রাখে। কোনোভাবে অধ্যায়টিকে গুরুত্বহীন করা হলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মহাসমুদ্র থেকে শিল্পীদের অংশটুকু সত্যনিষ্ঠভাবে তুলে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজন তথ্য ভিত্তিক গবেষণা।

যে কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পূর্বশর্ত হলো সমস্যা চিহ্নিত করে প্রকল্প প্রণয়ন করা। প্রকল্পকে বলা যায় একটি গবেষণার দিকনির্দেশক। প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে ঘটনা পর্যবেক্ষণপূর্বক গৃহীত কোনো প্রস্তাবনা গ্রহণযোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্প হচ্ছে গবেষণা ও তত্ত্বের মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় যোগসূত্র।

বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই আমি আমার গবেষণা "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীত শিল্পীদের অবদান" প্রকল্পটি প্রণয়ন করেছি।

খ. গবেষণা পদ্ধতি ও উৎস

বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ পরীক্ষাযোগ্য পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটনার অনুসন্ধান বা ঘটনাগুলোর সম্পর্ক আবিষ্কার করে কোনো বৃহত্তর নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করার সুশৃংঙ্খল পদ্ধতিকে গবেষণা বলে।

কোনো বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে কোনো না কোনো গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। কোনো একটি বিষয় তখনই সার্বজনীনতা লাভ করে যখন উহা কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির আওতায় আলোচনা করা হয়। একটি গবেষণায় একই সাথে একাধিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়।

আলোচ্য গবেষণা কর্মে মূলতঃ তথ্য বিশ্লেষণ ও বর্ণনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ ছাড়াও শিল্পী, সুরকার, গীতিকার, যন্ত্রশিল্পী, মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবীদের সাক্ষাৎকার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

গ. গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত

মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীদের গাওয়া গান একটি বিস্তৃত পরিসর জুড়ে রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার পাশাপাশি সঙ্গীত শিল্পীরাও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। গণমানুষের

 Dhaka University Institutional Repository

সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে তারা ঘুড়ে ঘুড়ে গান গেয়ে মানুষকে জাগিয়েছিলেন। আগুন ঝরানো গান শুনে বাঙালি তাদের জীবনকে তুচ্ছ করে শত্রু সৈন্যের মুখোমুখি হয়েছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে শিল্পীদের গান ছিল অসামান্য প্রেরণা। রণযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প, শরণার্থীদের আশ্রয়কেন্দ্র যেমন তাদের বিচরণক্ষেত্র ছিল নয়টি মাস, তেমনি অবরুদ্ধ দেশের বাঙালির আতঙ্কিত দিনগুলিতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কর্তৃক প্রচারিত গান ছিল অনন্ত প্রেরণার উৎস। শত্রু কবলিত বাংলাদেশে স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার কোনো প্রকার সুযোগ না থাকলেও বাঙালি চাতক পাখির প্রতীক্ষা নিয়ে প্রহর গুণতো কখন শোনা যাবে শিল্পী কণ্ঠের সাহস আর উদ্দীপনা জাগানো গান। শিল্পীদের গান বহির্বিশ্বেও বাঙালিকে প্রাণীত করেছে। জীবনকে তুচ্ছ করে যুদ্ধের দিনে শিল্পীদের সাহসী কর্মতৎপরতা যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বদলে দিয়েছিল। শিল্পীদের দেশপ্রেম, দায়বদ্ধতা, তাদের মানসিক দৃঢ়তা মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল।

ঘ. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

একটি গবেষণা কর্মের সামনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে, যাকে কেন্দ্র করে গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়। আর তথ্য সংগ্রহ এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রন করা হয়।

বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল পেশার মানুষ একাত্ম হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীত শিল্পীদেরও ছিল তেমনি এক বিরাট ভূমিকা। তাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ বেগবান হয়েছিল। শিল্পীরা একদিকে গর্বিতযোদ্ধা আবার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণার উৎসও বটে। সুতরাং তাদের অবদান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবজনক অধ্যায়।

বর্তমান গবেষণা কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১। শিল্পীদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা।

২। তাদের অংশগ্রহণ মুক্তিযুদ্ধের জন্য কতটা তাৎপর্যময় হয়েছিল তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা।

৩। বাঙালি খ্যাতিমান শিল্পীদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি গ্রামে-গঞ্জে স্থানীয় শিল্পীদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছিল। কৃষক, জেলে, তাঁতী, কামার, কুমারসহ সাধারণ বাঙালি বাউল, জারি, সারি গায়কদের সাধারণ কথার অসাধারণ সুরের গানে শক্তি-সাহস নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে বাঙালি। গ্রাম বাংলার স্বভাব গায়কদের অংশগ্রহণ কতটুকু ছিল তা নিরূপন করা।

৪। আন্তর্জাতিক বিশ্বের বরেণ্য শিল্পীদের মানবিক সহায়তা মুক্তিযুদ্ধকে কিভাবে সাহায্য করেছিল, সে বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে তুলে আনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙালি জাতি সত্তা ও সঙ্গীত

সঙ্গীত মানব সমাজের আদিম শিল্প কর্ম। মানুষ নিজেকে প্রথম প্রকাশ করতে শিখেছে সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই। মানুষের জীবন সংগ্রামের শুরুতেই প্রথম সাংস্কৃতিক আবিস্কার ছিল গান। মনের ক্ষুধা মেটানোর জন্য হৃদয়ের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির সাথে ভাবের স্বত:স্ফূর্ত আবেগ মিশে তৈরি হয় সঙ্গীত। মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টি হয়েছে নবনব আবিস্কার। আর মনোজগতের প্রয়োজনে উদ্ভব হয়েছে সঙ্গীতের। বলা হয় মানুষের মুখে ভাষা ফোটার আগেই সুর সৃষ্টি হয়েছে।

সঙ্গীতের সৃষ্টি কবে তার দিনক্ষন বা সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় নাই। মানুষ যখন দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শিখে, তখন তাদের ভাবের আদান প্রদানের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় ভাষা। আবার প্রকৃতির খেয়ালের কারণে বিচিত্র পরিবেশ মানুষকে করেছে ভাবপ্রবন ও আবেগী। ভাষা আর আবেগ মিলিত হয়ে মানুষের মাঝে তৈরি হয় শিল্পীত বোধ। আবহমান প্রকৃতির সুর, শব্দ, ছন্দ মানুষের মাঝে সুরের অনুভূতি জাগায়।[১] সেই সুর ও ছন্দ একসময় মানুষ নিজের গলায় ও যন্ত্রে বসানোর চেষ্টা করে। কঠিন চেষ্টায় মানুষ অনুকরণ করেই ক্ষান্ত হয় না। পরিশ্রম আর উন্নত শিল্পীত চেষ্টার মধ্য দিয়ে সে তার রূপান্তর ঘটায়। আর মানুষ সৃষ্ট এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয় শিল্প সৃষ্টি।

অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষ অকৃত্রিম জীবন যাপন করতে পারে না। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিরূপ প্রকৃতিকে বশ করে নিজের মতো আয়ত্বে এনে নিজের জীবন রচনা করে। সে শুধু প্রকৃতিকে বশ্যতা স্বীকার করিয়েই ক্ষান্ত হয় না। প্রকৃতির উপর প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। প্রকৃতিকে নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে মানুষ কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে। তার মাঝে বসবাস ও জীবন যাপন করার মধ্যদিয়ে তৈরি করে সভ্যতা ও সংস্কৃতি।[২] পৃথিবীতে সুরের ইতিহাস আর সভ্যতার ইতিহাস পাশাপাশি এগিয়েছে। মানব সভ্যতা যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভর করে বিকশিত হয়েছে। সঙ্গীতও তেমনি প্রাকৃতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশকে ভর করে সৃজিত হয়। কোনো স্থানের আবহাওয়া, প্রকৃতি, মানুষের রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ সে স্থানের সঙ্গীতকে অত্যন্ত

১. ফজল এ খোদা, সঙ্গীত ভাবনা, বাংলা একাডেমি পৃ. ০১, ২৪
২. আহমদ শরীফ, বাঙলা বাঙালি বাঙলাদেশ, মহাকাল, ২০১৩, পৃ. ১৭৭

স্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত ও বিকশিত করে। স্থানভেদে সঙ্গীতের এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় পৃথিবীব্যাপী। কোথাও চড়া গলার সুর আবার কোথাও সুক্ষ্ম গলার সুর তবে সঙ্গীতের সুর যাই হোক না কেন তা নিশ্চিত ভাবেই প্রাণ থেকে উৎসারিত। রবীন্দ্রনাথ সে কারনেই বলেছেন "সঙ্গীত একটি প্রাণধর্মী জিনিস। প্রানের যে ধর্ম, সে ধর্মের উৎস জীবন। তাই সঙ্গীতের ধর্ম জীবনধর্ম।"[৩]

সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ **১৮১৫** সালের ২০ সেপ্টেম্বর শিলাইদহে বসে লিখেছেন "সঙ্গীতের মতো এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজাল বিদ্যা জগতে আর কিছুই নাই-এ এক নতুন সৃষ্টিকর্তা। আমিতো ভেবে পাইনে সঙ্গীত একটা নতুন মায়াজগত সৃষ্টি করে যা এই পুরাতন জগতের অন্তরতম অপরূপ নিত্যরাজ্য উদঘাটিত করে দেয়। গান প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস আছে যা মানুষকে এই কথা বলে যে, "তোমরা জগতের সকল জিনিসকে যতই পরিস্কার বুদ্ধিগম্য করতে চেষ্টা করো না কেন এর আসল জিনিসটাই অনির্বচনীয় এবং তারই সঙ্গে আমাদের মর্মের মর্মান্তিক যোগ- তারই জন্যে আমাদের এত দুঃখ, এত সুখ, এত ব্যাকুলতা।"[৪] মানুষের জীবনে সঙ্গীতের আশ্চর্য প্রভাব সম্পর্কে সুচেতা চৌধুরী বলেন, "সঙ্গীত শিল্পই হলো শ্রেষ্ঠতম, যা যুগ যুগ ধরে মানুষের সঙ্গে মানুষকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলে। এর প্রধানতম কারনই হলো মানুষের মনের সঙ্গে সঙ্গীত পলকের মধ্যে যুক্ত হয়ে যায় এবং সঙ্গীতের সঙ্গেই অজান্তে মানুষের মনও মহাকালের গতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে।"[৫]

সুচেতা চৌধুরী আরো বলেন, "সঙ্গীতের প্রভাব এতই বেশি যে, সঙ্গীতের উদ্দেশ্য আপনিই সূচিত হয়। সঙ্গীতের প্রভাবে আগুন জ্বলে, বৃষ্টি নামে, মানুষের চিত্তশুদ্ধি ঘটে। অসুস্থ স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করে রোগীকে সুস্থ্য করে।"[৬]

ফজল এ খোদা লিখেছেন, "সঙ্গীত অথবা গান। যে কোনো একটি শব্দ উচ্চারনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় আলোড়িত হয়। মনন ও ভাবনা হয় আবেগাক্রান্ত। কেমন একটা নরম ও পেলব অনুভূতি অনুরণন তোলে সারা অস্তিত্ব জুড়ে। উচ্চকিত বা সহসা সজাগ করে পঞ্চইন্দ্রিয়। যা ভাষা দিয়ে সহজে সাবলিলভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। অনুভবেই যার অবস্থান এবং অনুধাবনেই যার স্বরূপ ও অবয়ব। এমন একটা অশরীরী আর বিমূর্ত আনন্দের নামই গান।"[৭]

আদিকালে সঙ্গীত ছিল দেবতা তুষ্টির নৈবেদ্য। সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি দিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করার প্রচেষ্টা ছিল। একসময়ে দেবতার নৈবেদ্য পরিনত হয় সর্ববিধ তুষ্টি সাধনে। যার কারনে সঙ্গীতের ভাষা ও কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। মানুষের নিত্যদিনের সুখ দুঃখ, প্রেম-প্রীতি, ব্যাথা বেদনার সঙ্গী হয়ে উঠে সঙ্গীত। তৈরি হয় সহজ সুর আর সহজ কথার লোকসঙ্গীত যার মূল

---

৩. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, সংস্কৃতিঃ জাতীয় মুখশ্রী, পলক পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩৪
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীত চিন্তা, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৪৬
৫. সুচেতা চৌধুরী, সঙ্গীত ও নন্দনতত্ত্ব, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৮৯
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৭. ফজল ও খোদা, সঙ্গীত ভাবনা, বাংলা একাডেমি, ২০১২, পৃ. ৩৫

সুরটি প্রোথিত ছিল মাটির গভীরে। মাটির গভীরের সেই সুরটিই বাংলার সুর, বাঙালির প্রাণের, গানের সুর।

ভারতবর্ষে সঙ্গীত চর্চা বিকশিত হয় মূলত সুফি মুসলমানদের সহযোগীতায়। পরবর্তীতে বহিরাগত রাজা বাদশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ক্ষেত্রটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। অসামান্য গায়কদের আবির্ভাব ঘটেছিল সঙ্গীতের সেই স্বর্নযুগে।

একই সময়ে বাংলার নিভৃত পল্লীর সঙ্গীতের ধারা নিজস্ব গতিতে পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই অব্যাহত ছিল। সঙ্গীত ছিল তাদের নিত্য আচরণীয় অনুসঙ্গ। বাংলার নরম পলিমাটি, প্রাণমন জুড়ানো উদার প্রকৃতি, নিসর্গের শোভা, জীবনধারনের সহজলভ্যতা, সাথে থাকতো বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত বিচিত্র বাংলা গান। সেসকল বাংলা গানের লেখকদের নাম পাওয়া না গেলেও গীতিকারের নাম খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের গানে তৎকালীন সমাজ জীবনের বাস্তবতা তুলে ধরা হতো। আধুনিক বিশ্বের অনেক দুরে অবস্থান করে নিভৃত পল্লীর অতি সরল মানুষেরা যে অসাধারণ কাব্য চর্চা করেছেন তা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। চণ্ডিদাস নিস্তরঙ্গ নিভৃত পল্লীতে বসে লিখেছেন, 'শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।' বিদ্যাপতি, দ্বিজচণ্ডিদাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস কবিরা লিখেছেন মানবীয় প্রেমের অসাধারন সব কাব্য। সময়কালটা ছিল স্বাধীন সুলতানদের আমল।[৮]

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় পীর দরবেশ, সুফী সাধকদের পদচারণায় সমাজে আসে সাম্য ও শান্তির অনুকূল পরিবেশ। ইসলামের সাম্যের বানী প্রচার করে তারা খুব সহজেই বাঙালি জনপদে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে সক্ষম হন। তাদের দ্বারা বাংলা গানের সুর ও বাণীও প্রভাবিত হয়। সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কর্ম সুফি ও বৈষ্ণব চেতনায় উজ্জীবিত হয়। সমাজে তা জীবনমুখী মানবতাদের প্রকাশ ঘটায়। বৌদ্ধ সহজিয়া ও ইসলামের মরমিবাদ মিলেমিশে এক নতুন সমৃদ্ধতর চেতনার মানবীয় সুরের আবির্ভাব হয়। যা মিলে যায় চণ্ডিদাসের, 'সবার উপরে মানুষ সত্য' দার্শনিক তত্ত্বের সাথে।[৯]

বাঙালি জীবনের দৈনন্দিন হাসি, কান্না, আনন্দ বেদনা আবেগ-অনুভূতি, ভাবনা কল্পনাকে উপজিব্য করে লিখা সেই সময়ের প্রাচীন লোকগীতি যেমন ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা আজও যার ঐতিহ্য বহন করে। বাংলার কবি ও গায়কদের আবেগ ও অনুভূতির মধ্যে ধরা দেয় বাঙালি জীবনের বহুমুখী জীবনধারা। তারা তৈরি করেছেন বিভিন্ন শ্রেণির গান। আর বিভিন্ন শ্রেণির গানগুলো শুধু নাম সর্বস্বই না গানগুলো নিজ বৈশিষ্ট্যের গুনেই একটার থেকে আরেকটা স্বতন্ত্র। কথা সুর তাল, লয়, গায়কী, প্রকাশভঙ্গি সবই ভিন্ন। যেমন ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া মুরশিদী, মারফতি, বাউল, রাখালি, কবি, তর্জ্জা, ধামাইল, বিচার, ধুয়া, জারি, সারি, ছড়া, ময়লা, পদ্মপুরান, ভজন, কীর্তন, হাবু, সুরেশ্বরী, মাইজভাণ্ডারি, ইত্যাদি অসংখ্য নামের গান।

---

৮. অনুপম সেন, আদি অন্ত বাঙালি, হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত বঙ্গ বাংলা বাংলাদেশ, সময় ২০১২, পৃ. ২২

৯. ড. আবদুল ওহাব, বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সঙ্গীত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার সঙ্গীত জগতে প্রথম করাঘাত লাগে কোম্পানি শাসনামলে। এর পূর্বেও বাঙালির পরাধীন জীবন ছিল কিন্তু তা বাঙালি তেমনভাবে অনুভব করে নাই, যতটা করেছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছিল তারা গোটা ভারতবর্ষে। তথাপি বাঙালি তার নিজস্বতা নিয়ে ঝড়ের মাঝেও সংস্কৃতির দ্বীপ শিখাটি সচেতনভাবে জ্বালিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হন বাউল সাধক, পুরোহিত লালন। তিনি নিজেকে নির্দিষ্ট কোনো জাত, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের বাইরে রেখে গানে গানে শুনিয়েছেন মানবতার অসাম্প্রদায়িক বাণী। বাংলা গানের অসাম্প্রদায়িক মানবিক রূপের সার্থক রূপকার বাউল সাধক লালন। তিনি একাধারে বাউল সাধক, মরমী কবি ও সঙ্গীতকার। অন্নদা শংকর রায় লিখেছেন—"তাঁর গান রচনা চলেছিল প্রায় এক শতাব্দীকাল। আনুমানিক দশহাজার গান লিখেছেন লালন, যার অনেকটাই কেউ লিখে রাখে নাই।"[১০] লালনদর্শণ প্রচার হয়েছে বাউল লালন ফকিরের গানে গানে। তার গানের বাণী এতটাই উচ্চ মার্গের, যা সাধারনের পক্ষে বোঝা কঠিন। উচ্চ পর্যায়ের বোধবুদ্ধি সম্পন্ন না হলে তা অনেকটাই থাকে দুর্বোধ্য। ফজল এ খোদা লালনের গান সম্পর্কে লিখেছেন, "লালন লোক ঐতিহ্যের ধারাকে সঞ্জীবিত রেখেই বাংলা গানের স্বকীয় উৎকর্ষ দান করে আধুনিক রূপ দিলেন। লালনের গানের ভাব যেমন উচ্চমার্গের, ভাষার গাঁথুনিও তেমনি সাবলীল ও গীতিময়: বিষয় ও প্রকাশের আঙ্গিকও যেমন বিভিন্ন সুর, ছন্দ ও লয়ও তেমনি বিচিত্র। লালনই প্রথমে বাংলা গানে আধুনিক চিন্তা ধারার উন্মেষ ঘটালেন।"[১১] লালন তার চিন্তা ও আদর্শে সকল ধর্মের সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। ইসলামের সৃষ্টিতত্ত্ব, হিন্দু ধর্মের ব্রহ্মতত্ত্ব, অবতারবাদ বা জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন বলেই তিনি গানে গানে বলেছেন—'এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে, যে দিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিষ্টান জাতি গোত্র নাহি রবে।' লালনের গান লালনের জীবদ্দশায় অনেকটাই আড়ালে ছিল। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে লালনের গান আধুনিক সমাজে পরিচিতি লাভ করে। মৃত্যুর পরে তাঁর গানের মানব মুখিনতা বাঙালি সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছিল।[১২] লালন ফকির মৃত্যুবরণ করেন ১৮৯০ সালে।[১৩]

লালনের কিছু গান

১. সবে বলে লালন ফকির হিন্দু না যবন
লালন বলে আমায় আমি না জানি সন্ধান।

২.সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন ভাবে জাতের কিরূপ দেখলাম না এই নজরে।

---

১০. অন্নদা শংকর রায়, লালন ফকির ও তাঁর গান, কবি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৩০
১১. সঙ্গীত ভাবনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
১২. ড. আব্দুল ওয়াহাব, বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সঙ্গীত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬, ১২৩১
১৩. ম. মনির-উজ্জামান, সাধক কবি লালন কালে উত্তর কালে, বাংলা একাডেমি, ২০১০, পৃ. ১০১

৩.আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর
এক পড়শি বসত করে।

৪.সে ভাব সবাই কি জানে!
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীর সনে।

৫.এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে
কত মুনি ঋষি চারি যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।

৬.ধরে রে অধর চাঁদের অধরে অধর দিয়ে
ক্ষীরোদ মৈথুনের ধারা ধর রে রসিক নাগরা
যে রসেতে অধর ধরা দেখরে সচেতন হয়ে।

৭. আমি ভেবে পাইনে দিশে,
সব জিনিস যে পয়দা করল সে পয়দা হলো কিসে?[১৪]

পরবর্তীতে লালনের অনুসারী শীতল শাহ, ভোলাই শাহ, মনিরুদ্দিন শাহ, মানিক শাহ, দুদ্দু শাহ, মহরম শাহ, পাঁচু শাহ, শুকুর শাহ, উজল শাহ, ছুটির শাহ, ওয়াছিম উদ্দীন শাহ, কোকিল শাহ ফকির, বিল্লাল শাহ, বাদের শাহ, নিজাম উদ্দীন শাহ, খোদা বকস শাহ, অমূল্য শাহ, ইসমাইল ফকির, কালু শাহ, বেহাল শাহ, গোলাম ইয়াছিন শাহ, মহিন শাহ, শুকচাঁদ শাহ, মকছেদ আলী সাঁই[১৫] প্রমুখ লালনের গান সংগ্রহ, সুরের অবিকৃতি ধরে রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তারা নিজেরাও লালন আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর গানের বাণী ও সুরকে প্রচার করা এবং লালনের মানবিক আদর্শ ছড়িয়ে দিতে তৎপর ছিলেন। স্মৃতি ও শ্রুতি অবলম্বন করে বাউল গান গুরু শিষ্য পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে বহমান রয়েছে এই প্রক্রিয়াতেই।

লালন ফকিরের পরে বাংলার সঙ্গীত জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন লোককবি হাসন রাজা। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৪ সালে আর মৃত্যুবরন করেন ১৯২২ সালে। মানুষকে নিয়ে তিনি অসংখ্য গান রচনা করেছেন। সাধারণ কথা দিয়ে গান লিখেছেন এবং সহজ সুরে সেই গান বেঁধেছেন। বাংলার লোকজ সুরের বিভিন্ন ধারার মধ্যে অন্যতম অংশ জুরে আছে তার গান। বাংলার মানুষও তার গানের ভক্ত। মানুষের ভালোবাসায় তার গান হয়েছে জনপ্রিয়ধন্য। সিলেটের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এই দার্শনিক প্রতিভা। বাউল সম্প্রদায়ের অন্যতম সাধক হাসন রাজা। মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গানে গানে। ধর্ম, সম্প্রদায়ের গণ্ডি অতিক্রম করে তিনি উদার মতবাদকে সমর্থন করেছেন সারাজীবন, যা বাঙালির হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য। তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা যেমন ছিল জনপ্রিয় তেমনি

---

১৪. অন্নদা শংকর রায়, লালন ফকির ও তার গান, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, ৭নং গানটির উৎস্য: ফজল এ খোদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

১৫. ম. মনির-উজ্জামান, সাধক কবি লালন, কালে উত্তর কালে, বাংলা একাডেমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৮০

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয় ছিল তাঁর কাব্য প্রতিভা। গানের মাঝেই তিনি তার জীবন দর্শন আর কাব্য প্রতিভাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বাঙালির মাঝে। হাসন রাজা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "পূর্ববঙ্গের এক গ্রাম্য কবির (হাসন রাজা) গানে দর্শনের একটি বড়তত্ত্ব পাওয়া যায় যেটি হলো, ব্যক্তি স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ সূত্রেই বিশ্বসত্য।"[১৬]

হাসন রাজার কিছু গান

১. মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী হইয়ারে
কান্দে হাসন রাজার মন মুনিয়ায় রে,

২. হাসন রাজায় কয় আমি কিছু নয় রে, আমি কিছু নয়,
অন্তরে বাহিরে দেখি কেবল দয়াময়।

৩. হাসন রাজায় কয়, নামাজ ছাইড়া দিছি বেস্তে যাবার ভয়।[১৭]

এই সময়কাল পর্যন্ত বাংলা গানের যে সন্ধান পাওয়া যায় তা মূলত ছিল মানবতাবাদ, আধ্যাত্মচেতনা, অসাম্প্রদায়িক, উদারপন্থী চিন্তাপ্রসূত। দেশকে উপজিব্য করে বা পরাধীনতা থেকে মুক্তির বিষয়গুলি তখনও পর্যন্ত বাঙালিকে তেমনভাবে ভাবায় নাই। 'স্বদেশ প্রসঙ্গের অবতারনা যদিও কিছু গানে পরিলক্ষিত হয়েছিল তা ছিল শুধুই ধর্মীয় ও নিসর্গীয় অর্থে। বাঙালির মাঝে দেশপ্রেম উদ্ভূত হয় ইংরেজ শাসনামলেই। পরাধীন জাতির বিপন্ন অবস্থা থেকেই মূলতঃ স্বদেশ চেতনা আর স্বদেশ চেতনা থেকে মুক্তির গান বা বাংলা দেশাত্মবোধক গানের সৃষ্টি। বাঙালির মাঝে যা অনুভূত হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। যদিও তখন তা ততোটা ব্যাক্ত হয় নাই কাব্য ও গীতে। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১৯১১) সময়কালে রচিত হয় অসাধারন কিছু দেশাত্মবোধক গান। দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা, ভক্তি, দেশের নৈসর্গিক শোভা- ইত্যাদি ফুটে উঠেছিল সেই সকল গানে। এই সময়ের গীত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১৮]

বাংলা গান বাংলা সংস্কৃতির প্রান, যা সমৃদ্ধ হয়েছে রবীন্দ্রনাথ এর হাত ধরে। সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ ঘরে জন্ম গ্রহণ করেও রবীন্দ্রনাথ বাঙালির লোক মানসের সন্ধান পেয়েছিলেন। বাংলার মাঠ- ঘাট, অবারিত প্রান্তর, আকাশ, বাতাস, বনভূমি, নদী-সমুদ্র, পাহাড় রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে টানতো। বাংলার অতি সাধারন সরল জীবন, বাংলার নর-নারীর আটপৌরে জীবনকে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন নতুন উপলব্ধিতে। অসাধারন অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে তিনি তা অনুভব করেছেন। বাঙালি তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে তার স্বাদ আস্বাদন করেছে। বাংলার রূপ সৌন্দর্যকে বাঙালি নতুন উপলব্ধিতে অনুভব করেছে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। ভারতের জাতিভেদ

---

১৬. সনজিদা খাতুন সম্পাদিত অচিন পাখির কলগীতি, লোকগীতি কবিদের দৃষ্টি ও সৃষ্টিবীক্ষা, আবুল হাসনাত, ছায়ানট, ২০১৫, পৃ. ১৮৩

১৭. ৩ নং গানটির উৎস্য: ফজল এ খোদা, সঙ্গীত ভাবনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

১৮. আবুদশ শাকুর, বাঙালির মুক্তির গান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ০৯-১৩

প্রথা, সাম্প্রদায়িক চিন্তা, আর অস্পৃশ্যতাকে তিনি কখনো সমর্থন করেন নাই। জাতি বৈষম্যকে নিন্দা করে তিনি সবার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন মানবধর্মকে। তাঁর উদার মানবতাবোধ, প্রগতিশীল চেতনা তাঁকে বিশ্বমানব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গণমানুষের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। হিন্দু মুসলিম বিভেদ তাঁকে পীড়িত করেছে। তিনি আন্তরিকভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মিলন ও ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ভাষ্য, "আমাদের বিপদ এই যে, এই দূর্গতির জন্য আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হয়। কিন্তু এই দূর্গতির রূপ যে, প্রত্যহই ক্রমশ উৎকর্ষ হয়ে উঠেছে-সে যদি ভারত শাসনযন্ত্রের উর্ধ্বস্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হ'ত তা হলে কখনোই ভারত ইতিহাসের এতবড় অপমানকর অসভ্য পরিনাম ঘটতে পারতো না।"[১৯] রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় সৃষ্ট সমস্যার জন্য ইংরেজদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতিকে দায়ী করেন। প্রতিনিয়তই যারা ভারতবর্ষকে তার ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার অন্যায় অপচেষ্টা চালিয়েছে।

বাংলার লোকায়ত বাউল দর্শন রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাউলদের জীবনাচার আর বাংলার প্রকৃতির হাতছানি রবীন্দ্রনাথকে বারবার শিলাইদহ টেনে নিয়েছে। বাউল সান্নিধ্য কবিকে দিয়েছিল নতুন জীবন দর্শন। ইতিমধ্যেই তিনি অসংখ্য গান লিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু বাংলার রূপ, সৌন্দর্য আর বাউলদের সান্নিধ্যে তিনি ঋদ্ধ হয়ে নতুন আবেগ, অনুভূতি নিয়ে গান রচনা করেন। এই সময়ে তিনি যত গান লিখেছেন তা ছিল তাঁর গান রচনার প্রকৃত সময়। তিনি তাঁর রচনায় বাউল সুর ব্যবহার করেছেন। তাঁর স্বদেশী গানের সুর, তাল, লয়ে বাউল সুরের স্পন্দন আর আবেগকে অসাধারণ নৈপুণ্যে ব্যবহার করেছেন। তার পূর্বের সৃষ্টির চাইতে এই সৃষ্টির স্বাদ ও সৌন্দর্য ছিল সম্পূর্ণই ভিন্ন। পূর্ব বঙ্গের মুক্ত, উদার পরিবেশের সাধারণ মানুষ ও প্রকৃতি কবিকে আক্ষরিক অর্থেই মুক্ত করেছিল। শৃঙ্খলমুক্ত, শাস্ত্র বহির্ভূত, ধর্মের উর্ধ্বে বাঙালির সহজ সরল ভক্তিময় এক মানবিক স্তরের পরিচয় পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[২০]

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট কয়েকটি গান

১. সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।

২. এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা।

৩. ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।

৪. সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।

৫. আমাদের যাত্রা হলো শুরু এখন ওগো কর্ণধার

৬. এই কথাটি মনে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে।[২১]

---

১৯. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৫৩

২০. আব্দুল ওয়াদুদ, বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সঙ্গীত, মওলা ব্রাদার্স, ২০১১, পৃ. ১৫৬-১৬৭

২১. লিয়াকত আলী লাকী সম্পাদিত দ্রোহ ও মুক্তির গান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১২২-১২৬

Dhaka University Institutional Repository

বাঙলার পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার জন্য রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য গান লিখেছেন। তাঁর সৃষ্টির উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে গান। এবং গান রচনাতে তিনি সবচাইতে বেশি আনন্দ পেতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমি যখন গান বাঁধি তখনই সবচেয়ে আনন্দ পাই। মন বলে প্রবন্ধ লিখি, বক্তৃতা দেই, কর্তব্য করি, এর সবই এর কাছে তুচ্ছ। আমি একবার লিখেছিলাম, "যবে কাজ করি, প্রভুদেয় মোরে মান, যবে গান করি ভালোবাসে ভগবান।"[২২] তিনি আরো লিখেছেন, "গানগুলো শুনলে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এই সুরগুলো কারো কাছে ধার করা নয়।"[২৩] রবীন্দ্রনাথ রচিত দেশের গান, স্বদেশী গান পরাধীন দেশে রচনা করা হয়েছে। পরাধীনতার গ্লানী কবি অনুভব করেছেন গভীরভাবে। তাই তার স্বদেশী সঙ্গীতের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় সার্বজনীন স্বাধীনতার আস্বাদ। বাঙালির প্রতিটি সংগ্রামে, সংকটে, আন্দোলনে কবির গান প্রাসঙ্গিক হয়ে অনিবার্যভাবে ধরা দেয়। মনে হয় বর্তমান সময়ের সংকটকে মাথায় নিয়ে কবি লিখেছেন তার প্রতিটি স্বদেশী গান। বাঙালি জাতীয়তাবোধের রূপকার রবীন্দ্রনাথ বাস করেন স্বাধীনচেতা প্রতিটি বাঙালির মাঝে, বিভিন্নরূপে বিভিন্ন অবয়বে। রবীন্দ্রনাথের সার্বজনীন উপস্থিতি এই বাংলার প্রতিটি উৎসবে, পার্বনে, সঙ্কটে, মুক্তিতে।

মানবিক লালন, হাসন, রবীন্দ্রনাথের উত্তরসুরী হয়ে এরপর আবির্ভূত হন রুদ্র বৈশাখের মেজাজে কাজী নজরুল ইসলাম। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরস্থিতি যখন সহিংস পর্যায়ে পৌঁছে যায় সেই সময়ে নজরুল ইসলাম তার শিকল ভাঙ্গার গান নিয়ে আবির্ভূত হন। সঙ্গীত কখনও প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে, সঙ্গীত কখনও ঔপনিবেশিক শাসকের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে পারে তা প্রমাণ করেছিলেন নজরুল, রাজনৈতিক সহিংসতার মোক্ষম জবাব দিয়েছিলেন নজরুল তার প্রতিবাদী কথার গানের মধ্য দিয়ে।

নজরুল দুঃখ, দারিদ্র, অনটনকে মোকবিলা করে জীবনে যে আদর্শ, চিন্তা, দর্শনকে লালন করেছেন তা তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল একাধারে মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক, সাম্য, প্রেমিক, বিদ্রোহী কবি হিসেবে। চুরুলিয়ার অজয় নদীর পারে জন্ম নেওয়া নজরুল যার পূর্বসূরী হিসেবে অজয় নদীর অপর পারে জন্ম নিয়েছিলেন কবি জয়দেব। তার কিছু দূরে জন্ম নিয়েছিলেন কবি চণ্ডিদাস-যার অমর বাণী 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।' এই এলাকার আশে পাশে আরও বসবাস করতো বহু বৈষ্ণব প্রেমিক- যারা ভক্তিমূলক প্রেমের গানে ভরিয়ে দিয়েছিল মানুষের মন। তাদের ভাবশিষ্য হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন নজরুল। তিনি গেয়েছিলেন মানবতার গান, প্রেমের গান, সাম্যের গান, মুক্তির গান, দ্রোহের গান, বিদ্রোহের ও বিপ্লবের গান। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি গান নিয়ে বিচরণ করেছেন। এমন কোনো ক্ষেত্র ছিল না যেখানে তিনি তাঁর সুর নিয়ে আবির্ভূত হন নাই। সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট বঞ্চনাকে উপজিব্য করে অসাধারন গানের মধ্য দিয়ে তিনি জনমানুষের একজন হয়ে উঠেছিলেন। শোসকের অত্যাচার নিপীড়ন এর বিরুদ্ধে তিনি কলম দিয়ে প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হন নাই, কৃষক, শ্রমিক, কুলি, ছাত্র

---

২২. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, সঙ্গীত চিন্তা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৯৩-৯৪

২৩. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, সংস্কৃতিঃ জাতীয় মুখশ্রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

নারী পুরুষ বঞ্চিত প্রতিটি শ্রেণির পাশে থেকে গানে গানে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। তিনি লিখেছেন 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা', 'উঠরে চাষী জগৎবাসী ধর কষে লাঙ্গল', 'বল বীর বল উন্নত মমশির', 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর', 'এই শিকল পড়া ছল মোদের এই শিকল পরা ছল', 'মোরা ঝঞ্জার মতো উদ্যাম' সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার বিরুদ্ধে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন', 'জাতের নামে বজ্জাতি', 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম', ইত্যাদি গান। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, গোত্র, নির্বিশেষে তিনি মানুষের মঙ্গল কামনায় গেয়েছেন 'জয় হোক জয় হোক, শান্তির জয় হোক সাম্যের জয় হোক, জয় হোক।'

নজরুল যে ভাষায় গান লিখেছেন তার পূর্বসূরীদের মধ্যে কেউ সেভাবে লিখতে পারেন নাই। যুগের ও সময়ের প্রয়োজনে নজরুলের পূর্বসুরীদের গান তখন হয়েছিল অনেকটাই নিস্প্রভ। যা পরিস্থিতিকে মোকাবিলার জন্য যথাযথ ছিল না। নতুন পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন ভাষার, নতুন ছন্দের নতুন মেজাজের উদ্দীপনা জাগানো গান। নজরুল তার স্বভাবজাত বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পুরোপুরি আত্মস্থ করেছিলেন যে, সহিংসতার জবাব দিতে হবে সহিংসতার মধ্য দিয়েই। এভাবেই বাঙালির মাঝে চেতনার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছিলেন নজরুল। নজরুল তাঁর বিশ্বাস ও তাঁর দর্শনকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সৎ সাহস দেখাতে পেরেছিলেন। যার কারণে রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে তিনি নিজের জন্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন একটি মৌলিক অবস্থান। নজরুল ছাড়া অন্য কোনো গায়ক, কবিকে এমন সাহসী অবস্থানে দেখা যায় নাই। তিনি সাহসী কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন 'হে দারীদ্র তুমি মোরে করেছ মহান।' বাংলা সংস্কৃতিকে তিনি তার সাহস, শৌর্য দিয়ে বিশিষ্টতা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলা গানকে বিপ্লবী করেছেন নজরুল, ঔপনিবেশিক দখলদার বিতাড়নের মোক্ষম অস্ত্র ছিল নজরুলের গান। সেই সময় সার্বিক পরিস্থিতিতে নজরুলের গানের বিকল্প কিছু ছিল না।

নজরুল সঙ্গীত

১. জাগো অনশন বন্দী ওঠোরে যত,
জগতের লাঞ্চিত ভাগ্যহত জাগো।

২. দূর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার হে,

৩. আজি রক্ত নিশি ভোরে একি এ শুনি।

৪. দাও শৌর্য, দাও ধৈর্য্য, হে উদার নাথ, দাও প্রাণ।

৫. চল চল চল,

৬. আমরা শক্তি আমরা বল আমরা ছাত্র দল।

৭. অগ্রপথিক হে সেনাদল, জোর কদম চলরে চল।[২৪]

২৪. মোনায়েম সরকার সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের গান, আগামী প্রকাশনী, ২০১৬, পৃ. ২৮-৮৭

বাঙালির প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রাণ দিয়েছে শিল্পীরা। শিল্পীদের গানের সুরে বাঙালির চেতনা শানিত হয়েছে। এরপর চল্লিশের দশকে রচিত হয় অসংখ্যা গণসঙ্গীত। গণসঙ্গীতের প্রতিবাদের ভাষা বাঙালিকে শক্তি সাহসে প্রতিবাদী করেছে। সে সকল গানের সুরে ও কথায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল বাঙালি। অগ্নিঝড়া সে সকল গান গেয়ে অগ্নিদিনের রাজপথ উত্তপ্ত করেছে শিল্পীরা। ব্রিটিশ বিতাড়নের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে জন্ম হয় ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্র।

উদারতা, সহনশীলতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা সব কিছুই পাকিস্তান রাষ্ট্রে শুরু থেকেই ছিল অনুপস্থিত। যার নগ্ন বহি:প্রকাশ ঘটতে থাকে পাকিস্তানি শাসক কর্তৃক বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি চরম উপেক্ষা আর অবজ্ঞা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে।

বাঙালিরা পাকিস্তানের নব্য ঔপনিবেশিক শাসকের অন্যায় অন্যায্য আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। বাঙালির প্রতিবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সেনা শাসকের অন্যায় শোষনের মাত্রা বাড়তে থাকে। দিন যত যায় ততই ব্যবধান ও দুরত্ব বাড়তে থাকে বিপরীত দুই মেরুতে অবস্থানরত মানুষের মাঝে। বাঙালির নির্ভেজাল, ভালোমানুষের বৈশিষ্টকে পাকিস্তান সরকার দুর্বলতা ভেবে প্রথমে চোখ রাঙিয়েছে। পরে শক্তি প্রয়োগ করেছে। সবশেষে অস্ত্রের ভাষায় কথা বলেছে। বাঙালির প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্যের দৃঢ়তা দেখেও পাক সরকার ভুলের পথ পরিহার করে নাই। বাঙালির হৃদয়ের চাওয়া পাওয়াকে বুঝতে না চেয়ে তারা ব্যবধানের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়েছে। দীর্ঘ প্রায় চব্বিশ বছরের শোষনের মধ্য দিয়ে একদিকে তারা বাংলার মাটি মানুষের আস্থা হারিয়েছে, আর বাঙালি তাদের ধৈর্য্য সহনশীলতা নিয়ে অপেক্ষা করেছে, নিজেদের প্রস্তুত করেছে। বাঙালির সংগ্রামী চেতনা শানিত হয়েছে দীর্ঘ এই সময়কালে। প্রতিটি শ্রেণি পেশার মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিবাদে আন্দোলনে সোচ্চার ছিল গোটা পাকিস্তান সময়কালে। বিশেষ করে সঙ্গীত শিল্পীদের পাকিস্তানের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই শক্তিশালী অবস্থানে দেখা যায়। তাদের দৃঢ় অবস্থান আন্দোলন সংগ্রামকে দূর্বার গতি দিয়েছিল। গান যে শুধু ভাবের সুক্ষ্ম প্রকাশ ঘটিয়ে বাঙালিকে বিনোদনই দেয় না, গান যে সংগ্রামের প্রেরণা, দুঃসময়ের শক্তি, কল্যাণ কাজে উদ্দীপনা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ার মন্ত্র শেখায় তা নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে দেখিয়েছে বাঙালি শিল্পীরা। গণচেতনা জাগিয়েছিল নিজেদের অস্তিত্ব ও পরিচয় নির্নয়ে। অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে, অন্যায় বঞ্চনা থেকে মুক্তিতে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সর্বপরি স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ যুদ্ধের অনিবার্য প্রেরণা ছিল শিল্পীদের গান।

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে সঙ্গীত ও শিল্পীদের অবস্থান

বাঙালি চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য সঙ্গীতপ্রিয়তা। সঙ্গীত বাঙালি জীবনকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা, দিয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়। বাঙালির মুক্তির সংগ্রামের দীর্ঘ পথের বাঁকে বাঁকে গান ছাড়িয়েছে মনি মুক্তা। GUN-এর চেয়েও 'গান' কতটা শক্তিশালী প্রভাব রাখতে পারে মানুষের জীবনে, প্রতিটি সংকটে বাঙালি তার প্রমাণ রেখেছে। গানের ভুবন মোহন সুরের ঈন্দ্রজাল বাঙালির সংকট অতিক্রমে শক্তি যুগিয়েছে যুগে যুগে।

পরাধীন জীবনের গ্লানির মাঝেও বাঙালি তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছিল সযতন-সচেতনতায়। শত প্রতিকুলতার মাঝেও বাঙালি তার সঙ্গীতসত্তাকে বিসর্জন দেয়নি। সূচনালগ্নের ইতিহাসে দেখা যায় বাঙালির শুদ্ধতম বিনোদন ছিল সঙ্গীত এবং চিরায়ত বাঙালির আত্মার খোরাক। বাংলার মাটির সাথে বাঙালির আত্মিক সম্পর্কের মত সঙ্গীতও বাঙালির আত্মার সাথে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। শত প্রতিকুলতায়ও বাঙালি তার সঙ্গীত ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে অক্ষতভাবে। হাজার বছরের প্রতিকুল পথ চলায় সে বহন করেছে তার গর্বিত জাতিসত্তাকে। সগৌরবে তার বৈশিষ্ট্যকে জানান দিয়েছে উন্নত শিরে।

আদি বাঙালির উৎসের সন্ধানে আর কিছু পাওয়া না গেলেও তার সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া গেছে ঠিকই। 'চর্যাপদ' সে প্রমাণ দেয়। 'চর্যাপদ' আদি যুগের বাংলা ভাষায় লেখা কয়েকজন কবির গীতবিতান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার ও প্রকাশ করেছিলেন সেই চর্যাপদগুচ্ছ, যাতে ছিল ছেচল্লিশটি পুরো আর একটি খণ্ডিত পদ। অর্থাৎ মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ বা গান ছিল তাঁর চর্যাপদে। পরে প্রবোধচন্দ্র বাগচি এ গানগুলোর একটি তিব্বতি সংস্করণ আবিস্কার করেন। তাতে মনে হয় চর্যাপদের মোট গানের সংখ্যা ছিল একান্ন। এ পদগুলো লিখেছিলেন বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক-সিদ্ধাচার্যগণ। তেইশজন সিদ্ধাচার্য লিখেছিলেন এই গানগুলো। গানগুলোর ভাষা যেমন সুদুর, ভাব যেমন রহস্যময়, তেমনি রহস্যময় বাঙলা ভাষার প্রথম কবিদের নামগুলো। যেমন কাহ্নপা, লুইপা, কুক্কুরিয়া, বিরুআপা, গুডরিপা, ভুসুকুপা, সরহপা, শবরপা প্রভৃতি। সবচেয়ে বেশি গান লিখেছেন কাহ্নপা, যার অন্যনাম কৃষ্ণাচার্য বা কৃষ্ণাচার্যপাদ বা কৃষ্ণবজপাদ। তিনি লিখেছেন তেরটি গান। আর ভুসুকুপা লিখেছেন আটটি গান। অন্যরা কেউ একটি, কেউ

Dhaka University Institutional Repository

দুটি গান লিখেছেন। এ গানগুলোতে ধর্মের গুঢ় কথা বলা হয়েছে। চর্যা শব্দের অর্থ হলো আচরণ। সাধনার জন্য কি আচরণ করতে হবে, কি আচরণ পরিহার করতে হবে তার নির্দেশ ছিল এতে।[১]

বাঙলার বাঙালির ঐতিহ্যের সন্ধান করতে গেলে এদের কাছে ফিরতেই হবে। এই গানগুলো বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অমূল্য সম্পদ– যাকে তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি বলা হয়। সে যুগে কবিদের বুকে কবিত্বের কোনো অভাব ছিল না। তাদের দেখা দৃশ্য, তাদের হৃদয়ের সৃষ্ট আবেগ, অনুভূতি সব কিছুই গানে গানে প্রকাশ হয়েছে। যাকে বলা যায় সে যুগের সমাজচিত্র। মনি মানিক্যের মতোন সাজানো রয়েছে সব। এজন্য চর্যাপদ আমাদের ইতিহাসে সোনার মতো দামি।

বাঙালি জীবনের সঙ্গীতপ্রীতি বা সঙ্গীতময়তার কারণ খুঁজতে গিয়ে আহমদ শরীফ তাঁর মধ্যযুগের তালনামা(১৯৬৭) গ্রন্থে লিখেছেন “মানস প্রয়োজনে ও জৈবধর্মের তাগিদে সঙ্গীত মানব সমাজে স্বতঃউদ্ভূত। এবং সঙ্গীত আমাদের বাংলা-ভারত উপমহাদেশেও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানব সমাজে সৌন্দর্য ও আনন্দ বেদনা প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠে।”[২]

বাঙালির মানস জগত গড়ে উঠেছে বাঙালির পারিপার্শিক অবস্থা থেকে। আবদুল ওয়াদুদ বাঙালির মনোগজৎ প্রসঙ্গে বলেন “মনোজগৎ কিন্তু আকাশ থেকে আছড়ে পরা বা পাতাল ফুড়ে ওঠা কোনো বস্তু নয়। জীবন সংগ্রামের নানাবিধ পর্যায়, উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের নানাবিধ নির্যাস থেকে দানা বেঁধে ওঠা বস্তুবাদী জীবন দর্শনই বাঙালির মনোজগৎ। বাঙালির মনোজগতের উপাদানে মানবিকতার রস সঞ্চার করেছে বাংলার ভূগোল ও তার জলবায়ু–এই ভৌগোলিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা জীবন সংগ্রামের নানা ঘটনা।”[৩]

বাঙালির মানস সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে প্রধানত সঙ্গীত, সাহিত্য, আধ্যাত্মচেতনা আর দর্শনকে আশ্রয় করে। কিন্তু বিজ্ঞান বা গণিতের সাধনার কোনো ঐতিহ্য প্রমাণ বাঙালির নেই। বাঙলার মাটি, বাঙলার প্রকৃতি থেকে উঠে আসা গান স্বভাবতই বাঙলার, বাঙালির প্রতিটি ক্ষেত্রকেই স্পর্শ করে ধন্য করেছিল। ড. মোহাম্মদ হান্নান লিখেছেন, ‘বাংলার সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরকেই স্পর্শ করেছিল। সকল সময় ও কাল বাঙালির গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে। খুঁজে পাওয়া গানের মধ্যে গায়েনের নাম পাওয়া যায় নাই তবে গীতিকারের নাম রয়েছে। প্রতিটি গানে রয়েছে আলাদা ব্যাঞ্জনা, এমনকি রাগ ও তালের কথাও বলা আছে। অসাধারণ সৃজনশীল ছিলেন আদি বাঙালি শিল্পীরা। অত্যন্ত সুন্দর কথামালা সাজিয়ে জনগণের জন্য গান রচনা করে গেছেন।’[৪]

---

১. হুমায়ুন আজাদ, কত নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৮-১৯
২. ফজল এ খোদা, সঙ্গীত ভাবনা, বাংলা একাডেমি, ২০১২, পৃ. ১-২
৩. আবদুল ওয়াদুদ, মহাত্মা লালন, মানবতাবাদ ও সঙ্গীত, সাম্প্রতিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৮১
৪. কারা বাঙালি কেন বাঙালি, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

শত বছরের সঙ্গীত ঐতিহ্য বাঙালির। বাঙালি জীবনের চড়াই-উতরাই, ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন বাঙালি সঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছে, একই সাথে করেছে ঋদ্ধ, সমৃদ্ধ ও পরিণত। পরাধীনতার বেদনা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের আহ্বান-অনুপ্রেরণা, ইংরেজ শোষণ, আর্থিক অনটন দারিদ্র্য, বঞ্চনা, স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা, স্বদেশী পণ্য বর্জন, স্বদেশী দ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা, আত্মগৌরব, ঐতিহ্য-লালন, প্রকৃতির নির্মমতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা, অকৃত্রিম আন্তরিকতা, সাম্য ভিত্তিক সমাজ নির্মাণ, ভ্রাতৃত্ববোধ সব কিছুই বাঙালির সঙ্গীতকে পরিপুষ্ট করেছে।

সুপ্রাচীন কাল থেকে বাঙলার সাহিত্য– সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাংলার উদার প্রকৃতি ধরা দিয়েছে বিভিন্নরূপে। প্রকৃতির সন্তান বাঙালির জীবনে সঙ্গীত এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত যে-তা পরিবেশনের জন্য কোনো অনুসঙ্গ বা আনুষ্ঠানিকতার, পরিবেশ বা পারিপার্শিকতার প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি বাঙালিই স্বভাব গায়ক। উজানে-ভাটিতে, শরতে, হেমন্তে, বর্ষায় প্রতিটি ঋতুতে, পৃথক বর্ণনায়, পৃথক অনুভূতিতে। শত্রু সেনার সম্মুখে, প্রচণ্ড ভারাক্রান্ত মন নিয়েও বাঙালি গান গায়। মায়ের, দাদীর, নানীর মুখে রূপকথার গল্প শুনে বাঙালি শিশু তার কল্পনা জগত তৈরি করে। ছোট্ট ছেলে ঘোড়ার গাড়িতে মাকে নিয়ে তেপান্তরের রাজ্যে ঘুরে বেড়ায় সপ্নলোকে। আবার গভীর বিষাদে বাঙালির বিরহীসুর ভারাক্রান্ত করে সর্বসত্তাকে। কোথায় নেই বাঙালির গান। বাঙালির গান বাঙালিকে হাসায়, কাঁদায় বাঙালিকে বাঁচায়। প্রাণবন্ত করে রেখেছে বাঙালিকে– বাঙালির গান। বাঙালির গান বাঙালির প্রাণ। গানে গানে যুদ্ধ জয় করার ইতিহাস একমাত্র আছে এই বাঙালির। সঙ্কট বাঙালির নিত্যসঙ্গী-আর এই সঙ্কট উত্তরণে বাঙালির প্রধান হাতিয়ারই গান। বাংলার সঙ্গীতকে রবীন্দ্রনাথ জনসঙ্গীত বলেছেন। তাঁর মতে, "জনসঙ্গীতের প্রবাহ সেও ছিল বহু শাখায়িত। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে যেমন ছোট বড় নদীনালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি বয়েছিল গানের স্রোত, নানা স্রোত ধারায়। বাঙালির হৃদয়ে সে রসের দৌত্য করেছে নানা রূপ ধরে। যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কবির গান, কীর্তন মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে। লোকসঙ্গীতের এত বৈচিত্র আর কোনো দেশে আছে কিনা জানিনা।"[৫]

সঙ্গীত বাঙালির আধ্যাত্মিক চেতনার অংশ। বাঙালির অন্তরের এতোটা গভীরে সঙ্গীতের লালন যেখানে ধর্ম, গোত্র, বর্ণ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠীর ভেদাভেদ নেই। বাঙালির বাংলায় প্রতিটি বাঙালিই একসঙ্গে মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু ঐতিহ্যের অংশীদার। প্রকৃতিও তার নিয়মে একটার পর একটা উৎসব দিয়ে বাঙালির এই সম্মিলনকে মহোৎসবে পরিণত করেছে। আজ মুসলিমের ঈদ তো, কাল হিন্দুর পুজা, তারপর খ্রীষ্টানদের বড়দিন, তারপর আসে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের নিজস্ব উৎসব। আবার দৈনন্দিন জীবনে 'মসজিদে যখন আজান পরে, ঠিক একই সময় মন্দিরে শঙ্খ বাজে, গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি, মঠে-হয় ত্রোস্তপাঠ। আজান-ঘণ্টা, শঙ্খ, ত্রোস্ত মিলে যে একক ও অভিন্ন সুরের সৃষ্টি হয় সেই সুরের মুর্ছনাই বাঙালির নিজের সুর, আধ্যাত্মদর্শন।'[৬]

---

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীত চিন্তা, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৫৬

৬. ফজল এ খোদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি জীবনে বঞ্চনাবোধ থেকে তৈরি স্বদেশী সঙ্গীতের কোনো ঐতিহ্য বা পূর্ব ইতিহাস ছিল না। ১৭৫৭ সালে কোম্পানি শাসনের হাতে ক্ষমতা চলে যায় মুসলমান শাসকদের শাসনামলে ভারতবর্ষ শাসিত হওয়ার সময়ে। মুসলমান নবাবগণ বিদেশি হলেও এদেশে এসে ভারতীয়দের জাতিসত্তার গুণে মুগ্ধ হয়ে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাদের শাসনামলে বাঙালিরা পরাধীনতার অনুভূতি বা বঞ্চনার অনুভূতি নিজেদের জীবনে অনুভব করেনি সেভাবে। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে প্রথমবারের মতো বাঙালি তা উপলব্ধি করে। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) যুগের দেশপ্রেমিক শ্রী সখারাম গনেশ দেউস্কর বলেছেন "মুসলমান আমলে ভারতবাসী পরতন্ত্র হইলেও এরূপ পরাধীন ছিল না। ইংরেজের আমল হইতেই ভারতে প্রকৃত পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার সূত্রপাত হইয়াছে। এই পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার বিষময়কালে দেশের লোকের আর পূর্বেকার ন্যায় সঙ্কল্পে দৃঢ়তা নাই,কার্যে উৎসাহ নাই, জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য নাই–দেশের জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ দেশের ও সমাজের এই দুরবস্থা দর্শনে হৃদয়ের ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছেন, নানা সঙ্গীত ও কবিতার আকারে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। ইহাই বর্তমান কালের স্বদেশ ভক্তিমূলক সঙ্গীতগুলির উৎপত্তির কারণ।"[৭]

কবে, কখন, কার দ্বারা প্রথম স্বদেশী সঙ্গীত রচিত, গীত ও সুরারোপিত হয়েছে সে বিষয়ে জানা না গেলেও এ ক্ষেত্রে যারা অগ্রবর্তী তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, মুকুন্দ দাস, কাজী নজরুল ইসলামের নাম অগ্রগণ্য। তাছাড়াও নাম না জানা খ্যাত-অখ্যাত কবি স্বদেশী গান রচনা করে এ ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনে ভারতবর্ষের জনজীবনে বিরাট অভিঘাত সৃষ্টি করে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই এর দ্বারা আক্রান্ত হয়। বাংলার সমাজচিত্র দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। বাংলা জনপদে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিতে দ্রুতই ফাটল ধরতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরসঙ্গতি যা বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য তা আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যেতে থাকে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের আগে শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র ভারত উপমহাদেশেও সাম্প্রদায়িক বিরোধের কোনো নযির ছিল না।[৮] চণ্ডিদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' লেখার সমসাময়িক কালে মুসলমান কবি আবদুল হাকিম লিখেছিলেন 'নানানবরণ গাভীরে ভাই একইবরন দুধ, জগত ভ্রমিয়া দেখি একই মায়ের পুত' মানবতার জয়গানে ভরা এমনি কাব্যগীতি দিয়ে বাংলার সংস্কৃতি অংগন মুখরিত ছিল। ব্রিটিশ সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক বিভেদের প্রতিবাদে সমাজ সচেতন সাধক কবি লালন ফকির তাঁর কালে বাংলাদেশের সর্বত্র নানান জনপদের বিরাজমান সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে গানের মধ্য দিয়ে আলোড়ন তুলেছিলেন। এতে তাঁর নিজ চিন্তা আর দর্শন– সাথে যুক্তির মিশেলে শুধু অসাম্প্রদায়িক ভাবনাই প্রকাশ পায়নি, তাতে একই সাথে সমসাময়িককালের জীবন উপলব্ধি আর চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। কৃষকের জীবন যখন নানাভাবে বিপন্ন করে তুলেছিল

৭. প্রভাত কুমার গোস্বামী, ভারতীয় সঙ্গীতের কথা, আদিনাত ব্রাদার্স, কোলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২৪৪

৮. সালাউদ্দিন আহমদ, বঙ্গবন্ধু বাঙালি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সমকালীন ভাবনা, আগামী প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশের শাসন তখন বিদ্রোহ করেছিল নিপীড়িত কৃষকরা। ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করেছিল প্রভাবশালী হিন্দুরা। তাঁর গানে তখন তিনি সেই চিত্র তুলে ধরেছিলেন 'রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি, চোরেরও সে শিরোমনি, নালিশ করবো আমি কোনোখানে কার নিকটে।' লালন ইংরেজ বনিকের বিরুদ্ধে রাণীর কাছে নালিশ করে কিছু হবে না তা-জেনে গান লিখেছেন, 'সেই ঘাটে মহারাণীর দোহাই মানে না, সে নিজে হয় খোদ কোম্পানি।' আবার ঋণগ্রস্ত কৃষক-প্রজা জমিদারকে খাজনা দিতে না পারলে তার সম্পত্তি লাটে উঠবে সেটা জেনে লিখেছেন লালন 'লালন কয় খাজনারো দায়, কখন যেন যায় লাটে।' জমিদারদের বিলাসী জীবন আর তার যোগানদার ঋণে জর্জরিত কৃষক প্রজার জীবনচক্র বহুদিনের। তার প্রতি লালন আক্ষেপ করে লিখেছেন—'রাজা প্রজা সাধু মহাজন শব্দগুলি সর্বকাল, কিন্তু এড়াবে কি বেড়াপাকে, জড়িয়ে পড়ে সবায় মলো।'[৯]

লালন তাঁর নিজস্ব চিন্তা আর যুক্তির মিশেলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এমন অসংখ্য গান লিখেছেন তাদের অত্যাচার, নির্যাতন আর সৃষ্ট বিভেদের বিরুদ্ধে। লালন, হাসন এরা সবাই মানবতাবাদ আর সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর করতে লিখেছেন অসংখ্যগান। আঠারো আর উনিশ শতক জুড়ে বাংলার গ্রামাঞ্চলে এ সকল বাউল ও চারণ কবির আবির্ভাব দেখা যায়। তাদের গান বাঙালিকে উজ্জীবিত ও স্পর্শ করেছিল গভীরভাবে। এদের মধ্যে লালন, হাসন অন্যতম। বাংলার বাউলরা সাধারণ লোক ছিলেন। তাদের গানের শ্রোতাও ছিল সাধারণ ঘরের লোক। লালন নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু বাউলদের সাধনতত্ত্ব বুঝা কঠিন। সাংকেতিক ভাষায় যেসব কথা বলা হয়েছে তা বাংলা ভাষা হলেও সুবোধ্য বাংলা নয়। সেই চর্যাপদের সময় থেকেই এই প্রকাশধারা প্রবহমান।[১০] লালন তাঁর গানে আন্দোলনের ডাক না দিলেও তিনি ব্রিটিশের দ্বারা বাংলার কৃষক-প্রজাসাধারণের প্রতি সৃষ্ট দুর্দশাকে গানে গানে তুলে ধরেন। তার দেশ প্রেমের প্রকাশ এর মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। আর অসাম্প্রদায়িক মানবমুক্তির কথা বলাতে তিনি ব্রিটিশের রোষানলেও পড়েছিলেন। জমিদারদের অত্যাচার ও অন্যায় শাসনে লালনের ঘনিষ্টজন কুমারখালীর কাঙ্গাল হরিনাথ পড়েছিলেন, তাঁকে সহযোগীতা করতে কৃষক-প্রজাদের পক্ষ নিয়ে জমিদারদের পাঠানো লাঠিয়ালদের বিরুদ্ধে লালন এবং তাঁর অনুসারীরা লাঠি ধরেন বলে জানা যায়।[১১]

কোম্পানি শাসনের শুরুর দিকেই অন্যায়-অত্যাচারে জর্জরিত বাংলার দরীদ্র কৃষকদের প্রথম প্রতিবাদ ছিল নীল বিদ্রোহ। বাংলায় নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয় দুই পর্যায়ে। ইংরেজরা বাংলার কৃষকদের দিয়ে জোরপূর্বক নীল চাষ করাত। −ইংরেজদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে চাষীরা বাধ্য হতো নীল চাষে। একসময় কৃষকদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ১৮৫৮ সালে কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয় নীল চাষ না করার জন্য। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অত্যাচারী কৃষকদের কষ্ট নিয়ে তৈরি হয় ছড়া যাতে ফুটে ওঠে নীলকরদের অত্যাচারের অবর্ণনীয় কাহিনি। দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেন :

৯. ম. মনিরউজ্জামান, সাধক কবি লালন, কালে উত্তরকালে, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১০৩-১০৪

১০. অন্নদা শংকর রায়, লালন ফকির ও তাঁর গান, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৩১

১১. ম. মনিরউজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

'নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছাড়খার।
অসময়ে হরিশ ম'লো, লং এর হলো কারাগার।
প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার।'[১২]

দুই পর্যায়ের এই বিদ্রোহ ১৭৭৮-১৮০০ এবং ১৮৫৯-১৮৬১ সাল সময় ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। ইংরেজদের অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম শোষণ থেকে কারোই নিস্তার পাওয়া সম্ভব ছিল না। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী অত্যাচারিত হওয়ার একটা পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আপোষহীন সে সংগ্রামে সাঁওতালরা ইংরেজদের কামান, বন্দুকের গোলার বিরুদ্ধে হাতে তৈরি তীর ধনুক দিয়ে লড়াই করেছিল। যুদ্ধের বীর নায়ক ছিল চার ভাই, সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরব। এদের বীরত্ব গাঁথা নিয়ে বাংলার প্রাচীন লোকগীতির অমর কয়েকটি চরণঃ

'শুন ভাই বলিতাই সভাজনের কাছে
শুভা বাবুর আদেশ পেয়ে সাঁওতাল ক্ষেপেছে।
আছে সব জড়ো হয়ে পূর্বমুখে
তীর মারিছে গাছে
কতশত কর্মকার, সঙ্গেতে এনেছে।
তীরের ফলা বানাইছে
বরাত মতে যখন যেমন হয়
হাতে হাতে বানাইছে ফলা পাছে কিনা হয়।'[১৩]

১৭৬৩ সালে শুরু হওয়া ফকির সন্নাসী বিদ্রোহ ১৮৫৫-১৮৫৭ সাল পর্যন্ত, নীল চাষীদের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, কোম্পানি শাসনের নৃশংশতার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। ১৮৫৭ সালে জাতি গোষ্ঠী নির্বিশেষে কোম্পানির অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রাথমিক ভাবে শুরু হয়েছিল সিপাহীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে, পরবর্তীতে ব্যাপক জনগোষ্ঠী এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। সকলেরই লক্ষ ছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির পতন ঘটানো। ভারত বর্ষের কিছু বুদ্ধিজীবী, উচ্চবিত্ত এমনকি মধ্যবিত্তের কিছু অংশ এ বিদ্রোহে বিরোধীতা করেছিল। ইংরেজদের পক্ষাবলম্বনের কারণে স্বভাবতই তাদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। লোককবি রাধানাথ গান বাঁধেন সেই সময়ের সমাজ চিত্র নিয়ে–যার মধ্যে বিষয়টি ফুটে ওঠে। গানটি হলো:

'ঝাসীর রাণী লক্ষীবাঈ, তুঙ্গ ঘোড়ায় চড়ে,
বীরদর্পে অস্ত্র চালায় ইংরাজ মাঝারে।

১২. সাইম রানা, বাংলাদেশের গণসঙ্গীত বিষয় ও সুরবৈচিত্র, বাংলা একাডেমি, ২০০৯, পৃ. ৪৩৬
১৩. সৈয়দ মনসুর আহমদ, প্রামানিক লালন গানের সন্ধানে, উৎস: মহাত্মা লালন, মানবতাবাদ ও সঙ্গীত, সাম্প্রতিক প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৮৬-৮৭

ও তার মূর্তি দেখে ভিরমি লাগে চোক্ষে ছোটে বজ্রপাত,
শত্রু সেনা হেটে চলে সঙ্গে নিয়ে দশটা হাত।
মাগো তোমায় ডড় করিগো সঙ্গে নিয়ে বরাভয়
শত্রু সেনা ধ্বংস করি এস তুমি এ বাংলায়।
হায়গো মোদের আশা-ভরসা, সব বুঝি ফুরাল,
কোম্পানিরই জয় হলো আশায় প্রদীপ নিভিল।
মরল যত গুলি খেয়ে দেশের বড় নেতা।
তাই না দেখে দেশবাসীর ধরেছে আজ মাথা,
অধম রাধানাথে বলে শেষে ধরি দুটি হাত,
একত্র হইও না করিও বিসম্বাদ।'[১৪]

কোম্পানি শাসন পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসনামলের নির্যাতন নিষ্পেষণের মাঝে স্বদেশী সঙ্গীতের ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় স্বদেশী আন্দোলন গড়ে ওঠার সময়কাল থেকেই। ইংরেজদের অপশাসন বাঙালির মধ্যে স্বজাতিবোধ জাগিয়ে তুলেছিল। আর সে থেকেই মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা, দেশাত্মবোধ থেকে সৃষ্টি হয় কবিতা ও গান। দেশের প্রতি নাড়ির টান থেকেই সঙ্গীত চেতনা নবরূপে স্বদেশী গানের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। স্বদেশ প্রীতির অংশ হিসেবে মাতৃভাষার প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশ করে বহুপূর্বে নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯) রচনা করেছিলেন গান:

'নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা,
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর
ধরা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা'?[১৫]

বাঙালির মনে স্বদেশ চেতনার বহিঃপ্রকাশ প্রথম লক্ষ করা যায় বিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গ ভঙ্গকে কেন্দ্র করে। দেশের নৈস্বর্গিক সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে তখন অনেক গান রচিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেলা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল বাঙালির মনে দেশপ্রেম তথা জাতীয় অনুভূতি সঞ্চার করতে।[১৬]

একই বিষয়ে সুভাষ চৌধুরীর বক্তব্য পাওয়া যায় 'মুক্তির গানের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ছিল হিন্দু মেলা থেকে। তার আগে তেমন কোনো ধারাবাহিকতার সন্ধান মেলে না, যা দিয়ে একটি ক্রমবিন্যাস করা সম্ভব। তার প্রধান কারণ জাতীয়তাবোধের উন্মেষে সঙ্গীতের ক্ষমতার সম্ভাব্যতার কথা তখনো তেমন করে উপলব্ধি করা যায়নি।'[১৭]

---

১৪. আব্দুল ওয়াদুদ, মহাত্মা লালন, মানবতাবাদ ও সঙ্গীত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
১৫. আবদুশ শাকুর, বাঙালির মুক্তির গান, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭, পৃ. ১৩
১৬. প্রভাত কুমার গোস্বামী, ভারতীয় সঙ্গীতের কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫-২৮৬।
১৭. মুক্তির গান, বিনোদন সংখ্যা, দেশ পত্রিকা, ১৯৮৪, কোলকাতা, উৎস: আবদুশ শাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

১৮৬৭ সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিন কোলকাতার বেলগাছিয়া ভিলায় প্রস্তাবিত ‘হিন্দু মেলার’ প্রথম অধিবেশন হয়। এর প্রস্তাবনায় বলা হয় এতদিন রাজশক্তির সহযোগিতায় বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি লালিত পালিত হয়েছে, এখন সেই সহযোগীতাকে গৌণ হিসাবে বিবেচনা করে ‘আত্মনির্ভর’ হওয়ার জন্য ‘হিন্দু মেলা’র জন্ম।

‘হিন্দুমেলার’ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে “আমাদের মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য ভারতভূমির জন্য। ইহার আরো একটি উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভর ইংরেজ জাতির একটি মহৎ গুণ। আমরা এই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের একটি প্রধান অভাব আমাদের সকল কর্মেই আমরা রাজপুরুষের সাহায্য যাঞ্চা করি। ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়...যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়–ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।”[১৮]

হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন “সেকালে এই ভারত বর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ; মুসলমান প্রভৃতির এদেশের ওপর দাবি আছে-ইহা শিক্ষিত সমাজের মনে উদয় হয় নাই। এই সংকীর্ণ স্বদেশীকতার প্রেরণায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুত্বের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—আর সেই স্বদেশিকতার প্রেরণাতেই নবগোপাল ‘হিন্দু মেলার’ প্রতিষ্ঠা করেন।”[১৯]

এতে স্পষ্ট হয় যে হিন্দু মেলা সর্বভারতীয় লক্ষ উদ্দেশ্য বা অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ শৃঙ্খল মোচনের কোনো লক্ষে গড়ে উঠে নাই। এটা জন্ম হয়েছিল হিন্দুদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি আর বুদ্ধিজীবীদের অবস্থানকে সুসংহত করার লক্ষে আর সেই সাথে ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রস্থল হিসেবে।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোলকাতাকেন্দ্রীক হিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষে ইংরেজ রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশায় ১৮৬৭ সালে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এখানে মুক্তির গান গাওয়া হয়েছিল বা স্বদেশী গান গাওয়া হয়েছিল কিন্তু তা শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত হিন্দু শ্রেণির অংশগ্রহণে, সেখানে মুসলমান বা সাধারণ বাঙালির কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। যার জন্য ভারতবর্ষের প্রেক্ষিত চিন্তা করলে সর্বসাধারণের মুক্তির গান হিসেবে হিন্দু মেলার গানকে কোনোভাবেই সনাক্ত করা যায় না। হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গান গাওয়া হয়:

‘মিলে সব ভারত সন্তান,

---

১৮. মুক্তির সন্ধানে ভারত, যোগেশচন্দ্র বাগল, উৎস: এম আর আখতার মুকুল, কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, অনন্যা, ২০১৪, পৃ. ৪৭

১৯. মাহবুবউল আলম চৌধুরী, সংস্কৃতি জাতীয় মুখশ্রী, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

একতান মনঃপ্রাণ

গাও ভারতের যশোগান ।[২০]

'১৮৬৭ সালের হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশনেই মেলার প্রথম সম্পাদক গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর গান লিখেন প্রথম অধিবেশনের জন্য ।

'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে,
লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকরে ।'

গানটি প্রথম অধিবেশনে গাওয়া হয়-বলে জানা যায়

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) রচিত নিম্নের গানটি একাধিক অধিবেশনে পরিবেশিত হয়:

'দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ ।'

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) রচিত 'ভারত সঙ্গীত' মেলার জন্য লিখিত হয়ে, গীত হয় এবং জনপ্রিয়তাও পায় । গানটি ছিল:

'বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এই বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ।'

১৮৬৮ সালে হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) রচিত এই গানটি:

মিলে সব ভারত সন্তান একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?

এই গানটি- হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশনে গাওয়া হয় বলে জানা যায়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ।

মেলা উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন একটি গান:

মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি
রাত্রিদিবা ঝরিছে লোচন বারি॥

রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭) লিখেছেন এ যাবৎ যতগুলো লিখা গান তার মধ্যে সবচাইতে জনপ্রিয় গানটি । পরবর্তীতে বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামেও গানটি বহুল গীত হয়েছিল:

---

২০. এম আর আখতার মুকুল, কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

গোবিন্দ চন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭) লিখেছেন:

কতকাল পরে বল ভারতরে
দুঃসাগর সাঁতারি পার হবে।

১৮৭৫ সালে নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) লিখেছেন:

চাহিনা স্বর্গের সুখ নন্দন কানন
মুহূর্তেই পাই যদি স্বাধীন জীবন।

১৮৮১ সালের বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) বিপুল জনপ্রিয় গানটি:

বন্দে মাতরম,
সুজলাং-সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরাম্।

গানটি ১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ তার নিজের কন্ঠে নিজের দেয়া সুরে পরিবেশনের কারণে ব্যপক জনপ্রিয়তা পায়, সেই সাথে স্বদেশী সঙ্গীত রূপে ব্যপক সমাদৃত হয়।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) লিখেছেন:

'উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই
উপস্থিত যুগান্তর,
চলাচল নারী নর
ঘুমাবার বেলা আর নাই।'

১৮৯৮ সালে বিনাবাদিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) রচিত গান:

চল রে চল সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহবান।
বীরদর্পে পৌরুষ গর্বে সাধরে সাধ সবে দেশের কল্যাণ
পুত্র ভিন্ন মাতৃ দৈন্য কে করে মোচন?[২১]

২১. আবদুশ শাকুর, বাঙালির মুক্তির গান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-২২

Dhaka University Institutional Repository

গানগুলিতে ভারত যশ, গৌরব গাথা, পরাধীন জীবনের গ্লানী, হাহাকার, বঞ্চনা, নিজেদের ব্যর্থতা, শৃঙ্খলিত জীবন, স্বাধীনতার আকাঙ্খা, জেগে উঠার প্রত্যয়, দেশের প্রতি ভালোবাসা ও দেশমায়ের ঋণ শোধ করার আহ্বান ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের পথিকৃত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বাগ্রে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গচর্চা ও বাঙালি জাগরণের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পারিবারিক পরিবেশ ও শিক্ষা সবটাই ছিল এর পক্ষে অনুকুল।

'নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেলার পরিবেশ রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশী সঙ্গীত রচনায় প্রেরণা দেয়। হিন্দু মেলা ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় ভাব সঞ্চারিত করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। জোড়াশাঁকোর ঠাকুর পরিবার নেপথ্যে থেকে 'হিন্দু মেলা'র উদ্যোগকে সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছিল। মাত্র ১৬/১৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ এতে অংশগ্রহণ করে সকলকে বিস্মিত ও আপ্লুত করেছিলেন আপন প্রতিভায়।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৭ সালে মাত্র ষোল বছরে বয়সে প্রথম দেশাত্ববোধক গানরচনা করেন:

'তোমারি তরে মা, সঁপিনু এ দেহ
তোমারি তরে, মা, সঁপিনু প্রাণ।'

এর পরে সতের বছর বয়সে আরো তিনটি দেশের গান রচনা করেন:

১। ঢাকোরে মুখ, চন্দ্র মা, জলদে।
বিহগেরা থামো থামো, আঁধারে কাঁদো গো তুমি ধরা।

২। অয়ি বিষাদিনী বীণা, আয় সখী, গালো সেই সব পুরানো গান
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে ভরিয়া দেনা লো আঁধার প্রাণ।

৩। ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি
যত দিন সিন্দু না ফেলিবে গ্রাসি ততদিন তুই কাঁদরে।

১৮৭৮ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদিত 'জাতীয় সঙ্গীত' গীতি সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণে রবিন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) এই চারটি গান প্রকাশিত হয়:

আঠারো বছর বয়সে লিখা গান:

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন–বন্দে মাতরম।

তেইশ বছর বয়সে লেখেন নীচের দুটি গান:

১। একি অন্ধকার এ ভারতভুমি।
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি!

Dhaka University Institutional Repository

২। শোন শোন আমাদের ব্যাথা দেবদেব, প্রভু, দয়াময়–
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয়।

রাম প্রসাদী সুর আর কবির স্বকণ্ঠে গীত ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে পরিবেশিত হয় নিচের গানটি:

'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে'?[২২]

শেষের গানটি পরবর্তী সময়ের সব সংগ্রাম আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধকালেও জনপ্রিয় গান হিসেবে গাওয়া হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অবিভক্ত বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা জানা প্রয়োজন। কোলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম। ঠাকুর পরিবার কয়েক পুরুষ ধরে সেই সময় পরাশক্তি ইংরেজদের বদৌলতে সম্পন্ন অবস্থানে ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পন করছেন তখন কোলকাতার বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি সাম্রাজ্যবাদী পৃষ্ঠপোষকতায় একটা সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছে গেছে। এর নেতৃত্ব স্থানীয়রা তখন ইউরোপীয় 'রেনেসার' আদলে বাঙলার নবজাগরণের একটা ক্ষেত্র খুঁজছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি অনুভব করে এই শৃঙ্খল থেকে বেড়িয়ে আসার চেষ্টা করেন। যার কারণে তাঁকে বহু বিরম্বনা সহ্য করতে হয়েছে।[২৩]

একই সাথে রবীন্দ্রনাথের জীবনের আরো একটি সত্যকে স্বীকার করে বলতে হয় যে, পারিবারিক আভিজাত্যের পরিবেশে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথ বাবার সাথে পূর্ববঙ্গে আগমন এবং এখানে সাধারণ বাঙালির আরম্বরহীন জীবন, সারল্য, প্রকৃতির উদারতা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন। এখানকার বাউল, ফকির, সন্ন্যাসীর গান, গানের কথা ও সুর তার সৃষ্টিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর গান বিশেষ করে স্বদেশী সঙ্গীতে এর বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পদ্মাতীরে আসার আগ পর্যন্ত কোলকাতার নাগরিক জীবনে তিনি ছিলেন পরবাসী। বাংলার প্রকৃতি তাঁকে শুধু মুগ্ধই করে নাই গ্রামের বিচিত্র সংঘাতময় জনসমাজের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে যা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি জীবন ও শিল্পী জীবনের বাঁক ঘুড়িয়ে দিয়েছিল।

বাংলার বাউলের দর্শন, তাদের আধ্যাত্মচেতনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ গভীর উৎসুক ছিলেন। তারা যে মিলনের গান গেয়েছেন তাতে ফুটে উঠেছে বাঙালির চিরায়ত সভ্যতা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য

২২. আবদুশ শাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৫
২৩. এম আর আখতার মুকুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

রাগ রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।"[২৪]

হিন্দু মেলাকে কেন্দ্র করে স্বদেশী সঙ্গীত রচিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু স্বদেশী সঙ্গীতের যথার্থ বিকাশ ঘটে ছিল বঙ্গভঙ্গ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই সময়ের সঙ্গীতকারগণ রাজনৈতিক, সামাজিক অস্থিরতা প্রশমন করতে একের পর এক স্বদেশী গান রচনা করেছেন। প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল বঙ্গদেশকে কেন্দ্র করে। সাম্প্রদায়িতাকে প্রতিহত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত সেন, মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪), অতুল প্রসাদ (১৮৭১-১৯৩৪) রচিত গান মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কোলকাতার বিশাল সভা ও শোভাযাত্রায় রবীন্দ্রনাথের 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ' প্রভৃতি গান গাওয়া হয়। টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় বাউল সুরে গাওয়া হয় 'আমার সোনার বাংলা।' ইংরেজ শাসনের অন্যায় স্বার্থ চিন্তার ফলশ্রুতিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরিতে সফল শাসকচক্র যে সর্বনাশ এর পথ তৈরি করেছিল তার প্রতিবাদে এর মাত্র ১৮ দিন পর ২৫ আগস্ট বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আরও একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর লিখিত 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। চরমপন্থী হিন্দুদের বিষয়টি মনঃপুত হয়নি।

১৯০৫ সালের ৯ অক্টোবর ছিল হিন্দুদের 'বিজয়া দশমী।' এই দিন কোলকাতার বাগবাজারে পশুপতি বসু মহাশয়ের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্রনাথ 'বিজয়া সম্মেলন' নামে এক ভাষণ দেন, যার কিছু অংশ:

"হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো। যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষন করো, যে রাখাল ধেনু দলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষনে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষন করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। ...একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্ব ভূবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো–

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পূণ্য হউক পূণ্য হউক
পূণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন

২৪. এম আর আখতার মুকুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

এক হইক এক হউক

এক হউক হে ভগবান।[২৫]

এই গানের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ একক বঙ্গভূমির কথাই ব্যক্ত করেন। তিনি অসম্প্রাদায়িক সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবানের আর্শীবাদ প্রার্থনা করেন।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গ বিভাগের সরকারি ঘোষণা কার্যে পরিণত হয়। ঐ দিনকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধন উৎসব উদ্ভাবন করেন এবং তাঁর লিখা গান গেয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা নেন। ব্যাপক সহিংস আন্দোলনের মাঝেও বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার দিন পর্যন্ত প্রতি বৎসর রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি গাওয়া হতো। বঙ্গভঙ্গের পুরোভাগে বর্ণ হিন্দুদের সাথে অবস্থান করে রাখী বন্ধনে অংশ নিয়ে তিনি নিজ হাতে অসংখ্য পথচারীর হাতে রাখী পড়িয়ে দেন। সেদিন বিকেলে ৫০ হাজার লোকের সমাবেশে মিলন মন্দির উদ্বোধন করেন। তারপর এক বিরাট নগ্নশোভাযাত্রায় রবীন্দ্রনাথের সদ্য রচিত 'ওদের বাধন যতই শক্ত হবে' আর 'বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান' গান দুটি সমবেতভাবে গাওয়া হয়। সেই গান গেয়ে শোভাযাত্রা এগিয়েছিল।[২৬] এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ কালে যত গান স্বদেশকে নিয়ে রচিত হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গান রচনা ও কণ্ঠ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বঙ্গভঙ্গ রদ উপলক্ষে রচিত গানে রবীন্দ্রনাথ গণমানুষের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করেন। তিনি তখনকার গানে অত্যন্ত সার্থকভাবে বাউল, কীর্তন, লালন, রামপ্রসাদী ইত্যাদি লোকসুরের ব্যবহার করেছিলেন। ঐ সময়ে–তাঁর রচনা, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।'

বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ নিজ কন্ঠে ১৫ খানা স্বদেশী গান রেকর্ড করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে 'ও আমার দেশের মাটি' 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' 'এবার তোর মরা গাঙ্গে', 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে', প্রভৃতি গান উল্লেখযোগ্য।

একই সময়ে 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিসনে তুই', 'বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই–মরতে হবে', 'আমরা পথে পথে যাব সারে সারে' গানগুলিও লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বাংলার লোকসুর, বাউলসুর রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের সুর রচনায় গভীর প্রভাব ফেলেছে। মাতৃভূমির প্রতি তার গভীর ব্যকুলতা, প্রেম, শ্রদ্ধা, আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। স্বদেশ চেতনায় পুষ্ট রবীন্দ্রনাথ কখনো কোনো রচনাতেই হিংস্র, উগ্র সহিংসতার কথা প্রকাশ করেন নাই। তারপরও তার লিখা স্বদেশী সঙ্গীত সে যুগের তৃষ্ণা মিটিয়ে আজও বাংলার মুক্তির সংগ্রামসহ সকল আন্দোলন সংগ্রামেরই প্রেরণার অংশ আর উৎস হিসেবে বাঙালির হৃদয়ে স্থান করে আছে।

২৫. এম আর আখতার মুকুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০-২৩১

বাঙলার বাউলসুরের গান–রবীন্দ্রনাথের রচিত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় আসীন। রচনার ৬৬ বছর পর বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গানটি স্বীকৃতি পায়।

এছাড়াও মুক্তির আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ গান তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছিল। তাঁর বাউলসুরের গান, রামপ্রসাদী সুরের গান বাঙালিকে আচ্ছন্ন করেছিল, সিক্ত করেছিল। গণমানুষের সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে গানগুলি নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছিল পরবর্তীকালে। কবি তাঁর গানের ডালি নিয়ে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। যেমন:

১) তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে।
২) ছি ছি চোখের জলে ভেজাসনে আর মাটি।
৩) যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে-যানা।
৪) নিশিদিন ভরসা রাখিস

রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ করার পায়তারা করলে বাঙালি প্রবল প্রতিরোধে তা ব্যার্থ করে দেয়। প্রথম জন্মতিথি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের উক্ত গানগুলো বাঙালি গণমানুষের মনকে ছুঁয়ে দিতে পেরেছিল।

একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে সার্থক হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের গান:

১) স্বার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
২) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়বো না মা।
৩) কে এসে যায় ফিরে ফিরে।
৪) চলো, যাই চলো যাই।

আবার মুক্তি যুদ্ধকালে গীত হয়েছিল গভীর মমতা আর ভালোবাসায়:

১) দেশে দেশে ভ্রমিতব দুখগান গাহিয়ে।
২) ঢাকোরে মুখ, চন্দ্র মা, জলদে
৩) সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে।

আবার স্বাধীনতার পরে আত্মতুষ্টি নিয়ে বাঙালি গেয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান

১) এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে।
২) জাগো নির্মল নেত্রে
৩) আমরা পথে পথে যাব সারে সারে।

কিছু গান লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ আত্মসমালোচনার ঢংয়ে, যখন বাঙালি নিজের গৌরব সম্মান ভুলে অন্যের দ্বারস্থ হয়। প্রশ্নবোধক সে গানগুলিও অনেক সময় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে শিল্পীদের কণ্ঠে। যেমন:

১) মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে

২) একহাতে ওর কৃপাণ আছে, আর এক হাতে হার।[২৭]

জানা যায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে সামিল ছিলেন মাত্র তিন মাস। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সংগঠন পর্যায়ে এবং সূচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথের অংশগ্রহণ দেখা গেলেও নানান অর্থবহ করণে তাঁর ভেতর মানসিক টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। সহকর্মীদের মধ্যে সংকীর্ণ ধর্মীয় মনোভাব, উত্তেজনাময় বক্তৃতা, রক্তাক্ত গুপ্ত সন্ত্রাসবাদীপন্থা আর সাম্প্রদায়িক বিভেদ রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করে। গণমানুষের কল্যাণের পরিবর্তে কোলকাতার উচ্চ পর্যায়ের হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ স্বার্থে পরিচালিত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের পক্ষে বিবেকের সমর্থন পান নাই তিনি।

একসময়ে সবাইকে বিস্মিত করে তিনি আন্দোলন থেকে দুরে সরে যান। তিনি বিদ্বেষ ছড়ানো বক্তৃতার জবাবে লিখেছিলেন "দেশে যদি বর্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মতো লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। ---উন্মাদনায় যোগ দিলে কিঞ্চিত পরিমানে লক্ষভ্রষ্ট হতেই হয় এবং তাহার পরিনামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।"[২৮] এরপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আকস্মিক সিদ্ধান্তে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান।

দ্বিজেন্দ্র লাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

-দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত স্বদেশী গান বাংলার অমূল্য সম্পদ। এই সঙ্গীতে তিনি এনেছেন গভীর প্রেমময়তা। তিনি একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে স্বদেশী সঙ্গীতের মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি বাংলা গানকে অনেকটা এগিয়ে নিয়েছেন। তাঁর স্বদেশী গানে কোমলতা ও বলিষ্ঠতার মিশ্রন খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর কিছু গান–

১। তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে
কখনো বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে।

২। ধনধান্যে পুস্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।

৩। বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।

৪। চল সকলে দিব জীবন ঢালি, জয় মা ভারত জয় মা কালী।

৫। গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ

ধনধান্য গানটি বাংলাদেশের জাতীয় গীতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

২৭. সনজিদা খাতুন, স্বাধীনতার অভিযাত্রা, ভাষা আন্দোলন নববর্ষ ছায়ানট মুক্তিযুদ্ধ, নবযুগ প্রকাশনী ২০০৪, পৃ. ৩৪-৩৫

২৮. এম আর আখতার মুকুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)

স্বকীয় বৈশিষ্টে উজ্জল রজনীকান্ত রচিত দেশের গান, অত্যন্ত সহজ সুর ও কথার এ-গানে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন তিনি। লোকসঙ্গীতের মধ্যে বাউল ঢংয়ে রচিত তাঁর গানগুলো বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। তাঁর লেখা কিছু গান–

১। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই

২। নমো নমো নমো জননি বঙ্গ, উত্তরে ঐ অভ্রভেদ্য, অতুল বিপুল গিরি অলঙ্ঘ্য।

১নং গানটি বাঙালির সংগ্রাম মুখর দিনে জনপ্রিয় গান হিসেবে অসংখ্যবার গীত হয়েছে।

অতুল প্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)

বিদেশী শাসনের চাপে মৃত প্রায় দেশবাসীর মনে স্বদেশিকতার প্রেরণা জাগাতে যাঁরা সঙ্গীত রচনা করেন তাঁদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ সেন অন্যতম। স্বদেশী গানে তিনি রাগ-রাগিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও সঙ্গীতে তার প্রভাব পাওয়া যায় নাই। সেটাই তাঁর কৃতিত্ব। তিনি দুই শ্রেণির স্বদেশী গান রচনা করেন। একশ্রেণীর গানে দেশের ভৌগলিক বিবরণ, দেশের অতীত মহিমায় গর্ববোধ এবং উত্তেজক ভাষার সঞ্চার আর এক শ্রেণির গানে তিনি জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তাদের দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততায় দ্বিধা-শঙ্কায় আশঙ্কায় ভুগে নিজেদের মাঝে বিভেদ পরিহার করার কথা প্রকাশ করেছেন। গানগুলো স্বদেশীকতা ও মানবতা গুনে সমৃদ্ধ। একই সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথাও বলা হয়েছে।

১। দেখ মা এবার দুয়ার খুলি গলে গলে,
এনু মা তোর হিন্দু মুসলমান দু ছেলে।

২। হও ধরমেতে বীর, হও করমেতে বীর।

৩। মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা।

৪। পরের শিকল ভাঙ্গিস পরে, নিজের নিগড় ভাঙ্গরে ভাই? ।[২৯]

৩ নং গানটি বাঙালির ভাষা আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। গানটি বাঙালি শিল্পীদের গলায় প্রতি বছর ভাষা দিবসে গভীর মমতায় ধ্বনিত হয়।

মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪)

নজরুলের পূর্ববর্তী সময়ে স্বদেশী গানে প্রথম প্রতিবাদের সূচনা হয় মুকুন্দদাসের গানে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টিতে মুকুন্দ দাসের সংগ্রামী ভূমিকা আজও অবিস্মরণীয় হয়ে

২৯. ৩ ও ৪ নং গান দুটি আবদুশ শাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৪, প্রভাত কুমার গোস্বামী, ভারতীয় সঙ্গীতের কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮-২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

আছে। কাজী নজরুল যেমন পেয়েছিলেন বিদ্রোহী আখ্যা তেমনি মুকুন্দ দাস পেয়েছিলেন 'চারণকবি' আখ্যা। অশান্ত যজ্ঞেশ্বর দাস ২৪ বছর বয়সে এক ত্যাগী সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে শান্ত, স্থীর হয়ে মুকুন্দ দাস নাম গ্রহণ করে জীবনের গভীরতার পানে মনোযোগী হন। তাঁকে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা দেন এবং চারণকবিতে পরিণত করেন বরিশালের একচ্ছত্র নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩)। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চারণকবি মুকুন্দ দাস তাঁর দেশ ও দেশের জনগণকে মুক্তির গান শুনিয়ে যান। তাঁর কিছু গান :

১। বাবু বুঝবে কি আর ম'লে, কাঁধে সাদা ভুত চেপেছে, একদম দফা সারলে।

২। আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম, তবে ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব-রথি অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।

৩। ফুলার আর কি দেখাও ভয়? দেহ তোমার অধীনবটে মনতো তোমার নয়।

৪। রাম রহিম না জুদা কর ভাই, মনটা খাঁটি রাখজী।

৫। আয়রে বাঙালি আয় সেজে আয়, আয় লেগে যাই দেশের কাজে।

৬। পণ করে সব লাগরে কাজে, খাটবো মোরা দিন কি রাতে।

৭। ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে।

৮। আবার যখন গান ধরেছি।

৯। হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে

১০। ভাইরে ধন্য দেশের চাষা

১১। বান এসেছে মরা গাঙ্গে খুলতে হবে নাও।

১২। আমরা নেহাত গরীব আমরা নেহাত ছোট,

১৩। করমেরই যুগ এসেছে, সবাই কাজে লেগে গেছে।

ইংরেজ শাসন বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন করে সকল পর্যায়ের মানুষের কাছে মুকুন্দ দাস সমাদৃত হন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। সৃজনশীলতা দিয়ে নিভৃত পল্লীর চারণকবি বহুদূর পর্যন্ত সমাদৃত হয়েছিলেন।[৩০]

গ্রামের সহজ সরল মানুষের বোধগম্য ভাষায় লিখা মুকুন্দদাসের গান বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলায় ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। মওলানা ভাষানী মুকুন্দ দাসের গান পছন্দ করতেন। তেমন গান শিল্পীদের বেশি বেশি লিখতে বলতেন, যে গান শুনে সাধারণ বাঙালি সহজেই একাত্ম হতে পারে। গণসংস্কৃতি কর্মীরা তার কথায় সাড়া দিয়ে সহজ ভাষায় গান লিখেছেন যা সহজেই গণমানুষকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছিল।

এ সকল গানে দেশ প্রেম, দেশের অতীত গৌরব, পরাধীনতার গ্লানী, শৃঙ্খল ভাঙ্গার আকুতি, জেগে ওঠার আহ্বান, সাদা ফিরিঙ্গিদের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর

---

৩০. ১০, ১১, ১২, ১৩ নং গানগুলি দ্রোহ ও মুক্তির গান, সম্পাদক: লিয়াকত আলী লাকি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০১২, পৃ. ১০৭-১১১, আবদুশ শাকুর, বাঙালির মুক্তির গান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

গানে ইংরেজদের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রুপের পাশাপাশি থাকতো ভারত থেকে বিতাড়নের হুংকার। জনগণ সে সময়ে এ সকল গানে খুঁজে পেয়েছে দেশের প্রতি নিজেদের ভালোবাসা, দায়িত্ব বোধের প্রেরণা, জনসচেতনতা জাগানোর জন্য বিশেষভাবে কাজ করেছিল এ সকল স্বদেশী গান। তবে মুকুন্দ দাস চিন্তার জগতে জনগণকে বেশি নাড়া দিতে পেরেছিলেন তার দৃপ্ত প্রত্যয়ী ও প্রতিবাদী শব্দ ব্যবহার করে। গানের সুরে তিনি বাঙালিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার সাহস যুগিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। দেশকে শত্রু মুক্ত করার এ মহান দায়িত্ব সকল বাঙালির জন্য অবশ্য পালনীয় বিষয়টি মুকুন্দ দাস বুঝিয়েছেন গানের বাণী দিয়ে। বাঙালিকে জাগিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন, ঐক্যবদ্ধ করেছেন–সাহসী এ চারণকবি।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মুকুন্দ দাসের চারণ আন্দোলনকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিয়ে যান উচ্চ শিক্ষিত চারণ কবি বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়। মার্কসীয় দৃষ্টি ভংগীতে অনুপ্রাণীত প্রগতিশীল এই চারণ কবি সঙ্গীত শিল্পের সাথে চারণ দর্শনের সমন্বয় ঘটান। চারণ আন্দোলনে আস্থাশীল এই কবি যিনি বিশ্বাস করতেন যে, চারণ গান ও গায়কদের আন্দোলনে অত্যাচারী শাসকের বিদায় ঘটবে, প্রতিষ্ঠিত হবে সাধারণ মানুষের মুক্তি। সময়ের প্রয়োজনে চারণ দল দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য গান গেয়ে শোভাযাত্রা করতো। কবি নিজেও অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশাত্ববোধক গান গেয়ে পথঘাট মুখরিত করেছেন। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এই চারণ আন্দোলন অব্যাহত ছিল। তবে পরবর্তী সাংস্কৃতিক আন্দোলন এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। শিল্পীদের চারণ গান নিঃসন্দেহে একটি ভিন্ন ধারা সৃষ্টি করেছিল।[৩১]

রমেশশীল (১৮৭৭-১৯৬৭)

চট্রগ্রামের লোক কবি বাংলার প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তাঁর অসাধারণ, প্রগতিশীল জীবনকে কাজে লাগিয়েছেন। বারংবার জেল খেটেছেন, সরকারের শত্রু তালিকায় থেকেও আপাদমস্তক বিপ্লবী, সঙ্গীতপ্রাণ মানুষটি জীবনকালে প্রতিটি সংকটে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর গানগুলো:

১. রইশ্যার বাপরে রইশ্যার বাপ
২. ওঠো জাগো কৃষক ভাই থেকো না আর ঘুমে
৩. বাংলার কৃষক ভাইগণ হওরে চেতন
৪. সর্বহারার দল ছুটে আয় সকল,
৫. শ্রমিকের দরদী ভাই জগতে নাই,[৩২]

---

৩১. ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৬-২৭

৩২. আবদুশ শাকুর, বাঙালির মুক্তির গান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪১

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পরবর্তী সময়কালে বাঙালির দেশাত্ববোধক গানের ধারা কিছুটা স্থিমিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখার ক্ষেত্র পরিবর্তন, কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ১৯০৭ সালে, রজনীকান্ত সেন ১৯১০ সালে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯১৩ সালে পরলোকগমন করেন। অতুল প্রসাদ ভিন্ন ধারায় গান রচনায় মনোযোগ দিলেন। স্বদেশী সঙ্গিতের শূন্যতার সেই সুযোগটি বেগবান করে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের পথকে। এই সময়ে"বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য আয়োজনে দেশাত্ববোধের প্রকাশ মরাকটালের নিস্তেজ ধারায় বহমান থাকলেও, দেশপ্রেমী সঙ্গীতের বিশেষ শ্রেণিটিতে গভীর শুন্যতাই দেখা দেয়। এই পটভূমিতেই বেগবান হয় বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা।"[৩৩]

১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল বঙ্গভঙ্গ রদ করার উন্মত্ত আন্দোলন চলাকলীন বৃটিশরাজ এর প্রতি আক্রোশ মেটাতে গিয়ে বিহারের মুজাফফরাবাদে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচাকী ইংল্যান্ডের চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে ট্রেনে বোমা মেরে হত্যার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে দুইজন নিরপরাধী মহিলা এতে নিহত হন। কিংসফোর্ড পরের ট্রেনে আসায় সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। ক্ষুদিরাম বন্দী হন। প্রফুল্লচাকী আত্মহত্যা করেন। ১১ আগস্ট ১৯০৮ সালে ১৯ বছর বয়সের ক্ষুদিরাম বসুকে ইংরেজ সরকার ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে।"[৩৪]

ক্ষুদিরামের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে ইংরেজ হটানোর স্বদেশী আন্দোলন দ্রুত সহিংস হয়ে উঠে। বীর নায়ক হিসেবে বাঙালির মুখে মুখে ক্ষুদিরাম বসুর নাম ছড়িয়ে পড়ে। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়ার গৌরব অর্জনের জন্য সবাই অমর হওয়ার সংগ্রামী শপথে হাসিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাঁর দুঃসাহসিক জীবনদানের মধ্য দিয়ে বাংলার সংগ্রাম ও আন্দোলন প্রথম বারের মতো সশস্ত্র রূপ ধারণ করে এবং বেগবান হয়। এই আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করার জন্য রচিত হয় অসংখ্য গান। তাঁর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় গান পিতাম্ভর বাউল রচিত (কারো কারো মতে রচয়িতা অজ্ঞাত) গানটি:

একবার বিদায় দেমা ঘুরে আসি
আমি হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে জগতবাসী (ভারতবাসী)
কলের বোমা তৈরি করে দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে মাগো
মাগো, বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম ইংল্যান্ডবাসী,
আবার অনেক বছর পরে জন্ম নেব ঘরে ঘরে মাগো
তখন চিনতে যদি না পারো মা দেখবে গলায় ফাঁসি।
এখন আমি মোটে একজন লক্ষ হয়ে আসবো তখন মাগো
তখন রোদন ভরা চোখে তোমার ফুটবে সুখের হাসি॥
এই দেশের মজুর কিষান যারা ক্ষুদিরাম যে হবে তারা মাগো
তখন মুক্ত হবে ভারতভুমি সকল শৃঙ্খল নাশি॥[৩৫]

---

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩৪. সাইম রানা, বাংলাদেশের গণসংঙ্গীত বিষয় ও সুর বৈচিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩৫. আবদুশ শাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

ক্ষুদিরামের গর্বিত জীবনদান ও তাঁকে নিয়ে তৈরি হওয়া জনপ্রিয় গান নিয়ে নুরজাহান মুরশিদ লিখেছেন,“বাংলার গান বাংলার সংস্কৃতিক ধারাবাহিকতায় এক আশ্চর্য মর্মস্পর্শী সূত্র। ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান গায় নাই এমন গ্রাম নেই। ‘একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, আমি হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে জগতবাসি।’ সত্যি ক্ষুদিরাম যেন তার অপূর্ব বাসনা নিয়ে বারবার ফিরে এসেছে এই বাংলার মাটিতে। যে সাহেব কানাইয়ের গলায় ফাঁসির দড়ি পড়িয়েছে সেই বলে, এমন মানুষ সে দেখেনি। তখন দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারলেই যেন জীবন চরিতার্থ হলো, এমন কথাই মানুষ ভেবেছে। জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে না পারলেও মরণ যুদ্ধে জয়ী হতে তারা ছিল বদ্ধপরিকর। ‘মরতে মরতে মরণটারে শেষ করে দে একেবারে’– বাঙালির ইতিহাসে জীবন উৎসর্গ করার এমন মহৎ উদাহরণ যদি না থাকতো ‘হা হা হা পায় যে হাসি ভগবান পরবে ফাঁসি’ লেখার মতো কবি যদি না জন্মাতেন, তবে বোধ হয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই ত্যাগ স্বীকারের ক্ষমতা বাঙালির হতো না’।”[৩৬]

ক্ষুদিরামের স্বদেশী আন্দোলন তথা বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতি ত্যাগের, জীবন উৎসর্গের কাহিনি নানাভাবে সম্মানিত হয়েছে বাঙালির কাব্য, গান, প্রবন্ধে, নাটকে।

ক্ষুদিরামের প্রাণ দেয়ার ঘটনা ইংরেজদের ক্ষমতার ভীত কাঁপিয়ে দেয়। পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। সঙ্গীত ক্ষেত্রেও যার প্রচণ্ড প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পূর্বের স্বদেশী সঙ্গীতের হাল্কা সুর, হাল্কা মেজাজের পরিবর্তে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা প্রয়োজন অনুভব করলেন নতুন সুরের, নতুন কথার, নতুন গানের, যাতে সার্বিকভাবে পরিস্থিতিকে তুলে ধরা যায়। ঠিক তেমনি এক প্রয়োজনের মুহূর্তে মঞ্চে আবির্ভূত হলেন প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে “কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ১৯২১ সালে। নজরুল তাঁর সহজাত জ্ঞান দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে আজকের বিশ্বনন্দিত তত্ত্বটি তখনই উপলব্ধি করেছিলেন,যেটি অনেক পরে ওয়েষ্ট ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিষ্ট এবং সোশ্যাল ফিলসফার ফ্র্যানাৎস ফানোঁ (১৯২৫-১৯৬১) তাঁর উৎযাপিত ‘দ্য রেচেড অব দ্যা আর্থ’-গ্রন্থে(১৯৬৮) লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তত্ত্বটি হলো: “সহিংসতার মাধ্যমে যে দখলদারের আগমন, তার বিতাড়নও সম্ভব কেবল সহিংসতারই মাধ্যমে। আরো খোলা কথায়– যে আমাদের দখল করেছে হানাদার হয়ে, আমাদেরও হানাদার হয়েই তাকে বেদখল করতে হবে।”[৩৭]

বিশ শতকের শুরুতে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যত গান রচিত হয়েছে আর যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম সাড়া জাগানো কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল বিদ্রোহী কবি, প্রতিবাদের কবি, দ্রোহের কবি, নিপীড়িত জনতার কবি একই সাথে সাম্য, মানবতা আর প্রেমের কবি। তিনি যে ভাষায়, যে শব্দে স্বত:স্ফুর্তভাবে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার গান লিখেছেন একটার পর একটা, তার পূর্বে তেমন করে আর কেউ লিখতে পারেন নাই। যুগের দাবিকে হুবহু মিটিয়ে তিনি যেভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যে প্রচণ্ড গর্জনে তা জানান দিয়েছিলেন তা সেই যুগকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, ইংরেজ শাসককে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। তিনি পরাধীনতার

৩৬. নুরজাহান মুরশিদ, আমার কিছুকথা, অন্য প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ৭১-৭২

৩৭. আবদুশ শাকুর, বাঙালির মুক্তির গান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

শৃঙ্খল ভাঙ্গার গানই শুধু লিখেন নাই, অন্যায় অত্যাচার, বৈষম্য, অসাম্য, কৃষক, শ্রমিকের মুক্তি, অসাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক অনাচার, অসাম্য সব ক্ষেত্রেই তিনি কলম ধরেছেন। বাংলার বাঙালির বঞ্চনার এমন কোনো ক্ষেত্র নাই যেখানে নজরুল তার লিখার মাধ্যমে প্রতিবাদ জানান নাই। এজন্য তাকে মূল্যও কম দিতে হয় নাই। একজন সঙ্গীত শিল্পী, সমানভাবে স্বদেশের জন্য সংগ্রামী তা নজরুলের জীবনেই লক্ষ করা যায়। ইংরেজ শাসককে তীব্র ভাষায় ঘৃণা আর ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়নের সাহসী শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন নজরুল। নজরুলের ভাষায়,"স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক একরকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীদের অধীনে থাকবে না, ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্তই থাকবে ভারতবাসীদের হাতে, তাতে কোনো বিদেশী মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।"[৩৮]

নজরুলকে রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করে বৃটিশ সরকার। "১৯২২ সালে নজরুল কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার হন, রাজদ্রোহীতার অভিযোগে। বিচারে একবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেলখানায় তিনি অনশন ধর্মঘট করেন। সে ধর্মঘটে দেশব্যাপী তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়; রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লচন্দ্র থেকে শুরু করে বিপুল সংখ্যক মানুষ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম পাঠান, চিত্তরঞ্জন দাশ কোলকাতার জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। এর আগেই নজরুলের কারাবাসের সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ নজরুলের নামে তাঁর সদ্য প্রকাশিত গীতিনাট্য 'বসন্ত' উৎসর্গ করেন। একটানা ৩১ দিন অনশন করেছিলেন নজরুল। জেল খেটেছেন ১ বছর তিন সপ্তাহ। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে অনেকেই কারাভোগ করেছেন। কিন্তু কবিতা লিখে কারাগারে যাওয়ার ঘটনা এই প্রথম এবং শেষও।"[৩৯]

হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য নজরুল যেভাবে কাজ করেছেন অন্য কোনো লেখক বা শিল্পী তা পারেননি। জেল, জুলুম, অত্যাচার-নিপীড়ন কোনো কিছুকে পরোয়া না করে নজরুল ব্রিটিশকে অভিযুক্ত করেছেন সরাসরি।

অসাম্প্রদায়িক নজরুল ব্রিটিশের সাম্প্রদায়িক বিষবাস্প ছড়িয়ে দিয়ে হিন্দু মুসলিমের বিরোধকে কোনো দিনই মেনে নিতে পারেন নাই। তিনি একদিকে গানের মধ্য দিয়ে তা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন, আবার লেখা এবং বক্তব্যের মাঝেও সবাইকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। প্রতিবাদের এমন রূপ ভারতবাসী প্রথম দেখেছিল নজরুল ইসলামের অসাধারণ সৃষ্টিতে। তাঁর সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে কেউই তার মতো সহায় সম্বলহীন দুর্দশা থেকে উঠে আসেন নাই। সম্প্রদায়গতভাবেও তারা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। বিত্তের দিক থেকে আর সম্প্রদায়গত পরিচয়ে নজরুল ছিলেন ব্যতিক্রম। নজরুল যেভাবে বৃটিশদের ঔপনিবেশিক ও

৩৮. ধুমকেতু, প্রথমবর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬ আশ্বিন, ১৯২৯ সাল, ১৩ অক্টোবর, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ, উৎস: জাতীয় কবি নজরুল, আসাদুল হক, শোভা প্রকাশ,২০১০, পৃ. ১২

৩৯. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নজরুলকে চিনতে চাওয়া, সংহতি, ২০১৪, পৃ. ১১২-১১৩

সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা সেকালের রাজনৈতিক মহল ও বুদ্ধিজীবী মহলও চিন্তা করতে পারে নাই।

অসামান্য প্রতিভা ৩০ বছর বয়সের কাজী নজরুল কবিতা লিখে জাতীয় বীর হয়েছিলেন, যা বাঙালির ইতিহাসে দুর্লভ ঘটনা। তাকে জাতীয় সংবর্ধনা দেয়া হয় কোলকাতায়। সভাপতি প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'নজরুল বাংলার কবি, বাঙালির কবি।' প্রধান অতিথি সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'নজরুলের গান গাইতে গাইতে আমরা জেলে যাবো, আমরা যুদ্ধে যাবো। যুদ্ধে সুভাষ বসু সত্যি সত্যি গিয়েছিলেন। আরো পরে পূর্ব বাংলার মানুষ গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে নজরুলের গান গাইতে গাইতে।'[৪০]

কাজী নজরুল ইসলামের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাঙালি মাত্রই এ মাটির সন্তান। এই বাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতি উভয়ের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এ সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য নজরুল সোচ্চার ছিলেন আজীবন।

নজরুল সর্বশক্তিতে অসাম্প্রদায়িক বাঙালির জাতীয়তার ঠিকানা রচনা করেছেন। নিজের জীবনেও ঐ সমন্বিত চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন যথাসাধ্য। এদিক থেকে নজরুল একক ও অনন্য। যেমন জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তেমনি সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে। আর এ জন্যই তিনি উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীলদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন–এ দিক থেকেও নজরুলের তুলনা তিনি নিজেই।

নজরুল সৃষ্ট গানে বাঙালি বিভিন্ন ভাবে প্রাণীত হয়েছে। বাংলার শান্ত স্নিগ্ধ রূপ ফুটে উঠেছে নজরুলের গানে। যেমন:

১) শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্মল

২) ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি

৩) একি অপরূপ রূপে মা তোমার

আবার বিপ্লবের প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে উচ্চকিত হয়েছে তার গান। তেমন গানই বেশি লিখেছেন কাজী নজরুল। কাজী নজরুলের আবির্ভাব ঘটে ঝঞ্ঝা, বিক্ষুব্ধ, অস্থির পরাধীন ভারতবর্ষে। যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ভারতবর্ষের আকাশ বাতাসকে দূষিত করে চলেছিল। দাঙ্গা হাঙ্গামায় রক্তাক্ত পরিবেশ ভারতবাসীর জীবন যাত্রাকে ব্যাহত করে তুলেছিল। তাঁর গান হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে প্রশমিত করেছিল। আর ঔপনিবেশিক শাষণ থেকে বাংলার শৃংখল মুক্তির অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

নজরুল বুঝেছিলেন এভাবে হুংকার না দিলে ব্রিটিশ এ দেশ থেকে লড়বে না। সত্যি সত্যিই বৃটিশ নজরুলের গানকে গুলির চেয়েও বেশি বিপদজনক মনে করতো। নজরুলের কিছু গান:

১। এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল।

---

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩

Dhaka University Institutional Repository

২। একি অপরূপ রূপে মা তোমার হেরিনু পল্লী জননী।

৩। ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি।

৪। কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট রক্ত জমাট।

৫। চল্ চল্ চল্ উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল

৬। জাগো অনশন বন্দী ওঠোরে যত

৭। দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার হে,

৮। মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মতো চঞ্চল,

৯। আজি রক্ত নিশি ভোরে একি এ শুনি

১০। শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয়রে আয়।

১১। জাতের নামে বজ্জাতি সব,

১২। তোরা সব জয়ধ্বনি কর,

১৩। মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম

১৪। ওঠরে চাষী, জগদ্বাসী ধর কষে লাঙ্গল,

১৫। জাগো নারী, জাগো বহ্নি শিখা,

১৬। আমি যুগে যুগে আসি,

১৭। গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ,

১৮। জয় হোক জয় হোক শান্তির জয় হোক।

১৯। নতুন পথের যাত্রা পথিক।[৪১]

'গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান' মানুষের মুক্তিই ছিল নজরুলের ধ্যান-জ্ঞান। নজরুল তাঁর গানে শুধু পরাধীনতার শৃঙ্খলই ভাঙ্গতে চাননি তিনি চিরদিন বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন তার গান ও সুর দিয়ে। বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ অবধি চিরন্তন প্রেরণা যুগিয়েছে তাঁর গান। আজও বাঙালি– জাতীয় কবির এ সকল গানে প্রাণিত হয়, সাহসী হয়। যে কোনো অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার শক্তি ফিরে পায়। '১৯২১-১৯২৬' পর্যন্ত নজরুল মাত্র ছয় বছর দেশাত্ববোধক গান রচনা করার সময় পেয়েছেন।'[৪২]

এ পর্যায়ে এসে 'দ্বিজেন্দ্রনাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রমুখের পর বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় যে 'গীতিকার' 'সুরকার' এবং গায়ক পৃথক হয়ে গেছেন। ২০ শতকের দ্বিতীয় দশকে সঙ্গীত জগতে আমরা পাই অন্যতম কয়েকজন সুরকার। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হিমাংশু কুমার দত্ত। অল্প বয়সেই তাঁর গানের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।তবে কোনো জলসায় তিনি গাইতেন না, তাঁর

---

৪১. ১-১৮ নং গান নেয়া হয়েছে দ্রোহ ও মুক্তির গান, সম্পাদক লিয়াকত আলী লাকী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০১২, পৃ. ৫০-৬২, ১৯ নং গান নেয়া হয়েছে সনজিদা খাতুন, স্বাধীনতার অভিযাত্রা, ভাষা আন্দোলন, নববর্ষ, ছায়ানট, মুক্তিযুদ্ধ, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ৩৫

৪২. প্রভাত কুমার গোস্বামী, ভারতীয় সঙ্গীতের কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

Dhaka University Institutional Repository

সুরের সাধনা ও বৈচিত্রে মুগ্ধ হয়ে ভাটপাড়া থেকে তাঁকে 'সুর সাগর' আখ্যায় ভূষিত করা হয়। তিনি গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়েও আপন স্বতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন।'[৪৩]

এর পূর্বে শ্রমবিভাজন না হওয়ার কারণে গানের সুরকার, শিল্পী, গীতিকার একজনই ছিলেন। যার কারণে পৃথকভাবে জানা যায় না গানের শিল্পী কে, সুরকার কে, গীতিকার কে? তাই পৃথক পরিচয় খোঁজার বা জানার সুযোগ অবান্তর। তবে অধিকাংশ স্বদেশী গান সম্মিলিতভাবে বা সমবেতভাবে বা ফোরামে গাওয়া হতো, দুই একটা ব্যতিক্রম ছাড়া। ফজল এ খোদা বলেন "বাঙালি মাত্রই গানের শ্রোতা। কেউ গানের বাণী রচয়িতা, কেউ সুরকার, কেউ বাদক, কেউ গায়ক। আবার কেউ কেউ গানের সবগুলো ক্ষেত্রেই সমান পারদর্শী। যিনি গান রচনা করেন, তিনিই সুর করেন, তিনিই বাজান, সাথে সাথে তিনি নিজেই গাইছেন। যার কারণে এ দেশে যত স্বভাব কবি-শিল্পীর জন্ম হয়েছে তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। সারা পৃথিবী জুরে শ্রম বিভাগের যুগ শুরু হওয়াতে সঙ্গীতেরও নবজন্ম হলো। যেখানে সঙ্গীতে একক প্রতিভার প্রভাব একচ্ছত্র ছিল, সেখানে খণ্ড প্রতিভার আবির্ভাব হলো, সৃষ্টি হলো সঙ্গীত কর্মীর। সৃষ্টি হলো বাণী রচয়িতা, সুরকার, বাজিয়ে ও গায়কের। সবাই সবার ক্ষেত্রের যোগ্যতা, দক্ষতা প্রমাণে সচেষ্ট। এভাবে সঙ্গীত একক প্রতিভার সাধনালব্ধ ফসল না হয়ে, হয়ে গেল সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। তাই যে গানে সঙ্গীতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমমানের যোগ্য সঙ্গীত কর্মীদের সম্মিলন ঘটে, সে গানটিই গান হয়। সর্বজনে সমাদৃত হয়।"[৪৪]

বাংলার মুক্তিসংগ্রামে গণসঙ্গীতের রয়েছে এক বিরাট অবদান। তিরিশ আর চল্লিশের দশকে গণমানুষকে জাগিয়ে তোলার এক বিপুল প্রয়াস লক্ষ করা যায় গণসঙ্গীতের মাধ্যমে। বাংলার বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত, কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়, প্রতিবাদ আন্দোলন ও উজ্জীবনে রচিত ও গৃহীত সামগ্রিক সঙ্গীতই বাংলাদেশের গণসঙ্গীত হিসেবে পরিচিত। গণসঙ্গীতের বাণী আর সুরের কারণে সাধারণ মানুষ সহজেই এর সাথে একাত্ম হয়।

মোবারক হোসেন খানের মতে, 'গণসঙ্গীতের বিস্তার অবাধ। সাধারণ মানুষ গণসঙ্গীতের বানী আর সুরে যোগ দিতে পারে অনায়াসে কারণ এ্ গান তাদেরই জন্য রচিত। তাদের মনের কথাই এতে প্রতিফলিত। তারা এ গানের ভিতর দিয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পায়।... ফলে এ গানের জনপ্রিয়তা অসীম, অসামান্য।'[৪৫]

গণসঙ্গীতের জোয়ার এসেছিল চল্লিশের দশকে কাজী নজরুল ইসলামের দেখানো পথ ধরেই। নজরুলকেই গণসঙ্গীতের পূর্বসুরী হিসেবে গণ্য করা যায়। গণসঙ্গীতের সাথে গণমানুষের বন্ধন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন নজরুল। সামাজিক মানুষকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে আন্দোলন শক্তিশালী হয় না। যা বুঝেছিলেন নজরুল ও পরবর্তীকালের গণশিল্পীরা। মানুষের হাহাকার ক্ষোভ গ্লানি আন্তরিক উপলব্ধি দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন গনশিল্পীরা। নজরুল যেমন আর্ত ও

---

৪৩. প্রভাতকুমার গোস্বামী, ভারতীয় সঙ্গীতের কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

৪৪. ফজল এ খোদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

৪৫. মোবারক হোসেন খান 'গণ মানুষের গণসঙ্গীত' যুগান্তর, ১৮ মার্চ, ২০০৫

নিপিড়ীত জনতার কাতারে বসে তাদের হৃদয়তন্ত্রীর ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করেছিলেন গানে গানে। তেমনি করেই গণসঙ্গীত শিল্পীরা সঙ্গীতের প্রতিবাদী ধারার পথ তৈরি করেছিলেন। পরবরর্তীকালের বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের সঙ্গীতাঙ্গন যাত্রা শুরু করেছিল গণশিল্পীদের প্রগতিশীল পথ ধরেই। যা ব্যক্তি ও গণমানুষকে নব জীবনের আকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

কাজী নজরুল যার বীজ বপন করে গিয়েছিলেন তাকে এগিয়ে নিয়েছিলেন তার উত্তরসুরী হয়ে দেড়দশক পরে গণসঙ্গীতের উদ্যোক্তারা। 'চল্লিশের গণসঙ্গীতের মুখ্য কথাকার, সুরকার এবং রূপকার ছিলেন কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১১-১৯৭৭), হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২-১৯৮৭), বিনয় রায় (১৯১৮-১৯৭৫) এবং সলিল চৌধুরী (১৯২২-১৯৯৫)। তাদের পাশাপাশি আরো যারা ছিলেন রমেশ শীল কবিয়াল (১৮৭৭-১৯৬৭), নিবারণ পণ্ডিত, পরেশধর, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫), কবি সুভাস মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩), কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭), সাধন দাশগুপ্ত, দিলীপ সেনগুপ্ত, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, সাগর চক্রবর্তী, ব্রজলাল অধিকারী, বিপুল চক্রবর্তী প্রমুখ। গণসঙ্গীতের আবার দুটি ধারা ছিল যার একটি শহুরে সঙ্গীত আরেকটি গ্রামীণ সঙ্গীত। প্রথমটির নেতৃত্বে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। তাঁর সাথে ছিলেন সলিল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস (১৯১১-১৯৮০), হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৯), সুজাতা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়, তৃপ্তি মিত্র (১৯২৫-১৯৮৯), সাধন রায় চৌধুরী।দ্বিতীয় ধারাটির নেতৃত্বে ছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী (১৯২২-১৯৮১), খালেদ চৌধুরী, গোপালনন্দী এবং হেমন্ত দাস প্রমুখ।[৪৬]

গণসঙ্গীত শিল্পীদের গান মুক্তির আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাদের রচিত গান বিপন্ন, অসহায় বাঙালিকে আশার বাণী শুনিয়েছিল। তাই তাদের স্মরণ করতে হবে যখনই বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম প্রসঙ্গের অবতারণা হবে। প্রতিটি গান আজও সমানভাবে বাঙালিকে উদ্দীপিত করে। প্রেরণা যোগায় অন্যায় শোষন বঞ্চনার প্রতিবাদে। সেই সময়ের গানগুলো যারা লিখেছেন এবং সুর করেছেন তাদের নাম এবং গানের সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরা হলো।

জোতিরিন্দ্র মৈত্র লিখেছেন:

১. এসো মুক্ত করো মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার

২. যশোর খুলনা বগুড়া পাবনা

৩. না না না না না মানব না মানব না

৪. ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই মরণের পাল তুলে জীবনতো আসবেই

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

৫. তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষান ভাইরে, কাস্তেটারে দিও জোরে শান

---

৪৬. আবদুশ শাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৬. বাঁচবো বাঁচবোরে আমরা বাঁচবোরে বাঁচবো

৭. উদয় পথের যাত্রী ওরে রে ছাত্র ছাত্রী

৮. এই মাটির এই ধুলিকণায় কতো রক্তরেখা

৯. সৈনিক, মুক্তিশিবিরে হাঁকে বিউগ্‌ল্ আহ্বান শোন ঐ সেনানীর

১০. ভুলবোনা, ভুলবোনা, ভুলবোনা মহানগরীর রাজপথে যত রক্তের স্বাক্ষর

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জনপ্রিয় গান

মাউন্ট ব্যাটন সাহেব ও
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে
থুইয়া গ্যালায় ও
তোমার সোনার পুরি আঙ্গার কইরা
ও ব্যাটন সাহেব
তুমি কই চলিলায়
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।...

পরাধীন দেশের নিদারুন দুর্ভাগ্যের সকল প্রহসন ভেঙ্গে ১৯৪৭ সালে বাঙালি বেড়িয়ে এসেছিল বীরত্বের সাথে লড়াই করে। ১৯০ বছরের সাম্রাজ্য ছেড়ে ব্রিটিশকে ফিরে যেতে হয়েছিল নিজ দেশে। ব্যঙ্গাত্বক কাব্য ও শ্লোকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস নিরিক্ষা মুলক ছন্দ বৈচিত্রে ভরা উক্ত গানটি রচনা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে রচিত গানটি গ্রাম-গঞ্জে, শহরে-নগরে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

বিনয় রায় লিখেছেন (১৯১৮-১৯৭৫)

১১. শোন ওরে ও শহরবাসী, শোন ক্ষুধিতের হাহাকার

১২. সপ্তকোটি জনরঙ্গভূমি বঙ্গদেশ বীর প্রসবিনী

১৩. ক্ষুধিতের সেবার ভার, লও লও কাধে তুলে

সলীল চৌধুরী (১৯২২-১৯৯৫)

১৪. কোন এক গাঁয়ের বধুর কথা তোমায় শোনাই শোনো,

১৫. হেই সামালো, হেই সামালো হেই সামালো ধান হো কাস্তেটা দাও শান হো,

১৬. বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা

১৭. ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে, আলো ফুটছে, প্রাণ জাগছে

১৮. ঝংকারো ঝংকারো রুদ্রবীণা তার সাম্য শান্তি রাগিনী জাগো যারা জাগোনি

১৯. নওজোয়ান নওজোয়ান বিশ্বে জেগেছে নওজোয়ান

২০. আর গান গেয়ে কি হবে বলো?

২১. শ্যামল বরণী কন্যা ওগো

২২. পথে এবার নামো সাথী পথেই হবে এ পথ চেনা

২৩. ধিতাং ধিতাং বলে কে, মাদলে তান তোলে

২৪. অধিকার কে কাকে দেয়?

২৫. রানার ছুটেছে তাই ঝুম ঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে

২৬. অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি

২৭. হে মহাজীবন আর এ কাব্য নয়

২৮. হিমালয় থেকে সুন্দর বন হঠাৎ বাংলাদেশ

২৯. হে সাথী আজকে সপ্নের দিন গোনা

অতিন্দ্র মজুমদার

৩০. এসো একবার একসার হয়ে ময়দানে যাবো মিশে

৩১. কোন গর্জনে নেমে আসে ঝড়

নিবারণ পণ্ডিত (১৯১৫-১৯৮৪)

৩২. ভাব কি চমৎকার গো দেশের ভাব কি চমৎকার

৩৩. একসাথে চল গড়বো মোরা রাঙা দুনিয়া

৩৪. এই দেশ ছিল দেশের সেরা

৩৫. নিশি অবসান জাগরে তোরা

কবিয়াল শেখ গুমানীর কথা ও সুর

৩৬. সঙ্খের ভেরী বেজেছে রে ঐ

কথা : আবদুল করিম, সুরঃ আব্বাস উদ্দীন

৩৭. ও ভাই মোর বাঙালিরে

কবিয়াল রাই গোপাল দাসের কথা ও সুরঃ

৩৮. আর কতদিন ঘুমিয়ে রবে বাংলাদেশের কৃষকগণ

পরেশ ধড়ের কথা ও সুরঃ

৩৯. ও ভাইরে, বন্ধু, বলতে কি পারো

৪০. এমন একটা আসছে রে দিন

৪১. প্রাণে প্রাণ মিল করে দাও

৪২. মোদের গানের অঙ্গনে যদি মানুষ না পায় ঠাঁই

৪৩. ক্ষুদিরাম ও ক্ষুদিরাম

কথা : মোহিনী চৌধুরী (১৯২০-১৯৮৭), কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সুর

৪৪. মুক্তির মন্দির সোপানতলে

অরিন্দম বন্দোপাধ্যায়'র কথা ও সুর

৪৫. আওয়াজ তোলো আওয়াজ তোলো

সুধীন দাসগুপ্তের (১৯৩০-১৯৮২) কথা ও সুরেঃ

৪৬. ঐ উজ্জ্বল দিন ডাকে স্বপ্নরঙিন

অনল চট্টোপাধ্যায়ের কথা ও অভিজিত বন্দোপাধ্যায়ের সুর

৪৭. অনেক ভুলের মাশুল তো ভাই দিলাম জীবন ভরে

সাধন দাসগুপ্তের কথা ও সুর

৪৮. জীবনের দুর্গে দাঁড়িয়ে আঁধারের সীমা ছাড়িয়ে

সুভাস মুখোপাধ্যায়ের কথা ও সুধীন দাসগুপ্তের সুর

৪৯. স্ট্রাইক স্ট্রাইক যেখানেই থাকো ময়দানে হবো সকলে সামিল আজকে

অনুপ মুখোপাধ্যায় সুর ও সুভাস মুখোপাধ্যায়ের কথা

৫০. ভাই আমাকে বকুক ঝকুক দিক গে যতই খোটা

সুভাস মুখোপাধ্যায়ের কথা ও কল্যাণ ঘোষের সুর

৫১. এ এক ভারী অদ্ভুত সময়

দিলীপ সেনগুপ্তের কথা ও সুর

৫২. এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে

বিনয় চক্রবর্তীর সুরে, আজিজুল হকের কথা

৫৩. চুপ করো তোমরা, এখানে ঘুমিয়ে আছে আমার ভাই

ভূপেন হাজারিকার সুর, শিবদাস মুখোপাধ্যায়ের কথা

৫৪. গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা

শিবদাস মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ, ভূপেন হাজারিকার কথা ও সুর

৫৫. মানুষ মানুষের জন্যে

৫৬. হে দোলা হে দোলা

৫৭. আমি এক যাযাবর

৫৮. বিস্তির্ণ দুপারের অসংখ্য মানুষের

পুলক বন্দোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৯) এর অনুবাদ, ভূপেন হাজারিকার কথা ও সুর:

৫৯. সাগর সঙ্গমে সাতাঁর কেটেছি কত

ভী. বালসাড়ার (১৯২২-২০০৫) সুর, শিবদাস মুখোপাধ্যায়ের কথা

৬০. আজ যত যুদ্ধবাজ দেয় হানা হামলাবাজ

ইসলাম উদ্দীনের কথা ও সুর

৬১. হিন্দু এসো মন্দিরে যাই জুড়ি দুই হাত,
মুসলিম চলো মসজিদে যাই করি এই মোনাজাত

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কথা ও সুর

৬২. যুদ্ধকে মুছে ফেলতে চাই আমরা যুদ্ধে নেমেছি ভাই

৬৩. খাদে ঠকি ফলে ঠকি ঠকি ঐ শুঁড়িখানায়

৬৪. আমি বাংলায় গান গাই

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সুর, স্নেহাকর ভট্টাচার্যের কথা

৬৫. মাগো আমার মরতে এখন এতটুকু ইচ্ছে করে না

সাগর চক্রবর্তীর কথা ও সুর

৬৬. ও শহিদের মা তুমি আর কাইন্দো না

অনুপ মুখোপাধ্যায়ের সুর, কর্ন সেনের কথা

৬৭. মোদের রাজা মহারাজা হরেক ছদ্মবেশে

পরেশ ধরের সুর, মূরারী মুখোপাধ্যায়ের কথা

৬৮. ভালোবেসে চাঁদ হয়ো নাকো, পারো যদি সূর্য হয়ে এসো[৪৭]

নজরুলের বীরত্বপূর্ণ, উদ্দীপনা মুলক গান থেকে গণসঙ্গীত অনুপ্রাণীত হয়ে এই ভূমিতে সাহসী পথচলা শুরু করেছিল। তার পরে ১৯৪০ দশক থেকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ রাজনৈতিকভাবে কৃষকদের অধিকার নিয়ে গান লিখা শুরু করে। এই সকল গান অবিভক্ত ভারতবর্ষের নিপীড়িত মানুষের দুঃখ ঘুচানোর গান যা সর্বশ্রেণীর মানুষকে নাড়া দেবার জন্য রচিত ও গীত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মানবিক দাবির প্রতি একাত্ম হয়ে রচিত হয়েছিল সে সকল গান। ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকায় আয়োজিত হয়েছিল ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন। এই সভা উপলক্ষে ছাত্রকবি

---

৪৭. আবদুশ শাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-১০৭, দ্রোহ ও মুক্তির গান, সম্পাদনা লিয়াকত আলী লাকি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫, সাইম রানা, বাংলাদেশের গণসঙ্গীত বিষয় ও সুর বৈচিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

সুভাষ মুখোপাধ্যায় গান লিখেছিলেন। গণসঙ্গীত স্কোয়াড সেই গান পরিবেশন করলেন। একেই ভারতের প্রথম ফ্যাসিবিরোধী গান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গানটি ছিলঃ

বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ রুখব দস্যু দলকে আজ
দেবে না জাপানি উড়োজাহাজ, আমরা নইতো ভিরুর জাত।[৪৮]

আব্বাস উদ্দীন

পল্লীগীতি সম্রাট আব্বাস উদ্দীন তার দরাজ ও সুরেলা কণ্ঠ দিয়ে গান পরিবেশন করে বাঙালি মুসলমান জাগরণে বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন পিছিয়ে পরা মুসলমান জনগোষ্ঠীকে আলোর পথে আনতে না পারলে কোনো সংগ্রামই কাঙ্খিত সুফল বয়ে আনবে না। মুসলিম বাঙালি সমাজের পিছিয়ে পড়ার জন্য তিনি মোল্লা- মৌলভীদের দায়ী করেছেন। ধর্মের সত্য বাণী গানে গানে প্রচার করার জন্য তিনি কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী গানগুলোকে বেছে নিয়েছিলেন। কাজটি প্রথম অবস্থায় খুব কঠিন ছিল। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে গান পরিবেশন করে মুসলিম তরুণ সমাজকে সত্যি সত্যিই জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তরুন মুসলিম সমাজ তাদের অবস্থান বুঝতে পেরে তারা অন্ধকার জগত থেকে আলোর জগতে আশার পথ খুঁজে পেয়েছিল। আবুল আহসান চৌধুরী লিখেছেন, "দেশ ভাগের আগে তিরিশ ও চল্লিশের দশকে আব্বাসউদ্দীন চারণের মতো সারা বাংলায় গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। আর তাতে মানুষের মধ্যে এক অসামান্য উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। মাটির সুরের গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, বিচ্ছেদী, মারফতি, মুর্শিদি শুনিয়ে মানুষকে আপ্লুত করেছেন। আবার নজরুলের উদ্দীপনা মূলক জাগরণী গান গেয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন সংগ্রামী চেতনায়।"[৪৯]

কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মভীরু মুসলিম সমাজ সে সময়ে ভয়ানক অনগ্রসর আর সঙ্গীত বিমুখ ছিল।' তারপরেও জনসভাগুলোতে আব্বাসউদ্দীন নজরুলের ইসলামী গান গেয়ে মুসলমানদের মুগ্ধ করেছিলেন। দেশ বিভাগের পূর্বে নজরুল রচিত ইসলামী গান গেয়ে আব্বাসউদ্দীন জনসমক্ষ্যে প্রচার করেছিলেন যে সঙ্গীতের সঙ্গে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। সংস্কৃতিবোধ জাগাতে নজরুল ও আব্বাসউদ্দীন যেভাবে গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন তা সমাজকে ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়েছিল।[৫০]

স্বদেশ বন্দনার জাগরণী গান আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠে গভীর আবেগ ও মমতায় ধ্বনিত হয়েছে। আব্বাসউদ্দীন শিল্পী হৃদয় দিয়ে গানের কথাকে আত্মস্থ করে, আন্তরিক ও সহজাত দরাজ গলায় তুলে নিয়ে সে গান গেয়ে মানুষকে মুগ্ধ করেছেন, যাতে থাকতো স্বদেশপ্রেমের গভীর চেতনা। সঙ্গীত বিমুখ মুসলিম সমাজ সে গানে অনুকুল সাড়া দিয়েছিল। ইসলামী গান, উদ্দীপনামূলক জাগরণী গান ছাড়াও তিনি সকল ধরনের গানই কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন। বিশেষ করে স্বদেশের

---

৪৮. কামাল লোহানী, আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪ পৃ. ৪৯-৫০
৪৯. সুরের চারণ আব্বাস উদ্দিন, সূচিপত্র, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৬৫-৬৬
৫০. সনজিদা খাতুন, সংস্কৃতি কথা সাহিত্য কথা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ থেকে তিনি দেশের প্রয়োজনে গান গেয়ে সাড়া বাংলায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আবুল আহসান চৌধুরী, সুরের চারণ আব্বাস উদ্দীন বইতে লিখেছেন, 'আক্ষরিক অর্থেই তিনি একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন।'[৫১]

আব্বাস উদ্দিনের বিখ্যাত গান 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে' শৃঙ্খলিত বাঙালি জীবনের অসহায় কান্না হয়ে হাহাকার তুলেছিল বাঙালি হৃদয়ে। বাঙালির মর্মে গভীর নাড়া দিয়েছিল তার গানটি।

শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের দরাজ গলায় গাওয়ানোর জন্য নজরুল ইসলাম অনেক গান রচনা করেন। সে গান মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবিষ্ট করতো। ঐ সময়ে নজরুল ইসলাম ও আব্বাসের সমন্বিত সাংস্কৃতিক শক্তির বিরাট গুরুত্ব ছিল। সেটা যেমন ছিল সঙ্গীত জগতে তেমনি ছিল রাজনীতি ক্ষেত্রেও। বাংলার প্রখ্যাত জননেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা রাখতেন। তাই কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি যদি কাজী আর আব্বাসকে নিয়ে বাংলাদেশে বের হই তাহলে সাড়া বাংলা আমি জয় করতে পারি ক'দিনের ভেতরেই।"[৫২]

বিরাট রাজনৈতিক সমাবেশ জমতো না তার উদাত্ত কণ্ঠের সুরের আহ্বান ছাড়া। সে জনসভাতে থাকতেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, সোহ্‌রাওয়ার্দী, নাজিমউদ্দীনের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্যের পাশাপাশি কাজী নজরুল, জসীমউদ্দীনের মতো কবি সাহিত্যিক। আব্বাস উদ্দীনের গান শোনার জন্য দূর দুরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হতো।[৫৩]

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িকতার কারণে দুই ভাগে বিভক্ত হয় ভারতবর্ষ। এক অংশ পশ্চিম বঙ্গ ভারতের সাথে আর পূর্ব বঙ্গ পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়। ধর্মের নামে গড়ে ওঠা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গীতাঙ্গনটি হয়ে যায় রিক্ত মরুভূমি। পূর্ববঙ্গের সঙ্গীতের ক্ষেত্রটির পৃষ্ঠপোষক ছিল পূর্বে হিন্দুরাই। দেশবিভাগের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে হিন্দুরা বেশিরভাগ দেশান্তরী হলো। যার ফলে শিল্পীদের অভাব পরিলক্ষিত হলো প্রকটভাবে। কেননা মুসলমানদের মধ্যে গানের চর্চা ছিল নগণ্য পরিসরে। তবে "১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাত বারোটার পর আব্বাসউদ্দীনই বেতারে প্রথম নতুন রাষ্ট্রের বন্দনা গীতি পরিবেশন করেন।"[৫৪]

বাঙালি মুসলমান হিন্দু আধিপত্য থেকে বাঁচার জন্য পাকিস্তান প্রস্তাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্বভাবতই তাঁদের সপ্নের পাকিস্তানকে নিয়ে তাদের প্রত্যাশারও কমতি ছিল না। মহাসুখে স্বাধীন পাকিস্তানে সুখী বাঙালি গেয়েছিল গণসঙ্গীত শিল্পী আব্দুল লতিফের সাথে কণ্ঠ মিলিয়েঃ

> 'কলিজার খুনে ওয়াতানের ধুলি করিয়া লাল
> আজাদীর তরে শহিদ হলে যে বীর দুলাল'
> তাহারা মোদের সালাম লও, তাহারা মোদের আশিস দাও!

---

৫১. আবুল আহসান চৌধুরী, সুরের চারণ আব্বাস উদ্দিন, সূচিপত্র, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৫৬

৫২. আব্বাস উদ্দীন আহমদ, আমার শিল্পী জীবনের কথা, ঢাকা, মাঘ ১৩৯৪, উৎসঃ আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮

৫৩. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৫৪. আবুল আহসান চৌধুরী, সুরের চারণ আব্বাস উদ্দিন, সূচিপত্র, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ভাঙ্গা কেল্লার উর্ধ্বে যাহারা উড়ালে সবুজ আল হেলাল' !

সন্‌জিদা খাতুন লিখেছেন, 'এই গান পরিবেশনের সময় তারা সবাই ছিলেন পাকিস্তানি জোশে উদ্বেল। মুকুল ফৌজের মাঠে আবদুল লতিফ শিখিয়েছিলেন তাদের এই গান। আরবী-ফারসী শব্দের মিশেলে তারা এতে কোনো দোষও খুঁজে পান নাই বা এটা তাঁদের মনে কোনো রেখাপাতও করে নাই। উপরন্তু এই সকল শব্দের সঠিক উচ্চারণ করার জন্য অধিকতর পারদর্শীদের স্মরণাপন্ন হতেন তারা। যেমন আজাদ কে 'Z' দ্বারা, আর কলিজা 'Z' শব্দ সহযোগে উচ্চারণের চেষ্টা করতেন তাঁরা। এ প্রচেষ্টায় তাদের আন্তরিকতার কোনো খাদও ছিল না।কিন্তু জবরদস্তি করে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানিকরণের চেষ্টা শুরু হলে বাঙালি সেটাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে নাই।'[৫৫]

বিভাগপূর্ব ভারতে হিন্দুদের অন্যায় অত্যাচার, নির্যাতন যেমনভাবে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল তেমনি নব্য পাকিস্তানে কট্টর পাকিস্তানি শাসকদের বিমাতাসুলভ আচরণে বাঙালি প্রচণ্ড হতাশায় নিমজ্জিত হয়। তারা বিশেষ করে বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠায় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সাংস্কৃতি অঙ্গন, তরুণ-প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ প্রথম প্রতিরোধের ডাক দেয়। অবিভক্ত বঙ্গের স্বদেশী গানকে আশ্রয় করে আবার শুরু হয় পাকিস্তানি শাসকচক্রের অন্যায়-অপশাসনের প্রতিবাদ। শাসকগোষ্ঠীর দুঃশাসন আর বাঙালিকে পরাধীন করার ষড়যন্ত্রকে বাঙালি বিনা চ্যালেঞ্জ এ ছেড়ে দেয় নাই। তারা নিজের শক্তিতে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন দাঁড়িয়ে যায় পাকিস্তান সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। ১৯৪৮ সাল থেকেই প্রতিবাদী গান গেয়ে মানুষকে জাগিয়েছে শিল্পীরা। সাধারণ বাঙালি রাজনৈতিক জনসভার আগে ও পরে শিল্পীদের প্রতিবাদী গানে উজ্জীবিত হতো, তেমনি একজন গণশিল্পী আব্দুল হাকিম যিনি তার দরাজ গলায় কোনো যন্ত্র ছাড়াই হাজার হাজার মানুষের জনসভায় গাইতেন "মরি হায়রে হায়, দুঃখ বলি কারে, মুসলিম লীগের কাণ্ড দেইখ্যা পরান উঠে জ্বলিরে।"[৫৬] কামাল লোহানী আরো লিখেছেন, '১৯৫০ সালে গঠিত হয় 'ধুমকেতু' শিল্পী সংঘ। সাধারণ মানুষের জীবনের হাসি কান্না, ব্যাথা-বেদনা এবং নব্য স্বৈরশাসনের চরিত্র তুলে ধরার প্রয়াসে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন নিজামুল হক, মোমিনুল হক। এ সময়েই গড়ে ওঠে পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ। ঐ সময়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুবলীগ তখন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ছাত্রকর্মী গাজিউল হক সঙ্গীতের জন্য সোচ্চার কণ্ঠে এগিয়ে এলেন। ১৯৫১ সালে গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ। প্রগতিশীল সংস্কৃতিক আন্দোলনের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী অবদানের জন্য এর একক অবদান অনস্বীকার্য। গণসঙ্গীতও ব্যাপক অবদান রেখেছিল এই সময়ে। নজরুলগীতি শিল্পী শেখ লুৎফর রহমান দেশাত্ববোধক গান গেয়ে জনমনে দারুণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন। যুবলীগের কালচারাল স্কোয়াড ও পূর্ব পাকিস্তান শিল্পী সংসদের সাথে বরিশাল থেকে এসে যোগ দিলেন তরুণ শিল্পী আলতাফ মাহমুদ। তার অংশগ্রহণে গণসঙ্গীত

---

৫৫. সনজিদা খাতুন, সংস্কৃতি কথা সাহিত্য কথা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ২৮
৫৬. কামাল লোহানী, রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলা বেতার, ভূমিকা, ২০১২, পৃ. ১৯

স্কোয়াড সমৃদ্ধ হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে ঢাকার বাইরেও গণসাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এরমধ্যে কুমিল্লার অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গণশিল্পী সুখেন্দু চক্রবর্তী বা খোকা চক্রবর্তী, ফজলে নিজামী, রুহুল্লাহ, শামসুল আমিন, নমীতা বল ও জালাল উদ্দিন প্রমুখ শিল্পীদের গান বাঙালিকে প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। রাজশাহীতে নাটোরের স্কুল শিক্ষক গোপাল সরখেল দরাজ গলায় গান গেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তার সাথে আরও ছিলেন আব্দুল মালেক খান (অবঃ বেতার কর্মকর্তা), তৌফিকুর রহমান (টিএন্ডটি বোর্ডের অন্যতম কর্তাব্যক্তি), বেগম জাহানারার নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে আব্দুল লতিফ বাচ্চু এদের সাথে সম্পৃক্ত হন।[৫৭]

পাকিস্তান সরকার দমন নীতি চালায় বাঙালির উপর। কিন্তু কোনো আঘাতই বাঙালির রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিকে দমন করাতে পারে নাই। সংস্কৃতি-কর্মী, প্রগতিশীল ছাত্র-যুবকদের সেই নগরকেন্দ্রীক প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বাংলার সচেতন সমাজে। যা দ্রুতই সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ নেয়। সর্বত্র প্রতিবাদ গর্জন– সরকারি শোষণ নীতিকে উপেক্ষা করে। বাঙালির প্রাণের দাবির শক্তিকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ পাকিস্তানি সরকার **১৯৫২** সালের **২১** ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ মিছিলে গুলি চালায়। সালাম, রফিক, বরকত, সেলিমের রক্তে রঞ্জিত রাজপথ আর জানা-অজানা শহীদের প্রাণের বিনিময়ে বাঙালি প্রতিষ্ঠা করেছিল ভাষার দাবি। সেই দিনের আত্মদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রচিত কবিতা যা পরে একুশের গান হিসেবে পরিচিতি পায়। লিখেছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরী। এতে প্রথম সুর দিয়েছিলেন আবদুল লতিফ, পরবর্তীতে আলতাফ মাহমুদের সুরে গীত গানটি অমর একুশের গান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। স্মরণীয়, বরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করা গানটি:

> ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
> আমি কি ভুলিতে পারি,
> ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি
> আমি কি ভুলিতে পারি।’[৫৮]

ইতোপূর্বে অবশ্য বাংলা ভাষার অধিকার থেকে বাঙালিকে বঞ্চিত করে যখন উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেবার ঘোষণা রাষ্ট্রের শীর্ষ অবস্থান থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, তখন সাথে সাথেই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে গানটি আনিসুল হক চৌধুরী রচনা করেছিলেন আর সুর দিয়েছিলেন শেখ লুতফর রহমান। গানটিতে বাঙালির শৌর্য-বীর্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি শাসকের প্রতি কিছুটা ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গানটি শেখ লুতফর রহমান বিভিন্ন মঞ্চে পরিবেশন করে ব্যপক প্রশংসা যেমন পেয়েছেন তেমনি শাসকপক্ষের মাঝে প্রতিক্রিয়াও তৈরি করেছিল তা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটা সময় শিল্পী ও সুরকারের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয় যাতে শিল্পীরা ভবিষ্যতে গানটি আর গাইতে সাহস না করেন। গানটি ছিল:

---

৫৭. কামাল লোহানী, আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
৫৮. সাইম রানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

'ওরে ভাইরে ভাই বাংলাদেশে বাঙালি আর নাই।'

গানের শেষ চার লাইন:

'বাঘের জাত এই বাঙালেরা জান দিতে ডরায়না তারা,
তাদের দাবি বাংলা ভাষা আদায় করে নেবেই।'[৫৯]

পুরো গানটিতে বাঙালির প্রতিবাদী সত্তার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

১৯৫৩ সালের প্রথম শহিদ দিবসে যে গানটি প্রভাতফেরির গান হিসেবে গাওয়া হয়েছিল তা ভাষা সৈনিক গাজিউল হকের লিখা ও তাঁর ভাই গণশিল্পী নিজামুল হকের সুর করা। গানটি হলো :

'ভুলবোনা, ভুলবো না, ভুলবো না, সেই একুশে ফেব্রুয়ারি– ভুলবোনা।'[৬০]

১৯৫৩ সালের প্রথম প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণকারী ড. আনিসুজ্জামান তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, "১৯৫৩ সালের প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হয়েছিল মহাসমারোহে। হাজার হাজার মানুষ, নারী, পুরুষ, বালবৃদ্ধা খালি গায়ে আজিমপুর কবরস্থানে শহিদ বরকত ও সফিউর রহমানের সমাধিতে এবং মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের সামনে প্রথম গুলি বর্ষনের জায়গায় পুস্পার্ঘ্য নিবেদন করে।" একই বইতে লেখক আরো লিখেছেন, "প্রভাত ফেরির গান ছিল তিনটি। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোশাররফ উদ্দীন আহমদের (রাজনীতিবিদ মহিউদ্দীন আহমদের মধ্যম ভ্রাতা) রচিত ও সুরারোপিত 'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে, আজিকে স্মরিও তারে', গাজিউল হক রচিত ও বোধহয় তাঁর অনুজ নিজামুল হক সুরারোপিত 'ভুলবোনা এই একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলবোনা', আর আবদুল লতিফ সুরারোপিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি শুনে কী যে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম।"[৬১]

২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদদের জীবন দানকে স্মরণ করে গ্রামীণ সুরে গীতিকার সামসুদ্দীন আহমদ আরেকটি গান রচনা করেন যার সুর দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। গ্রামীণ সুরে হৃদয় স্পর্শ করা গানটির দুটি লাইন:

'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলিরে বাঙালি
তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি, ও বাঙালি...।'[৬২]

ভাষা আন্দোলনের উপর সুরকার, গীতিকার ও শিল্পী আবদুল লতিফ একাধিক গানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার সর্বাধিক জনপ্রিয় দীর্ঘ গান যা বাঙালির চিরায়ত কৃষ্টির ছন্দবদ্য আলেখ্য।

---

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৬১. আনিসুজ্জামান, কাল নিরবধি, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২০৯-২১০

৬২. সাইম রানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

এ ছিল বাংলার অতি সাধারণ মানুষের সহজ সারল্যে ভরা অতি সাধারণ জীবন গাথা। বাংলার জারির ঢংয়ে গীত সেই গান দীর্ঘ সময় ব্যাপী শুনেও শ্রোতা দর্শক ক্লান্ত না হয়ে বাঙালির সাধারণ জীবনের সার্বজনীনতাকে খুঁজে নিতো।

গানটি ছিল:

ওরা আমার মুখের কথা কাইরা নিতে চায়
ওরা কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে পায়।

তাঁর আরো কিছু গান:

১. বুকের খুনে রাখলো যারা মুখের ভাষার মান
ভোলা কি যায়রে তাদের দান।

২. আমি কেমন কইরা ভুলি
মুখের কথা কইতে গিয়া ভাই আমার খাইছে গুলি।

৩. এসেছে আবার অমর একুশে পলাশ ফোটানো দিনে
এদিন আমার ভায়েরা আমায় বেঁধেছে রক্ত ঋণে।

৪. মুখের কথা কইতে গিয়া খাইছি বুকে গুলিরে,
একুইশা ফেব্রুয়ারির কথা কেমন কইরা ভুলিরে।

৫. সেবার একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে বীজ হয়েছে বোনা
সে বীজ বৃক্ষে ধরিয়াছে ফল স্বাধীনতা সোনা সোনা।

৬. ওদের ভাষা তাদের ভাষা তায় না আমি গুনি
মাতৃভাষা বাংলা আমার সোনা, রূপার খনি।

পরবর্তীতে তিনি ভাষা ও দেশকে নিয়ে আরো কিছু জনপ্রিয় গান লিখেছেন:

৭. রফিক শফিক বরকত নামে বাংলা মায়ের দুরন্ত কটি ছেলে,
স্বদেশের মাটি রঙিন করেছে আপন বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে।

৮. মাটি তুমি মায়ের মতন আমায় লালন কর,

৯. আমার দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে,

১০. আটই ফাল্গুনের কথা আমরা ভুলবো না,

১১. ধানে ভরা গানে ভরা আমার এ দেশ ভাই,

১২. ও আমার দেশের মাটি রে,

১৩. ও আমার এই বাংলা ভাষা,

১৪. দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা কারো দানে পাওয়া নয়।[৬৩]

গানগুলি বাঙালির গ্রাম বাঙলার চিরপরিচিত শব্দসারল্যে আর সহজ সুরের কারণে ব্যপক জনপ্রিয় হয়েছিল।

১৯৫৩-১৯৫৪ সালে আবদুল গাফফার চৌধুরীর কবিতায় সুর দেন শেখ লুতফর রহমান।

'রক্তে আমার আবার প্রলয় লেগেছে দোলা'

বদরুল হাসান এর প্রভাতফেরির গান, আলতাফ মাহমুদের সুরে

'ঘুমের দেশে ঘুম ভাঙ্গাতে ঘুমিয়ে গেল যারা।'

হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-১৯৮৩) লিখা আর শেখ লুতফর রহমান এর সুরে,

'মিলিত প্রাণের কলরবে যৌবন ফুল ফোটে রক্তের অনুভবে।'

নাজিম সেলিম বুলবুলের লেখা ও সুরারোপিত গানে শহিদের ত্যাগের আর বীরত্বের বর্ণনা ফুটে উঠেছে :

'নিস্ফল কভু হয় না ধরায় রক্তের প্রতিদান
দিকে দিকে তাই ফেব্রুয়ারির শোন ঐ জয়গান।'

কবিয়াল রমেশ শীল ১৯৫৫ সালে বীর শহিদের স্মরণে লিখলেন

'ভাষার জন্য জীবন হারালি বাঙালি ভাইরে
রমনার মাটি রক্তে ভাসাইলি।'

লোকমান হোসেন ফকিরের লেখা ও সুরে শহিদ দিবসকে স্মরণ:

'একুশ আসে জানাতে বিশ্বে ভাষার কতটা মূল্য।
ভাষার দাবিতে নেই কোনো জাতি বাঙালির সমতুল্য।'

নাজিম মাহমুদের লেখা ও সাধন সরকারের সুরে :

'আমাদের চেতনার সৈকতে একুশের ঢেউ মাথা কুটলো।'

কামাল লোহানী সংগৃহিত এবং মাহমুদুন নবীর সুর করা জনপ্রিয় গানটি ছিল:

'এই পথ এই কালো পথ পিচে ঢাকা ইতিহাস
রক্ত জমাট কালো এপথ ঠিকানা দিলো
দিলো জীবনের আশ্বাস॥'

৬৩. ১-৬নং গান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬, ৭নং গান আবদুশ শাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১, ৮-১৪নং গান, দ্রোহ ও মুক্তির গান, সম্পাদক-লিয়াকত আলী লাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-৩২

২১ ফেব্রুয়ারি রাতে লেখা মাহবুব উল আলম চৌধুরীর (১৯২৭-২০০৭) কবিতা, পরবর্তীতে সুর দেন মোমিনুল হক।

'এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে রমনার উর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়।'

সিলেটের গণশিল্পী শাহ আবদুল করিম ভাষা শহিদ স্মরণে লিখেন:

১. ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে সালাম বরকতের বুকে গুলি চালায় বেঈমানে।

২. সালাম আমার শহিদ স্মরণে দেশের দাবি নিয়া দেশপ্রেমে মজিয়া
প্রাণ দিলেন যেসব বীর সন্তানে।

৩. আমি বাংলা মায়ের ছেলে,
জীবন আমার ধন্য যে হয় জন্মে বাংলা মায়ের কোলে।

শিল্পী আবদুল হালিম বয়াতি ভাষার উপর দীর্ঘ সারি গানে বাঙালির সংগ্রাম মুখর জীবনের কাহিনি অনবদ্য ভাষায় তুলে ধরেন। গানের কয়েকটি লাইন :

'একুশে ফেব্রুয়ারি সু-প্রভাতের কালে জীবন মরণ খেলা আজ বাঙালির কপালে।'

মানিকগঞ্জের বাউল সাধক ফকির মাহিন শাহ ভাষা আন্দোলনকে স্বরণ করে গান লিখেছেন,

১। আ- মরি বাংলা ভাষা, মা বলা ডাক মধুর ডাক মধুর লাগে,

মা বলে গলা জড়িয়ে ধরে, মা মা বলে পুলক লাগে।

২। আমার এ মাতৃবুলি সুর ও ছন্দে বলিহারি

হৃদয় পাত্রে সোনার তুলি---,

৩। মিষ্টি আমার মায়ের ভাষা শিখিয়াছি মাতৃকোলে বসি
কেমন মধুর কেমন খাসা

৪। 'বলিহারি ধন্য ধন্য, আমার এই মাতৃবুলি সোনার তুলি
মায়ের ভরম রাখার তরে।'

কবিয়াল রমেশ শীল গেয়েছেন তাঁরই লেখা গান

'আমি বাংলা ভালোবাসি।'

কমিউনিস্ট পার্টির নিবেদিত প্রাণ কর্মী কমরেড সত্যেন সেন লিখেছেন এবং সুর দিয়েছেন
'এ আগুন নিভাইবো কে রে, এ আগুন নেভে না,
এ আগুন জ্বলে দ্বিগুন, জ্বলবে দ্বিগুন, চাপা দিলেও নিভবে না।'

ফজলে লোহানী কবিতা লিখেছেন। তাতে সুর দিয়েছেন খান আতাউর রহমান
'শীতল পৃথিবী অবশ নগর।'

ইন্দু সাহার,

'রক্ত শিমুল তপ্ত পলাশ দিল ডাক সুনীল ভোরে
মিনার এবার বাঙময় হয়ে উঠো।'

আবু বকর সিদ্দিক লিখেছেন,

'একুশের ডাকে আবার যৌবন জাগেরে'

সাধন সরকারের সহায়তায় তিনি নিজেই এতে সুর করেছেন বলে জানা যায়।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন,

____'শোন দেশের ভাই ভগিনী শোনো এক আচানক কাহিনি।'

বাংলার চরণকবি আবদুল হাকিম লিখেছেন ভাষা শহীদ স্মরণে এই গান:

'বাংলা মোদের মাতৃভাষা বাংলা মোদের বুলি

সেই বাংলায় কথা কইলে পরে বুকে চালায় গুলি।'

শেখ লুতফর রহমানের কথা ও সুরে:

'আমি বাংলা ভাষার এক তারাতে প্রাণ হারাতে চাই।'

সৈয়দ শামসুল হুদার লিখা গান:

'রক্ত শিমুল তপ্ত পলাশ দিল ডাক সুনীল ভোরে'

ভাষা আন্দোলনের উপর গান লিখেছেন ফনি বড়ুয়া

১। একুশে ফেব্রুয়ারি দাও তুমি স্বরন করিয়ে শহীদের লাল খুনের কথা

২। বাঙালিদের বাংলা ভাষার রাখি ইজ্জত মান,
হাসি মুখে শফিক বরকত করে জীবন দান।[৬৪]

অসংখ্য গান রচনার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার বাঙালি তাদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটাতে থাকে। পাকিস্তানি শাসকের অন্যায়, শোষন, নির্যাতন বাঙালির অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র খুঁজে পেতে সহায়ক হয়েছিল দারুণভাবে। বাঙালির সম্ভ্রম, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদা রক্ষাকারী, ইতিহাস সৃষ্টিকারী একুশের প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বতন্ত্রধারা। শান্তিপ্রিয়, নিরস্ত্র বাঙালির প্রথম প্রতিবাদ ছিল–সশস্ত্র অন্যায়-দুঃশাসনের বিরুদ্ধে। মুক্তিসংগ্রামে প্রেরণাদানকারী এই ঘটনা ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর গালে প্রথম চপেটাঘাত। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে দিকভ্রান্ত বাঙালি তার পথের দিশা খুঁজে পেয়েছিল। সংস্কৃতির ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বাঙালির নতুন করে শুরু হয় মুক্তির সংগ্রাম।

৬৪. গানগুলো কামাল লোহানী, আবদুশ শাকুর, মাহবুব উল আলম চৌধুরী, বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, সাইম রানা, কল্যাণী ঘোষ প্রমুখদের বই থেকে নেয়া হয়েছে।

এই সময়ে শুধু ভাষার গানই গীত হয় নাই। সাথে সাথে দেশাত্মবোধক পঞ্চকবির গানও সমানভাবে গীত হয়েছিল। সম্মিলিত সেই পরিবেশনা বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে করেছিল পরিপূর্ণ। সন্‌জিদা খাতুন লিখেছেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারির আরো যেসব গানের প্রেরণা আমাদের ভাষা-সংস্কৃতির আন্দোলনকে ক্রমশ বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের দিকে টেনে নিয়ে গেছে, সেসব গানের কথাও বলতে হয়। ভাষা আন্দোলন স্বভাবত ছিল দেশপ্রেমের আবেগ সঞ্জাত। তাই এই সময় থেকেই 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', 'স্বার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে', ' যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা', 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা', ইত্যাদি রবীন্দ্র রচনার পাশাপাশি নজরুলের অনেকগান অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। দেশপ্রেমের 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি', 'একি অপরূপ রূপে মা তোমার হেরিনু পল্লী জননী', উদ্দীপনার 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল', ইত্যাদি গান মুক্তির আন্দোলনে গতি সঞ্চার করেছিল। অতুল প্রসাদ সেন রচিত ভাষার জন্য প্রীতি আর গৌরবের গাথা 'মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা' ঐতিহ্য স্বরণের অদ্বিতীয় অবলম্বন হয়ে উঠেছিল সেসব দিনে। এখনো এইসব গান আবেগতারিত করে বাঙালিকে। আর একখানি গান বাঙালির পরম প্রিয় হয়ে থেকে এখন বাংলাদেশের জাতীয় গীতিতে পরিণত হয়েছে; সেটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অমর সৃষ্টি 'ধন ধান্য পুস্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।' বাঙালি তার অচ্ছেদ্য ঐতিহ্য সম্পদ থেকে দু'খানি গানকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আর জাতীয় গীতি হিসেবে অঙ্গীকার করেছে। প্রথমটি শিলাইদহ অঞ্চলের বাউল গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' গানের সূরের আদলে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'আমার সোনার বাংলা', দ্বিতীয়টি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধন্য ধান্য পুস্পভরা।'[৬৫]

১৯৫৪ সালে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রথম নির্বাচন ছিল ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় শোষনের হাত থেকে মুক্ত হতে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল 'যুক্তফ্রন্টের' পক্ষে। হক ভাষানীর পক্ষে 'নৌকা' প্রতীককে জয়যুক্ত করার জন্য গোটা পূর্ববঙ্গ এক কাতারে সামিল হয়েছিল। বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা আর উৎসবের মেজাজে পূর্ব বাংলার জনগণ ভোট দিতে আগ্রহী হয়েছিল। এই নির্বাচনী প্রচারণায় শিল্পীদের অংশগ্রহণ ছিল বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। সারা বাংলায় শিল্পীরা গানে গানে নির্বাচনী প্রচারণা চালায়। অসংখ্য ভোটের গান রচিত হয়েছিল। প্রত্যন্ত জনপদও শিল্পীদের সুরের টানে কেঁপে উঠেছিল। শুধুমাত্র শহুরে পরিচিত শিল্পীরাই গান করেন নাই। গ্রামের শিল্পী, সুরকারগণও গান লিখেছেন, সুর করেছেন। আর সেই গান পরিবেশন করেছেন শিল্পীরা। জনগণকে ভোট দিতে উৎসাহী করেছে, সচেতন করেছে পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে। নতুন গানের পাশাপাশি অনেক প্যারোডি গানও গাওয়া হয়েছিল এই সময়ে। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে সচেতন ও সোচ্চার করা। এমন অনেক প্যারোডি গান ছিল যেগুলো পূর্বের জনপ্রিয় প্রচলিত গানের কথা ও সুরের সংমিশ্রণে লিখা

৬৫. সনজিদা খাতুন, সংস্কৃতি কথা সাহিত্য কথা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৫

হয়েছে এবং গাওয়া হয়েছে। আবার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা দিয়েও প্যারোডি রচনা করে জনপ্রিয় গানের কথা ও সুর বসিয়ে গাওয়া হতো। তেমন একটি গান 'ভাব কি চমৎকার গো দেশের ভাব কি চমৎকার' দুর্ভিক্ষের সময় কন্ট্রোল ব্যবস্থাকে সমালোচনা করে রচিত হওয়া গানকে অনুকরণ করে, নির্বাচনকালে তৈরি হওয়া গান যেখানে অনেক গানের সমন্বয় ঘটেছিল। গানটি হলো:

মোরা কী দুঃখে বাঁচিয়া রবো
মোরা উজিরে নাজিরে বাঁচায়ে রাখিতে
চির উপবাসী হবো
কি দুঃখে বাঁচিয়া রবো॥[৬৬]

এই সময়ে নির্বাচনের উপর যারা গান রচনা করে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কবিয়াল রমেশ শীল,অচিন্ত চক্রবর্তী, আবদুল লতিফ, আলতাফ মাহমুদ, নিজামুল হক, মোমিনুল হক, সুখেন্দু চক্রবর্তী, চিরঞ্জীব দাস শর্মা, নুরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম প্রমুখ গণশিল্পী সারা বাংলাদেশ চষে বেড়িয়েছেন। মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করতে আর সচেতনতা জাগাতে গানগুলি ব্যপক ভূমিকা রেখেছিল। সেই সময়ের জনপ্রিয় কয়েকটি গান:

১. স্বর্গে যাব গো,
২. মরি হায়রে হায়, দুঃখ বলি কারে,
৩. হুনছনি ভাই দেখছনি, দেখছনি ভাই হুনছনি,
৪. লীগের মন্ত্রীরা আজি কাঁদে ঘরে ঘরে,
৫. ভোট দিমু ভাই হক ভাষানীর নায়ে।[৬৭]

কবি নিবারণ পণ্ডিত লিখেছেন:

'তোমরা এবার লও চিনিয়া
আসছেন কত দেশ দরদী ভোটাভুটির গন্ধ পাইয়া',

কবিয়াল গুমানী দেওয়ান লিখেছেন:

'বাবারে ও বাবারে কোন দিকে বা যাই
আমার একুল ওকুল দু'কুল অকুল
বিলকুল কিনারা নাই।'

রমেশ শীল লিখেছেন:

১. ইলাক্ সানে যাইও,
হিন্দু-মুসলেম, কৃষক-মজুর এক হয়ে দাঁড়াইওরে।

---

৬৬. সাইম রানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭
৬৭. কামাল লোহানী, আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

২. ভোট দিবা কারে তোমরা ভোট দিবা ভাই কারে,
ভোটের জ্বালায় অস্থির হইলাম টিকতে নারি ঘরে।

৩. শুন শুন দেশের ভাই বোনেরা বন্যা এল দেশে
কিছু মুসলিম নর-নারী মরে উপবাসে।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে শেখ লুতফর রহমান সুরারোপিত গানের ব্যপক ভূমিকা ছিল। 'আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দেরে' গানটির প্যারোডি করেন আবদুল করিম। সুর দেন শেখ লুতফর রহমান:

এই আসমানের নীচেরে জমিন আর জমির মালিক কারা
আর সেই জমিতে ফসল ফলাই আমরা সর্বহারা।

আবদুল লতিফ এর লেখা একটি গান:

হকের নায়ে চড়্বি কেরে আয়
হক হাল ধইরা বইস্যা রইছে
ভাষানী তার বৈঠা বায়।[৬৮]

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে সকলের সাথে সঙ্গীত শিল্পীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছিল, তারা তাদের গানের মাধ্যমে নৌকার পক্ষে ব্যাপক গণসংযোগ এ অংশ নেন। প্রতিটি জনসভায় সমাবেশে শিল্পীদের গান ছিল অবশ্যম্ভাবী। চুয়ান্ন সালের মার্চের নির্বাচনে আলতাফ মাহমুদ ছিলেন একজন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। আলতাফ মাহমুদ ও নিজামুল হক ব্যাপক সাংস্কৃতিক সফর করেছেন পূর্ব বাংলায়। লেখা হয়েছে নির্বাচনের প্রচারোপযোগী গান। উল্কার মত ছুটে বেড়িয়েছেন আলতাফ মাহমুদ বরিশালের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায়। গণসঙ্গীত গেয়ে সভা জমিয়েছেন আলতাফ মাহমুদ, গান গেয়ে জনতাকে উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত করেছেন। দশজন বক্তার বক্তৃতার চেয়ে আলতাফ মাহমুদের একটি গানে কাজ হয়েছে শতগুন। চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন শিল্পী আলতাফ মাহমুদের বাবা নাজেম আলী সাহেব। পিতার পক্ষে এক দিনের জন্যেও ক্যানভাস করতে যাননি আলতাফ মাহমুদ। নাজেম আলী সাহেব অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু আলতাফ মাহমুদ সেই অনুরোধ উপেক্ষা করেছেন। বরগুনা মুলাদী নির্বাচনী এলাকায় আলতাফ মাহমুদ যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর জনসভায় গান গেয়েছেন। নির্বাচন উপলক্ষে কিছু নতুন গানে সুরারোপ করেন। গানগুলো হলো ১. মোরা কি দুঃখে বাঁচিয়া রবো / মোরা উজিরে নাজিরে বাঁচায়ে রাখিবো / চির উপবাসী রবো (২) মন্ত্রী হওয়া কি মুখের কথা / যদি না বুঝে জনতার ব্যাথা। তাছাড়াও ১৯৫০-৫৩ সাল পর্যন্ত যুবলীগের শিল্পী সংসদেও শিল্পী হিসেবে আলতাফ মাহমুদ যে গানগুলো গাইতেন সেই গানগুলোও চুয়ান্নর নির্বাচনী সভাতে গাইতেন। অন্যান্য সুরকারদের গানও আলতাফ মাহমুদ গেয়েছেন। গানগুলো হলো (১) মরি হায় রে হায়

৬৮. সাইম রানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯৫

দুঃখে পরান জ্বলে / পাঁচশো টাকার বাগান খাইলো পাঁচ টাকার ছাগলে। (২) শুনছনি ভাই দেখছনি/ দেখছনি ভাই হুনছনি স্বাধীনতার নামে আজব কাণ্ড দেখছনি ইত্যাদি।[৬৯] কামাল লোহানী ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আলতাফ মাহমুদের ভূমিকা নিয়ে বলেন, "১৯৫৪ তে পূর্ববাংলায় জনগনের চাপে দেয়া সাধারন নির্বাচনের প্রচারাভিযানে সর্বদলীয় মোর্চা-যুক্তফ্রন্টের পক্ষে আলতাফ মাহমুদের অবদান অবিস্মরণীয়। নিজাম, ভুটি, লাইজু এদের সাথে নিয়ে চারনের মতো আলতাফ ঘুরে বেড়িয়েছেন মানুষকে জাগাবার জন্যে। গ্রামে-গঞ্জে, মাঠে-ময়দানে, নগরে-বন্দরে অসংখ্য জনসভা আর সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে গণসঙ্গীত পরিবেশন করে মানুষের চেতনাকে শানিত করেছেন। এ সময় যে গান বাংলার গণমানুষকে উদ্বেলিত করেছে, সংগ্রামে যুগিয়েছে অনুপ্রেরনা, তাদের মধ্যে আলতাফ পরিবেশন করেছেন কীর্তন, কাওয়ালী কিংবা উর্দু, হিন্দি, বাংলা গণসঙ্গীত।"[৭০]

নির্বাচন ঘিরে ব্যাপক গণজাগরণের সৃষ্টি হয় অগণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কর্মীরা সচেতনভাবে সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গান গেয়েছেন সারা বাংলার পথে প্রান্তরে। মাঠে-ঘাটে, নগরে বন্দরে। তখন বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি ও গায়ক ছিলেন হাকিম ভাই। ঢাকায় পল্টন ময়দানের জনসভা মানেই হাকিম ভাইয়ের গান। তাঁর রচিত সব গানই ছিল সমসাময়িক কালের সমস্যা নিয়ে। নৌকায় করে তিনি ঘুড়ে বেড়াতেন মাওলানা ভাষাণী, শেরেবাংলা, শেখ মুজিব এদের সবার সাথে গ্রামে গঞ্জে। সারা বাংলার শিল্পী, গায়েন,কবিয়ালরা সাধারন মানুষের পাশাপাশি সচেতনভাবে অংশ নিয়েই হক ভাষানীর নৌকার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন।[৭১]

পাকিস্তানি শাসকচক্রের অন্যায় শাসন শোষণের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার ছিল সংস্কৃতাঙ্গন। বাঙালির সাংস্কৃতি চর্চাকে ব্যাহত করাই ছিল শাসক চক্রের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জকে গোটা তেইশ বছর পূর্ব বঙ্গের সংস্কৃতিজনরা সুকৌশলে অত্যন্ত সন্তর্পনে এবং সঙ্গোপনে পরিকল্পিত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে মোকাবেলা করেছেন। দেশ বিভাগ দুই বাংলার বাঙালির আবেগ, অনুভূতিকে কখনই দ্বিখণ্ডিত করতে পারে নাই। বাঙালিরা একই অনুভূতিতে গেয়েছে পূর্বের গাওয়া অসংখ্য গণসঙ্গীত। সলীল চৌধুরীর লিখা ও সুর করা গান, ১। 'মানবো না এ বন্ধনে' ২। 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা' গান দুটিতে শেখ লুৎফর রহমান ও আলতাফ মাহমুদ স্মৃতি থেকে স্মরণ করে সুর দিয়েছিলেন। সলীল চৌধুরী পরবর্তীতে তাদের দেয়া সুর শুনে অবাক হয়েছিলেন। প্রায় একই সুরে দু-একটা নোট এদিক ওদিক হওয়া ছাড়া তেমন কোনো তফাৎ ছিলনা। দুই বাংলার সুরকারদের সুর বঞ্চিত মানুষের আদর্শ আর লক্ষের কথাই তুলে ধরেছিল। সলীল চৌধুরীর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন কামাল লোহানী তাঁর সাক্ষাৎকারে।

---

৬৯. আলতাফ মাহমুদ, হেদায়েত হোসেন মোর্শেদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ২৭-২৮
৭০. কামাল লোহানী, আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৪২
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষে ১৯৫৫ সালে ঢাকার ওয়াইজঘাটে স্থাপিত হয় 'বুলবুল অ্যাকাডেমি ফর ফাইন আর্টস (বাফা)' বা বুলবুল ললিতকলা একাডেমি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নজরুল সঙ্গীতের বিভাগটি সূচনা থেকেই শুরু করলেও আস্তে আস্তে একসময় রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চাটাই এগিয়ে যায়। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক বন্ধাত্বকে ঘুচানোর লক্ষ নিয়ে আর শিল্পী গড়ার উদ্দেশ্যে নৃত্যশিল্পী রশিদ আহমদ চৌধুরী ওরফে বুলবুল চৌধুরীর (১৯১৯-১৯৫৪) স্মৃতি রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছিল।[৭২]

পূর্ববাংলার বাঙালির জীবনে বাংলা বলে যা কিছু ছিল তাই পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে ছিল অসহনীয় আর পরিত্যাজ্য। বাংলা ভাষা, বাংলা গান, বাংলা ঐতিহ্যের যা কিছু সব তারা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। এরই অংশ হিসেবে 'উনিশ শো ছাপ্পান্ন সালে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান' করা হয়।'[৭৩] শাসক গোষ্ঠীর অসহিষ্ণু আচরণ যত তীব্র হয়েছিল বাঙালিও ততোটাই বাঙালিত্বে আশ্রয় খুঁজে ছিল। সনজিদা খাতুন লিখেছেন "ছাপ্পান্ন সালের কথা, ঢাকাতে কোনো সরকারি বৈঠকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিছু প্রতিনিধি এসেছিলেন। তাঁদের জন্যে কার্জন হলে আয়োজিত সংস্কৃতি সন্ধায় আমি গান গাইবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। হঠাৎ একজন খবর দিল 'আমার সোনার বাংলা' গাইতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমান এই গানখানি পশ্চিম পাকিস্তানি ডেলিগেটদের শোনাতে চান। এতবড় গানের পাঁচখানি স্তবকতো পুরো মুখস্থ নেই। 'গিতবিতান' এর খোঁজ পড়ল। কোনোমতে গান খানি গাওয়া হয়েছিল। তখন বুঝিনি, আজ বুঝি এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। সুপরিকল্পিতভাবে এই গানখানি গাওয়ানো হয় সেদিন। এর পরেও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে বড় বড় জনসভায় জাহিদুর রহিমকে দিয়ে এই গানখানি গাইয়েছেন বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রনাথ যখন সাধারণ্যে বিজাতীয় কবি গীতিকার হিসেবে বিজ্ঞাপিত, তখন জনসভায় রবীন্দ্রনাথের এই গানের পরিবেশনা সোনার বাংলার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার ঘোষণা হিসেবে যেমন, রবীন্দ্রনাথের অনুকুল পরিচিতি প্রচারের হিসেবে তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।'[৭৪] বাঙালি সংস্কৃতি বুকে নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্ধও রাজনৈতিক মঞ্চে সোচ্চার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আর তার গান বাঙালির সংস্কৃতি জুড়ে আছে। উক্ত অনুষ্ঠানে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি পরিবেশন করিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছিল।

ভাষার দাবির মধ্য দিয়ে যে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়েছিল তারই পথ ধরে বাঙালি এগিয়ে যায় তার লক্ষ স্থির করা গন্তব্যে। বাঙালির জীবনের প্রতিবাদী এই ঘটনা প্রতিটি আন্দোলনে আলোকবর্তীকা হিসেবে পথ দেখিয়েছে। প্রতিটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে নতুন নতুন গান। গীতিকার, সুরকারদের রচিত সে সকল গান গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে প্রগতিশীল চেতনার মানুষের কাছে। এদের মধ্যে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিখেছেন, 'তারা এ দেশের সবুজ ধানের শীষে', 'শহিদ মিনার ফুলে ফুলে ঢেকে গেছে' আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা,'ওরা

---

৭২. আবদুশ শাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৭৩. সনজিদা খাতুন, সংস্কৃতি কথা সাহিত্য কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

ভেবেছিল লুট করে নেবে', 'অপমানে তুমি জ্বলে উঠেছিল সেদিন বর্ণমালা।' গানগুলো প্রতিটি সংগ্রামে আন্দোলনে সমাদৃত হয়েছিল, প্রাণস্পন্দন তৈরি করেছিল সাধারণ বাঙালির মাঝে।

সংস্কৃতিজন, সাংস্কৃতিকর্মীরা যেমন আন্তরিকভাবে নিজনিজ সচেতনতা নিয়ে রাজপথে অবস্থান নিতে সদাই ছিলেন অগ্রগামী গোটা পাকিস্তান শাসনামলে, তেমনি রাজনীতিবিদরাও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন অকুণ্ঠচিত্তে। দু'য়ের মেলবন্ধনেই সংগ্রাম আন্দোলন সফল অগ্রযাত্রার পথ তৈরি করেছিল। ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারিতে আওয়ামীলীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে মাওলানা ভাষানীর উৎসাহ ও সহযোগীতায় সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব-বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে বেগবান করা। মাওলানা ভাষানী বলতেন, "তোমরা মুকুন্দ দাসের গান করো যা মানুষ বুঝবে। তোমাদের গান সাধারণ মানুষ কেউ বুঝতে পারে না। গান বোঝার জন্য একটা করে ডিকশনারী দিতে হবে। মানুষ যেন বুঝে এমন গান গাইবে 'আজি বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার' এসব কথা সরাসরি মানুষের কথা। 'বাংলার কমরেড বন্ধু এইবার তুলে নাও হাতিয়ার।' এ গানের মধ্য দিয়ে বাংলার দামাল ছেলেরা একাত্তরে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল।"[৭৫]

পাকিস্তান রাষ্ট্রে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনও ছিল প্রবল শক্তিশালী। যে কোনো রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সংস্কৃতির ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালির জীবনে যতবারই সংকট, সংগ্রাম ঘুরে ফিরে এসেছে ততবারই দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদেরা পাশে পেয়েছেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের। বাংলার মানুষের রাজনৈতিক মুক্তির অনুপ্রেরণার উৎস ছিল সঙ্গীত। তাই বাংলাদেশের সঙ্গীতের সঙ্গে বাঙালির টান তাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত। সঙ্গীতের সাথে বাঙালির প্রাণের টান আছে, নারীর যোগ আছে। আর এই বিনিসুতার আকর্ষণে রাষ্ট্র ভাষার জন্য শিল্পীদের প্রতিবাদ প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায়। শিল্পীদের ভূমিকা ছিল তখন অসামান্য। প্রতিটি বাঙালির মুখে মুখে ফিরতো শিল্পীদের গান। সে সময়ে যেমন তৈরি হয়েছে গণসঙ্গীত, তেমনি তৈরি হয়েছে গণসঙ্গীত শিল্পী।

শাসক গোষ্ঠীর অজান্তে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি যাত্রা বর্ধিষ্ণু হওয়ার প্রেক্ষিতে ১৯৫৮ সালে জারি করা হয় সামরিক শাসন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে দমন করা হয় কঠিন হাতে। পাকিস্তানিদের অবস্থান ছিল 'পাকিস্তানের মাটিতে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা চলবে না। আর বাঙালির অবস্থান ছিল হাজার বছর বয়সী বঙ্গ সংস্কৃতির গায়ে বারো বছর বয়সী পাকিস্তানি সংস্কৃতিকে আঁচরও কাটতে দেয়া হবে না।'[৭৬]

সরকারি নিষেধাজ্ঞা ভেঙ্গে দিয়েছিল পূর্ব বঙ্গের ছাত্র ও সংস্কৃতিজনরা। ১৯৫৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে অংশগ্রহণ করেন শেখ লুতফর রহমান, আবদুল লতিফ, আলতাফ মাহমুদ,

---

৭৫. কামাল লোহানী, রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলা বেতার, ভূমিকা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২১

৭৬. আবদুশ শাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

ফাহমিদা খাতুন, বদরুল হাসান, আজমেরী বেগম। ঘোষণা দিয়ে পরের বছর শহিদ মিনারে একুশের উদযাপন সম্পন্ন হয়েছিল।[৭৭]

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে উদযাপনের আয়োজন চলছিল। পূর্ববঙ্গেও সকল বাধা বিপত্তিকে মোকাবিলা করে রবীন্দ্র জম্মশত বার্ষিকী উদযাপনের আয়োজন সম্পন্ন করার জন্য কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয়। মারমুখী শাসকের রবীন্দ্রনাথকে উৎখাতের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল তরুণ ছাত্র-যুবশক্তি, কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীতকে তুলে নিয়ে শাসকগোষ্ঠীকে বুঝিয়ে দিয়েছিল "রবীন্দ্রনাথের বর্ণাঢ্য বিচিত্রমূখী অবদান বাঙালিকে ঋদ্ধ করেছে। পাকিস্তান হয়েও আমরা তার অংশীদার।"[৭৮] বাঙালি তার প্রতিটি কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলার বাঙালি সম্পূর্ণভাবে পৃথক সত্তার অধিকারী। বাঙালিরা পাকিস্তানি হতে রাজি আছে কিন্তু নিজস্ব সত্তা নিয়ে। "এই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সে সত্তার একটি প্রকাশ। এই প্রতীকের মধ্য দিয়ে আমরা সেদিন অনেক কথা বলতে চেয়েছি।"[৭৯]

একজন প্রকৃতশিল্পী যার অবস্থান জাত ধর্মের বহু উর্ধ্বে। অসাম্প্রদায়িক বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান কোথায় সেটা বিজাতীয় পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী সামান্যতম অনুধাবন করার চেষ্টা করে নাই। তারা পাকিস্তানের পুণ্যভূমিতে ঠাকুরপূজার কোনো সুযোগ না দেয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বাঙালির হৃদয় ভূমি থেকেই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নাই, রাষ্ট্র ব্যবস্থাটিকেও করে দিয়েছিল দূর্বল। তাই খান সারওয়ার মুরশিদ লিখেছেন "এই উদ্যোগ গ্রহণের মধ্যদিয়ে আমরা পাকিস্তানিদের জানিয়ে দিলাম রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিত্তের কতটা জুড়ে আছেন।"[৮০]

বুলবুল ললিত কলা একাডেমী বিশেষভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষপুর্তী পালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। জন্মশত বার্ষিকীর রেশ থাকতে থাকতেই সংস্কৃতজনরা ঐক্যমত্য পোষণ করে গঠন করলেন 'ছায়ানট।' সভাপতি সুফিয়া কামাল আর সাধারণ সম্পাদক ফরিদা হাসান। বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার ধারা অব্যাহত রাখা, আর প্রসার ঘটানোর লক্ষে ১৯৬৩ সালে এর যাত্রা শুরু হয়। ১ বৈশাখ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সুর সম্রাট আলাউদ্দীন খাঁর পরিবারের সুরবাহার শিল্পী আয়েত আলী খাঁ। ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তনের দ্বার উদঘাটন করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।[৮১]

ছায়ানটের অগ্রযাত্রা সুদুর প্রসারী করা আর বাঙালি সংস্কৃতির ব্যাপক পরিচিতি ও চর্চার অব্যাহত ধারা সমৃদ্ধ করার লক্ষে ১৯৬৭ সালের ১৪ এপ্রিল রমনার বটমূলে শুরু হয় পহেলা বৈশাখ[৮২]

---

৭৭. কামাল লোহানী, আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৭৮. খান সারওয়ার মুরশিদ, কালের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১০৯

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

৮১. সনজিদা খাতুন, সংস্কৃতি কথা সাহিত্য কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৮২. পহেলা বৈশাখে চারুকলা আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রা ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্মানে স্বীকৃতি পেয়েছে।

উদযাপন। আজ অবধি একাত্তরের হত্যাযজ্ঞের বছর ছাড়া আর কখনো এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে ছেদ পড়ে নাই।

১৯৭১ সালের ১৪ই এপ্রিল রমনার বটমূলের বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হতে পারে নাই। কোনো গানও বেজে উঠে নাই রমনার বটমুলে। ঘরে ঘরে ছিল শোক আর চাপা কান্না। শিল্পী সনজিদা খাতুন সাভারের জিরাব গ্রামে সন্তানদের নিয়ে গান গেয়ে বটমুলের প্রভাতী অনুষ্ঠানকে স্মরণ করেছেন।[৮৩]

'বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৬৩ সালে তাদের আয়োজিত 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০' বাঙালিকে প্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছিল সপ্তাহব্যাপী সেই আয়োজন।[৮৪]

শাসকের শোষণ অত্যাচার যত বাড়তে থাকে বাঙালি ততই নিজের আস্তিত্বকে আবিষ্কারে করতে থাকে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজের চিন্তা চেতনায় পূর্ব বঙ্গের বাঙালির স্বতন্ত্র সত্তাকে খুঁজে পায়। পশ্চিম পাকিস্তানের বাঙালির থেকে পূর্ববঙ্গের বাঙালি স্বতন্ত্র এবং বাঙালির দৈনন্দিন জীবনাচার একেবারেই ভিন্ন। এই সময়ে তারা পশ্চিম বাংলার প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজেদের স্বাধীন পরিচয়ে সঙ্গীতের নব নব সৃষ্টির প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। আনিসুজ্জামান লিখেছেন, সঙ্গীতের ধারাটি পূর্ব বঙ্গে বিরাট ভাবে আলাদা হয়ে যায় ১৯৬৫ সালে। সেই সময়ে দেশের গান লিখেছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন' আবদুল আহাদের সুরে ব্যাপক জনপ্রিয় হয় গানটি।'[৮৫]

১৯৬৬ সালের ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণার পর বাংলার মানুষ বিপুল ভাবে এর প্রতি সমর্থন দেয়। যাদের ইতিপূর্বে সচেতনভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহ ছিল না তারাও উৎসাহ নিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে থাকে। রাজনৈতিক প্রতিটি সভাতে সাংস্কৃতিক অঙ্গণের মানুষদের উপস্থিতি গণমানুষের সচেতনতা বাড়িয়ে দিতে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছিল। শিল্পী ইন্দ্রমোহন রাজবংশী বলেন, "আগে ছাত্র ইউনিয়নে যুক্ত থাকলেও ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনের পর আমি মনের অজান্তেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হই। ১৯৬৭ সালে আমার অন্যতম সঙ্গীতগুরু জনাব হাফিজুর রহমানের বাণী ও সুরে কণ্ঠে তুলে নেই আন্দোলনের গান। 'ছয় দাঁড়েতে নৌকা চলে মুখে আল্লাজী/পাছানায়ে হাল ধইরাছে গোপালগঞ্জের মাঝি' গানটি তখন থেকেই আমি দেশব্যাপী প্রায় প্রতিটি মঞ্চে গাইতে থাকি—যা মানুষকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা কণ্ঠশিল্পী ইন্দ্রমোহন রাজবংশী তাঁর সাক্ষাৎকারে।

---

৮৩. সনজিদা খাতুন, স্বাধীনতার অভিযাত্রা, ভাষা আন্দোলনঃ নববর্ষঃ ছায়ানটঃ মুক্তিযুদ্ধ, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ৬৩

৮৪. আনিসুজ্জামান, কাল নিরবধি, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা,২০০৩, পৃ. ৩৫৩

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২

১৯৬৭ সালের ২১, ২২, ২৩ ফেব্রুয়ারি ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্বোধন হয় পল্টন ময়দানে। সাংস্কৃতি অংগনে প্রতিবাদের ভাষাকে আরো দৃঢ়, সাহসী ও বেগবান করার জন্য ক্রান্তির যাত্রা শুরু হয়। কামাল লোহানী ক্রান্তির যাত্রালগ্নে বলেন, সামরিক শাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই লড়াকু বাঙালির জাতিগত ঐতিহ্য সম্পদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'আমাদের বলে ঘোষণা করেছিল। ১৯৬৭ সালে সদম্ভে প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতনতা, প্রগতিশীলতা নিয়ে মাঠের লড়িয়ে সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্রান্তি–২১ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশাল পল্টন ময়দানে, বিপুল জনসমাবেশের সামনে।' সেদিনের ছায়ানটের ভূমিকা প্রসঙ্গে কিছুটা ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায় তাঁর লিখায়, "ছায়ানট সেদিন অগ্রণী ভূমিকায় ছিল না। সেদিন ছায়ানটের একজন প্রতিষ্ঠাতা সক্রিয় সংস্কৃতি সংগঠক আমাদের (সাংবাদিক আবদুল মতিন ও আমি) দু'জনকে বলেছিলেন, তোমরা করো আমরা আছি। নিশ্চুপ বসে না থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সহযোগীতায় সমাবেশ করেছিলাম।"[৮৬]

সংগঠনের মধ্যকার পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি স্বত্ত্বেও আন্দোলন সংগ্রামে জনগণের ব্যাপক সমর্থন দেখে শাসক গোষ্ঠীর অস্থিরতা বেড়ে যায়। তাদের ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডেও বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার উচ্ছ্বাস কোনোভাবেই ঠেকানো যায় নাই। ১৯৬৭ সালে ২৯ অক্টোবর 'উদিচী' সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্ম হয়।[৮৭] সংগঠনটি জনসচেতনতা তৈরির জন্যে, গানে গানে সর্ব সাধারণকে সচেতন করার জন্য সংঘবদ্ধ করেছিল। সঙ্গীতের অব্যর্থ শক্তি সেদিন মানুষকে সচেতন করার জন্য যেভাবে কাজ করেছিল তা ছিল বিস্ময়কর।

১৯৬৭ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে এক ঘোষণার মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করে।[৮৮] গোটা দেশ এর প্রতিবাদ করে। সকল প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল 'সাংস্কৃতিক স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ।'[৮৯]

পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই অসাম্প্রদায়িক নজরুল ইসলামকে তারা সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজালে বন্দী করতে চায়। তারা তাঁর ইসলামি গানগুলিকে আশ্রয় করে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য জাল বুনতে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথকে কোনোভাবেই মেনে না নিয়ে নজরুলের ইসলামি গানের প্রচার প্রসারের উদ্যোগ নেয়। নজরুলকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করে। নজরুলকে মোল্লা প্রমাণ করার জন্য ভীষণভাবে তৎপর হয়। একইসাথে নজরুলের গানের বানীতে মন্দির, শ্যাম, হরি, ভগবান, জল ইত্যাদি শব্দ থাকলে তা সরকারি নির্দেশে পারিবর্তিত করে মসজিদ, আল্লাহ, পানি উচ্চারণে গাইতে বাধ্য করতো। কীর্তণ নিষিদ্ধ ছিল। শুধু নজরুল ইসলামের ইসলামী গান প্রচার করে তাকে মুসলমান বানানোর প্রাণপণ চেষ্টা

৮৬. কামাল লোহানী, লড়ায়ের গান, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৭
৮৭. আবদুশ শাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
৮৯. সনজিদা খাতুন, সংস্কৃতি কথা সাহিত্য কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

করেছে। তাঁর দেশ প্রেমের গান বা গণসঙ্গীতও গাওয়ার সুযোগ ছিল না। সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অসম্পূর্ণ নজরুল ইসলামকে নিজেদের হাতিয়ার করার ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করে।

গোটা পূর্ব বাংলা যখন সঙ্গীত ও বাংলার ঐতিহ্য, সমৃদ্ধ কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের ধারা নিয়ে বেগবান গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই মুহূর্তে ১৯৬৮ সালে সুকৌশলে নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য গঠন করা হয়েছিল নজরুল একাডেমী। পূর্ব বাংলার নজরুলগীতির অগ্রণী শিল্পীরা এতে সহযোগিতা করেন সার্বিকভাবেই।[৯০]

অসাম্প্রদায়িক কাজী নজরুলকে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক শাসকগোষ্ঠী যতই বৃত্তে বন্দী করার বৃথা চেষ্টা করেছিল বাংলার গণমানুষ তাতে কর্ণপাত না করে সমানতালে সর্বত্র রবীন্দ্র, নজরুল এবং নজরুল সৃষ্ট গণসঙ্গীত, ক্রান্তি, উদিচীর প্রতিবাদী পরিবেশনা দিয়ে সাড়া বাংলার মানুষকে পাকিস্তানি দুঃশাসন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও সোচ্চার করেছিল। গানে গানে অন্যায় অপশাসনের জবাব দিয়ে যায় শিল্পীরা। ঐ সময়কালে শিল্পীদের সমবেত পরিবেশনায় ছিল:

১. আমার সোনার বাংলা
২. ধনধান্য পুস্প ভরা
৩. মুক্তির মন্দির সোপান তলে
৪. ও আমার দেশের মাটি
৫. আজি সপ্ত সাগর ওঠে উছলিয়া
৬. আগুনের পরশমনি
৭. ভয় কি মরণে
৮. বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা
৯. আমার প্রতিবাদের ভাষা
১০. শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল
১১. দুর্গম গিরি কান্তার মরু
১২. জনতার সংগ্রাম চলবে

এ সময়ে উত্তাল সংগ্রাম মুখর পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী জাহিদুর রহিম এতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। জাহিদুর রহিমের সাহস ও ব্যক্তিত্ব গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হতে বিশেষভাবে কাজ করেছিল। এ প্রসঙ্গে জাহিদুর রহিম লিখেছেন, ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ স্বাধীন সার্বভোম বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং আমার সঙ্গীত জীবনের গর্ব। এ গানটি আমার ভীষণ প্রিয়- তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে সর্ব সময়ে আমার কণ্ঠে গীত হতো। পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুষ্ঠানে আমারই কণ্ঠে সর্বপ্রথম এ গানটি পরিবেশিত হয়। গর্ব

৯০. সনজিদা খাতুন, প্রবন্ধ সংগ্রহ, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ৮৬ ও ১৪২

করেই বলতে পারি আমার কণ্ঠে পরিবেশিত হয়েই এ গানটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের যেখানেই আমন্ত্রিত হয়ে গান গাইতে গিয়েছি সেখানেই জনসাধারণের অনুরোধে আমাকে অন্যান্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংগে এ গানটি গাইতেই হতো। আইয়ুব খানের শাষণামলে একবার কোনো মহল থেকে আমাকে হুমকি দেয়া হলো আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি গানটি আর আমার কণ্ঠে উচ্চারিত হলে বিপদে পড়তে হবে। কিন্তু তৎকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায় এ চ্যালেঞ্জই আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং পরবর্তীকালেও আমি মাথা উঁচু করে এ গান অনেক অনুষ্ঠানে গেয়েছি।"[৯১]

গণজাগরণের উত্তপ্ত সেই সময়ের গানের কন্ঠ শিল্পীরা ছিলেন গোলাম মোহাম্মদ ইদু, কামরুল আহসান খান, মাহমুদ আলী মল্লিক, রিজিয়া বেগম, আজিম সুলতানা, নাজনীন সুলতানা, নাসিমুন আরা মিনু, নিনু নাজমুন আরা প্রমুখ। এবং সঙ্গীত সংগঠক ছিলেন ইকরাম আহমেদ ও মনির রহমান।[৯২]

১৯৬৭ সালে গঠিত হয় বঙ্গবন্ধু শিল্পী গোষ্ঠী। বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব নিজে সংগঠনটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। মোঃ আব্দুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, মাহমুদুন্নবী, খন্দকার ফারুক আহমেদ, নমীতা ঘোষ, মৌসুমী কবির, অজিত রায়ের কণ্ঠে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে তারা রমনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সোহ্‌রাওয়ার্দী, উদ্যান, বটতলা, বাংলা একাডেমি চত্বর মুখর করে তুলেছিলেন প্রতিবাদী গানে গানে জানিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা কণ্ঠশিল্পী নমিতা ঘোষ তাঁর সাক্ষাৎকারে।

গোটা পূর্ব বাংলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পরে। শিল্পীদের গান আন্দোলনকে আরো বেগবান করে। রাজপথে শিল্পীদের অবস্থান, তাদের কণ্ঠের সমবেত গণসঙ্গীত আগুনের মতো জ্বলে উঠতে থাকে। বাংলা ভাষা আর বাংলা সংস্কৃতির উপর পাকিস্তান সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপে গণমানুষের কন্ঠ রুদ্ধ করার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে তারুণ্য দিপ্ত কণ্ঠে, উদ্ধ্যত ভঙ্গিতে শারিরীক অক্ষমতাকে পরোয়া না করে নির্ভিক ও অকুতোভয় শিল্পী লুতফর রহমান গণসঙ্গীত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, 'রক্তশিমুল তপ্ত পলাশ' (সৈয়দ শামসুল হুদা), 'বাংলার ফাল্গুন ইতিহাস (ফজল এ খোদা), 'জনতার সংগ্রাম চলবেই' (সিকান্দার আবু জাফর), 'বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই' (রবীন্দ্র সঙ্গীত), 'জাগো অনশন বন্দী উঠো রে যত' (নজরুল সঙ্গীত), 'ফুল খেলবার দিন নয় আজ' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়), 'আগুন নিভাইবো কেরে' (সত্যেন সেন), 'ওরে মাঝি দে নৌকা ছেড়ে, ছেড়ে দে' (শহিদ সাবের), 'লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয়' (মতলুব আলী)। তাঁর কন্ঠের উদাত্ত সুরের আহ্বান সকল বাঙালিকে উদ্দিপ্ত করেছিল। গণমানুষ সেই গণসঙ্গীতের আহ্বানে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো।[৯৩] বিপ্লবের জোয়ারে গান রচিত হয়েছিল অনেক। তম্মধ্যে সিকান্দার আবু জাফরের লেখা ও শেখ লুতফর রহমানের সুর করা 'জনতার

৯১. ফজল এ খোদা, সংগীত ভাবনা, বাংলা একাডেমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৯৩. ফজল এ খোদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

সংগ্রাম চলবে, আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে জনতার সংগ্রাম চলবে।' গানটি এপার বাংলা ওপার বাংলা দুই বাংলাতেই সমান জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৬৬-৬৭ সালের দিকে সত্যেন সেনের লেখা ও শেখ লুতফর রহমানের সুরের আরেকটি গান গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল। গানটি হলো—'এ আগুন নিভাইবো কেরে, এ আগুন নেভে না।' ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় আবু বকর সিদ্দিকের লেখা আর শেখ লুতফর রহমান ও সাধন সরকারের সুরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গান সাড়া বাংলায় সর্বত্র মিছিলে মিটিং এ গাওয়া হতো। তেমন কিছু গান:

১. বিপ্লবের রক্ত রাঙা ঝাণ্ডা ওড়ে আকাশে,
২. মার্কিনী লাল ইয়াংকিরা, চায় কিহে রক্ত হে,
৩. পায়রার পাখনা বারুদের বহ্নিতে জ্বলছে,
৪. বাংলার ঘরে ঘরে সংগ্রামী জানক (সাধন সরকারের সুরে)
৫. বেরিকেড বেয়নেট বেড়াজাল, পাকে পাকে তরপায় সমকাল।

গাজী মাজাহারুল আনোয়ারের 'রক্ত শুধু রক্ত' গানটি ১৯৬৭-৬৮ সালের দিকে লেখা।[৯৪] বাঙালির রুদ্ররোস আর উত্তপ্ত পরিস্থিতি ফুটে ওঠেছিল গীতিকারের গানের শব্দ চয়নে। বাংলা সংস্কৃতি নিয়ে আইয়ুবী শাষণামলের বাড়াবাড়ির জবাব দিত সাহসী শিল্পীরা ব্যঙ্গাত্মক কৌতুকছলে। তেমনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন গীতিকার ফজল এ খোদা। "বাঙালিদের আরো কার্যকরভাবে শাসন করার জন্য পাকিস্তানি সামরিক জান্তা আর্মির ভেতর পাঞ্জাবিদের মধ্য থেকে কিছু সেনা সদস্য নিয়ে বিশেষ সেল গঠন করেছিল যাদেরকে বাংলা শেখানো হতো। যাতে তারা বাঙালিদের কথা ও লিখা বুঝতে পারে। অর্ধশিক্ষিত পাঞ্জাবিরা ভালো করে উর্দুই বুঝে না আর বাংলা বোঝার ব্যাপারটি ছিল রীতিমতো হাস্যকর। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সম্মানে আয়োজিত ঢাকার রমনা গ্রীনে এক অনুষ্ঠানে বাঙালিদের প্রিয় শিল্পী মোহাম্মদ আবদুল জব্বার পরাক্রমশালী আইয়ুবের মুখোমুখী বসে গান গেয়েছিল 'তুমি কি দেখেছ কভু আইয়ুবের পরাজয়, দুঃখের দহনে করুন রোদনে তিলে তিলে তার ক্ষয়' আইয়ুব তো গানের মধ্যে তার নাম শুনে মহাখুশি। আইউব ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা এই ভেবে খুশি হয় যে, বাঙালিরা আইউবের নামেও গান বেঁধেছে। কিন্তু বাঙালি এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মুখ কালো হয়ে যাওয়ায় শোনা যায় আইউব অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। সেই বাঙালি কর্মকর্তা পাকিস্তানের এক নম্বরের দালাল ছিল। আইউব সন্তুষ্ট হয়ে মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের পিঠ চাপড়ে দিলেও ঢাকা বেতার কর্তৃপক্ষ প্রায় ছ'মাস বেতার থেকে জব্বারের গান গাওয়া বন্ধ রেখেছিলেন।"[৯৫]

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে আলতাফ মাহমুদ ও শেখ লুতফর রহমানের সুরে জনপ্রিয় হয়েছিল একটি গান যার দুটি লাইন:

---

৯৪. সাইম রানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫০
৯৫. ফজল এ খোদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৪

‘ঝঞ্ঝা-ঝড় মৃত্যু দুর্বিপাক
ভয় যারা পায় তাদের ছায়া দূর মিলাক।’[৯৬]

আন্দোলনে উত্তপ্ত পূর্ব বাংলার শিল্পীরা শহর বন্দর জনপদ কাঁপিয়েছে গানে গানে। শ্রোতারা দিনের পর দিন রক্তে আগুন লাগানো সুরে প্রতিবাদী হয়েছে।

উনসত্তরের গনআন্দোলনে শিল্পী ইন্দ্রমোহন রাজবংশীর অনুরোধে গিতীকার হাফিজুর রহমান তিনটি গান লিখে সুর করে দেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে ইন্দ্র মোহন রাজবংশী গান তিনটি শহরে ও গ্রামের মঞ্চে বহুবার গেয়েছেন। জনপ্রিয় হওয়া সেই তিনটি গান গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণ করেছেন বিখ্যাত লোকগায়ক ও গণশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় সহশিল্পী হিসেবে ছিলেন ইন্দ্রমোহন রাজবংশীর স্কুল শিক্ষকের দুই মেয়ে লিলি হক ও জলি হক। সাথে সুরকার ও গীতিকার হাফিজুর রহমানও ছিলেন বলে জানিয়েছেন শিল্পী ইন্দ্রমোহন রাজবংশী তাঁর সাক্ষাৎকারে।

সিলেটের গণশিল্পী রাম কানাইদাশ উত্তাল উনসত্তরের অভ্যুত্থানের সময় গান গেয়েছেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। প্রখ্যাত কবি দিলওয়ারের রচিত গণসঙ্গীতে সুর দিয়েছেন। সিলেটের বিভিন্ন স্থানে উদীচীর ব্যানারে সে সকল গান গাইতেন। সাথে থাকতেন তার আত্মীয় ভবতোষ চৌধুরী। কয়েকটি গানের কথা

১। দিকে দিকে ধিকি ধিকি লাল উত্তাল

২। হিন্দু কি মুসলিম, বৌদ্ধ কি খ্রিস্টান

৩। রাত পোহাল দরজা খোল

কবি দিলওয়ারের ব্যক্তি চরিত্রের গণমুখীনতা শিল্পী রাম কানাই দাশের আত্মবিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।[৯৭]

১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি অভ্যুত্থান ঠেকাতে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে পরিস্থিতিকে আয়ত্বের বাইরে নিয়ে যায়। নিহত হয় ছাত্রনেতা আসাদ। ২৪ জানুয়ারি নিহত হয় মতিউর। তার পরই ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়। প্রতিবাদে, দ্রোহে, ক্ষোভে রাস্তায় নেমে আসে সাধারণ মানুষ। বিশিষ্ট গণশিল্পী নিজামুল হক, শহিদ আসাদ ও শামসুজ্জোহাকে নিয়ে একটি গান লিখেন।

‘আসাদ জোহা আর যত শহীদের
রক্তে নিশান দেখেছি
তাইতো মোরা সব কিছু ভুলে
এক মিছিলে মিলেছি।’

---

৯৬. দিনু বিল্লাহ, সুরের বরপুত্র শহিদ আলতাফ মাহমুদ, অনন্যা, ২০১৫, পৃ. ৯৬
৯৭. রাম কানাই দাশ, সঙ্গীত ও আমার জীবন, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ১০৬

বিশিষ্ট সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার গণঅভ্যুত্থানের সময় গান লিখেন আর আলতাফ মাহমুদ সুর দেন। গানটি হলো :

আমরা পূবে পশ্চিমে আকাশে বিদ্যুতে
উত্তরে দক্ষিণে হাসিতে সঙ্গীতে
নদীর কলতানে আমরা।

ফজলে লোহানী রচিত গান, সুর দেন খান আতাউর রহমান:

'শীতল পৃথিবী অবশ নগর
অসার আকাশ-বাতাস নিথর।'

সুখেন্দু চক্রবর্তীর একটি গান যা স্মরণীয় করে রেখেছে লেখককে। গানটি হলো :

'ডিম পারে হাসে খায় বাঘডাসে
শুনছনি ভাই শুনছনি বুঝছনি ভাই বুঝছনি
আসল কথা বুঝছনি?'

একইসাথে পুরনো গানগুলোও গাওয়া হয় সমানভাবে। স্বাধীকার পাবার এই আন্দোলনে সংগ্রামের একটি অসাধারণ গান লিখেছেন মুস্তাফিজুর রহমান, সুর করেছেন আবদুল আজিজ বাচ্চু। গানটি হলো :

'জনপথ প্রান্তরে সাগরের বন্দরে শুনি হুংকার
চাই স্বাধীকার স্বাধীকার স্বাধীকার।'[৯৮]

গানগুলির মধ্যে বাঙালির মুক্তির আকুতি ফুটে উঠেছে। মুক্তির লক্ষ্যে রচিত সেই গান শিল্পীদের লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময়েই বাংলার ছাত্র সাধন ঘোষের কথা ও সুরে দারুণ জনপ্রিয় হওয়া গানটি ছিল 'বাংলার কমরেড বন্ধু এইবার, তুলে নাও হাতিয়ার।[৯৯]

১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদ দিবস ভিন্নরূপে এসেছিল। যথার্থ অর্থেই ঐ বছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়েছিল। অসংখ্য বাঙালি শহিদ হয়েছিল ঐ বছর—যার অনেকটাই অজানা। পরিচিত অপরিচিত গান কবিতা নতুন শক্তিতে নতুন অর্থে উচ্চরিত হয়েছিল। আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছিল সেই গানে। গানগুলো ছিল কারার ঐ লৌহ কপাট, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, আমার সোনার বাংলা। সপ্তাহজুড়ে পূর্ব বাংলা প্রতিবাদে বিক্ষোভে আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল। সরকারের সিদ্ধান্তে ২১শে ফেব্রুয়ারি ছুটি ঘোষণা করা হয়।[১০০]

---

৯৮. সাইম রানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫৪

৯৯. কামাল লোহানী, আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

১০০. জয়নাব আখতার, ভুলে যাওয়া রাজনৈতিক মঞ্চের আত্মকথন, প্রকাশক নিলুফার সুলতানা, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম, ২০০৭, পৃ. ২১৬

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন। ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল জনমনে। পাকিস্তানি শাসকের হাত থেকে মুক্তির আকাঙ্খা নিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ নির্বাচনে জয়ী হবার জন্য সর্বাত্মক সহযোগীতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শিল্পী, সুরকার, গীতিকারগণ প্রাণপন চেষ্টায় নিয়োজিত হন নির্বাচনের প্রচারণায় জনমানুষকে সামিল করতে। নিজেদের প্রতিনিধির পক্ষে গানে গানে তারা প্রচারণা চালান গোটা পূর্ব বাংলায়। তারা গানের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অন্যায়, দুঃশাসন আর শৃংখল থেকে মুক্তির উপায় খোঁজে। ভোট যুদ্ধে জিততে হবে—সে লক্ষে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামকে উপজিব্য করে গান লিখেছেন আবদুল লতিফ:

ও রহিম ভাই, ও করিম ভাই, ও যদু ভাই, ও মধু ভাই
দুঃখের দইরা হইবা যদি পার,
দেখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর হাল ধইরা রইছে নৌকার॥
এগারো দফাতে গড়া নৌকাখানা মনোহরা
মাস্তুলে তার বাদাম ওড়ে দেখনারে ভাই ছয় দফার।[১০১]

এমনি সময় ঘুর্ণিঝড় দক্ষিণ বাংলাকে বিরান করে দেয়। আলতাফ মাহমুদের দরদী মন কেঁদে ওঠে। সুরের যাদুকরের সুরে কেঁদেছেন নিজে, কাঁদিয়েছেন লাখো জনতাকে গান গেয়ে। একটি জনপ্রিয় গান ছিল:

‘কাঁদো বাংলার মানুষ আজিকে কাঁদো
কাঁদো ভাইবোন।’

পূর্ব বাংলার প্রতি শাসকের বঞ্চনার ক্রোধ বিস্ফোরণে পরিণত হয়েছিল। কবি সুকান্ত লিখেছিলেন আর শেখ লুতফর রহমান সুর দিয়েছিলেন:

‘হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছাসে।’[১০২]

বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল থমথমে। এমনি পরিস্থিতিতেই পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে সে নির্বাচন। আলতাফ মাহমুদ এ সময়ে লিখেন সফল একটি গান, যাতে নিজেই সুর দিয়েছিলেন:

‘এই ঝঞ্ঝা মোরা রুখবো
এই বন্যা মোরা রুখবো
মায়েদের বোনেদের শিশুদের অশ্রু মুছবোই।’[১০৩]

পূর্ব বাংলার দুর্যোগের সেই সময়ে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ আর পূর্ব বাংলার সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রেসক্লাবের যৌথ উদ্যোগে সমাজের সকল শ্রেণিকে একত্রিত করে পথমিছিলের মাধ্যমে

১০১. সাইম রানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
১০২. কামাল লোহানী, আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
১০৩. আলতাফ মাহমুদ, হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, বাংলা একাডেমি, ১৯৮২, পৃ. ৫৭

অর্থসংগ্রহ আর প্রতিবাদের আয়োজন করেছিল। গণসঙ্গীত ছিল পথমিছিলের হাতিয়ার। যার দায়িত্বে ছিলেন শিল্পী আলতাফ মাহমুদ। তাঁর সাথে আরো যারা ছিলেন তাদের মধ্যে শেখ লুতফর রহমান, আব্দুল লতিফ, সমর দাস, আতিকুল ইসলাম, অজিত রায়, মনিরুল আলম, ফকির আলমগীর, মাহমুদ উন-নবী প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ছায়ানট, বুলবুল একাডেমী থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী যোগ দিয়েছিল এতে। এর বাইরেও অনেকে স্বত:স্ফূর্তভাবে এতে অংশ নিয়েছিল। এই সময়ে অনেক গণসঙ্গীতের পাশাপাশি আরো দুটি গণসঙ্গীত সৃষ্টি হয়। যার একটি,

‘ওরে বিষম দইরার ঢেউ উথাল পাথাল করে
নাও আজি তার সাথে নাচেরে।’

গানটি গণসঙ্গীত শিল্পী শেখ লুতফর রহমান অভিনেতা আরিফুল হকের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সুর আর কথায় কিছুটা পরিবর্তন এনে নিজে গেয়েছেন। গানটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল সেই সময়ে এবং বিভিন্ন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে অসংখ্যবার গাওয়া হয়েছিল। আরেকটি গান ছিল সুরকার সমর দাসের সুর করা ও গীতিকার নইম গহরের লিখা,

‘সাগর পানিতে ঝড় জাগে যদি,
জাগতে দাও জাগতে দাও।’
বজ্রের গানে গানে কণ্ঠ মিলিয়ে
শপথ নাও শপথ নাও।’[১০৪]

বিপুল বিজয় পেয়েছিল বাঙালির প্রাণ প্রিয় দল আওয়ামী লীগ তার নৌকা প্রতীক নিয়ে। বাংলার গণমানুষের ভালোবাসার ম্যান্ডেট পেয়ে বিপুলভাবে বিজয়ী হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলে পূর্ববাংলার সকলের সাথে শিল্পীরাও বিজয় উল্লাস করেছে। গান গেয়ে তারা উদযাপন করেছে বিজয়ের আনন্দ। পাকিস্তানি সেনা শাসক কোনোভাবেই ফলাফল মেনে না নিয়ে একটার পর একটা ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পূর্ববাংলার জনগণকে সাথে নিয়ে বিজয়ী দল যখন সরকার গঠনে প্রায় প্রস্তুত তখন আকস্মিক ঘোষণায় জাতীয় সংসদের আহুত অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে। বাঙালি নেমে আসে রাজপথে। শুরু হয় অভিনব এক আন্দোলন যা অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত। প্রতিবাদী জনতা নেতৃত্বের আহবানে শুরু করে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, শ্লোগান, মিছিল। সরকারের নির্দেশ অমান্য করে পূর্ব বাংলায় সব চলেছে শেখ মুজিবের নির্দেশে। ৭ মার্চ রেসকোর্সের উত্তাল জনসভায় শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার প্রতিবাদে উত্তাল জনগণকে স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেন।

১০৪. দিনু বিল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯

মার্চ মাসের অসহযোগ চলাকালীন শিল্পীরা নতুন শক্তিতে রাজপথ, জনপদ কাঁপিয়েছে। সমগ্র পূর্ব বাংলার শহর, বন্দর সর্বত্র শিল্পী সংস্কৃতি কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে যা ইতিপূর্বে এমন প্রবল আকারে দেখা যায় নাই। বঞ্চিত জনতার ক্রোধের আগুন মিশে যায় একস্রোতে। শিল্পীদের গানের সুদৃঢ় ঐক্য পাকিস্তান সরকারকে উপেক্ষা আর অমান্য করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। শিল্পীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ নিয়ে লিখেছেন গীতিকার ফজল এ খোদা, ২ মার্চ থেকে বেতারের সবাই অসহযোগ করেছে। ৭ মার্চ '৭১ থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের পর সারা দেশ বঙ্গবন্ধুর পেছনে দাঁড়ায়। ১০ মার্চ ৭১ থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রেডিও, টেলিভিশনে পাকিস্তানের গান বাজে নাই, বেজেছে বাংলা গান, বাঙালির গান। ফজল এ খোদার লেখা 'সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম, চলবে দিনরাত অবিরাম।' মুস্তফা মনোয়ারের ব্যতিক্রমি উপস্থাপনায় আজাদ রহমানের সুরে আব্দুল জব্বার, ফেরদৌসী রহমান, আব্দুল আলীম, আবদুল হাদী, খন্দকার ফারুক আহমদ, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, আঞ্জুমান আরা, খুরশিদ আলমসহ প্রথম সারির ১৭ জন শিল্পীর কণ্ঠে মার্চ মাসের প্রায় প্রতিদিনই গানটি প্রচার হয়েছে। তাঁর আরো একটি গান অসহযোগ চলাকালীন মিছিলে গেয়েছেন শিল্পী মোঃ আবদুল জব্বার। 'বাংলার জয় মানে না যারা, পিটাও তাদের পিটাও! মানব নামের দানব কুলের অলীক স্বপ্ন মিটাও।' গানটি বঙ্গবন্ধু খুব পছন্দ করেছিলেন। শিল্পী আঃ জব্বরের কণ্ঠে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে বঙ্গবন্ধু সামনাসামনি শুনে উচ্ছসিত হয়ে বলেছিলেন 'আমরা শয়তানদের লাঠি দিয়ে পিটাইয়া সোজা করতে পারতেছি না। আর তোরা কলম দিয়ে পেটাতে শুরু করলি'? অসহযোগের প্রতিদিনই মিছিল মিটিং এ আবদুল জব্বারের গাওয়ার জন্য ফজল এ খোদাকে ২/১ টি গান লিখতেই হতো। কোনো দিন রিকসা মিছিল, কোনো দিন বস্তিবাসির মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে শিল্পী তাঁর উদাত্ত সুরেলা কণ্ঠে সেই গান গেয়ে মিছিলের নেতৃত্ব দিতেন।'[১০৫]

"'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বশ্রেণীর শিল্পীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। প্রগতিমনষ্ক শিল্পীরা একত্রিত হয়েছিলেন পাকিস্তানি সেনা শাসকের বিরুদ্ধে। দুর্বার সংগ্রাম, আন্দোলন গড়ে তুলেছিল শিল্পীরা। অভিনেতা হাসান ইমামের নেতৃত্বে সংগঠনটি সৃষ্টি হয়। তাঁর সাথে আরো ছিলেন ওয়াহিদুল হক, আতিকুর রহমান।[১০৬] শিল্পী হিসেবে ছিলেন অজিত রায়, আলতাফ মাহমুদ, শেখ লুৎফর রহমান, সুখেন্দু চক্রবর্তী, আপেল মাহমুদ, ফাহমিদা খাতুন, জাহেদুর রহিম প্রমুখ। দলবেঁধে শিল্পীরা ঢাকার শহিদ মিনার, প্রেসক্লাব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে গান পরিবেশন করতেন। গণহত্যার রাত পর্যন্ত শিল্পীরা গান গেয়ে পাকিস্তান সরকারের অন্যায় কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছে।"[১০৭]

---

১০৫. ফজল এ খোদা, সঙ্গীত ভাবনা, বাংলা একাডেমি, ২০১২, পৃ. ১২০-১২১

১০৬. সনজিদা খাতুন, প্রবন্ধ সংগ্রহ, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ২৬০-২৬১

১০৭. ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সংস্কৃতি ধারা, অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ২৭৩-২৭৪

ফজল এ খোদার বিখ্যাত গান 'ছালাম ছালাম হাজার ছালাম' গানটি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ১৪ তারিখ ধীর আলী মিয়ার সঙ্গীতায়োজনে রেকর্ড হয়ে সেদিন থেকেই রেডিওতে প্রচার শুরু হয়। প্রতিদিন ২/৩ বার করে গানটি প্রচার হয়ে শহর, নগর, গ্রামে সর্বত্র বাঙালিদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল।[১০৮]

শিল্পীরা অসহযোগ আন্দোলনে শুধু গান গেয়েই প্রতিবাদী ছিল না, অনেক সঙ্গীত শিল্পীই পাকিস্তান বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। শিল্পী আলতাফ মাহমুদ অসহযোগ আন্দোলন শুরু হতেই ৩ মার্চ থেকে একটু একটু করে পঞ্চাশ গ্যালন পেট্রোল মজুদ করেছিলেন নিজ বাড়িতে। যা দিয়ে হাতিয়ার বানিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ করবেন পরিকল্পনায়।[১০৯] শিল্প মালা খুররম তাঁর সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন।

ডালিয়া নওশিন, রফিকুল আলম, অরূপ রতন চৌধুরী, এম এ মান্নান, মনোরঞ্জন ঘোষাল, জাহিদুর রহিম, অনুপ ভট্টাচার্য, বুলবুল মহলানবিশ, বিপুল ভট্টাচার্য, নমিতা ঘোষ, কাদেরী কিবরিয়া, মলয় কুমার গাঙ্গুলী, শাহীন সামাদ, মালা খুররম, রূপা ফরহাদ, মাহমুদুর রহমান বেনু, অরূপ রতন চৌধুরী, সুবল দত্ত সহ অনেক শিল্পী রাজপথে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। ২৩ মার্চ ছিল 'পাকিস্তান দিবস।' শিল্পী-কুলাকুশলী সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দিনটি তারা পালন করবে না, গণমাধ্যম টেলিভিশনেও প্রচার করবে না। টেলিভিশন ভবনের বাইরে পাক আর্মি অবস্থান নিয়েছিল পতাকা প্রদর্শন করা না হলে টেলিভিশন ভবন উড়িয়া দেওয়া হবে। টেলিভিশনে পতাকা দেখানো হয়েছিল যখন ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর অতিক্রম করে, অর্থাৎ সময়টি ছিল ২৪ তারিখ। বাঙালি তাদের জেদ বজায় রেখেছিল।[১১০] শিল্পী অরূপ রতন চৌধুরী বলেন, ভয়ভীতি উপক্ষো করে শিল্পীদের গান পাকিস্তান শাসককে ক্রুদ্ধ করেছিল। তারা কঠিন নযরদারীতে রেখেছিল শিল্পীদের। সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার টিভিতে যে গান গাওয়ার সুযোগ ছিল না, উন্মুক্ত খোলা মঞ্চে শিল্পীরা মুক্তকণ্ঠে গেয়েছেন প্রতিবাদের গানগুলো। যার জন্য শিল্পীদের অনেককেই তখন আত্মগোপনে থাকতে হয়েছে। শিল্পীদের জীবন ছিল হুমকীর মাঝে।[১১১]

শিল্পীরা প্রতিবাদী গান গেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি, পুরান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত গলায় হারমোনিয়াম বেঁধে সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে পাকিস্তান সরকারের প্রতি হুংকার দিয়েছে। ২৫ মার্চ রাত পর্যন্ত শিল্পীরা প্রতিবাদী গান গেয়ে রাজপথ উত্তপ্ত রেখেছিল।

---

১০৮. ফজল এ খোদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২২

১০৯. আলতাফ মাহমুদ, হেদায়েত হোসেন মোর্শেদ, বাংলা একাডেমি, ১৯৮২, পৃ. ৫৯

১১০. সনজিদা খাতুন, স্বাধীনতার অভিযাত্রা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ১৪৯

১১১. অরূপ রতন চৌধুরী, সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্ট-০১

ঢাকা শহর আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেনা শাসকের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ আর দ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে শিল্পীদের শানিত কণ্ঠ।

গণসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে যাদের নাম উল্লেখ করতে হবে তারা হলেন সুখেন্দু চক্রবর্তী, অজিত রায়, জাহিদুর রহিম, মাহমুদ সেলিম এবং মুক্তি সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আরো যারা ছিলেন তাদের মধ্যে আবেদা বেগম, মুনিরুল আলম, মোর্শেদ, ইকবাল, জাহাঙ্গীর, খসরু, মুসা আহমেদ, মাহবুবুর রহমান, মাহবুব, ওমর কোরেশি, ফকির আলমগীর, আজম খান, দুলু, মিনি জাহানারা, নিলুফার বেগম, স্নিগ্ধা চক্রবর্তী, আনজুম, কুসুম, সাধন, কল্যাণী ঘোষ, প্রবাল চৌধুরী, কেনেডি আরো অনেকে। শিল্পীদের সংগঠিত করার দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা হলেন সায়িদুল হাসান, খুলনার খালেদ রশিদ, চট্টগ্রামের মাহবুব আলম চৌধুরী, ঢাকার ওয়াহিদু হক, বদরুল হাসান, মোসলেহ উদ্দিন, শাহাবুদ্দিন প্রমুখ।[১১২] পাক সেনাবাহিনীর ২৫ মার্চের অতর্কিত আক্রমণের পরেই শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

১১২. কামাল লোহানী, আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ৬৩-৬৪

চতুর্থ অধ্যায়

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে শিল্পী সুরকার গীতিকারদের ভূমিকা

২৫ মার্চ এর মধ্যরাতে ঘুমিয়ে পরা ঢাকা নগরীর উপর পাক হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমনে ঢাকাবাসীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ভয়ংকর বিষাদ আর আতংকে বাঙালি উৎকণ্ঠার প্রহর পার করেছে সেই রাতে। মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছিল বাঙালি ২৫ মার্চ এর কালো রাতে। নির্দিষ্ট কিছু স্থানকে চিহ্নিত করে পাক বাহিনী চালিয়েছে অপারেশন সার্চ লাইট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা, রাজারবাগ, পুরান ঢাকাসহ আরো কিছু স্থানে তাদের নারকীয় গণহত্যা[১] চালায়।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পাশে ছিল গণশিল্পী, সুরকার, গীতিকার আলতাফ মাহমুদের বাসভবন। ২৫ মার্চ রাতের অনুষ্ঠান পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের সাথে তিনি ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠ।মাঝরাতের পাক বাহিনীর মর্টার, কামান, ট্যাঙ্ক নিয়ে হামলায় ৩৭০ নম্বর আউটার সার্কুলার রোডে আলতাফ মাহমুদের বাড়িটি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভাড়া বাসার কাঁঠাল গাছটি আগুনের গোলা নিক্ষেপে পুড়ে যায়। রাজারবাগ লাইনের বহু পুলিশ তাঁদের একমাত্র সম্বল থ্রি-নট থ্রি-রাইফেল নিয়ে গোপনে আলতাফ মাহমুদের বাড়ির ছাদে পজিশন নেয়। অল্পক্ষণের প্রতিরোধেই তাদের সব গোলাবারুদ শেষ হয়ে যায়। তাদের তখন খালি হাতে করার আর কিছু ছিল না। বাড়ির ভেতর আলতাফ মাহমুদ প্রাণান্তকর চেষ্টায় বালতির পর বালতি পানি ঢেলে, শীতের ভারি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন জমানো পেট্রোলের টিনগুলো। বাতাসের গতির জন্য সে রাতে তাঁর বাসাটি বেঁচে যায়। ২৬ মার্চ স্ত্রী, কন্যা, শ্বাশুড়ি ও শ্যালক শালিকা সবাই পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন। ২৭ তারিখ কার্ফু তোলা হয় কয়েক ঘণ্টার জন্য। সেই সময় মাইল খানেক দূরে কমলাপুর বৌদ্ধ বিহারে সবাই আশ্রয় নেন। পাকবাহিনী মসজিদ, মন্দির, গীর্জায় আক্রমণ করতেও বিবেক থেকে বাঁধা পায় নাই। যার কারণে ৯ দিন পর খিলগাঁও এক আত্মিয়ের বাসায় ১৮ দিনের জন্য সবাই আশ্রয় নেন। তারপর তারা আবার নিজ বাসায় ফিরে আসেন।

আঠারো দিনের কিছু স্মৃতির বিষয়ে জানা যায় আলতাফ মাহমুদের স্ত্রীর বড় ভাই ফখরুল আলম বিল্লাহর কাছ থেকে, 'অত্যন্ত শক্ত নার্ভের মানুষ আলতাফ মাহমুদ নিজ থেকে না বললে ভেতরের খবর জানা দুঃসাধ্য। এক কলি গানও তিনি গান নাই সেক'দিন। অন্যমনস্ক তিনি মাঝে

---

১. ২৫ মার্চের গণহত্যার বিভৎসতার প্রতি তীব্র ঘৃণা আর অগণিত বাঙালির জীবনদানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মারণ করতে ২০১৭ সাল থেকে দিবসটিকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে সরকার পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। একই সাথে দিবসটিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়।

মাঝে বলতেন কে বেঁচে আছে। কে কোথায় আছে কিছু বুঝছিনা, কারো সঙ্গে কারোর যোগাযোগ নাই। কিভাবে লিঙ্ক করা যায়? কি করা যায়? একদিন হঠাৎ বললেন আর্মি আসলে কিভাবে রেসিসটেন্স দেবে ভেবেছ? কিন্তু এ ব্যাপারে কোনোদিনই তিনি কাউকে সব কথা বলেননি। তবে মনে পড়ে গোরার দিকে আমরা প্ল্যান করেছিলাম বোতল কেনা হবে। মিলিটারী এলে বোতলে পেট্রোল ভরে ছুঁড়ে মারা হবে। হাইলি সফিসটিকেটেড আর্মসের বিরুদ্ধে সেই ছিল আমাদের প্রথম প্রতিরোধের অস্ত্র। তারপর এপ্রিলের শেষের দিকেই আলতাফ ভাই নিজের জন্য কিভাবে পাইপ গান তৈরি করে নেন।'[২]

শিল্পীরা যেভাবে যে অবস্থানে থেকে নিরাপদ মনে করেছে সেভাবেই কাজ করেছে। অবশ্য নিরাপদ কথাটা সেদিনের বাঙালির জন্য প্রযোজ্য ছিল না, যারা দেশের শ্বাপদ সংকুল অবস্থার মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়েছেন মৃত্যুর নিশানায় তারা স্বভাবতই ছিলেন অন্ধকার অনিশ্চয়তার নিরাপত্তাহীনতায়। সে তুলনায় যারা সীমান্ত পাড়ি দিয়েছিলেন তাদের অন্তত, মৃত্যু ঝুঁকিটা ছিল না। আর যুদ্ধক্ষেত্রতো সবার জন্যই অনিশ্চিত, অনিরাপদ। যারা যুদ্ধে গেছেন তারা জীবনকে তুচ্ছ করেই গেছেন। ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েই গেছেন। শিল্পী আলতাফ মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল অসাধারণ, অবিস্মরণীয়। মিলিটারীদের নাকের ডগায় বসে তিনি জীবনকে বাজি রেখে দেশের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করেছেন অবিচল দৃঢ়তায়, আপাদমস্তক শিল্পী কখনো হয়েছেন মলোটভ গ্রেনেড হাতে নিয়ে দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা, কখনও হয়েছেন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়। আবার সেই কঠিন দিনগুলিতে গানের রচনা, সুর দেওয়া, রেকর্ড করার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিল্পীদের সংগ্রহ করে আবার নিরাপদে যার যার বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার মতো দায়িত্বশীল একজন শিল্পী মানুষ। মুক্তিযোদ্ধাদের কে কোথায় আছেন তারা নিরাপদে আছেন কিনা সার্বক্ষনিক ভাবনায় ছিল তার। সব সময়ই অন্যমনস্ক আলতাফ মাহমুদকে পুরো নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পাকসেনাদের পতন কিভাবে ঘটানো যায়। কিভাবে দেশকে স্বাধীন করা যায়। দেশের সেই দুঃসময়ে দেশ ছেড়ে যান নাই। তিনি ভেবেছেন সবাই চলে গেলে সেই মুহূর্তে দেশের জন্য লড়বে কে? জীবন তার ছিল প্রতিটি মুহূর্তেই মৃত্যু ঝুঁকিতে। প্রাণপ্রিয় একমাত্র কন্যা, স্ত্রীর কথা ভেবেও তিনি তার দায়িত্ব পালনে এতটুকু শিথিলতা করেন নি। দিনরাত প্রায় পুরোটা সময়ই তিনি ভেবেছেন মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে, দেশকে নিয়ে, প্রিয় মাতৃভূমিকে নিয়ে।

যুদ্ধকালে তিনি পরিচিত যার সাথে দেখা হতো কুশল বিনিময়ের পর যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। পাক সেনাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র সংগ্রহ করে কাছে রাখতে বলতেন প্রয়োজনে যেন কাজে লাগানো যায়। সবাইকে মাঠের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলতেন। যাদের সুযোগ ছিল তাদের বলতেন বাংলা দেশের যুদ্ধের কথা বাইরের পত্রিকায় যেকোনোভাবে প্রচার করার জন্য, যাতে আন্তর্জাতিক বিশ্ব জানতে পারে পাকিস্তানি বর্বরতার কথা।[৩]

---

২. আলতাফ মাহমুদ, হেদায়েত হোসেন মুর্শেদ, বাংলা একাডেমি, ১৯৮২, পৃ. ৬০

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

নিজ চোখে দেখা পাকিস্তান বাহিনীর পৈশচিকতা আলতাফ মাহমুদের ভাবনা জগতকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। অগণিত বাঙালির রক্তে বাংলার মাটি সিক্ত হতে দেখেছেন তিনি। নতুন মন্ত্রে আলতাফ মাহমুদ দেশ প্রেমে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ব্যস্ততা বেড়ে গিয়েছিল তার। কাছের মানুষের কাছেও তিনি তা প্রকাশ করেন নাই। সেই সময়ে তাঁর বাসায় সমমনা যাদের আগমন বেড়ে গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুল লতিফ (গণসঙ্গীত শিল্পী), হাফিজ আহমেদ (যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী), কামাল লোহানী (সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক), জহির রায়হান (চলচ্চিত্র পরিচালক), নিজামুল হক (গণসঙ্গীত শিল্পী এবং সংগঠক) প্রমুখ।[৪]

কার্ফিউ জারি করা ঢাকা শহরের আতংকের জীবনে শোনা যায় কিছু নামি- দামী মানুষের তালিকা করা হয়েছে, যাদের মেরে ফেলা হবে। খবরটি শুনতে পেয়ে ২৬ মার্চ কার্ফিউ শিথিল হবার সুযোগে স্বামী আর কাজের মেয়েকে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পথে নেমেছিলেন শিল্পী সনজিদা খাতুন। সন্তানদের কিছুক্ষণ আগে এক আত্মীয়ের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গ্রামের দিকে। পথে মানুষজটে আবার দেখা হয়ে যায় সন্তানদের সাথে। সাভারের জিরাব গ্রামে একদিন কাটান তারা। ২৭ মার্চ বিকেলে রওনা করে পৌঁছান শিল্পী ইফ্‌ফাত আরার বাবার বাসায়। একরাত সেখানে কাটিয়ে পরদিন ভোরে স্বামী তিন ছেলে মেয়েসহ ঢাকা ছাড়লেন। সাথে ছিলেন নৃত্যশিল্পী লায়লা হাসান ও তাঁর পাঁচ বছরের কন্যা। কালো বোরখা পরে তারা নিজেদের আড়াল করেছেন শত্রুর চোখ থেকে বাঁচতে। সারাদিন সারা পথ কিছু না খেয়ে, দু মুঠো মুড়ি খেয়ে ছিলেন কোনো এক সময়ে, সোনামুরা সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন শেষ বিকালে। প্রিয় দেশ, বাবা, মা, পরিজন ছেড়ে গিয়েও জীবন ফিরে পাবার আনন্দে খুশিতে গেয়ে উঠেছিলেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি আর চোখে ছিল আনন্দাশ্রু। তারা জানতেন না কবে, কখন আবার নিজ বাড়ি আর মাতৃভূমিতে ফিরে আসবেন।[৫]

ডালিয়া নওশিন : ২৫ মার্চ গণহত্যার পর প্রথম সুযোগেই ঢাকা থেকে পরিবার পরিজনের সাথে শিল্পী নিরাপদ দূরত্বে পালিয়েছিলেন। পাকিস্তান সরকারের কালো তালিকায় থাকা তার পিতার সাথে আরো ছিলেন পরিবারের অন্যান্য সদস্য। তিনি লিখেছেন, "২৫ মার্চ কালো রাতের পর ২৭ মার্চ পালাতে হলো শহর ছেড়ে গ্রামে। টাঙ্গাইলের করটিয়ায়। সেখান থেকে দেরমাস পর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে চলে যেতে হলো ওপারে। যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কোনো রকম অনুপ্রেরণা আমাদের কারুরই দরকার ছিল না। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও বাঙালি নিধনযজ্ঞের চিত্র সকল দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল পাক হানাদারদের দেশ ছাড়াতে। তাই বাঙালি ঝাঁপয়িে পড়েছিল দেশ স্বাধীন করতে।" সাক্ষাৎকারে তিনি বিষয়টি তুলে ধরেন যা, পরিশিষ্ট **১**-এ উল্লেখ আছে।

মালা খুররম বলেন, ২৫ মার্চের সেই দিনের ভয়াভয় হত্যার আগে কিন্তু শিল্পীরা অসহযোগ আন্দোলনে সবাই এক হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। আমরা তখন অসহযোগের উপযোগী

৪. দিনু বিল্লাহ, সুরের বরপুত্র আলতাফ মাহমুদ, অনন্যা, ২০১৫, পৃ. ১২৯-৩০

৫. সনজিদা খাতুন, স্বাধীনতার অভিযাত্রা, ছায়ানট, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ১৫১-৫২

গানগুলোই গাইতাম আমি,আমার বোন এবং অন্যান্য শিল্পীরা। ২৫ মার্চ রাতে আমাদের একটা রেকর্ডিংও ছিল। দেশাত্মবোধক গান পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। প্রতিদিন রাতে আমরা রিহার্সাল করছি। সেই দিন রাতে যখন রেকর্ডিং করতে যাই টেলিভিশনের ভেতরেও ঢুকে গিয়েছি। সন্ধ্যার সময় আমি আর আমার বোন ভেতরে ঢুকে দেখি ভেতরটা একদম খালি। অন্যদিনের মতো শিল্পী কেউ নেই। কে যেন আমাদের কানে কানে এসে আস্তে করে বলল শিগগির তোমরা বের হয়ে যাও। রাতে বাসায় ফিরার পথে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ওখানে ট্রাকের ওপর গণসঙ্গীত শিল্পীদের গান গাইতে দেখলাম। গান শুনতে শুনতে বাসায় আসি। সারা রাত গোলাগুলি শুনি। ২৭ মার্চ আত্মিয় স্বজন পাড়ার লোকজন ৪০-৫০ জনকে নিয়ে মাদারটেক হয়ে মেরাদিয়া চলে গেলাম। ওই যে বের হলাম আর ফিরে আসিনি। এপ্রিলের দিকে আব্বা আমার দুই ভাইকে নিয়ে ওপারে চলে গেলেন। তখন যাওয়াটাও অত সহজ ছিল না। জানটা হাতে নিয়ে কিভাবে যে আমরা আগরতলা হয়ে ওপারে গেলাম সেটাও আমার জন্য একটা বড় ঘটনা, একটা বিরাট স্মৃতি। অবরুদ্ধ দেশের শিল্পীদের কতটা অনিশ্চিত জীবন যাপন করতে হয়েছিল তার কিছুটা উপলব্ধি করা যায় মালা খুররমের কথায়। তিনি বলেন, ‘আব্বা চলে গেলেন ভাইকে নিয়ে, আমরা ঢাকার আশে পাশেই এদিক সেদিক ছিলাম,আমাদের কিন্তু আবার প্রোগ্রাম আসত। ওরা যদি জানতো আমরা ঢাকায় আছি কিন্তু প্রোগ্রাম করছি না তাহলে আমাদের জন্য সেটা অসুবিধাজনক। তাই আমরা অনেকটা লুকিয়ে থাকতাম ওদের জন্য যে আমরা আছি ঢাকায়। তারপর আর কোনো প্রোগ্রাম করিনি।’[৬]

রূপা ফরহাদ বলেন, ‘আমাদের এখানে থেকে যাবার যথেষ্ঠ সুযোগ ছিল আব্বার সুনামের কারণে কিন্তু আব্বাও চলে গেছেন এই ভাবনা নিয়ে যে এখানে থাকলে কিছু করতে পারব না। কিন্তু আমার কিছু করতে হবে, আব্বা যাবার আগে বলে গেছেন তোমরা একদম কোথাও অংশগ্রহণ করবে না। আমি ওখানে থেকে তোমাদের জানাব এবং সেই মুহূর্তে তোমরা চলে যাবে। গিয়ে ওখানে যা কিছু করার করবে।’[৭]

শিল্পীরা সবাই যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে দেশ ছেড়েছেন তা বলা যায় না। আত্মারক্ষার কারণে অনেক শিল্পীই সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন। তারা সেই মুহূর্তে নিজের এবং নিজের পরিজনের জীবন বাঁচানোর কথা ভাবার বাইরে অন্য কিছু ভাবতে পারেন নাই। তারা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে নিরাপদ হয়ে ভেবেছেন তাদের কিছু একটা করতে হবে। এদের মধ্যে সুজেয় শ্যাম, কল্যাণী ঘোষ, নমিতা ঘোষ, কাদেরী কিবরিয়া, মঞ্জুলা দাস গুপ্তা প্রমুখ শিল্পীদের লেখা থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়।

মঞ্জুলা দাস গুপ্তা তাঁর দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা যেভাবে উল্লেখ করেছেন, ‘২৬ মার্চের পরের দিন যতসামান্য কাপড় চোপড় নিয়ে, কিছু টাকা নিয়ে বেড়িয়ে পরলাম। রামপুরা, বাড্ডা হয়ে বৃষ্টির মধ্যে নৌকা নিয়ে কোথায় দিয়ে জানি না, খাল বিল পাড়ি

---

৬. মালা খুবরম, তারেক মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আগামী প্রকাশনী ২০১৩, পৃ. ৯৭-৯৯
৭. রূপা ফরহাদ, সাক্ষাৎকার, তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

দিয়ে বহুকষ্টে ২ দিন পর নরসিংদি পৌঁছলাম। কিছুদিন থাকলাম, ছেলেরা রাতে পালা করে গ্রাম পাহারা দেয়। রাতে ডাকাতি শুরু হলো। রাজাকাররা আসছে, জীবনটা অনিশ্চিত হয়ে গেল। ২-৩ মাস থাকার পর বৃদ্ধ শ্বশুর শ্বাশুরিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। তারা গেলেন না, আমাদের পালাতে বললেন। আমরা আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা করি। পথে নৌকায় পাড়ি দিতে হবে। নৌকায় মাঝি সবাইকে কালো শাড়ি পরতে বলেন। আর পুরুষদের বলল আপনারা কেউ সিগারেট খাবেন না। সিগারেটের আগুন দেখলে গুলি করবে ওরা। নৌকা যখন স্টার্ট করল তখন জল আর দেখা যাচ্ছিল না, শুধু নৌকা আর নৌকা। হঠাৎ শুনলাম যে একটা নৌকা থেকে একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। মুহূর্তে সেই কান্নার আওয়াজটা থেমে গেল। পরে আগরতলায় পৌঁছে জানতে পারলাম, মা নাকি তার বাচ্চাটিকে গলাটিপে মেরে ফেলেছিল। আমার সেই কথা মনে পরলে এখনো কান্না আসে। বাচ্চার কান্না শুনলে শত্রুর হাতে সবাই ধরা পরে যাবে, এজন্য সবাইকে বাঁচানোর জন্য তিনি নিজের বাচ্চাটিকে মেরে ফেলেছিলেন। সেই মহিলা কি মুক্তিযোদ্ধা না'?[৮]

কামাল লোহানী : মুক্তিযুদ্ধের হাজারো হৃদয় বিদারক ঘটনার মাঝে অবরুদ্ধ বাংলায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন যা সাক্ষাৎকার অংশে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেই অসহায় মুহূর্তে বাবা-মা সন্তান হারানোর কষ্টকে পাথর চাপা দিয়ে বোধশূন্য হৃদয়ে পালিয়ে ছিলেন জীবন রক্ষায়। হায়েনা শক্তির বিভৎসতা পদদলিত করেছিল বাঙালির স্বাভাবিক হৃদয় অনুভূতিকেও।

২৫ মার্চের গণহত্যা শুরু হলে জীবন পরিবার পরিজনের মায়ায় সবাই আত্মরক্ষার উপায় খুঁজতে থাকে। জীবন না বাঁচলে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে না। আর সেই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করলে পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্যই সফল হতো। তাই পালানো এবং বাঁচা সেটাও ছিল সেই মুহূর্তের বড় যুদ্ধ। জীবনটাকে হাতে নিয়ে শত্রুর অবরোধের মধ্য থেকে পালানোর উপায় ছিল খুবই ক্ষীণ। ধরা পড়লেই মৃত্যু। মানুষ মারার লাইসেন্স নিয়েই পাকিস্তানি হায়েনা বাহিনী যুদ্ধে নেমেছিল। **সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন,** "সেনাবাহিনীর তৎপরতা শুরু হওয়ার পরপরই বাঙালি পালিয়ে বাঁচার পথ খুঁজে এবং এ পালানোর অর্থ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার সূচনা। বাঙালি ঐ অবস্থায় না পালালে শত্রুর গোলার মুখে অকাতরে প্রাণ দেয়াটা হতো পরাজয় মেনে নেয়ার লক্ষণ। গোটা বাংলাদেশ প্রথম পালিয়েছে প্রতিরোধ গড়েছে পরে।"[৯]

সেই গণহত্যার বিভীষিকার মধ্যে পালিয়ে বাঁচাটাও যে ছিল কত কঠিন তারই করুন চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় **কল্যাণী ঘোষের** দেশ ছেড়ে যাবার বর্ণনায়। তিনি বলেন, "২৬ মার্চের গোলাগুলি শুরু হয়ে যাবার পর তিনদিন কোনো রকমে রক্তাক্ত চট্টগ্রাম শহর, রাস্তাঘাট পাকিস্তানি দোসর বাঙালিদের আমাদের প্রতি এত অত্যাচার যা ভাবলে এখনও ভয়ে শিউরে উঠি। সেই লোমহর্ষক ঘটনার মধ্যে থেকে বাবা মা ভাইবোন, স্বামী আর ছোটমেয়ে নিয়ে নৌকা পথে কর্ণফুলি নদী

---

৮. তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

৯. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, দুই যাত্রায় এক যাত্রী আত্মজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পার্ল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১১১

দিয়ে চলে যাই রাউজানে। ভাবতাম মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। তার কোনো লক্ষণ না দেখে ১৫ দিন গ্রামে থাকার পর ২১ এপ্রিল মুষলধারে প্রচণ্ড বর্ষণের মধ্যে সপরিবারে আমরা ত্রিশাল নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা শুরু করলাম বোরখা পরে মুখে কালি মেখে। তখন তো সবারই অল্প বয়স কোথায় যাচ্ছি সেটা জানি না। বৃষ্টির সাথে বজ্রপাত, গ্রামের রাস্তা, বাবা পড়ে যাচ্ছে, মা পড়ে যাচ্ছে। বাবাকে একটা চাদরে বসিয়ে তার চারকোনা চারজন ধরে নিয়ে চললাম। তিনদিন পর পৌছলাম রামগড় বাজারে। যাবার পথে আমার ছোট বোন দেবী চৌধুরীর এক ছেলে দশ মাসের, তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এক ফোটা জল নাই যে তাকে খাওয়াবো আমরা। তার একমাত্র সন্তান। সবাই বলছে এই বাচ্চাতো এমনিতেই মারা যাবে। ফেলে দিয়ে চলে যাও তোমরা। এটা কি কেউ পারে। আমার বাবাও বলছিলেন আমাকে তোরা রেখে যা। আমার বোনের সেই ছেলে এখন এমবিবিএস ডাক্তার, এভাবেই আমরা ২২ এপ্রিল বর্ডার ক্রস করলাম।”[১০]

নজরুল গীতি শিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল নিজেই ২৫ মার্চের গণহত্যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সরাসরি, তার পরিবার সহ। তাঁর ভাষ্যে ‘২৫ মার্চ বর্বর পাকিস্তানি সেনারা আমাদের বাড়িতে আক্রমন করে। গুলি করে আমার দাদাকে মেরেছে। জল খেতে চেয়েছে বারবার দেয়া হয় নাই। বাবা ভয়ে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে ধর-পাকরের ভয়ে সরে পড়তে বললেন। তাছাড়া আমরা হিন্দু ছিলাম বলে আমাদের ভয় ছিল একটু বেশি। আর গানের কারণে পাকিস্তানিদের আক্রোশ ছিল আরো বেশি। বেড়িয়ে পরে ২৮ তারিখে আমি ধরা পড়লাম। আমার ঝাকড়া চুলসহ সদরঘাটে পাকিস্তান আর্মি আমাকে গুণ্ডা বদমাশ বললে পাশের একজন বলল ও গুণ্ডা বদমাশ না, ও হলো পাঞ্জাবি জাতি, পাঞ্জাবি টেক্সটাইল মিলে চাকরি করে। শুনে আমাকে ছেড়ে দিল। তারপর সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে আশ্রয় নিলে আটক হয়ে গেলাম। যদিও নিরপেক্ষ জোন মনে করে হিন্দু ছেলেমেয়ে বুড়া বুড়ি সবাই সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। আর্মিরা এসে ছেলেদের ধরে গুলি করেছে। এক পাদ্রি মিশনারি টিচার ইংরেজিতে বলল, এটা একটা পবিত্র জায়গা, তোমরা এখানে কোনো অমানবিক কাজ করতে পারবে না। বলাতে সেই মুহূর্তে তা বন্ধ হলো। তারপর আমাদের দুহাত উচুঁতে তুলে জগন্নাথ কলেজে ২৩ ও ২৪ নং কমনরুমে এনে রাখল। সন্ধ্যা সাতটার দিকে মিলিটারীর বিভিন্ন গ্রুপ এসে আমাদের পরীক্ষা করছে পায়জামা খুলে। আমার পায়জামা খুলে তিনবার পরীক্ষা করেছে আমি হিন্দু না মুসলমান। সভ্যতার লেশ মাত্র পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে ছিল না। পাশের রুমে মেয়েদের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, তাতে বুঝেছিলাম মেয়েদের নিয়ে এসে টর্চার করছে। রেপ করছে, বোঝাই যাচ্ছিল। সন্ধা সারে সাতটার দিকে ১১/১২ জনের ব্যাচ করে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর জয়বাংলা শ্লোগান শোনা যাচ্ছিল। এরপর গোঙ্গানির আওয়াজ একটা মানুষের মৃত্যুর শেষে যে আওয়াজ হয় সেটা। ৩নং ব্যাচে আমি। আমার হাত বেঁধে মোটা একটা পর্দা দিয়ে চোখ বেঁধে নিয়ে গেল। জগন্নাথ কলেজ থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে গেলে ওদের ঘাঁটি। বড় একটা টঙ ছিল। পুরনো কাগজ পুড়িয়ে ছাই করা হয়। ওই

১০. তারেক মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র, আগামী, ২০১৩ পৃ. ৯২-৯৩

মোহনায় নিয়ে আমাদের গুলি করে। আমার তখন জ্ঞান ছিল না। পরে মনে হয়েছে তারা গুলি করেছে পরে ধুপ ধাপ করে চলে গেল। আমার সেন্স আসলে আমি বুঝতে পারছিলাম একটা গাড়ি আসছে। গাড়িতে দল করে সব তোলা হচ্ছে। সেখানে থেকে সামনেই জজ কোর্ট। পাশেই একটা বাগান ছিল। ওখানে একটা গর্তের মধ্যে সবাইকে গুম করে ফেলা হলো। আমি চিমটি কেটে দেখলাম আমিতো মারা যাইনি। ওঠার চেষ্টা করি। ১১ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় লেগেছিল আমার হাতের বাঁধন খুলতে। ঢং ঢং করে গির্জার ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল ভোর ৬ টা। তা শুনতে পেলাম। আস্তে আস্তে উঠলাম। লক্ষিবাজার ইত্তেফাকের মোর দিয়ে কখনো হেটেছি, কখনো রিকশায়, কখনো দৌড়েছি, কখনো গরুর গাড়ি। তারপর নদী পার হয়ে বাসে উঠলাম। চিনিসপুর, কাপাশিয়া, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর তারপর নেত্রকোনা হয়ে ইন্ডিয়া বর্ডারের কাছে গেলাম, একজন সহৃদয় পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার আমাদের দায়িত্ব নিয়ে যত্ন করে ছাড়পত্র দিলেন। তারপর ট্রেনে উঠে রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন, রাগদা ঐতিহাসিক জায়গা পার হয়ে আমরা কোলকাতা পৌঁছলাম।'[১১]

কাদেরী কিবরিয়া কণ্ঠযোদ্ধা

১৯৭১ এর মার্চ মাসের আগের কথা বলতে ২৫ মার্চের আগের কথাই বুঝিয়েছেন তিনি। তখন একটা গান বেশ প্রচারিত হতো। '২২ মার্চ আমরা গানটা রেকর্ড করেছিলাম। আমার একটা সলো গানও ছিল। গানটি রচনা করেছিলেন সাফায়েত আলী। সুরও তিনি করেছিলেন। গানটি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর তিনি আমাকে লিখে দিয়েছিলেন। গানটি আমি টেলিভিশনে সলো গেয়েছিলাম। গানটি ২৩,২৪,২৫ তিনরাত কন্টিনিউ এবং আরো একটি গান 'চিরদিন রবে এই জন্মভূমি হাসি গানে ভরা, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ...' -আরেকটি 'জয় জয় জয় বাংলা, জয় জয় জয় বাংলা' দুটি গান প্রচারিত হচ্ছিল। যার ফলে ক্রাক ডাউনের পর আমার মা-বাবা একটু ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবলেন আমাদের পরিবার টার্গেট হয়ে গেছি। মোহাম্মদপুরের ওদিকে শ্লোগান হতো, ২৫ মার্চের পর আর্মিরা ঘোরাঘুরি করত। সেই সময়ে আমার কারণে আমরা ঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারফিউ কিছু সময়ের জন্য উঠে গেলে আমরা বের হয়ে যাই। কিছুক্ষণ পরে দেখি কিছু লোকজন আমাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাবা ভয় পেয়ে আমাকে গ্রামে চলে যেতে বলেন। আমি আরিচা ক্রস করে আমিনবাগ পৌঁছে ধরা পড়ে গেলাম আর্মির হাতে। আর্মিরা রাইফেলের বাট দিয়ে খুব পেটালো। পেটানোর পর লাইনে দাঁড় করাল। আমাদের সামনেই লাইনে দাঁড় করিয়ে অনেক লোকজনকে গুলি করছিল। ইয়াং দাড়িওয়ালা একজন লোক এসে আমাকে দেখিয়ে বলল ইসকা মাত মারো, ইসকা মাত মারো। তাকে আমার চেনা চেনা লাগছিল। হঠাৎ মনে হলো এই আর্মি অফিসারকে আমি আমার মামার বাসায় দেখেছি এবং সে আমার গান শুনেছে। তখন আমি গজলও গাইতাম। সে আমাকে হঠাৎ দূরে সরায়ে নিল। আর আমাকে বলল 'আগার তুমকো পচেগো, তুম কিয়া করতা, তু বলা ফিল্ম

---

১১. তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১৩০

মে গানা গ্যাতি হো----।' এরপর সে তার একজন অফিসারকে নিয়ে এলো। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমি কি করি। আমি উত্তর দিয়েছিলাম ছবিতে কাজ করি আর গান করি। কি গান করি একটা গান গাইতে বললে আমি গাইলাম। এভাবে ওখান থেকে ছাড়া পাই। অনেক কষ্টের পথ পাড়ি দিয়ে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে পৌঁছাই।'[১২]

শিলা ভদ্র বলেন, '২৭ তারিখ অনেক ঝড় ঝাপটা অতিক্রম করে কোলকাতা পৌঁছাই। মেজো বোন শিপ্রা ভদ্র, ছোটবোন শুক্লা যমুনা নদী পার হয়ে আগরতলা হয়ে ১ দিন পর কোলকাতা পৌঁছাই। তিনবোন সহযোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছি।'[১৩]

অনেক শিল্পী অবরুদ্ধ বাংলায় ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে থেকেই প্রতিমুহূর্ত মৃত্যুর আশংকা নিয়েও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছিলেন। অবরুদ্ধ বাংলার প্রতিটি পদে পদে তখন মৃত্যুঝুঁকি। তার মধ্যেই পরিবার পরিজন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কাজ করে গেছেন ওস্তাদ মমতাজ আলী খান।

গায়ক ও সুরস্রষ্টা মমতাজ আলী খান করাচি থেকে মুক্তিযুদ্ধকালে ফিরে আসেন নিজ দেশে, নিরাপদ নিশ্চিত চাকুরীস্থল ছেড়ে দেশ মাতৃকার জন্য যুদ্ধে নেমে পড়েন সঙ্গীতের অস্ত্র নিয়ে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিজ গ্রাম এবং তার আশেপাশে ইরতা, কাশিমপুর, পেটকাটা তালেবপুর, গোলড়া গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের গান গেয়ে মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি নিজ গ্রামে এসে লিখেছিলেন গান—

১. ও আমার মায়ের রাখাল ছেলে বাঁশি দিলো টান, শোন ভাই হিন্দু মুসলমান।

২. বাংলাদেশের মাটি ওগো তুমি আমার জন্মস্মৃতি,
আহা তোমার কোলে জন্ম লইয়া ধন্য হলো মোর বসতি।

শিল্পী কণ্ঠে গান দুটো শুনে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্য থেকে অনুরোধ আসে যে, গ্রামের স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য গ্রামে যেয়ে যদি দেশাত্মবোধক গান শোনান তবে তরুণদের মাঝে দেশপ্রেম আর স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগবে, তারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। শিল্পী তাদের আশ্বস্ত করেন যে, তরুণদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে, স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে তিনি প্রয়োজনে প্রাণ দিতেও রাজী। তিনি তার জীবনের স্বরণীয় কাহিনি ভাষা আন্দোলনে তাঁর অংশগ্রহণ আর মানিকগঞ্জের মানিক, পারিল গ্রামের রফিকের আত্মদানের গর্বিত ইতিহাসের কথা সবাইকে শুনিয়ে উপস্থিত তরুণদের মাঝে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিলেন। একই সাথে তিনি সকলকে সাবধানও হতে বলেছিলেন যে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসর শান্তিবাহিনীর হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে, যারা বাঙালির পিছু লেগে আছে, যেকোন মূল্যে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে নস্যাত করতে। এভাবে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে নিজের লিখা গান এবং অন্যান্য আরো উজ্জীবনী, জাগরনী গান গেয়ে গ্রামের তরুণ ছেলেদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ

১২. তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-৪১
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

করতে অনুপ্রাণীত করেছেন। ওস্তাদ মমতাজ আলী খান তার কিশোরী মেয়েদের সাথে নিয়ে গ্রামে গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের গান গেয়ে সকলকে অনুপ্রাণীত করেছেন।[১৪]

শিল্পী রামকানাই দাশ বলেন, 'শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর বন্ধু বান্ধবের আড্ডায় শুনেছিলাম যে নিরাপদ পশ্চাদপসারণও একটা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ কৌশল।'[১৫]

রামকানাই দাশ সিলেটের নিবেতিদপ্রাণ সঙ্গীত শিল্পী। মুক্তিযুদ্ধ কালে নিজের যতটুকু সামর্থ্য ছিল তাই দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কঠিন সেই দিনগুলিতে নিজেকে সমর্পন করেছিলেন। উনসত্তরের গণআন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে গণহত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। যুদ্ধপূর্ব গণআন্দোলনের সোচ্চার কণ্ঠ অসহযোগকালীন পাকিস্তান রেডিওতে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাকে ধরে নিতে আসলে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন এপ্রিলের ৪ তারিখে। দেখতে পান দেশত্যাগী শত শত কাফেলা।[১৬]

একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অনিরাপদ জনগোষ্ঠীর পাশে সাহয্যের হাত বাড়ানোটাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সামিল। রাম কানাই দাস তার যুদ্ধটা শুরু করেছিলেন তেমনি এক পরিস্থিতি দিয়ে। তাঁর ভাষায় "গ্রাম ছেড়ে ভারতে শরণার্থী শিবিরে রওয়ানা হবার সময় অন্তত আমি তা বেশ অনুভব করেছিলাম। সে ঘটনায় একটা বিস্ফোরনোত্তর আবহের সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে ত্বড়িতগতিতে একটা বড় ভাওয়াল নৌকা যোগাড় করে নারী পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ সবাইকে গাদাগাদি করে নৌকায় উঠিয়ে সকাল দশটার মধ্যে নিরাপদে নৌকা ভাসাতে পারাটা আমাকে বাস্তবিক একটা যুদ্ধ জয়ের পরিতৃপ্তিই দিয়েছিল।"[১৭] পুরা মুক্তিযুদ্ধকালেই সহযোগীতার এমন হাজারো মানবীয় আবেগ জাগানোর ঘটনা বাঙালিকে সিক্ত করেছিল বলেই সেই সময়ে বাঙালি হয়েছিল শুদ্ধ মানুষ। নয়তো মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে স্বাধীন হবার ইতিহাস পৃথিবীতে কমই আছে। রাম কানাই দাশ বলেন, "কয়েকটা মাত্র মাস। মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় থাকে, থাকে জাতির জীবনেও। ১৩০২ বঙ্গাব্দের প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের কথা শুনেছি, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা শুনেছি, উনসত্তরের বিধ্বংসী সাইক্লোনতো আমাদের সময়েই। ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি ও সাতচল্লিশের স্বাধীনতা নিজের চোখে দেখা। কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয় পরাজয় আর হত্যাযজ্ঞের কথা ইতিহাসে লেখা আছে। ব্যাপ্তী আর গভীরতার বহুমাত্রিক বিচারে কোনো সংকট দুর্যোগ আর ঐতিহাসিক ঘটনাই বাঙালি জীবনে একাত্তরের তুল্য নয় বলে আমার বিশ্বাস।"[১৮]

শিল্পী রামকানাই দাশের অতৃপ্ত হৃদয়ের গ্লানীর কিছুটা লাঘব করতে চেয়েছেন লিখার মধ্যে দিয়ে। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে না পাড়ার কষ্টকে তিনি ভুলেছেন আরেক যুদ্ধ করে। তিনি লিখেছেন 'দুটো কারণে আমার সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমতঃ ছোট ভাই গৌরাঙ্গের

---

১৪. ওস্তাদ মমতাজ আলী খান ও তার লোকসঙ্গীত, মোহাম্মদ সফিউদ্দীন, এম এস প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ২৯-৩২
১৫. সঙ্গীত ও আমার জীবন, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ১০১
১৬. রামকানাই দাশ, সঙ্গীত ও আমার জীবন, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ৯৮
১৭. রাম কানাই দাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
১৮. রাম কানাই দাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

মাস দুয়েক আগে মুক্তিযুদ্ধে চলে যাওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ মা-স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ বৃহৎ যৌথ পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারার মতো পরিবারের আর কেউ না থাকা।' যেমন ভাবনা তেমনভাবেই নেমে পরলেন তিনি পরিবার পরিজন সাথে নিয়ে শরণার্থী শিবির এর অসহায়, ছিন্নমূল বিপন্ন মানুষের আত্মবিশ্বাস, সাহস আর উদ্দীপনা জাগানোর কাজে। তার কাছে সে কাজ ছিল আরেকটি যুদ্ধের সমতুল্য।'[১৯]

বাড়ি ঘর ছেড়ে যাওয়া বাঙালি যাদের জীবনের ঝুঁকি ছিল অনেক বেশি তারা নিরাপত্তার কারণে সীমান্ত পাড়ি দেয়। শেকড়ছিন্ন মানুষগুলো আবার কবে ফিরে আসতে পারবে নিজ ভূমিতে কেউ তারা জানতো না। অনেকেই আত্মগোপন থেকে পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। তাদের কি করা উচিত কিছুই তারা বুঝে উঠতে পারে নাই। পালাতে চেয়েও অনেকে পালাতে পারে নাই। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী। বেশিদিন পালিয়ে থাকাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সরকারের পক্ষ থেকে বার বার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা যেন কাজে যোগদান করে। তাদের কোনো ভয় নাই। আস্তে আস্তে অনেকেই কাজে যোগ দেয়ার জন্য নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে আসে। পাকিস্তানের সরকার ১৯৭১ সালের গণহত্যার তাণ্ডবের মাঝেও অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা স্বাভাবিক দেখানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়। বড় বড় শিল্পীদের যারা সরকারি কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাদের অনেকেই জীবনের প্রয়োজনে, জীবীকা রক্ষার তাগিদে সরকারের নির্দেশ মেনে কাজ করেছেন কিন্তু তাদের পরিপূর্ণ মানসিক সমর্থন ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। প্রতিদিন তাদের অভিনয় করে বাঁচতে হয়েছিল। কিন্তু প্রতিমূহুর্ত তারা ছিল পাকিস্তান সরকার আর প্রশাসনের বিরুদ্ধে। প্রতিটা মুহূর্ত অবরুদ্ধ বাংলাদেশের প্রতিটা বাঙালিকে মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যে পার করতে হয়েছে। কতটা বিভৎস, কতটা পাশবিক আতংকে বাঙালি বেঁচেছিল তা শুধু অবরুদ্ধ বাংলাদেশের বাঙালিই অনুভব করেছে। সাজেদুর রহমান খান সংক্ষেপে এস আর খান এক সাক্ষাৎকারের বলেন, “আমি শরীফ ইমামের সঙ্গে কোলকাতার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েছি। একাত্তরের যুদ্ধের সময় আমি ও শরীফ বেশি করে জড়িয়ে পড়লাম। আমার ভাগ্নে মেজর খালেদ মোশাররফ (মনি) ওপারে গিয়ে K-force তৈরি করে। ... এই বাহিনীতে রুমী যোগ দেয় এবং ১ নাম্বার গেরিলা বলে গণ্য হয়। আমি ও শরীফ ব্রীজের নকশা করে মুক্তিযোদ্ধাদের মারফত মেজর খালেদ মোশাররফের কাছে পাঠাতাম। মুক্তিযুদ্ধে শরীফ ও রুমী বেশি সক্রিয় ছিল।”[২০]

শাহরিয়ার কবিরের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে শিল্পী, গীতিকার, সুরকার, ক্রীপ্ট লেখকরা মুক্তিযুদ্ধের সময়োপযোগী করে স্ত্রীপ্ট লিখে পাঠাতেন, তা সীমান্তের ওপারে প্রচার হতো। লেখক সৈয়দ সামসুল হক এর লেখা স্ক্রীপ্ট বিচিত্রার শাহাদাত চৌধুরী

---

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

২০. তাহমিদা সাঈদা, জাহানারা ইমাম, বাঙালি সমগ্র প্রকাশনা, ২০০৪, পৃ. ৮৫

অত্যন্ত গোপনে তা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। তাদের সকলের প্রচেষ্টাতেই মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যা নয় মাসের যুদ্ধে স্বাধীন হয়েছে। যে যুদ্ধ কোনো অভিধান মেনে হয় নাই। নিরস্ত্র, চাষা, ভুষা, কামার, জেলে, অশিক্ষিত নারী-পুরুষ, নৌকার মাঝি সবাই দুর্বার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বলেই বাংলাদেশ আনতে পেরেছিল স্বাধীনতা। অবরুদ্ধ দেশে অবস্থানরত শিল্পী আজাদ রহমান তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন সাক্ষাৎকারে যা পরিশিষ্ট ১-এ দেয়া আছে।

অনেক শিল্পী স্বাধীন বাংলা বেতারের অগ্নিঝরা প্রচারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য পরিবার পরিজনের চোখ ফাঁকি দিয়ে নিরবে পালিয়েছিল। অভিভাবকের অনুমতি পাবে না যেনে পালানো ছাড়া তাদের কোনো উপায় ছিল না।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে বাঙালি অনেক গোপনীয়তার মাঝে শুনতো স্বাধীন বাংলা বেতার। বেতার প্রচারিত অনুষ্ঠানের জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো। সেখানকার দিক নির্দেশনাতেই তারা পরিচালিত হতো। কেননা যুদ্ধের সার্বিক তথ্য পাওয়ার দ্বিতীয় আর কোনো মাধ্যম ছিল না। স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান, খবরাখবর আর গান ছিল অবরুদ্ধ বাঙালির একমাত্র সান্তনা আর ভরসার স্থান। নিজ বাসভূমিতে বন্দী বাঙালি জানতো না কবে তাদের মুক্তি আসবে। বাঙালির প্রাণশক্তি ফিরে আসতো যখন স্বাধীন বাংলা বেতারের উদ্দীপনা জাগানো কণ্ঠ তারা শুনতে পেতো। তাদের আশার বাণী ও সুর শোনার প্রতিক্ষায় থাকতো প্রতিটি বাঙালি। কিন্তু এই বাংলায় তখন স্বাধীন বাংলা বেতার ছিল এক নিষিদ্ধ নাম। কোনোভাবেই পাকবাহিনীর কাছে নামটি সহনীয় ছিল না। মুক্তিযোদ্ধা **কণ্ঠশিল্পী অরূপ রতন চৌধুরী বলেন** 'প্রতিটি মানুষ যারা রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বালিশের নিচে স্বাধীন বাংলা এই বেতার যন্ত্রটি রেখে শুনতো। ভয়ে থাকতো যদি কেউ শুনে ফেলে। ভয় ছিল পাকিস্তানি আল বদররা শুনলে এসে ধরে ফেলত। এজন্য ভয়ে ভয়ে মানুষ শুনতো। সেটাই ছিল তাদের সবচেয়ে প্রেরনাদানকারী, উৎসাহ দানকারী এবং সাহস জোগানকারী একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, সেটা আমি যখন শুনলাম, আমাদেরই বন্ধু শিল্পীরা সেখানে চলে গেছে এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়মিত অনুষ্ঠান করছে। ১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম দিন। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে একটা ব্যাগে কিছু কাপড় চোপড় নিয়ে বাবা মাকে না বলে মশারি টাঙ্গানো রেখেই আমি বেরিয়ে গেলাম। বাবা মা জানলে কান্না করবেন তাদের কান্না সহ্য করতে পারবো না, বাসায় একটা হুলস্থুল পড়ে যাবে ভেবে নাটকীয় ভাবেই চলে গেলাম। কিন্তু যাব কিভাবে কোনো বন্ধু নাই, গাইড নাই। তখন তুমুল যুদ্ধ, রাজাকাররা বুদ্ধিজীবীদের ধরছে। আর আমরা হিন্দু ছিলাম বলে আমাদের উপর ক্ষোভ ছিল বেশি। বিআরটিসি বাসে দাউদকান্দি। সেখানে মিলিটারির হাতে পরে ভাবি নাই আর বাঁচতে পারবো। ওদেরকে বললাম আমার বাড়ি এখানে, আমি আমার বাবা মার কাছে যাচ্ছি। ওরা আমাকে ছেড়ে দিল, সৃষ্টিকর্তা আমাকে রক্ষা করলেন। দাউদকান্দি থেকে কুমিল্লার এক গ্রাম আড়িখোলা। সেখানে আমার একজন বন্ধু পেয়ে গেলাম। সে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিল। যাদের সহযোগীতা সেখানে পেয়েছিলাম তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা

একজন মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বর্ডার পার করে দিলেন এক লোক। আমি আগরতলায় পৌঁছে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, আমি সত্যি সত্যি পৌঁছে গেছি। সেখানে থেকে আমার সব তথ্য পরিচয় নিয়ে আমাকে এক বিখ্যাত জায়গায় নিয়ে গেল। যেখানে আগরতলা সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটা শেল্টার দিয়েছিল। সেখানে আমাদের তৎকালীন নেতাদের সাথে দেখা হয়ে গেল। মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ক্যাম্প ছিল সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং এরপর সারাদিন যুদ্ধ করার জন্য চলে যায়। সন্ধায় তারা ফিরে আসলে একটা সাংস্কৃতিক দল আছে যারা গান করে মুক্তিযোদ্ধাদের মেন্টাল রিক্রিয়েশনের জন্যে। আমাকে সেখানে যোগ দিতে বলা হয়। সেখানে পেলাম সরকার আলাউদ্দিনকে, যিনি বিখ্যাত পল্লীগীতি শিল্পী। কিন্তু আমাদের লক্ষ ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমি নেতাদের বললাম তারা সরকার আলাউদ্দীনসহ আমাকে স্বাধীন বাংলা বেতারে পৌঁছে দিল।[২১]

তপন মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন তিনি ঢাকায় ছিলেন। ৮ এপ্রিল বরিশাল দেশের বাড়ি চলে যান। লুকিয়ে ছিলেন তিন মাস। ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরে সীমান্তের ঐ পারে চলে যান। তিনি বলেন, '... আমি যে ক'মাস বাংলাদেশে ছিলাম, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আশ্বাস দিয়ে। আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে। আপেল ভাইয়ের কণ্ঠে মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যখন শুনেছি, অনেক কেঁদেছি।'[২২]

যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী সুবল দত্ত গণহত্যার পরের সময় কালের কথা বলেছেন নিজের ভাষায়। ওই সময়টা এতই কঠিন ছিল এখনো স্মৃতিচারণ করতে গেলে চোখে জল আসে। এ সময় গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি জীবন বাঁচানোর জন্য। বাবা, ভাই, স্ত্রী ছিলেন। ওই অবস্থায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান শুনেছি। শুনে উদ্বুদ্ধ হলাম। মনে করেছি আমারতো একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে সেখানে কাজ করার। ওখানে আমাদের যাওয়া দরকার। পথের লম্বা কাহিনি কিভাবে কঠিন পথ অতিক্রম করে গেলাম স্বল্প সময়ে বলা যাবে না।[২৩]

শিল্পীদের অনেকেই গান গেয়ে যুদ্ধ করার জন্য বাবা-মায়ের সাথে অথবা কেউ কেউ বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে গেছেন। আবার অনেকে যুদ্ধ করার জন্য গেলেও তারা গানের অস্ত্র নিয়ে হয়েছিলেন কণ্ঠযোদ্ধা। অনেক শিল্পী বয়সের কারণে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি না পেয়ে গানে গানে যুদ্ধ করেছেন। সকলেই দেশকে মুক্ত করার জন্য সবকিছু তুচ্ছ করে লড়েছেন পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে। শিল্পী রফিকুল আলম, তিমির নন্দী প্রমুখদের সাক্ষাৎকার থেকে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়।

---

২১. তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১২
২২. তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫৩
২৩. তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

সুরস্রষ্টা অনুপ ভট্টাচার্য

গণআন্দোলনে যেখানে সুযোগ পেয়েছিলাম গান করেছি। ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠীর সাথে আমার সখ্য গড়ে ওঠে। গণসঙ্গীত গাইতাম, জাগরনী গান গাইতাম। তারপরতো '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। আমি রাজনৈতিক কোনো শ্লোগান মুক্তিযুদ্ধে যাইনি। দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায় আমি গেছি। আমি যেটা ফিল করি গ্রামে যদি ডাকাতি হয় যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ওই ডাকাতের পিছু ধাওয়া করে। আমার দেশেও ডাকাত পড়েছে তখন অবশ্যই আমাকে ড্রাইভ করতে হবে।[২৪]

মে-জুনের দিকে সুরকার **ফজল এ খোদা** জানতে পারলেন, তার নামে পুলিশি হুলিয়া জারি হয়েছে। তাতে করে তার জন্য গ্রামের বাড়িতে থাকাও নিরাপদ নয়। তাঁর লিখা 'সালাম সালাম' গানটি আবদুল জব্বার গাওয়ার জন্য তাঁকে ধরিয়ে দিতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য তাকে ১৪ বছরের জেল দেওয়া হয়। ঐ যুদ্ধ শেষে জব্বার ফিরে এলে বঙ্গবন্ধু তাকে সালাম সালাম গানের সুর করা আর গাওয়ার জন্য স্বর্ণপদক দেয়ার কথা ঘোষণা করেন।[২৫]

গণহত্যার চিত্র কতটা বিভৎস হতে পারে তা দেখেছে শিল্পীরা অবরুদ্ধ ঢাকায়। শিল্পীদের মুক্তিযুদ্ধ প্রস্তুতিটা যে ২৫ মার্চের অনেক পূর্বেই শুরু হয়েছিল তা উল্লেখ করেছেন শিল্পীরা। সাধারণ মানুষ সেভাবে বুঝতে না পারলেও শিল্পীদের সচেতনতায় তারা তা বুঝেছিলেন পূর্ব বাংলার সামগ্রিক পরিবেশ থেকেই।

ফকির আলমগীর বলেন, 'মার্চ এপ্রিল মে তখন আমরা প্রথম পর্যায়ে শরণার্থীদের সাহায্য করলাম। বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করা, তখনতো আর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় নাই। মুক্তিযোদ্ধারাও তখন দেশে ফেরেনি। আমরা স্থানীয়ভাবে যা করার তাই করলাম। রাজাকার, আল-বদররা মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে।তখন তরুণ প্রজন্ম আমরা একত্রিত হয়ে কিছু একনলা বন্দুক, এটা সেটা, বোম বানিয়ে তৈরি থাকলাম যাতে রাজাকাররা একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে তার জন্য প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তারপর জুন মাসে তখন ছিল বর্ষাকাল। নৌকায় করে অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে কাকরগাছি পৌঁছাই। সেখানকার পরিচিতজন যাদের পেয়েছিলাম, ফল বিক্রেতাসহ আরো অনেকে, তারা আমাদের সাহায্য করেছেন। আজ তারা বেঁচে নেই। সেদিন তারা সাহায্য সহযোগীতা না করলে আমরা স্বাধীনতা পেতাম না। তাদের স্মরণ করি শ্রদ্ধাভরে। তার কিছুদিন পর আমরা কল্যাণী ক্যাম্পে গেলাম। সেখান থেকে স্বাধীন বাংলা বেতারে চলে যাই।'[২৬]

---

২৪. তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫২
২৫. ফজল এ খোদা, সঙ্গীত ভাবনা, বাংলা একাডেমি, ২০১৩, পৃ ১২৬
২৬. তারেক মাহমুদ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬

অবরুদ্ধ দেশে স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ ছিল না। আবেগকে চাপা দিয়ে কাটিয়েছে নয়টি মাস বাঙালি জাহান্নামের বিভীষিকায়। বাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়েই পাকিস্তানি বাহিনী চালিয়েছিল ধ্বংসযজ্ঞ। বাঙালির জীবন অবরুদ্ধ বাংলাদেশে বেঁচেছিল হায়ানা পাক বাহিনীর দয়ার উপর। কদাচিৎ সুযোগ মিলতো স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার। গানও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সূত্রে নিজেদের কিছুটা উজ্জীবিত করার সুযোগ পেতো বাঙালি। আর এভাবেই প্রাণীত হয়ে দলে দলে বাঙালি ট্রেনিং নেয়ার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে। প্রশিক্ষন নিয়ে কেউ যোদ্ধা হয়েছে, কেউ অন্যান্য উপায়ে মুক্তিযুদ্ধে সহয়োগিতা করেছে। যাদের কোনোভাবেই যাওয়া সম্ভব হয় নাই, তারা অবরুদ্ধ দেশে থেকে গোপন তৎপরতায় সাহায্য করে গেছে মুক্তিযুদ্ধকে।

আলতাফ মাহমুদের কাছে ফেরিওয়ালাদের আনাগোনা বেড়ে যায়। ভিক্ষুক, রিকশাওয়ালা, সংবাদপত্রের হকার প্রভৃতি সেজে মুক্তিযোদ্ধারা আসতেন আলতাফ মাহমুদের কাছে। তাঁর কাছ থেকে খবর নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা গোপনে পৌঁছে দিত সীমান্তের ওপারে মেলাঘরে। আর ঐ পাড়ের খবর পৌঁছে দিত আলতাফ মাহমুদের কাছে। ওপার থেকে আসতো প্রচুর গোলাবারুদ। আলতাফ মাহমুদের বাড়িটি এক সময় দূর্গবাড়িতে পরিণত হয়েছিল। এ সকল গোলাবারুদ দিয়ে ক্র্যাক প্লাটুনের গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা শহরে একের পর এক সফল অপারেশন পরিচালনা করেছিল, যা দ্রুত বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, আকাশবাণী, রাশিয়া, চীন, জার্মান, জাপান সর্বত্র প্রচার হয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিভৎসতাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিল।[২৭]

অবরুদ্ধ দেশে নিরন্তর মৃত্যুকে সঙ্গী করে আলতাফ মাহমুদ কাজ করেছেন দেশের স্বার্থে। ভেবেছেন সার্বক্ষনিক দেশের কথা। স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে ঢাকা বেতার থেকে নিয়ে যাওয়া সীমিত সংখ্যক গান বেজে বেজে পুরনো হয়ে যাওয়ায় নতুন গানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আলতাফ মাহমুদ কঠিন ঝুঁকি নিয়ে নতুন গান রেকর্ড করিয়েছেন। সেই রেকর্ডকৃত গান কোলকাতয় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আলতাফ মাহমুদের স্ত্রী ও স্ত্রীর বড় ভাই বলেছেন, ‘বাড়িতে কে কখন আসে। কেন আসে আমি প্রায় জানতামই না, বুঝতাম কিছু একটা হচ্ছে তবে ঠিক কি ব্যাপার তার আন্দাজ পেতাম না,পেতে চাইতাম না, কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতাম। হাফিজ সাহেব এসে (যন্ত্র শিল্পী হাফিজুর রহমান) হর্ন দিলে উনি যে কোনো অবস্থাই থাকুন না কেন দৌড়ে বেরিয়ে আসতেন। গেটের পাশে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দুজন কথা বলতেন। হাফিজ সাহেব বড় একটা ভেতরে আসতেন না।’ ফখরুল বললেন, ‘তখন স্বাধীন বাংলা বেতার ভালোভাবে চলছে। রোজ প্রায় একই গান বাজতো। আলতাফ ভাই এ কারণেও নতুন গানের প্রয়োজন অনুভব করতেন।’ সারা বলেন, ‘কেই জানে না, লতিফ সাহেব আমাদের বাড়ি বসেই গান লিখতেন, বলতেন সুর দেওয়া হলেই ছিড়ে ফেলবে।’ আলতাফ সাহেবও কিছু গান লিখেছেন, ঐ সময়টা যেন আচ্ছন্নের মতো কাটিয়েছেন। দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে একা বসে সুর দিতেন। ঘরে কেউ থাকতে পারতো না, হয়তো খুব কষ্ট পেয়েছেন। গলা খুলে গাইতে পারতেন না বলে। আর বাড়িতে যারা থাকে, নিয়মিত যারা আসে, তাদেরও জানতে

২৭. দিনু বিল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

দিতে চান না। এইভাবে তিনি সুর করেছেন, লতিফ সাহেবের লেখা, নিজের লেখা সব কটা গানেই আলতাফ সাহেব সুর দিয়েছিলেন, লেখা ও সুর দেওয়ার সাথে সাথেই ছিড়ে ফেলা সেই গানের রেকর্ড বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্রে আছে।' সারা মাহমুদ আরো বলেন 'গানগুলো টেপ করতে পেরেছিলেন। মিউজিক্যাল হ্যান্ডস জোগাড় করতেন হাফিজ ভাই আর রাজা হোসেন খান। আলতাফ সাহেব নিজের গাড়িতে ঘুরে ঘুরে গাইয়েদের যোগাড় করতেন। শিল্পী কারা ছিলেন ঠিক জানিনা, বেঙ্গল স্টুডিও আর ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন স্টুডিওর কোনো একটায় রিহার্সাল- আর রের্কডিং হতো একদিনে একসঙ্গে। রেকর্ড করে সকলকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে রাত তিনটা নাগাদ বাড়ি ফিরেছেন। এপ্রিল মাস থেকে প্রায়ই তাঁর ফিরতে অনেক রাত হতো। আলতাফ মাহমুদ দুবার রেকর্ড করান। প্রথম দিকে তাঁর ১২ খানা গানের একটি স্পুল নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করার সময় একজন অবাঙালি ক্যুরিয়ের ধরা পড়েন। তাঁর মৃত্যু হয়। সেই স্পুলটি আর পাওয়া যায়নি। জুলাইয়ের শেষের দিকে আবার অনেকগুলো গান রেকর্ড করে দুটো বড় স্পুলে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য পাঠান। বহু দেরীতে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সেটা কোলকাতায় পৌঁছে। সারা মাহমুদ বলেন, এপ্রিলের শেষের দিকে তার গানের ব্যাপার শুরু হয়, জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত ঐ কাজে ছিলেন।'[২৮]

সঙ্গীত বাঙালির মননশীল আত্মার শুদ্ধতম আবেগ থেকে উৎসারিত শব্দমালা, মুক্তিযুদ্ধে যা শিখর স্পর্শ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধে অবরুদ্ধ দেশে থেকে শিল্পী আবদুল লতিফ, সুরকার রাজা হোসেন খান আর যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী হাফিজুর রহমান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গান লিখেছেন সুর দিয়েছেন। যুদ্ধ বিভিষীকার মধ্যেও তারা শিল্পী সংগ্রহ করেছেন। গান রেকর্ড করেছেন। ঐপারে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রয়োজন মিটিয়েছেন। আর যেই শিল্পীরা একদিনের রিহার্সেলে গান রেকর্ড করার মতো যোগ্য ছিলেন তাদের নামও জানার সুযোগ হয় নাই কারো। এ ব্যাপারে কারো পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগও নেয়া হয় নাই। সেই শিল্পীরা মুক্তিযোদ্ধা কণ্ঠ সৈনিক হিসেবে স্বীকৃতি ও সম্মান পাবার যোগ্য। আর যেই অবাঙালি রেকর্ডকৃত স্পুল পৌঁছে দিতে গিয়ে ধরা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিও মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে তার সাহসী ভূমিকা যে কোনো মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে কোনো অংশেই কম না। মুক্তিযুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিই অংশগ্রহণ করেছে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে, হাতে গোনা ২/৪ জন রাজাকার আলবদর ছাড়া। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বাঙলা দেশের চরম ক্ষতি হয়েছিল এবং রক্তক্ষয়ও বেশি হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের লক্ষ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে সেই ষড়যন্ত্রকারী পাকিস্তানের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলসামসরা ঘৃনার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকবে। রুমু খান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একজন যন্ত্র সৈনিক। তিনি বলেন, যারা ডাইরেক্ট অ্যাকশনে মানে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলায় যারা কাজ করেছিলেন, যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারেননি কিন্তু সহযোগীতা করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাকে খাবার দিয়ে

২৮. আলতাফ মাহমুদ, হেদায়েত হোসেন মোর্শেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

সহযোগীতা করেছেন। কাজেই মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু অংশগ্রহণকারী অনেক, নানাভাবে। খুব অল্প সংখ্যক লোক কিন্তু এর বিরোধীতা করেছে।[২৯]

এভাবে প্রতিটি বাঙালিই হয়ে উঠেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। যাদের ওপর ভর করে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশন পরিচালনা করতেন। তাদের গোপন তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী অপারেশনের প্রস্তুতি নিতেন গেরিলা যোদ্ধারা। দেশে থেকে, পাকিস্তানি শত্রুর নাগালের মধ্যে রেকী করে, তথ্য, চিরকুট আদান প্রদান, ম্যাপ সংগ্রহ করা, কতটা ঝুঁকিতে তারা মুক্তিযুদ্ধে সহযোগীতা করেছেন, তা ভাবলেও ভয়ংকর আতংক ছড়িয়ে যায় সমস্ত শরীরে। সেই ভয়ংকর বিনষ্টের সময়েও বাঙালি মাটি কামড়ে পরে ছিল মাটির সত্ত্ব ধরে রাখতে।

শিল্পী আলতাফ মাহমুদ জুলাই মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের অভ্যন্তরে সাহসী তৎপরতায় আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রায় দিন আগত দেশে থেকেও কাজ করা যায়, যার যা সামর্থ প্রত্যেককে সেই কাজ করতে হবে। সাংবাদিক বন্ধুকে বলেছিলেন, প্রয়োজনে সাংবাদিককেও ষ্টেনগান হাতে নিতে হয়। ময়দানে না গিয়েও কাজ করা যায়, কেউ কলমকে ষ্টেনগান বানায়, কেউ তার ইনটেলিজেন্স আর টেনাসিটিকে বানায় ষ্টেনগান। নিজের ধরা পড়ার ব্যাপারে তিনি শংকিত ছিলেন। এ সময় থেকেই বিভিন্ন গেরিলা ইউনিটের সাথে আলতাফ মাহমুদের সরাসরি যোগাযোগ হয়। বাসায় আসতো অনেকে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু অপারেশনের আলোচনা তাঁর বাসাতেই হয়েছে। গেরিলা যোদ্ধাদের রেকি করার কাজেও তিনি সাহায্য করেছেন। জুলাই এর শেষদিকে কিংবা আগষ্ঠের প্রথম দিকে তিনি ক্র্যাক প্লাটুনের সাথে পুরাপুরি সম্পৃক্ত হয়ে যান। এই সময় তাঁর মা ঢাকায় এসে ছেলেকে অনেক পিড়াপিড়ি করেন ভারতে চলে যাবার জন্যে। স্বাধীন বাংলা বেতারের গান রেকর্ড হয়ে যাওয়ার পর তিনি একবার স্থির করেছিলেন মা ও স্ত্রীকে বরিশালে রেখে তিনি পশ্চিম বাংলায় চলে যাবেন। অজ্ঞাত কারণে তিনি তার সিদ্ধান্ত পাল্টান। আবার আগস্টের শেষ সপ্তাহে সিদ্ধান্ত নেন সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তিনি চলে যাবেন পশ্চিম বাংলায়। কিন্তু তিনি আর যেতে পারেননি। তার আগেই বন্দী হয়ে যান হানাদারদের হাতে। এর কিছু দিন আগে ক্র্যাক প্লাটুনের দু'জন গেরিলা অস্ত্র বোঝাই দুটি ট্র্যাক আলতাফ মাহমুদের বাড়ি রেখে যায়। কাঁঠাল গাছের গোরায় মাটি চাপা দিয়ে ট্র্যাক দুটি রাখা হয়। ক্র্যাক প্লাটুনের একজন গেরিলা ধরা পরে যায়, পাক সেনাদের হাতে, মার খেয়ে সবকিছু পাঞ্জাবি পুলিশকে বলে দেয়।

দিনু বিল্লাহর লেখা থেকে জানা যায় যে, ক্রাক প্লাটুনের সামাদকে সাথে নিয়ে পাকবাহিনী আলতাফ মাহমুদকে সনাক্ত করে অস্ত্রসহ তাঁকে আটক করে। শত জেরাতেও আলতাফ মাহমুদ কোনো তথ্য দেন নাই। যখন সন্তানসহ পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলার হুমকি দেয় তখন সবার জীবন রক্ষায় পাকবাহিনীর কাছে অস্ত্রের সন্ধান দেন।[৩০]

---

২৯. তারেক মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা বেতার কন্দ্রে, আগামী প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ১২০-২

৩০. দিনু বিল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

৩০ আগস্ট সকালবেলা আলতাফ মাহমুদকে পরিবার পরিজনের সামনে থেকে ধরে নিয়ে মাটি খুরিয়ে অস্ত্র বোঝাই ট্র্যাক বের করে আনে। লাথি, ঘুসি মেরে এরা আলতাফ মাহমুদকে টেনে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। সাথে আরো নিয়ে যায় তার দুই শ্যালক, দুজন ভাগ্নেকে। শিল্পী আবুল বারক আলভীসহ তার বাসার উপর তলার আরো তিনজনকে। সেদিন বিকেলে এবং দুদিন পরে বাকি সবাইকে ছেড়ে দিলেও আলতাফ মাহমুদকে ছাড়ে নাই। দুই দিন পর্যন্ত যারা আলতাফ মাহমুদের সাথে ছিলেন তাদের ভাষ্য তার স্ত্রী ব্যক্ত করেছেন, "ওই দুই দিন ওরা রমনা থানায় আলতাফ সাহেবের সঙ্গে ছিল। তাঁকে দিনের বেলা এমপিএ হোস্টেলে নিয়ে টর্চার করতো।রাতে রমনা থানায় রাখতো। সবাইকে ভীষণ অত্যাচার করেছে। মাথা নীচু করে পা উপরে ঝুলিয়ে দিত। তারপর ধাক্কা। ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দোল খেতে খেতে শরীরটা যেই কাছে আসে অমনি পিটুনি। মুক্তিফৌজদের নাম বাতাও বলতে না পারলেই মার। আলভী ছবি আঁকে তার হাতের নখ তুলে নিয়েছে। ভাই ভাগ্নেদের একজন অনেকদিন কানে শুনতো না -- ভীষণ অত্যাচার করেছে। একটা বাথরুমে ১৬ জনের থাকার ব্যবস্থা। আলতাফ মাহমুদের ওপর অত্যাচারের মাত্রাটা ছিল বেশি।"[৩১]

নাখালপাড়ার বন্দী জীবনে আলতাফ মাহমুদের সঙ্গী ছিলেন কে এম মামুনুর রশিদ, রুমি, আজাদ, সামাদ, বদি বাকি ও জুয়েল। আলতাফ মাহমুদের ওপর পাকসেনাদের অত্যাচারের বর্ণনা দেন কে এম মামুনুর রশিদ '...এরপর ওদের টার্গেট ছিল আলতাফ মাহমুদ। তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে প্রথমে এলোপাথারি পেটাতে থাকে। আমাদের দরজাটা তখন খোলা। পরের দিকে দুজন দুইহাত, দুইজন দুইপা টেনে ধরে ৫/৭জন মিলে মুখে বুকে তলপেটে বুটের লাথি মারছিল। একটা সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলে তাঁকে আমাদের ঘরে ছুঁড়ে মারে। আলতাফ মাহমুদ আমাদের কোলে এসে পড়েন। তখনই তাঁর মুখ দিয়ে রক্তবমি বের হয়ে আসে। সেই রক্ত প্রায় দেড় মাস আমার লুঙ্গিতে লেগেছিল। ধোঁয়ার কোনো উপায় ছিল না। পরে আলতাফ মাহমুদকে পা ধরে টেনে নিয়ে যায়। আমার মনে হয়েছিল ওই অত্যাচারেই আলতাফ মাহমুদ মারা গেছেন।'[৩২]

দিনু বিল্লাহ লিখেছেন যে, তারা হায়েনার খাঁচা থেকে মুক্ত পরিবেশে ফিরে আসার পেছনে কারণ ছিল আলতাফ মাহমুদ সব দোষ নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। স্বেচ্ছা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে আলতাফ মাহমুদ সবাইকে মুক্ত করেছিলেন।[৩৩]

যন্ত্রশিল্পী হাফিজুর রহমান সম্পর্কে জানা যায় যে, স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রয়োজনে অবরুদ্ধ বাংলা থেকে প্রয়োজনীয় টেপ পাঠানো হতো। কাজটির সাথে বেতারের সাহসী কর্মীদের মধ্যে ছিলেন হাফিজুর রহমান, আশফাকুর রহমান খান, টিএইচ শিকদার, তাহের সুলতান, শহীদুল

৩১. আলতাফ মাহমুদ, হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৭

৩২. প্রত্যক্ষদর্শী মামুনুর রশিদ, মৃত্যুপুরীতে দিনরাত্রি, উৎস পপি চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা, প্রীতম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ২৮

৩৩. দিনু বিল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

ইসলাম, আশরাফুল আলম ও আজাহার উদ্দীনসহ অন্যান্যরা। কিন্তু টেপগুলো বের করে আনা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকিপূর্ণ কাজটা একমাস ধরে করেছিলেন গিটার বাদক হাফিজুর রহমান। শাহবাগ বেতার ভবন থেকে প্রয়োজনীয় সব টেপ বাইরে নিয়ে আসলেন গিটারের খোলে ভরে হাফিজুর রহমান। সেই টেপ বালিশের তুলা হয়ে আগরতলা দিয়ে মুজিবনগরের স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছিল। মে-জুন মাসে জানা গেল গিটার বাদক হাফিজুর রহমানকে বেতার ভবন থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। তাঁর কোনো খবর পাওয়া যায় নাই। তিনি শহীদ হয়েছিলেন।[৩৪] এ প্রসঙ্গে কামাল লোহানীর লেখা থেকে জানা যায় যে, গিটার বাদক হাফিজুর রহমান শিল্পী আলতাফ মাহমুদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। একই মতাদর্শী দুজনই মুক্তিযুদ্ধকালে রাজা হোসেন খানকে নিয়ে গণশিল্পী আবদুল লতিফের লেখা গান সুর করতেন এবং স্বাধীন বাংলা বেতারে পাঠাতেন। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ যা স্বাধীন বাংলা বেতারে পৌঁছেছিল।[৩৫] আরো জানা যায় যে, আলতাফ মাহমুদের গ্রেফতারের পর তাঁর শ্যালকসহ দুইদিন একত্রে ছিলেন, সেখানে মোট ১৬জনের মধ্যে গিটার বাদক হাফিজুর রহমানও ছিলেন। ১৬ জনের থাকার জায়গা হয়েছিল একটি বাথরুমে, পা ছড়িয়ে বসার সুযোগ ছিল না সেখানে। পাকসেনাদের অত্যাচারে জর্জরিত হাফিজ আলতাফ মাহমুদের শ্যালক দিনুর পায়ে শোয়ার সম্মতি নিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। দিনু দেখে হাফিজ সাহেবের একটি চোখ তুলে নেয়া হয়েছিল এবং হাতের আঙুলগুলো ছিল কাটা।[৩৬] দেশপ্রেমে জ্বলে ওঠা শিল্পীদের প্রতি নৃশংস পাশবিক অত্যাচারের মধ্যদিয়ে তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠকে এভাবে নিভিয়ে দিয়েছিল পাকসেনা বাহিনী অবরুদ্ধ বাংলায়। শিল্পীদের সংগ্রামের বীরত্বগাঁথা হাফিজুর রহমানের জীবনদানের মধ্যদিয়ে আরো দুর্বার হয়েছিল। যদিও ইতিহাসে এইসকল ঘটনা, শিল্পীদের ত্যাগ, সংগ্রাম, দেশপ্রেম, দেশের প্রতি দায়িত্বশীলতা তেমনভাবে প্রকাশ হয় নাই।

বাঙলার মুক্তিসংগ্রামে শিল্পীদের ভূমিকার কথা উন্মোচিত হবে না, তাদের সম্পৃক্ততা কতটা গভীরভাবে ছিল তার ইতিহাস জানা সম্ভব হবে না, যদি না শিল্পীরা সে বিষয়ে কলম ধরেন। গান এবং শিল্পীদের দ্বারা বাঙলার মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে এগিয়েছিল, উপকৃত হয়েছিল তা অনেকের কাছেই অজানা। কেননা যুদ্ধ বলতে সবাই বুঝে অস্ত্র নিয়ে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করাকে। শিল্পীদের কণ্ঠ, সুরকারের সুর আর গীতিকারের লেখা গান কতবড় অস্ত্র হতে পারে তা দেখেছে বাঙালি যারা বাঙলার মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী আর দেখেছে বিশ্ববাসী। তাছাড়া অনেক সময় বিষয়টাকে এভাবেও বলা হয় যে, যারা সীমান্ত পাড়ি দিয়েছেন তারাই মুক্তিযোদ্ধা। যারা দেশে থেকেছেন তারা মুক্তিযোদ্ধা না, অনেক সচেতন মানুষের মাঝেই বদ্ধমুল ধারণা এটাই। কিন্তু অবরুদ্ধ দেশে থেকে যারা শত্রুর বুলেট আর গোলার মুখে থেকে প্রতিনিয়ত বেঁচেছেন দেশকে বাঁচিয়েছেন সেটাই ছিল তাদের বড় যুদ্ধ। পাক বাহিনীর ষড়যন্ত্রকে নস্যাত করার জন্য সকলেই চেষ্টারত ছিলেন। তাদের সাহস আর দেশপ্রেম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছিল।

৩৪. ফজল এ খোদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-১২৫

৩৫. কামাল লোহানী, মরণে যার ছিল না ভয়, আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৩৬. আলতাফ মাহমুদ, হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭

শরণার্থীরা জীবনের নিরাপত্তা পেয়েছিলেন কিন্তু তাদেরও প্রতিনিয়ত যুদ্ধের প্রয়োজনেই খেয়ে না খেয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছে। মাতৃভূমি পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে, তাদের অনিশ্চিত প্রবাস জীবন পাড় করতে হয়েছে, তারা যেমন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত, দেশের ভেতর থেকে যারা কাজ করেছেন, তথ্য দিয়েছেন, আনুসাঙ্গিক সরবরাহ করে প্রতিমুহূর্ত জীবনের ঝুঁকিতে কাটিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধে তাদের ত্যাগ, তাদের সাহস বেশি ছাড়া কোনো অংশেই কম নয়। মুনতাসির মামুন লিখেছেন, "একাত্তরের ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল মূলত এক অবরুদ্ধ নিষিদ্ধ দেশ। কতটা ভয়াবহ দুঃসহ ছিল যুদ্ধ দিনের সে সময়গুলো, একমাত্র এদেশে বসবাসকারী সে সময়ের সাধারণ বাঙালি জনগোষ্ঠীই কেবল জানেন এর যথার্থ উত্তর। অনবরত ভয়, শঙ্কা ও মৃত্যুকে সামনে রেখে অনিশ্চয়তার দোলাচলে যেমন ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ, তৈরি ও সরবরাহের কাজে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে নানাভাবে সাহায্য সহযোগীতা করেছেন। জীবনের ভয় তুচ্ছ করে লুকিয়ে রেখেছেন মুক্তিযোদ্ধা আর মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র। সন্তানদের যুদ্ধে পাঠিয়ে বাবা মা পাকসেনাদের হাতে নিহত হয়েছেন। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত বাঙালি জনগণই একাত্তরের ভয়াবহতা, প্রচণ্ডতা সবচেয়ে বেশি অনুভব ও প্রত্যক্ষ করেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"[৩৭]

অবরুদ্ধ দেশের ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে থেকে প্রতিমুহূর্ত মৃত্যুর আশংকা নিয়েও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছিলেন শিল্পীরা। অনেক কবিয়াল তাদের কবিতা, গানে সেই সময়ের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। বিপিন গোসাই তেমনই একজন সাধক ও কবিয়াল। পাঁচ বিবিতে বসবাসরত সনাতন ধর্মী এই সাধক অনেক শিষ্য রেখে গেছেন। তাদেরই একজন যিনি কালাই উপজেলার রাধানগর গ্রামের বংশীবাদক ও লোকসঙ্গীত শিল্পী মোহন্ত বর্মনের থেকে পাওয়া বিপিন গোসাইয়ের লেখা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

ওরে দেখে এলাম বালুর ঘাটে মোটরখানা
শিলিগুড়ি রেল স্টেশন হিলি হয় তার ঠিকানা
তিয়র ধামে মোটর থামে
কালীবাড়ি হয় থানা
শেল পড়ে মানুষ মরে
দেখে এলাম দশজনা।

মুক্তিযুদ্ধ সময়ে আরো একটি গান পরবর্তী এক দশককাল পর্যন্ত লোকশিল্পীগণ গেয়েছেন। গানটি সহজ ছন্দে ও কথায় খিলা। নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :-

পিয়ারে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান
ও তোম চাহো মাই দে দে বাঙালি আপনা জান।
চলবে না চলবে না খানের দালালি

---

৩৭. মুনতাসির মামুন সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধ কোষ, প্রথম খণ্ড, সময় প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ১৯

জেগেছে জেগেছে মুজিব বাঙালি
বাংলাদেশে ভাগা পাঞ্জাবি আর পাঠান।
এ দেশের লোক বাবা এমন যে বোকা
বলে কী পার হতে দেবেনা নৌকা
ও সে কাঁহা হ্যায় নিয়াজ কাঁহা টিক্কা খান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে সহজ সরল কথায় লিখা গানগুলি বাঙালিকে উদ্দীপিত করতো। স্বপ্ন জাগাতো বাঙালির মনে। পাকিস্তানি মিলিটারিরা সুন্দর চেহারার মেয়েদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিত। স্থানীয় ভাষায় পাকিস্তানি বাহিনীর কুৎসিত চরিত্রের দিকটা তুলে ধরা হয়েছে আঞ্চলিক এই গানটিতে। গানটি হলো :-

সড়ক দিয়া মেলেটারি যায় হায় নুনদা হায়
গোর গোর বেটিছলোক তুলে নিবার চায়
হায় নুনদা হায় সড়ক দিয়া মেলেটারি যায়।
কালো কালো মাগিগুলাক গুলি করবার চায়
হায় নুনদা হায়, সড়ক দিয়া মেলেটারি যায়।[৩৮]

শিল্পী কছিম উদ্দীন বাংলার মাটি মানুষকে ভালোবেসে গানকে জীবনের অংশ করে নিয়েছিলেন। **১৯৫২** সালে সুর সম্রাট আব্বাস উদ্দীনের সহযোগীতায় অডিশনে পাশ করে রেডিওর শিল্পী হিসাবে গান করতে শুরু করেন। **১৯৬৪** সাল থেকে টেলিভিশনে ভাওয়াইয়া শিল্পী হিসাবে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রংপুর বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে **১৯৬৮** সালে গীতিকার হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। **১৯৭১** সালে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন গান গাওয়ার কারনে পাকিস্তানে সরকারের রোসানলে পড়েন। বন্ধু শুভাকাঙ্খির পরামর্শে পরিবারসহ আত্মগোপন করেন। সাথে ছিল অন্ধ দোতরা বাদক, গায়ক নমরুদ্দীন। ফুলবাড়ি থানার মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিবারকে রেখে কছিম উদ্দিন **১৮** এপ্রিল ভারত চলে যান।[৩৯]

প্রাণ শক্তিতে ভরপুর বাঙালি, সাহসী বাঙালি, সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ বাঙালি তার দেশ মাতৃকার সম্ভ্রম রক্ষায় মনের সাহসে, দুর্দমনীয় চেতনার জোরে মুখোমুখী হয়েছিল শত্রুর। সেই যুদ্ধে বাঙালি জয়ী হয়েছিল তার চেতনা আর মানসিক সক্ষমতার জোরে। আর পাকবাহিনী তাদের সব থাকা সত্ত্বেও তাদের মনের জোর ছিল না। আরেকটি বিষয় ছিল, মাটির সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী মাটির শেকড়ের শক্তিকে পুঁজি করে বাঙালি যতটা বলিয়ান ছিল মুক্তিযুদ্ধে ঠিক ততটাই বিচ্ছিন্ন ছিল শেকড় ছিন্ন পাকিস্তানি জনগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনপদে। তারা এই দেশের উত্তরাধীকারী ছিল না, তারা ছিল বহিরাগত আর বাঙালি এই মাটির সন্তান, হাতে গোনা বিশ্বাসঘাতক বাদে সবাই ছিল

৩৮. বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমেলা, জয়পুর হাট, প্রধান সম্পাদক : শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমি, ২০১৪, পৃ. ২১১-১২
৩৯. জেসমিন বুলি, অচিন পাখীর কলগীতি, লোকগীতি কবিদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি ভিক্ষা, সম্পাদনা- সনজিদা খাতুন, আবুল হাসনাত, ছায়ানট, ২০১৫ পৃ. ১৬৩-১৬৫

মুক্তিযোদ্ধা, হয়তো তারা অস্ত্র হাতে মাঠে নামে নাই কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তারা দেশের প্রয়োজনে নিয়োজিত ছিল। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই ছিল প্রাণবন্ত বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা। যারা গান গেয়ে, গান শুনে দুঃখ ভুলতে পারে। শত্রুকে বধ করতে পারে। গানের মধ্যে প্রাণ ফিরে পায়। সেই গানের অস্ত্রে বাঙালি বধ করেছিল বিজাতীয় শত্রুকে।

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ শত হাজার বছরের এক রূপকথা। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ শুধু অস্ত্র দিয়ে হয় নাই। শুধু অস্ত্র আর প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকলে বাঙালি কোনোদিনই এই যুদ্ধে জয়ের মুখ দেখতো না। ক্ষমতাধর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উন্নত, আধুনিক সমরাস্ত্র, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আধুনিক সেনাবাহিনীর সামনে বাঙালি অল্প সংখ্যক সেনা সদস্যদের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সুযোগ ছিল না। তাদের ছিল না আধুনিক সমরাস্ত্র যা দিয়ে তারা মোকাবেলা করবে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে। সেই কারণে তাদের গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করতে হয়। মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ, বীর উত্তম লিখেছেন, "মুক্তি শব্দটি শোনামাত্র পাকিস্তানি সৈন্যরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো। এটি তাদের সাহসিকতাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। মুক্তি আতংকে মোহবিষ্ট করে দেয়। গেরিলা হচ্ছে উক্ত রূপকথার নায়কের আরেক নাম। বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য প্রচলিত ধারার যুদ্ধ প্রয়োজন নয়। এর বড় কারণ হচ্ছে শত্রুদের প্রতিহত করার মতো সমরাস্ত্র আমাদের হাতে নেই। আমাদের হাতে যা আছে সেসব হচ্ছে সেকেলে ধরনের তাও আবার সামান্য পরিমানে। এসব নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। পক্ষান্তরে এটি হচ্ছে আমার দেশ। এর ভূ-খণ্ড আমাদের পরিচিত। এর প্রকৃতি, রাস্তা ঘাট, নদী-নালা, বাগান, আমাদের কাছে শুধু পরিচিত এমন নয়-এসব আমাদের শৈশবের খেলাধুলার স্মৃতি হয়ে রয়েছে। জনগণ আমাদের সাথে। তারা তাদের সার্বিক সহযোগীতার হাত মেলে ধরেছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে গেরিলা যুদ্ধের উজ্জল সফলতার সম্ভাবনা রয়েছে।"[৪০]

শিল্পীরা ব্যক্তিগত সচেতনতা নিয়ে গান লিখেছেন, গান গেয়েছেন। দেশের মধ্যেও যেমন করেছেন দেশের বাইরে সীমান্ত অতিক্রম করে শরণার্থী শিবিরের মানুষের মুখে একটু হাসি ফুটাতে তাদের দুঃখ ব্যাথা কিছুটা লাঘব করার জন্য গান করেছেন।

সিলেটের মরমী গায়ক শাহ আবদুল করিম গানে গানে তৎকালীন সমাজ চিত্র তুলে ধরেছেন সাধারণের মাঝে, প্রতিটি সঙ্কটে, প্রতিটি সংগ্রামে তিনি দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর সাধারণ বাণী সমৃদ্ধ গানে। তাঁর সেই গান ব্যাপক পরিসরে প্রভাব ফেলেছিল। মুক্তিযুদ্ধেও তিনি গানে গানে মানুষকে জানিয়েছেন বাংলার দুর্যোগের কথা। তিনি লিখেছেন,

শেখ মুজিব ঘোষণা দিলেন
বাঙালি অস্ত্র ধরিলেন
ওসমানী দায়িত্ব নিলেন
মুজিব কারাগারে॥

৪০. কে, এম, সফিউল্লাহ, বীর উত্তম, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ১৬১

শেখ মুজিবের বন্দীত্বের খবর শুনে লিখলেন,

নজরুল তাজউদ্দীন ছিলেন
দেশের ভিতরে
দেশ প্রেমিগান নিয়ে তখন
মুজিব নগর সরকার গড়ো॥[৪১]

সাধারণ জনগণ শিল্পীদের এমন সাধারণ কথার গানেই সাড়া দিয়েছিল। যুদ্ধদিনের প্রতিদিনের ঘটনাই নাম না জানা শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের সাধারণ কথার গানে। শিল্পীদের গানের সুর ও বাণী সে সময় অস্ত্রের শক্তির চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। মানুষ সে গানের মধ্য দিয়ে জেগে উঠেছিল। মোবারক হোসেন খান লিখেছেন, আমাদের দেশের গান মুক্তিযুদ্ধের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। সেই হাতিয়ারে অনুপ্রাণীত হয়েই যুদ্ধ করেছে জনগণ। শত্রু সৈন্যরা লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেও এদেশের মানুষের মনোবলকে বিন্দু মাত্র লক্ষচ্যুত করতে পারেনি। তাদের মনের বল অটুট রাখার শক্তি দেশের গানের ভেতরেই ছিল নিহিত। তাই মুক্তিযুদ্ধে শব্দযোদ্ধাদের ভূমিকা সীমান্তে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদেরই পরিপূরক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নয় মাসের ইতিহাস। নয় মাসে সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর দেশের গান।[৪২]

গ্রাম, গঞ্জ, শহর নগর সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের গান বাংলার মানুষের নৈতিক শক্তিকে জাগিয়ে রেখেছিল। নয়টি মাস গানের তরঙ্গে ভেসেছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। শেখ লুতফর রহমান সঙ্গীত জগতের প্রাণ পুরুষ মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব থেকেই সোচ্চার হয়েছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধকালেও তিনি পুরোনো গান গেয়ে মানুষকে দেশের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মুক্তির লক্ষে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর ভাষ্যে “এই সময় আমি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আমার বেশ কিছু শুভাকাঙ্খি পরিচিত জনদের কাছে থেকে চাঁদা তুলে মুক্তিবাহিনীর জন্য পাঠাতাম। আমার হয়ে এই কাজটি করতো আমার ছোট ভাই শেখ মুহিবুল হক। মুখে তখন তার চাপদাড়ি, পড়নে ঢোলা সুন্নতি পাঞ্জাবি, মাথায় সাদা টুপি, তাকে কেউ চিন্তে পারতো না। আমার হয়ে তলে তলে সে এই রকম ভয়াবহ কাজ করে যাচ্ছে।”[৪৩]

শিল্পীদের সচেতনতা বাংলাদেশের আপামর মানুষের বোধের জায়গাটিকে জাগিয়ে তুলেছিল। তারা গানে গানে পাকবাহিনীর অন্যায়, দুঃশাসনকে মানুষের কাছে উন্মোচন করেছিল পূর্ব থেকেই। যার জন্য শিল্পীদের প্রতি পাকবাহিনীর আক্রোশ ছিল অনেক বেশি। শিল্পীরাও দেশের ভিতরে থেকে গোপনে তাদের মুক্তিযুদ্ধের তৎপরতা চালিয়ে যায়। গোপন তৎপরতা চালাতে গিয়ে কে কখন পাক বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে শেষ হয়ে যেতো তার অনেক খবরই তখন দেশবাসী জানতে পারতো না। তার কোনো উপায়ও ছিল না। স্বাধীনতা প্রাপ্তীর পর সেই সকল

---

৪১. মিহির কান্তি চৌধুরী, শাহ আবদুল করিম জীবন ও কর্ম, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৭১

৪২. মোবারক হোসেন খান, মুক্তিযুদ্ধের গান, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৯

৪৩. সাইম রানা,বাংলাদেশের সঙ্গীত বিষয় ও সুর বৈচিত্র, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৮৭

নারকীয়, বিভৎস ঘটনা প্রতিদিন মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছে। রাবেয়া খাতুনের লেখায় নারী ও শিশুদের উপর পাকবাহিনীর বিভৎস ও পাশবিকতার ঘটনা উদ্বৃত হয়েছে যেভাবে। ৯টি মাস বাঙালিদের জন্যে সে এক জাহান্নামী বিষম বিষাক্ত কাল ছিল, সব মিডিয়ায় সেসব প্রকাশিত হতে থাকে নতুন করে শিউরে উঠেছিল বাঙালি। প্রতিদিন সংবাদপত্রে থাকতো পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুরতার সচিত্র বিবরণ। বন-জঙ্গল, পরিত্যক্ত ভিটায় অবিষ্কৃত হতো গণকবর। কোনো কোনোটার নিরব অধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নির্মম নারকীয় সংহারক ভূমিকাকেও ছাড়িয়ে যাবার মতো। তিনি লিখেছেন, একজন হতভাগ্য গায়িকার কথা যিনি ছিলেন প্রায় তার নিকট প্রতিবেশী। নিষ্ঠুর নৃশংসতার হাত থেকে তিনি বাঁচতে পারেন নাই। মুক্তিযুদ্ধের সেই কঠিন দিনের বলি হয়েছিলেন নাম না জানা সেই সঙ্গীত শিল্পী। "বাসাবোর প্রায় প্রতিবেশী পল্লী নন্দীপাড়া, প্রতিশ্রুতিশীল এক গায়িকা থাকতেন। মধ্য একাত্তরে যখন বাধ্যগতভাবে খোলা হচ্ছিল স্কুল কলেজে। শিল্পীদের বল প্রয়োগে বাধ্য করছিল রেডিও টিভিতে প্রোগ্রাম করার জন্যে। তখন ঐ মহিলা ওদের সংকল্পের অংশীদার হতে চাননি। তার স্বামী ওপারে গিয়ে জয়বাংলা বেতারে যোগ দিয়েছিলেন। তিনিও সুযোগে ছিলেন যাবার কিন্তু তাকে আর দেখা যায়নি। বাড়িটা পরিত্যক্ত ছিল কিংবা বেহাত ছিল বিহারীদের হাতে। স্বাধীনতার পর দেখা গেলো বাথরুমে কংকাল হয়ে আছে সে। পাক সৈন্যরা তার অবাধ্যতার জবাব দিয়েছিল বিনা দানাপানিতে বন্দী রেখে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় দিনের পর দিন কাটিয়ে কোনও এক সময়ে সে মারা গেছে। দরজা ভাঙ্গার পর মনে হয়েছিল তার গলে যাওয়া চোখ যেনো জীবন্ত হয়ে তাকিয়ে আছে। অদৃশ্য ভাষা সম্বলিত সেই দৃষ্টি যেনো বিধে যাচ্ছিলো বেদনা বিহবল নতুন প্রজন্মের বুকের খাঁচায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ, নির্দয় কর্মকাণ্ডের চেয়ে একাত্তর কত বেশি কলঙ্কিত ছিল যে, মাত্র নয় মাসে খুন হয়েছে তিরিশ লক্ষ বাঙালি আর বেআবরু হয়ে ইজ্জত হারিয়েছে দু'লাখ বধু মাতা কন্যা।"[৪৪]

গীতিকার আবু হেনা মোস্তফা কামাল অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাক সেনাদের আদেশ পালন না করার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। "একাত্তরে পাকিস্তানিরা আমায় রেখেছিল যে সেলে তার খুব কাছে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামীদের কুঠরি। আমি খুনি নই। আমার অপরাধ ওদের সেবাদাস হয়ে ওদের গুণগানে রেডিও প্রোগ্রামে রাজী না হওয়া। মানসিক নির্যাতনের জন্যে ঐ ব্যবস্থা। প্রতিরাত প্রতিদিন আমায় শুনতে হতো মধ্যযুগীয় বর্বর পন্থায় নিহত বন্দীদের অন্তিম আর্তনাদ। মনে হতো মৃত্যু কতো বিভৎস, বিকৃত, অবাঞ্চিত। জেদে-ক্রোধে-ঘৃণায় কেমন হয়ে গেলাম। এমন অপ্রতিবাদী নিরর্থক মৃত্যু কখনো আমার হতে পারে না ...। তারপর আবার স্বাধীন দেশেও কতো হৃদয়হীন, বিবেচনাহীন, মুর্খঘটনা। পণ্ডিতরা, ক্ষমতাসীনরা যখন ভুল করেন, বা ব্যক্তি স্বার্থে অন্ধ হন তখন সূর্য ঢেকে যায় বিভ্রান্তির কুয়াশায়। আমার শত্রুরা আমাকে চিহ্নিত করতে চাইলো দালাল ছাপ মেরে।"[৪৫]

---

৪৪. রাবেয়া খাতুন, জীবন ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩

৪৫. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, উৎসঃ রাবেয়া খাতুন, জীবন ও সাহিত্য, অনন্যা, ২০১১, পৃ. ২৪৪

সীমান্ত পাড়ি দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ড. অরূপ রতন চৌধুরীর মা ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী অবরুদ্ধ বাংলাদেশে বসে সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে লিখেছেন, "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র রোজ শুনি সবাই গোল হয়ে বসে-আর আকাশবাণীতে দেবদুলালের সংবাদ ও সংবাদ ভাষ্য। এগুলো প্রেরণা দেয়। মুক্তিযোদ্ধারা আসে, তাদের সাহায্য করি। সুমন্ত কলাকাতায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ২ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলো-তার নিজ নামে 'অরূপ রতন চৌধুরী' নামে। তখনি জানি কপালে না জানি কি অঘটন আছে।"

সন্তানকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েও অরূপ রতনের বাবা অবরুদ্ধ বাংলাদেশে থাকার পক্ষে যা বলেছেন, তা জানা যায় তার মায়ের লিখা থেকে, "আমরা যারা দেশে আছি তারা দেশ প্রেমেই দেশে ছিলাম। দেশ ত্যাগ করিনি। প্রতি মুহূর্তে জানি মৃত্যু ভয়। তবুও আমরা এক পা নড়িনি। উনি বলতেন—বৈতল (প্রবাসী) হয়ে দেশ ছেড়ে অন্যত্র যাবো না-মরবার হয় দেশের মাটিতেই মরবো-ভয় কিসের ?"[৪৬]

একই শহরে, জনপদে, অরণ্যে বসবাস করেও ১৯৭১ সালের নয় মাস বাঙালি জানতে পারে নাই তারই নিকটতম প্রতিবেশীকে কতটা ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতম পরিণতি বরণ করতে হয়েছে। যদি তা বাঙালি জানতে পারতো তবে কোনো বাঙালির পক্ষেই স্বাভাবিক থাকা সম্ভব হতো না। আতংকে বাঙালি উন্মাদ হয়ে যেতো, অস্বাভাবিক আতংক কিছুটা লাঘব হতো কঠিন গোপনীতায় মুক্তিযোদ্ধা শিল্পীদের পরিবেশিত গান শুনে, স্বস্থির কোনো সংবাদ শুনে, যদিও তার সুযোগ ছিল খুবই সামান্য।

শিল্পীদের পরিবেশিত গান বাঙালির শুদ্ধতম আবেগকে ঘিরে রচিত হয়েছিল। শিল্পীদের পরিবেশনা বাঙালির আবেগকে ছুঁয়েছিল। বাঙালি সে গান শুনে আবেগে কেঁদেছে,আবেগে হেসেছে। সম্মান ও গৌরবের সে গান গেয়ে শিল্পীরা সম্মানিত হয়েছে।

একাত্তরের নয় মাস রংপুর এলাকার গ্রামের মেঠোপথ দিয়ে গান গেয়ে যেতেন পথ গায়কেরা। তাদের গানের কথায় থাকতো মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা আর রাজাকার পাকবাহিনীর বিপর্যয়ের কথা। নদীর ধারে, বটের ছায়ায়, হাটবাজারে গান গাইতেন নিন্দালু সামাদ দোয়াড়ি। বৃহত্তর রংপুরে রসিক লোকদের দোয়াড়ি বলা হয়। সামাদ দোয়াড়ি তার রসাত্মক ভঙ্গিতে মনকাড়া সুরে গাইতেন 'আজাংকারের মাইয়া কান্দে হাম্বা হাম্বা করি।' অসংখ্য পথ গায়ক এভাবে গান গেয়ে পথ-ঘাট, মেঠোপথ, হাটবাজারে ঝংকার তুলতো তাদের বাস্তবভিত্তিক কথার গানে। বাঙালি উদ্বুদ্ধ হতো তাদের গানে। ব্যাপক লোক সমাগম হতো তাদের উপস্থিতিতে।[৪৭]

সংগ্রামী বাঙালির ক্রোধ স্বপ্নকে ধারণ করেছিলেন গীতিকার, সুরকার আর শিল্পীরা, গানে গানে সে কথাই ব্যক্ত হয়েছিল। প্রতিটি গান হয়ে উঠেছিল সাধারণের হৃদয়ের অভিব্যক্তি। গণহত্যা শুরুর পরই সবাই প্রতিরোধ গড়েছিল মনে মনে কোনোভাবেই দেশের সম্মান পাকিস্তানি

৪৬. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, চলতি পথের রেখা, উৎস প্রকাশন, ২০১০, পৃ. ১৬৬-১৬৭
৪৭. মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক, প্যারিস পেরিয়ে বিলেত, নালন্দা, ২০১২, পৃ. ১২

হায়েনাদের কাছে বিসর্জন দেবে না। কেউ পাড়ি দিয়েছিল সীমান্ত আবার কেউ দেশে থেকেই নিভৃতে শত্রুর চোখকে আড়াল করে তাদের পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করেছে। যার অবস্থান যেখানেই হোক না কেন সবারই লক্ষ ছিল দেশের স্বাধীনতা। এই লক্ষে সবাই ছিল বলেই নয় মাসে স্বাধীনতার স্বপ্ন পুরণ করতে সক্ষম হয়েছিল বাঙালি। গ্রামের নাম না জানা স্বভাব গায়কও এই যুদ্ধে নতুন নতুন গান বেঁধেছে। সেই গানে স্থানীয় জনগণ জেনেছে পাকিস্তানি বর্বরতার কথা, বাঙালির উপর চালানো গণহত্যার কথা। তাদের সেই গান বাঙালির ইতিহাসের সমৃদ্ধ অংশ হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে। যদিও এলাকা ভিত্তিক গবেষণা না হওয়ার কারণে এমন অনেক গৌরবজনক ইতিহাস সকলের জানার বাইরে রয়ে গেছে। তথাপি কালের সাক্ষী হয়ে আর মুক্তিযুদ্ধের সচেতন অংশ হিসেবে সে সকল গায়ক তাদের গান নিয়ে সসম্মানে বেঁচে থাকবেন স্থানীয় পর্যায়ের গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা হয়ে। গানের মাঝে তারা মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানি বাহিনীর নিষ্ঠুর অত্যাচার আর বিভৎসপন্থায় মানুষ মারার যে নজির সৃষ্টি করেছিল পাক হায়েনা, তাদের সেই গানে তার চিত্র ফুটে উঠেছে। যুদ্ধের সময়ের তেমনি একটি গান যার লেখক ও গায়কের কোনো পরিচয় জানা যায় নাই।

আবার লাইন কইরা গুলি ছোড়ে
কত মানুষ মারে
গোর খুদিয়া জ্যান্ত মানুষ
মাটির নিচে গাড়ে।
দুঃখ বলবো কত মাথা নত
চোখে ঝরে জল
রাস্তাঘাটে কত মানুষ কান্দিয়া পাগল॥[৪৮]

এমন অসংখ্য গান বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের উপকরণ হয়ে আছে। কিন্তু সে সকল গানের লেখক বা গায়কের কোনো পরিচয় আজও অজানা। তারা তাদের স্বভাবজাত দায়িত্ববোধ থেকে গান বেঁধেছিলেন বাঙলার কঠিন সেই যুদ্ধদিনে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সচেতন হয়ে মুক্তির সংগ্রামে অংশ নিতে। অধিকাংশ গানই লিখার পর ছিঁড়ে ফেলতে হতো নিরাপত্তার স্বার্থে। বিশেষ করে যারা দেশে থেকে পাকসেনাদের অবরোধের মধ্যে তাদের সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। তাদের নিয়ে গবেষণা হয়েছে একেবারেই কম আর যারা সক্রিয় ছিলেন তারাও তাদের যুদ্ধ দিনের কোনো অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ না করার কারণে তা রয়ে যায় লোকচক্ষুর অগোচরে। সেই মুহূর্তে গাওয়া গানটি হয়তো পরবর্তীতে আর গীত হয় নাই। গ্রাম বাংলার হাটে মাঠে ঘাটে গ্রামীণ গায়েন কবিয়ালদের এমন অসংখ্য গান বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের এক অসামান্য দলিল হতে পারতো, যদি তা সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো।

৪৮. সাইম রানা, বাংলাদেশের গণসঙ্গীত বিষয় ও সুর বৈচিত্র, বাংলা একাডেমি, ২০০৯, পৃ. ২১১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীদের অংশগ্রহণ একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক সংখ্যক শিল্পী সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সকলের অংশগ্রহণের ফলে তা হয়েছিল সত্যি সত্যিই সাইকলোজিক্যাল ওয়ার। তারা বুঝতে পেরেছিলেন সাংস্কৃতিক মুক্তি ছাড়া একটা দেশ সভ্য হতে পারে না। মূলতঃ বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ছিল সংস্কৃতিক লড়াই। বাঙালি জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পীদের সচেতনতা নান্দনিক পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তাদের সে অবদান মুক্তিযুদ্ধে সচেতন বাঙালির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছিল ব্যাপকভাবে।

মানুষকে সচেতনতার কেন্দ্র বিন্দুতে এনেছিলেন সঙ্গীত শিল্পীরা। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের অধিকার রক্ষায় সকলকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শিল্পীরা। বাঙালির হাজার বছরের কৃষ্টি আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করার মন্ত্র দিয়েছিলেন শিল্পীরা, গীতিকার,সুরকার লিখেছেন নতুন গান,সুর করেছেন মুক্তির আকাঙ্খায়। শিল্পীরা দেশের মুক্তির জন্য সে গান গেয়েছেন অন্তর নিঃসৃত আবেগ ঢেলে। মুক্তি পাগল বাঙালি সে গান শুনে সব দুঃখ কষ্ট ভুলে নবউদ্যমে জীবন ফিরে পেয়েছে। যুদ্ধের মাঠে শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে বিপুল বিক্রমে। সে গান সাধারণ জনগনের গভীর আবেগকে ছুঁয়ে যেতে পেরেছিল বলেই তা অবরুদ্ধ বাংলার জনগণকে যেমন আবেগে ভাসিয়েছে শরণার্থী বাঙালির দুঃখ কষ্ঠকে লাঘব করেছে একইভাবে।

অসহযোগের উত্তাল দিনগুলিতে যারা গান গেয়ে সারা বাংলার মানুষকে জাগিয়ে ছিলেন,যাদের গানের সুরে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষও সচকিত হয়েছে তাদের অনেকেই নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকালে দেশ ছেড়ে যেতে পারেন নাই। নানা সংগত কারণেই হয়তো তাদের সীমান্ত পাড়ি দেয়ার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু দেশে থেকেও তারা গোপনে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাহায্য সহযোগীতা করে গেছেন যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস অবরুদ্ধ বাংলার বাঙালির জীবনে নিয়ে এসেছিল বিভিষীকা আর দুর্যোগের ঘনঘটা। কেউ জানতো না তাদের দুঃখের সেই দিনগুলি কবে শেষ হবে। সীমাহীন কষ্ঠ, দুঃখ, অপমান আর লাঞ্চনার সেই জীবন থেকে তারা সত্যিই কোনোদিন মুক্ত হবে সে অন্তহীন ভাবনারও কোনো শেষ ছিল না। তাদের চারপাশে ছিল হত্যা, ধর্ষণ, আগুনের লেলিহান শিখা আর বর্বরতা। গোটা দেশটাই পরিণত হয়েছিল মৃত্যুর পাষাণপুরিতে। যেখানে ছিল না কোনো জীবনের স্পন্দন। হঠাৎ সুযোগ পেলে সেই জীবনে তারা শুনতো স্বাধীনবাংলা বেতারের ভেসে আসা গান। তারা কিছুক্ষণের জন্য ধরে প্রাণ ফিরে পেতো। আবার তারা স্বপ্ন দেখতো ভবিষ্যৎ জীবনের। শিল্পীদের গান নিয়ে বাংলাদেশের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌসী রহমান বলেন,

> মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ফলশ্রুতিতে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। মুক্তিযুদ্ধ না হলে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিল না। মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীদের অবদান সীমান্তে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শিল্পীরা সমগ্রজাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের শিল্পের মাধ্যমে। সুতরাং সে অর্থে শিল্পীরাও মুক্তিযোদ্ধা।[৪৯]

---

৪৯. মোবারক হোসেন খান, মুক্তিযুদ্ধের গান, শোভাপ্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ১০৭

পাকিস্তানের স্বৈরশাসকের মৃত্যু ঘণ্টা বেজেছিল সেদিন অবরুদ্ধ বাংলার আকাশে বাতাসে। শিল্পী সাহিত্য জগতের সৃজনশীল তৎপরতায় তা যেন আরো বেগবান হয়ে উঠেছিল। পুরো বাংলাদেশই ছিল পাকিস্তানি শাসকের অগণতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ।

মুক্তিযুদ্ধে দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছে বাঙালি। সন্তানকে সাজিয়ে মা পাঠিয়েছেন দেশ রক্ষার সংগ্রামে। পাকিস্তানি হায়েনা বাহিনীর গুলিতে আদরের সন্তান হাড়িয়েছেন মা। সন্তান হারা মায়ের দুঃখ কষ্টকে স্মরন করে গান লিখেছেন গফুর হালি। নিজের সুর করা গানটি নিম্নরূপ :-

শহিদের মা কান্দেল্যে বটগাছ তলে বই
বেয়াগ গনের পোয়া ফিরি আইলো আঁর পোয়া কই।
পঁচিশ বছর বয়স অইয়েল চাঁদর মত মুখ
সোয়ামি হারাই মনে গাইয়্যেল পুতে দিব সুখ
দারুন যুদ্ধে সুখর ঘরগান ভঙ্গি গেই এ গে
রাইত দিন কাডায় কান্দি পাগলিনি মা
কেয়ারে পাইল পুছার গরে শহিদ আই এর না
পুতর আশায় দুই যুগ ধরে রাস্তা দিয়ে চই
ছিড়া কাঁথার গাট্টি বালই ঘুরে পথে পথে
ভুগ লাগিলে মানুষ দেইলে ভিক্ষল্লাই হাত পাতে
হক্কল সমত কয় আল্লা আঁরে যা তুই লই।

গফুর হালির লিখা আর একটি গান

ফজল কাদের কণ্ডে আছে, জাননি খবর
চাটগাঁ ছাড়ি আইক্যাপ যাইতে ধৈয্যে সাম্পানের ভিতর
মুসলিম লিগের বড় পাণ্ডা গুণ্ডাদের সর্দার
দেশদ্রোহী বাংলার শত্রু ফজল ইসপিকার
তার মত নাই ভালো মানুষ চোর ডাকাতের মাতব্বর
ফজল্যার চেলা চামুণ্ডা আছে যেই জায়গায়
মুক্তি ফৌজের পায়ে পড়ি গড়া গড়ি যায়
তারা ইচ্ছামতো জুলুম চালায়, কত মা বোনের উপর
ফজল্যার মাথার উপরে বসিয়া শকুন
চট্টগ্রামের বহু মানুষ করিয়াছে খুন
গ্রামে গ্রামে দিল আগুন
বেশি পোড়ে হিন্দুর ঘর

ডাণ্ডার ভয় যারা করে ছালাম নমস্কার
এখন ঝাঁটা জুতার মালা গাঁথে দিতে পুরস্কার
বন্ধু সাজি ইয়াহিয়া সৃষ্টি করে রাজাকার
জয় বাংলার ধ্বনি দিয়া হাতে হাত মিলাই
মির্জাফরের চামড়া দিয়া ডুগডুগি বাজাই
তাদের হাড্ডি দিয়া বাঁশি বানাই বাজাবে শেখ মুজিবর।"[৫০]

২নং গানটি লিখা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকবাহিনীর দোসর কুখ্যাত বাঙালি ফজলুল কাদের চৌধুরীর অপকর্মকে উপজীব্য করে। পাকবাহিনীকে সহযোগীতা করার জন্য যার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল রাজাকার বাহিনী। এদের অত্যাচারে, অনাচারে আর ধ্বংসত্মক কার্যক্রমে বাঙালির জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। বাঙালির বিরুদ্ধে আর পাকবাহিনীর সমর্থনে এমন কোনো কাজ নাই যা এই ব্যক্তি তার সহযোগীদের নিয়ে না করেছে। পাক বাহিনীর নৃশংসতার পাশাপাশি এই শ্রেণীটি বাঙালির জীবনে ছিল সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতার কারণে ফজলুল কাদের ছিল গণধিকৃত ব্যক্তি।

১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে আত্মগোপন করে নৌকায় বার্মা (মায়ানমার) পালিয়ে যাবার সময় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে যায় গণধিকৃত ব্যক্তিটি। কুখ্যাত ফকা চৌধুরী নামে ব্যাপক পরিচিত ব্যক্তির ধরা পড়ার ঘটনাটি সেই সময়ে খুব আলোচিত হয়েছিল। আর তার উপরে ফনি বড়ুয়া যে গান লিখেছেন—তা যুগ যুগ ধরে ফকা চৌধুরীর অপকীর্তির কথা বাঙালি জানবে এই গানের মধ্য দিয়ে।[৫১]

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ একটি মহাযজ্ঞ। এ যজ্ঞে এদেশের অগণিত নরনারী নানাভাবে অংশ নিয়েছেন, অবদান রেখেছেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে তাজউদ্দীন তাৎপর্যপূর্ণ একটি কথা বলেছিলেন। দেশত্যাগ করে টেনিং নিয়ে যারা যুদ্ধ করেছে, যারা অধিকৃত এলাকায় থেকে ট্রেনিং নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সংগ্রামে এবং অধিকৃত এলাকায় যে কোটি কোটি বাঙালি সাহায্য ও সহযোগীতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সংগ্রাম করেছে, তারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা।[৫২] দেশের ভিতর এবং বাইরে আন্তর্জাতিক বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাঙালির দূর্বার প্রতিরোধে পরাস্ত হয়েছিল পাক বাহিনী। তাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

---

৫০. কল্যাণী ঘোষ, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান, বাংলা একাডেমি ১৯৯৮ পৃ. ৬৫, ১৩২-৩৩
৫১. কল্যাণী ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৫২. খান সারওয়ার মুরশিদ, কালের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১, পৃ. ৫০

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : স্বাধীন বাংলা বেতার ও শিল্পী, সুরকার, গীতিকারদের ভূমিকা

“নাসরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারীব” আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী–ধ্বনি শোনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষার নতুন অধ্যায়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বর্বর প্রতিরোধহীন ‘অপারেশন সার্চ লাইট’-এর লক্ষ যেখানে ছিল কয়েক ঘণ্টার নৃশংস, বর্বর আক্রমণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার দম্ভ, সেখানে ২৬ মার্চের এই সাহসী ও সত্য উচ্চারণ হায়েনা শাসকের পরিকল্পিত পরিকল্পনাকে করেছিল স্তম্ভিত। তারা কিছুক্ষণের জন্য হলেও হয়েছিল স্তব্ধ। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আগাতে হয়েছিল তাদের বাঙালির সাহস ও উদ্ধত্যের জবাব দিতে। তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরেছিল এই ধ্বনির উদ্যোক্তা আর উৎসস্থানকে।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, পিছুটানহীন, জীবন বাজী রাখা সাহসী পরিকল্পনা নিয়ে বিশাল এই কর্মে যারা সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের পুঁজি ছিল শুধুমাত্র নিজেদের জীবনটুকু। পৈশাচিক পাকিস্তানি বাহিনীর নগ্ন সেই হামলার সাথে সাথেই তারা অসহায় বাঙালি ও বাংলাদেশের জন্য কিছু একটা করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন গভীরভাবে। বাঙালির পাশে থেকে সাহস ও শক্তি যোগানোর সে প্রচেষ্টার মাঝে অন্ধকারে নিমজ্জিত বাঙালি খুঁজে পেয়েছিল আলোর দিশা।

প্রচার মাধ্যম একটি দেশের সার্বিক চিত্র তার প্রচারণার মাধ্যমে তুলে ধরে। দেশের জনগণ ও বহির্বিশ্ব এর মাধ্যমে দেশটি সম্পর্কে অবগত হয়ে থাকে। যুদ্ধকালীন একটি দেশ তার অভ্যন্তরীণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি যতোটুকু পারে সরকারের ছত্রছায়ায় গোপন রাখার চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর দুর্দশার চিত্র প্রচার মাধ্যমে স্থান পায় না। উপরন্তু মিথ্যা আর অসত্য প্রচারণা দিয়ে দেশ ও দেশের বাইরের জনগোষ্ঠীকে অন্ধকারে রাখার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালানো হয়। এর ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মানবিক সুবিধা পাওয়ার অধিকার যেমন ক্ষুণ্ন হয়, তেমনি আন্তর্জাতিক মানবিক বিশ্বের সহানুভূতি ও সহমর্মীতা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সাহসী জনতা উদ্যোগ গ্রহণ করে–বহির্বিশ্বে দেশের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ পরিস্থিতির তথ্য প্রদান করতে। কাজটি যদিও অত্যন্ত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। তথাপি দেশপ্রেম, সাহস আর দায়িত্ববোধ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত জনগণের উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়েই তা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র ছিল নির্ভীক, সাহসী বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেম আর দায়িত্বশীলতার স্বাক্ষর। কামাল লোহানী বলেন, "বিপ্লবী বেতারের মতো প্রচার মাধ্যম না হলে মুক্তিযুদ্ধ সম্পন্ন হতো না। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মুক্তিযুদ্ধ চলতে পারে না। কারণ প্রচলিত বেতার কেবল রং চড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধকে বিকৃত করে বিরুদ্ধ প্রচারই করে থাকে। সে কারণেই বোধ হয় এই প্রচারকে 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' বলা হয়ে থাকে।"[১]

মুক্তিসংগ্রামে প্রচারণা অত্যাবশ্যকীয় একটি অংশ। প্রচারণার মাধ্যমে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী তাদের প্রতি অন্যায় বর্বর আক্রমণের সত্য কাহিনি দেশ ও বিদেশের জনগণের মাঝে প্রচার করতে সক্ষম হয়। সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম দেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত স্বাভাবিক দেখানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, আর আক্রান্ত জনগণের পক্ষের প্রচার মাধ্যম শাসক পক্ষের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের সঠিক চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার প্রয়াস চালায়।

২৫শে মার্চের কালোরাতের অতর্কিত আক্রমণের পর সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অসহায়ত্বকে উপলব্ধি করে চট্টগ্রাম বেতারের সাহসী কর্মীবাহিনীর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গোটা বাঙালি জাতিকে আস্বস্ত করেছিল, সাহস যুগিয়েছিল। বর্বর হায়েনা আক্রমণের মুখে সবাই যখন জীবন নিয়ে পলায়নরত, সেই মুহূর্তে অল্পকয়েক ঘণ্টার চিন্তা প্রসূত সিদ্ধান্ত বাঙালিকে অন্ধকারের মাঝে আলো দেখিয়েছিল। নিঃসম্বল কর্মীবাহিনীর সেই উদ্যোগ কতোটা সফল হবে, আদৌ সফল হবে কিনা, এতসব ভাবার সুযোগ বা অবকাশ কোনোটাই তখন ছিল না, তারা তাদের সৎ সাহস নিয়ে বিশাল সেই সাহসী কর্মযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গী ছিল একমাত্র দেশপ্রেম আর নিজেদের কাছে নিজেদের প্রতিশ্রুতি।

সারাদেশে যুদ্ধ শুরু হবার প্রাক্কালে কোনো কমান্ড তৈরি হবার আগেই জীবনকে তুচ্ছ করে, সকল পিছুটানকে উপেক্ষা করে মহান দায়িত্ব কাধে তুলে নিয়েছিলেন যারা, তারা সকলেই ছিলেন চট্টগ্রাম বেতারের প্রোগ্রাম ও প্রকৌশল শাখার কর্মী, যাদের লক্ষ ছিল জীবন দিয়ে হলেও সেই কঠিন দুঃসময়ে জনগণের পাশে থাকা। স্বউদ্যোগে তারা গড়ে তোলেন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র।' এই কেন্দ্রের অন্যতম উদ্যোক্তা আবুল কাশেম সন্দ্বীপ বলেন, "আমি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারের যারা প্রতিষ্ঠাতা সেই তিনজনের এবং পরবর্তী পর্যায়ের দশজনের অন্যতম একজন। আমি এই বেতারের প্রথম কণ্ঠ। আমার কণ্ঠে সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত 'নাসরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারীব', 'আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী' পাঠের মাধ্যমে এই বেতারের নাম ঘোষণা করা হয়। আমি স্বকণ্ঠে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার বাণী সর্বপ্রথম বাংলায় তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করি। আমি এই বেতারের প্রথম সংবাদ পাঠক ও সংবাদ লেখক। পরবর্তী পর্যায়ে আমি যতদুর

১. কামাল লোহানী, *মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার*, দেশ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৫

মনে পড়ে ১৯৭২ সালের ২রা জানুয়ারি পর্যন্ত বেতারের সঙ্গে জরিত ছিলাম এবং সংবাদ বিভাগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্বপালন করেছি।"[২]

বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের সাহসী সে ঘোষণার বার্তা প্রচারের এক ঘণ্টার মধ্যেই বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকাসহ বহু বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংবাদ।[৩]

রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রামের শিল্পী, কলা-কুশলী, উদ্যোগী সংস্কৃতি-জনদের তৎপরতায় ২৬ মার্চ শুরু হওয়া স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারের বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে ছিলেন বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, মোস্তফা আনোয়ার, আবদুল্লাহ আল ফারুক, সৈয়দ আবদুশ শাকের, আমিনুর রহমান, রাশেদুল হোসেন, শরফুজ্জামান, রেজাউল করিম চৌধুরী, হাবিবুর রহমান মনি সকলেই প্রত্যক্ষভাবে এর র্কাযক্রমে জড়িত ছিলেন। মাত্র ১ কিলোওয়াট যন্ত্র ব্যবহার করেই তারা মুক্তিযুদ্ধের প্রচার কার্যক্রম শুরু করেন।[৪]

নেপথ্যে থেকে যারা এই উদ্যোগকে সফল করার জন্য নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছেন তাদের মধ্যে চট্টগ্রামের ড. আনোয়ার আলী, নাট্য ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদ, নাট্য সংগঠক মাহবুব হাসানের সাথে শিল্পীরাও সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম বেতারের তরুণ অফিসাররা পাকিস্তান সরকারের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক পুরোধা ব্যক্তিত্বদের সাথে যুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার প্রতিষ্ঠা করে বাঙালিদের সাথে সাথে আর্ন্তজাতিক বিশ্বকেও চমকিত করেছিলেন।[৫]

আরো যারা সূচনালগ্নে নিবিড়ভাবে কাজ করে এই উদ্যোগকে সফল বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে চট্টগ্রাম সংস্কৃতি অঙ্গনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় ডা. শফি, যিনি ছিলেন একজন প্রগতিশীল দক্ষ সংগঠক যিনি পরবর্তীতে শহিদ হন। আরো ছিলেন ডা. কামাল এ খান।[৬] এ প্রসঙ্গে বেলাল মোহাম্মদ লিখেছেন, বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা পর্যায়ে নেপথ্যে ছিলেন ডাক্তার এম শফী (শহিদ), বেগম মুশতারী শফী, খোন্দকার এহসানুল হক আনসারী (শহিদ), অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, এয়ার মাহমুদ প্রমুখ। প্রত্যক্ষ সহায়ক ছিলেন অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ, মাহবুব হাসান, সেকান্দার হায়াত খান, আনোয়ার আলী, রঙ্গলাল দেব চৌধুরী, ড্রাইভার এনাম প্রমুখ।[৭] স্বাধীন বাংলা বেতারের সুতিকাগার ছিল 'মুশতারী লজ।'

---

২. আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, স্বাধীনবাংলা বিপ্লবী বেতার থেকে বলছি, উৎস : *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, সম্পাদনা সেলিম রেজা, অনুপম প্রাকাশনী, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ৯৮। আরো, শামসুল হুদা চৌধুরী, বরেন্দ্র থেকে বাংলাদেশ, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১০০০, পৃ. ১৯

৩. শামসুল হুদা চৌধুরী, *একাত্তরের রনাঙ্গন*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৮২, পৃ. ৭৫

৪. কামাল লোহানী, *মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার*, দেশ পাবলিকেশন্স ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৫

৫. কামাল লোহানী, লড়াইয়ের গান, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ৪১

৬. কামাল লোহানী, *মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার*, দেশ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩১,৩২

৭. বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, অনুপম প্রকাশী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২২

স্বাধীনবাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশনের প্রথম ঘোষণাটি ঠিক সন্ধা ৭ টা ৪০ মিনিটে আবুল কাশেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছিল। ‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র’ নাম ঘোষণা করে আবদুল্লাহ আল ফারুক এবং সুলতানুল আলমের কণ্ঠেও প্রচারিত হয়েছিল সেই অধিবেশনে। বঙ্গবন্ধুর নামাঙ্কিত ‘জরুরী ঘোষণা’ হ্যান্ডবিলটিও বারবার প্রচারিত হয়েছিল আর ছিল কবি আব্দুস সালামের ভাষণ।[৮]

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের পূর্বেও দেশপ্রেমিক সাহসী বেতার কর্মীদের উদ্যোগ ও তৎপরতায় দুটি ঘোষণা প্রচার হয়েছিল। তার একটি ২৬ মার্চ দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য এবং আরেকটি রাত দশটার পর মাত্র ১০ মিনিটের জন্য। “১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সকাল ৯টায় চট্রগাম বেতার কেন্দ্র পাকিস্তান সরকারের সামরিক নির্দেশাবলী প্রচার বন্ধ করে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কার্যক্রম শুরু ও প্রচারের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ঐ দিনই দুপুর ২টা ৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে প্রেরিত বার্তা আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা জনাব হান্নানের কণ্ঠে এ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম পঠিত হয়।”[৯]

কামাল লোহানী এ প্রসঙ্গে বলেন, “২৬ মার্চ দুপুর বেলা বেতার প্রকৌশলীদের জোর করে ধরে এনে চট্রগামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান তার নিজের বক্তৃতা মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য প্রচার করে ছিলেন। এতে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না বা পরে এমন প্রয়াস অব্যাহত রাখারও কোনো চিন্তা ছিল না কারো। ... ২৬ মার্চ রাত দশটার পর আকস্মিকভাবে আরেকটি অধিবেশন বসেছিল মাত্র ১০ মিনিটের জন্য। এই অধিবেশনে মাহমুদ হোসেন নামে দীর্ঘকায় এক তরুণ ব্যবসায়ী ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বিদেশের কাছে নিজ গলায় সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। সাথে ছিলেন ফারুক চৌধুরী ও রঙ্গলাল দেব চৌধুরী।”[১০]

গবেষক আফসান চৌধুরী সম্পাদিত ‘বাংলাদেশ ১৯৭১’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ ব্যাপারে লেখা হয়েছে যে, “২৬ মার্চ রাত দশটার সময় মাহমুদ হোসেনের প্রচেষ্টায় ফারুক চৌধুরী, বেতার শিল্পী রঙ্গলাল দেব এবং কবির হোসেনের সহায়তায় কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে এ অধিবেশন প্রচার হয়। বেতারের দুজন প্রকৌশলী দেলওয়ার ও সোবহান তাদের সঙ্গে ছিলেন। ‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র’ ঘোষণা দেয়া এই অধিবেশন চলে প্রায় ১০ মিনিট।”[১১]

“২৭ মার্চ রাতে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে সুঠাম দেহের সুদর্শন, দীর্ঘ চুলের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর সাহসী মাহমুদ হোসেনকে অবাঙালি সন্দেহে আটক করা হয়। নির্ভিক, দেশপ্রেমিক মাহমুদ হোসেনকে সি আই এর এজেন্ট ঘোষণা করে তার বন্ধুদেরসহ গুলি করে হত্যা করা হয়।”[১২]

---

৮. বেলাল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৯. আসাদুজ্জামান আসাদ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী শিবির, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯ পৃ. ৪৫৪
১০. কামাল লোহানী, আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫১
১১. নির্মলেন্দু গুন, আত্মকথা ১৯৭১, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২২৪-২২৫
১২. বেলাল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

স্বাধীন বাংলা বেতারের উদ্যোক্তারা তাদের সেই দিনের দুঃসাহসী ভূমিকার স্মৃতি বিভিন্ন লেখায় তুলে ধরেছেন। প্রামাণ্য ঘটনা হিসেবে তা মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের অন্যতম উদোক্তা মুস্তফা আনোয়ার লিখেছেন, "২৬ মার্চ ১৯৭১ সকাল ৯.০৫ মি: আমরা কয়েকজন অফিসার জাতীয় অনুষ্ঠানে সামরিক আইন জারি সম্প্রচার বন্ধ করে চট্টগ্রাম বেতার ব্রডকাস্টিং হাউসের মেশিন ইত্যাদি বিকল করে দিয়ে দপ্তর ত্যাগ করি। উল্লেখ্য আমরাই ছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম বিদ্রোহী কর্মচারী। (সন্দ্বীপ, বেলাল প্রমুখ স্টাফ আর্টিস্ট নন) আমরা একটি সশস্ত্র বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। সাংগঠনিক শক্তি ক্রমেই একটি বিশাল শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। একক ব্যক্তির একক সিদ্ধান্তের প্রশ্নই ওঠে না। বিপ্লবের একটি স্তর থেকে অন্যস্তরে যে অগ্রসরতা সার্বক্ষণিকভাবে স্বাধীন বাংলা বেতারের সঙ্গে যুক্ত কয়েক জনের সুচিন্তিত চিন্তার যোগফল। কয়েকজন সহকর্মী মিলে টি এন্ড টি স্টোরের এফ/৩ নং একটি কক্ষকে কন্ট্রোল রুমে রূপান্তরিত করে নির্বাচনে জয়যুক্ত একমাত্র পার্টির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। কেউই কোনো রাজনীতি করতাম না। করতাম কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী। তাই উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামী লীগ আমাদের সহায়তা করুক। 'রেডিও' কে বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করুক।"[১৩]

বেতার কেন্দ্রটি চট্টগ্রাম শহরে থেকে পরিচালনা করা বিপদজনক ও কঠিন হবে মনে করে সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক আব্দুল কাহহার চৌধুরী কালুর ঘাট ট্রান্সমিশন ভবন থেকে প্রচারের পরামর্শ দেন।[১৪]

ঢাকা তখন পুরোপুরি আক্রান্ত। পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণে ঢাকা বেতার। চট্টগ্রাম তখনো পুরোপুরি আক্রান্ত হয় নাই এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রচার কার্য চালাতে প্রয়োজন ছিল ১০ কিলোওয়াট। বেলাল মোহাম্মদ বলেন, "আমি তখন চট্টগ্রাম বেতারের স্ক্রিপ্ট রাইটার ছিলাম। বেতারকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম কালুর ঘাট স্টেশনটাকেই স্টাবলিস্ট করার চেষ্টা করলাম।'... এই বেতার কেন্দ্রের উদ্যোগটা এতোটাই তাৎক্ষণিক আর স্বতঃস্ফূর্ত ছিল যে নামকরণের ক্ষেত্রে একবার 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' আবার পরে আবুল কাশেম সন্দ্বীপের প্রস্তাবে এ্যারো চিহ্ন দিয়ে 'বিপ্লবী' শব্দটি যুক্ত করা হয়।... প্রতিদিন সকাল ৯ টার পর প্রথম অধিবেশন। দুপুর একটার পর দ্বিতীয় অধিবেশন এবং সন্ধা সাতটার পর তৃতীয় অধিবেশন। ২৬ মার্চের প্রস্তুতি লগ্নে মমতাজ উদ্দীন আহমদ সার্বিক সহযোগিতা এবং পরিকল্পিত বেতার কেন্দ্রের নিরাপত্তা প্রহরা মোতায়েনের গুরুত্ব উপলদ্ধি করে ইপিআর কমান্ডার রফিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সহযোগীতার কথা গুরুত্ব দিয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন। যদিও তিনি তা রক্ষা করতে পারেন নাই। সেই সময়ে মুল্যবান তথ্য এবং উপদেশ দিয়ে সমাধানের পথ দেখিয়েছিলেন চন্দনপুরের তাহের সোবহান। পাহারার বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি রাইফেলধারী জোয়ান এর সন্ধান দিয়েছিলেন। পটিয়ার বাঙালি সৈনিক এবং একজন মেজর আছে বলে তাদের সঙ্গে যোগাগোগ

১৩. সৈয়দ মকসুদ আলী, অরন্য বেতার, প্রথমা, ঢাকা-২০১১, পৃ. ১০৯
১৪. কামাল লোহানী, রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলা বেতার, ভূমিকা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১২১

করার পরার্মশ দেন। কথামতো পটিয়া যেয়ে মেজর জিয়াউর রহমানকে পেয়ে তার সাথে আলোচনা করে ঐদিন বিকাল পাঁচটায় তারা ট্রান্সমিটারে পৌছেন। সন্ধ্যায় জিয়াউর রহমান স্বকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন। ঘোষণাকালে 'বিপ্লবী' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিল। তাঁর ঘোষণার বাংলা অনুবাদটি মমতাজ উদ্দিনের সহযোগীতায় করা, অন্যরা তাতে কণ্ঠ দেন। বারবার প্রচারিত হয়েছিল ঘোষণা দুটি।"[১৫]

জিয়াউর রহমানের ঘোষণা অসহায় বাঙালিকে সাহস যুগিয়েছিল আর বিক্ষিপ্ত যুদ্ধকে সংহত করেছিল। শেখ মুজিবের নামে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা দেশে বিদেশে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। ছাত্র, তরুণ ও সাধারণ জনগণকে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পরতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[১৬]

দ্রুত সমগ্রজাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারণায়। পাকিস্তানি সামরিক জান্তার দম্ভকে চূর্ণ করে দেয়া বেতার ধ্বনির উৎপত্তিস্থল খুঁজে বের করার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিল পাকবাহিনী। অবশেষে খুঁজে পেয়েছিল তাদের কাঙ্ক্ষিত স্থান। উপর থেকে রেকী করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ নিশ্চিত করে ৩০ মার্চ দুপুরের অধিবেশনের পরে সবাই যখন পরবর্তী অধিবেশন পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন তখন দুপুর ২.১০ মিঃ বিমান হামলার শব্দ শোনা যায়। একের পর এক বোমাবর্ষণ চলতে থাকে। পরপর দশটি বোমার বিস্ফোরন ঘটানোর পর শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীন বাংলা বেতারের সকল কর্মী বাহিনী সেখানে উপস্থিত থাকলেও সামান্য হতাহত হওয়া ছাড়া বড় কোনো আঘাত কারোর লাগে নাই। বাইরে পরে দেখা গিয়েছিল একটি কুকুর মারা গেছে।[১৭]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ওপর ৩০ মার্চের বোমা হামলা ছিল বাংলাদেশের প্রথম বিমান হামলা। "সেই মুহূর্তে পাকিস্থানি বাহিনী আমাদেরকে একমাত্র এবং ভয়ঙ্কর শত্রু বলে মনে করেছিল।"[১৮]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নির্ভিক, সত্যনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক উদ্যোগী কর্মী বাহিনী সরকারি প্রচার যন্ত্রের মিথ্যা প্রচারণার জবাবে দায়িত্বশীল সত্যপ্রকাশ করে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। সরকারি প্রচার যন্ত্রের খবর মিথ্যা, উদ্দেশ্যমূলক তা তারা তাদের প্রচারণার মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাঙালির মনোবল ভেঙে দেয়া, পরাজিত করা, নত মস্তকে পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পন করার বানানো গল্প সরকারি বাহিনী প্রচার করে যাচ্ছিল, বিপরীতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বাঙালির মনোবল চাঙ্গা রাখা, সাহস নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা আর পাকিস্তানিদের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হতে জাতিকে আহবান জানিয়ে যাচ্ছিল।

---

১৫. বেলাল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-৪২

১৬. আহমদ রফিক, বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধ, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭২

১৭. বেলাল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০,৫

১৮. বেলাল মোহাম্মদ, সাক্ষাৎকার, উৎস: তারেক মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৪

পরাক্রমশালী, উন্নত ও আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়কে জয় করে, নৃশংশতাকে তুচ্ছ করে উদ্যোক্তারা যে দায়িত্বশীলতার স্বাক্ষর রেখেছিল তা বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামকে মহিমান্বিত করেছিল। বিপর্যস্ত বাঙালি তার পথের দিশা পেয়েছিল বেতার কর্মীদের সাহসী উচ্চারণে।

প্রচার কাজ অব্যাহত রাখার জন্য বেতার কর্মীরা মুক্তাঞ্চলের অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়িয়েছিল। সেই অধ্যায়টা মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের স্বাধীন বাংলা বেতারের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং ইতিহাস। যুদ্ধের গতি প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে বেতারের প্রবীণ প্রকৌশলী মোসলেম খান সীমান্তবর্তী এলাকাকে নিরাপদ বলে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সেখানে প্রচার কাজ চালিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশের একজনও যদি শুনতে পায়, তবে সেটাই তাদের উদ্দেশ্যকে সফল করবে। ভারতীয়দের আগ্রহের কারণেই তারা তা প্রচারের জন্য আগ্রহী হবে। মোসলেম খান বলেন, 'ওখানেও ওদের যন্ত্রে ধরা পড়বে, ঠিক কোন জায়গা থেকে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু ওরা বিমান হামলা করতে পারবে না। কারন বর্ডার এলাকায় বোমা ফেলার জন্য ডাইভ দিতে গেলে বিমানের 'ল্যাজ' ইন্ডিয়ার উপর দিয়ে ঘুরে আসবে। তখন তো রক্ষা নাই।'[১৯]

সার্বিক কাজের সুবিধার জন্য এই সময়ে বেতার কর্মীরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদল রয়ে যায় বগাফার জঙ্গলে। তারা এক কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গের ট্রান্সমিটারটি পুনঃস্থাপন করেন। অন্য দলটি আগরতলা চলে যায়। বগাফার জঙ্গলে ১ কিলোওয়াট প্রচারযন্ত্রটি চালু করতে চট্টগ্রাম বেতারের প্রকৌশল বিভাগের তরুণ কর্মীদের কৃতিত্ব ছিল অনন্য, অসাধারণ। বিশেষ করে একমাত্র বেতার প্রকৌশলী আবদুশ শাকের ও রাশেদুল হোসেন সহযোদ্ধাদের সহায়তায় কপিবুক ছাড়া যে অসাধ্য সাধন করেছেন তা ছিল রিতিমত বিস্ময়কর। তাদের কর্মকাণ্ড পরির্দশন করেছিলেন সেই সময়কার ভারতীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপতি ও আকাশবাণীর প্রধান প্রকৌশলীসহ আরো অনেকে। বগাফায় গিয়ে সূক্ষ্মাতিসুক্ষ যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন করে তারা কোনো কপিবুক ছাড়া ট্রান্সমিটারটিকে পুনরায় প্রচার উপযোগী করা দেখে বেতার কর্মীদের দেশপ্রেমের গভীরতা আঁচ করতে পেরেছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধিরা। তারা তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, ধৈর্য, মেধা, সর্বোপরী দেশপ্রেমের ব্যাপকতা দেখে বলেছিলেন 'তোমরা অবশ্যই জয়ী হবে।'[২০]

বগাফার জঙ্গলে বেতার যন্ত্রটি বসানো হয় এক উঁচু পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে। ট্রান্সমিটারের এরিয়াল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বড় বড় গাছ। সেটি রাখা হয়েছিল একটি বেড়ার ঘরে যার পাশে শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটারটিও ছিল। পুরো কারিগড়ি বিষয়টি দেখার দায়িত্বে ছিলেন রেডিও ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ আবদুশ শাকের। অত্যন্ত সাহস ও দক্ষতার সাথে পুরো কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল। কোনো বাঁধাই বেতার কর্মীদের কর্মযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে নাই। প্রয়োজনের সময় সকল বাধাই তারা তাদের দেশপ্রেম, সততা ও দায়িত্বশীলতা দিয়েই অতিক্রম করেছিলেন। দীর্ঘ তিনটি মাস স্বাধীন বাংলা বেতারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল এই জঙ্গল থেকে। যা ছিল প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের

১৯. বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
২০. কামাল লোহানী, মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীনবাংলা বেতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

পরিবেশ। বাইরের কারো সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল না। জঙ্গল থেকে তারা কেউ বেরও হতেন না। আশপাশের গোলাগুলি ও মর্টারের শব্দ তারা শুনতে পেতেন। তেমনি এক বিভীষিকাময় ভয়ঙ্কর জঙ্গলের আতংকগ্রস্থ জীবনের মাঝে অবস্থান করেও তারা তিনমাস গোটা বাঙালি জাতিকে দিয়েছেন ভরসা আর শুনিয়েছেন আশার বাণী– সাহসী জীবনের আহবান।[২১]

মুস্তফা আনোয়ার বলেন, "কালুর ঘাটের এক কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন ট্রান্সমিটারটি বিচ্ছিন্ন করা এবং আবার তাকে সংযুক্ত করে কাজে লাগানো যে কোনো বিপ্লবের ইতিহাসের জন্য অতি গৌরবজনক ও সাহসী অধ্যায়ের স্মৃতি হয়ে চিরচিহ্নিত স্তরের মতো একটি সত্য ঘটনা। বিপ্লব পাচার করা যায় না। দেশের মাটিতেই তার শিকড় প্রোথিত। এই ট্রান্সমিটারের বিযুক্তি আর সংযুক্তি তার প্রমাণ বহন করবে আগামী দিনের জন্য।"[২২]

মানুষ যখন মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে শেখে তখন তার কাছে কোনো কিছুই বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি তাদের জীবন তুচ্ছ করে সংগ্রাম করেছে। ঐ সময় তাদের সামনে সাধ্যাতীত বলে কিছু ছিল না। ৩০ মার্চের পর বাঙালি বেতার প্রচারিত অনুষ্ঠান শুনতে পায়নি বলে বেতার কর্মীরা সদা সচেষ্ট ছিল দ্রুত বেতার কার্যক্রম পুনরায় শুরু করতে।

কামাল লোহানী বলেন, "মাঝে চারদিন বন্ধ ছিল এই বেতার। ঐ সময় বেতার অনুষ্ঠান শুনতে না পেয়ে মানুষ কতখানি বিপন্ন হয়ে পড়েছিল মানসিকভাবে, তা আজও আমার মনে পড়ে।"[২৩]

৩ এপ্রিল রাত ১০টা। এটা ছিল স্বাধীন বাংলা বেতারের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম অধিবেশন। সূচক সুর হিসেবে এই দিন বেজেছিল 'জয় বাংলা বাংলার জয়' রেকর্ডের গানটির ১ম পিঠ এবং সমাপ্তীতে ২য় পিঠ। বাংলা সংবাদ বুলেটিন পাঠ করেছিলেন আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, ইংরেজি বুলেটিন শামসুদ্দীন খান। ঢাকা রেকর্ডের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' এবং আরো কয়েকটি গান বাজানো হয়েছিল। অধিবেশনটি ১ ঘণ্টাব্যাপী প্রচার হয়েছিল।[২৪]

"৪-৮ এপ্রিল ১৯৭১। বগাফার ৫ দিন দুটি করে অধিবেশন সকাল ৮-৯ টা আর সন্ধা ৭-১০ টা। বাঁশের ঘরে ট্রান্সমিটার আর সেখানেই সারতে হত লিখার কাজ। অমর সিং এর সহায়তায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো। ৮ এপ্রিল সকালের অধিবেশন প্রচারের পরেই লড়িতে করে অনেক যান্ত্রিক সরঞ্জামের সাথে অমর সিংকে সহযাত্রী করে শালবাগানের উদ্দেশ্যে যাত্রা। সান্ধ্য অধিবেশন শালবাগান থেকে প্রচারের কথা থাকলেও তা আর সম্ভব হয় নাই। তিনদিন বিরতীর পর আবার ১২ এপ্রিল প্রভাতী অধিবেশন দিয়ে শুরু হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। ৪০০ ওয়াট ক্ষুদ্র তরঙ্গ ট্রান্সমিটার, মিটার ব্যান্ড ৮৩.৫৬।"[২৫]

---

২১. কাজী হাবিব উদ্দিন আহমদ (মনি), অনুষ্ঠান সংগঠক, বাংলাদেশ বেতার, সৈয়দ মকসুদ আলী, অরণ্য বেতার, প্রথমা, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৪১

২২. মুস্তফা আনোয়ার, অরণ্য বেতার, সৈয়দ মকসুদ আলী, প্রথমা, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১১০

২৩. কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫২

২৪. বেলাল মোহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

২৫. বেলাল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪, ৬৯,৭০

৯ এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠান প্রচার হয়নি। প্রচার না হওয়ার বিষয়ে লিখেছেন নির্মলেন্দু গুন, "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তখন অনেক অনুষ্ঠানেই দখলদার পাক-সেনাদের বর্বরতার কাহিনি প্রচারিত হতো। পাক সেনা মানেই পাঞ্জাবী সেনা, পাক সেনাদের মধ্যে পাঠান বা বালুচরা থাকলেও তাদের সবারই নিয়ন্ত্রক ছিল মূলত পাঞ্জাবি সেনারাই। জাতি পরিচয়ে যারা ছিল পাঞ্জাবি। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলার মতো পাঞ্জাবও দ্বি-খণ্ডিত হয়। মুসলমান অধ্যুষিত পশ্চিম পাঞ্জাব পড়ে পাকিস্তানে আর পূর্ব পাঞ্জাব পড়ে ভারতে। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তখন প্রচুর প্রাণ ও সম্পদহানির ঘটনা ঘটে। তারপরও জাতি তৃষ্ণা বলে কথা, ধর্মের চেয়েও অনেক পুরনো এ ব্যাধি। তাই পাঞ্জাব ভাগ হয়ে গেলেও পাঞ্জাবিরা তাদের জাতিসত্ত্বার গর্বিত পরিচয়কে ঠিকই আগলে রাখে বাঙালিদের মতোই। বি এস এফ এর সদর দফতরে কর্মরত হিন্দু পাঞ্জাবি সৈনিকরা তাদের মুসলমান পাঞ্জাবি ভাইদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও নিন্দামন্দ প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তাতে একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। রামকে বাদ দিয়ে রামায়ন রচনা সম্ভব নয়। পাঞ্জাবিদের বাদ দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের রামায়ন রচনাও তেমনি সম্ভব নয়। কিন্তু সর্দারজীরা তার মর্ম বুঝতে রাজি নয়। যারা আশ্রয়দানকারী, তারা আশ্রিতের যুক্তি মানবে কেন? তাই এক পর্যায়ে জাত্যাভিমানী সর্দারজীরা আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্প্রচার গায়ের জোড়ে বন্ধ করে দিলে ৯ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। পরে উপর মহলের ফলপ্রসু হস্তক্ষেপের পর ১২ এপ্রিল থেকে আবার তার সম্প্রচার শুরু করা সম্ভব হয়।"[২৬]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কবি বেলাল মোহাম্মদের কাছে থেকে শোনা 'অনিবার্য কারণে' বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যাবার অন্তরালের ঘটনা এভাবেই ব্যক্ত করেছেন কবি নির্মলেন্দু গুন।

২৫ মে ১৯৭১ পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে বেতার কর্মীগণ শ্রম, ঘাম, দেশপ্রেম, দায়বদ্ধতা আর নীতিবোধ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের মুখপাত্র হিসেবেই তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন, কোনো রাজনৈতিক দলের নয়। দেশপ্রেম আর বাঙালির প্রতি দায়বদ্ধতা ছিল সব কিছুর মূলে।

স্বনিয়ন্ত্রিত বেতারকর্মীরা অরক্ষিত ভীত, সন্ত্রস্ত বাঙলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। শত্রু সেনার আক্রমণের মুখে সাধারণ মানুষ কিভাবে নিজেদের রক্ষা করবে, ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধ কিভাবে করতে হবে ইত্যাদি জানিয়ে সাহসী প্রচারণা চালাতেন। গানে, কবিতায় স্বরচিত কথিকায়, বজ্রকণ্ঠের স্লোগান দিয়ে তাদের ভয় দুর করার চেষ্টা করত স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র। আর থাকত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। বেতার কর্মীরা তাদের সাহস, মেধা, বিক্রমকে কাজে লাগিয়ে পরাক্রমশালী পাকিস্তানি শোষকের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। হানাদার

২৬. নির্মলেন্দু গুন, *আত্মকথা ১৯৭১*, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২১৫-২১৬

উৎখাতে দেশে বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা, শেখ মুজিবকে জাতীয় নেতা হিসেবে স্বীকার করেই জাতিকে মুক্ত করা এবং স্বাধীনতার লক্ষে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। চট্টগ্রামে যে বেতার প্রচারণা দিয়ে শুরু হয়েছিল 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' যজ্ঞ, আগরতলা এসে দ্বিতীয় পর্বে তা শেষ হয়েছিল। ৩০ মার্চ বোমা বর্ষণের মধ্য দিয়ে যে মহান কর্মযজ্ঞের মৃত্যু ঘটাতে চেয়েছিল পাকিস্তান হানাদার বাহিনী, তাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। দেশবাসীর পাশে থেকে তাদের অনিশ্চিত জীবনে কিছুটা আশা, স্বস্তি আর নিশ্চয়তা দেবার লক্ষে ৩ এপ্রিল শুরু হয়েছিল উদ্যোক্তাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা। পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, বন্ধুদের আবার ফিরে পাওয়া, অভিন্ন হৃদয় বন্ধুরা সর্বক্ষণ সচেষ্ট ছিল পিছুটানহীন জীবনে বাঙালির দুর্দশাকে লাঘব করতে।

স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেমিক উদ্যোক্তাগণ যোগ দিয়েছিলেন সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে। দশজনের দলটি সংগঠিত হয়েছিল শব্দ সৈনিকদের প্রাথমিক সংগঠন হিসেবে। যখন সংগঠনটি তৈরি হয়েছিল তখনও দেশে সশস্ত্র সৈনিকদের কোনো সংগঠন গড়ে ওঠে নাই।[২৭] পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে স্বাধীন বাংলা বেতার কর্মীরা 'রাষ্ট্রদ্রোহী' অপরাধী ছিল।

ইতোমধ্যে মুজিবনগর অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় ১০ এপ্রিল ১৯৭১। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলা গ্রামের নাম পরির্বতন করে নতুন নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। সেখানেই শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মুক্তির সংগ্রাম শুধু অস্ত্র আর সৈন্যবল দিয়েই সম্পন্ন হয় না। জনগণের মানবিক গুনাবলিকে জাগানোর জন্য দরকার হয় সংস্কৃতি চর্চার মুক্ত পরিবেশ। বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমেই জনগণের মাঝে সে অনুভূতির ব্যাপক বিস্তার ঘটানো সম্ভব। সে ক্ষেত্রে দরকার প্রচার মাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রয়োজনীয়তা। অস্থায়ী সরকার বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নব নির্বাচিত অস্থায়ী সরকার মুক্তিযুদ্ধের প্রচার কাজকে জোরদার করার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে স্বীকৃতি দিলেন এবং নিজস্ব বেতার যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সবধরনের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নতুন করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দায়িত্ব পেয়েছিলেন জনাব আব্দুল মান্নান এম এল এ, আর পরোক্ষ উপদেষ্টা ছিলেন সর্বজনাব জিল্লুর রহমান এম এল এ, মোহাম্মদ খালেদ এম এল এ, তাহের উদ্দীন ঠাকুর এম এল এ।[২৮] প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সরকার ও কংগ্রেস দলের সম্পূর্ণ সহযোগীতায় ঢাকার বেতার কর্মীদের ন্যূনতম ব্যয়ে ৫০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ২৫ মে কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন ১১ জ্যৈষ্ঠ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে কোলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ছোট একটি দোতলা বাড়িতে কেন্দ্রটি চালু হয়।[২৯]

---

২৭. বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-৫৭
২৮. শামসুল হুদা চৌধুরী, একাত্তরের রণাঙ্গন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৬৪-৬৫
২৯. কামাল লোহানী, মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২

স্বাধীন বাংলা বেতার কর্মীদের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ প্রচারিত অনুষ্ঠানে ছিল ২৫ মে ১৯৭১ সালের সকাল বেলার প্রচারিত অনুষ্ঠানটি।

প্রথমে সকাল ও সন্ধ্যায় দুটি অধিবেশনের প্রচার দিয়ে শুরু হয় এই পর্ব। ইতিমধ্যে ঢাকা বেতার থেকে কিছু কর্মী চলে আসায় তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম অধিবেশন থেকেই পেশাদার বেতারকর্মী দ্বারা সুব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠান প্রচারের চেষ্টা করা হয়। বেতার কেন্দ্রের কাজে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের বাঙালি ছাড়া কারো সাহায্য নেয়া হয় নাই। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি নিয়েই বেতারের কর্মীরাই সব করতেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কাজ ২ ভাগে ভাগ করে সম্পন্ন হতো। দুটো বিভাগই সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটি বিভাগ ছিল তথ্য ও প্রচার যার প্রধান লক্ষ ছিল জনগণের মাঝে তথ্য প্রদান করে হানাদার পাকবাহিনীর অত্যাচার, অনাচার, বর্বরতা, নৃশংসতা প্রচার করে তাদের প্রতি বাঙালিদের মনে তীব্র ঘৃণা, ক্ষোভ ও বিদ্বেষ তৈরি করা। একই সাথে পাকিস্তানিদের কাছে এমন কিছু কাহিনি প্রচার করা যার দ্বারা তারা মানসিকভাবে দুর্বল, ভীতু হয়ে মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলে, একই সাথে তাদের দোসর আলবদর, রাজাকারদের অন্যায় কর্মকাণ্ডকে যতটা সম্ভব বাধাগ্রস্থ করা। দ্বিতীয়টি ছিল সঙ্গীত বিভাগ। এর দায়িত্ব ছিল উদ্দীপনা ও জাগরনী গানের মাধ্যমে অবরুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক শক্তি জোগানো, সাহস, আশা ও উদ্দীপনা তৈরি করা। অসহায়, বিপর্যস্ত বাঙালির স্বপ্ন আকাঙ্খাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলা, শত্রুকে বধ করা এবং প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া। দুটি বিভাগই ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের সময়োপযোগী করেই তার সঙ্গীত বিভাগটিকে গড়ে তুলেছিল। শিল্পী ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সহযোগিতা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতা, সর্বোপরি দায়বদ্ধতার কারণে বিভাগটি খুব দ্রুত সকলের কাছে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে পেরেছিল। যার উপর যতটুকু দায়িত্ব অর্পিত হতো সে ততটুকু নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করতে কখনই অবহেলা করে নাই।

একাত্তরের ২৫ মার্চ শিল্পী, কলা-কুশলী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ছাত্র নির্বিশেষে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে শরণার্থী হয়। আহার-বস্ত্র বাসস্থান, অর্থ কোনো কিছুরই সংস্থান ছিল না তাদের। সঙ্গীত শিল্পীরা সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সহায়-সম্পদ সব ফেলেই তাদের পালাতে হয়েছিল। প্রস্তুতি নিয়ে তো আর মুক্তিযুদ্ধ হয় না। সেই সময় শিল্পীদের অসহায়ত্ব ও তারা কতটা আতঙ্কগ্রস্থ ছিল এবং সেই অবস্থা থেকে তারা কিভাবে শিল্পী হয়ে আবার গান গাইতে সক্ষম হয়েছিল, সে ব্যাপারে লিখেছেন রবিন সেনগুপ্ত, "স্বাধীন বাংলাদেশের রেডিও থেকে দেশাত্ববোধক গান ও সংবাদ শোনার জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিটে-মাটি ছেড়ে আসা লাখ লাখ শরণার্থী বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে ও বাসস্থানে অধীর উম্মুখ হয়ে থাকতো। এমনি একদিন নিজের গাড়ি চালিয়ে আগরতলার কর্ণেল চৌমুহনির রাস্তা দিয়ে কৃষ্ণনগর যাচ্ছি। তখনকার 'জয়বাংলা' অফিসের ভারপ্রাপ্ত যোগাযোগকারী প্রয়াত এম আর সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। পথে দেখি কিছু উদভ্রান্ত যুবক উদাস মনে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে

হয় সদ্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছে। কুশল বার্তা দিয়ে জানলাম, ওদের মধ্যে আছে আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, শহীদুল ইসলাম, আহমদ রেজাসহ রেডিও ও টেলিভিশনের শিল্পীরা। ওরা একটু আশ্রয় চায়। সঙ্গে সঙ্গে ওদের গাড়িতে তুলে নিয়ে গোলাম এম আর সিদ্দিকির কাছে। তিনি সব বৃত্তান্ত শুনে তখনকার 'বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সংস্থার' ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জে পি দত্তের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য একটি বাড়ি ঠিক করে দিলেন। যেটা ছিল ঐ মৈত্রী সংস্থার অফিস। আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, শহীদুল ইসলাম, রেজা ওদের সারাক্ষণের আড্ডা, খাওয়া দাওয়া, গান-বাজনা আমার বাড়িতে হতো। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করতাম–ওরা সঙ্গীত জগতের মানুষ, নিষ্ঠুরতাকে ভয় পায়, ঘৃণা করে। তাই খুঁজতে লাগলাম কি করে ওদের প্রতিভাকে ওদেরই দেশোদ্ধারের পথে সৃজনী শক্তি রূপে ব্যবহার করা যায়। তাই ওদের নিয়ে একটা সংস্থা গঠন করা হয়, যার মুখ্য আবেদন ছিল গানে গানে বাংলাদেশ ইয়াহিয়া খান ও দস্যুদলের নির্মম অত্যাচারের কাহিনি পরিবেশন করা। শেখ মুজিবের বক্তৃতা ও আহবানের টেপ, সঙ্গীতে, দেশাত্মবোধক তর্জাগানে মানুষের মনে একটা দৃঢ় প্রত্যয় ও সংকল্প গড়ে ওঠে। গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে ওদের নিয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠান হতে লাগলো। মানুষ অন্ন সংস্থানের মধ্যেও খুঁজে পেতে চায় একটু জীবন চেতনার গান, দেশের গান, দেশের কথা।"[৩০]

উদ্বাস্ত শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হতেই জীবন বাঁচানোর জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গসহ পাশ্ববর্তী নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই অসহযোগকালীন সময়ে শিল্পীদের মধ্যে যারা রাস্তার খোলা মঞ্চে, নগর বন্দরে গান গেয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সোচ্চার ছিলেন তারাই মূলত পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাদের পরিচিত মুখ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছে ছিল চিহ্নিত। সুতরাং তারাই আক্রমণের লক্ষবস্তু হয়ে উঠেছিলেন প্রথম দিকেই। তাই মৃত্যুর ভয়ালপুরী থেকে জীবন নিয়ে শিল্পীরা পালিয়ে আগে বাঁচার পথ খুঁজেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কোলকাতা, কেউ আগরতলা যে যেভাবে পেরেছে সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম মহিলা কণ্ঠ শিল্পী হিসেবে দাবি করে নমিতা ঘোষ বলেন, "১৬ এপ্রিল আগরতলা রাজবাড়ি ক্যাম্পে আমি শরণার্থী হই। ওখানে দেখা হয় কংগ্রেস নেতা প্রিয় দাস চক্রবর্তীর সঙ্গে। ওখানেই দেখা হয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ. টি ইমাম সাহেবের সঙ্গে। ওখানে আরো দেখা হয় আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদের সঙ্গে। আগরতলাতে আমরা অনেকগুলো প্রোগ্রাম করি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ২৫ মে উদ্বোধন হবে শুনলাম। এইচ টি ইমাম সাহেব দুটো টিকেটের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি এবং আমার মা আগরতলা থেকে কোলকাতা চলে গেলাম। ২৯ মে আমিনুল হক বাদশা সাহেব আমাকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়ে যান। ওখান থেকে আমি প্রথম কণ্ঠ দিতে থাকি। গণেশ ভৌমিকের লেখা 'স্বাধীন করো মুক্ত করো জয় বাংলা...।' ওখানে এক প্রফেসর ছিলেন তাহের উদ্দীন। তিনি জাগরণী নামের একটি গণসঙ্গীতের অনুষ্ঠান করতেন।

৩০. রবীন সেন গুপ্ত, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা, কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ২৮

দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান করতেন–সেখানেই আমি গানটা গাইলাম। পরবর্তীতে আরো গান আসে। আমি যখন এই গানটা করি, তখন ওখানকার শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন আবদুল জব্বার, রমা ভৌমিক, স্বপ্না রায়। তারপরতো সবাই এলো। যখন আমি ওখানে যাই প্রথম, তখন মেয়েদের মধ্যে আর কোনো শিল্পী ওখানে যায় নাই। ঐ সময়ে তাজউদ্দীন সাহেব আমাদের ১৪ জনের একটি টিম গঠন করলেন–ভারত বর্ষের বিভিন্ন জায়গায় গান করার জন্য। আরো উদ্দেশ্য ছিল টাকা কালেকশন এবং মুক্তিযুদ্ধের বিভৎসতা আর পাকিস্তানের বর্বরতার কাহিনি তুলে ধরা। মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত একটা দেশের শরণার্থী হিসেবে সকলের সহানুভূতি আদায় করা ছিল আমাদের লক্ষ। আমরাও সেই লক্ষে বিভিন্ন জায়গায়, স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন রাস্তায় গলায় হারমোনিয়াম বেঁধে গান করেছি। শেষে ১১ লাখ টাকা, জামা-কাপড়, ওষুধ নিয়ে ফিরেছিলাম। সেগুলো সরকারি ফান্ডে জমা দিয়েছিলাম।”[৩১]

স্বাধীন বাংলা বেতারের কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগেই শিল্পীরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। ভারতীয় শিল্পী ও সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতায় তারা তাদের অসহায় জীবনে ব্যাপক সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন। যার ফলে জীবনধারনসহ সার্বিক সহযোগিতায় তারা আবার স্বাভাবিক জীবন শুরু করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতারের কার্যক্রম শুরু হলে শিল্পীরা সেখানে যোগদান করেন। স্বাধীন বাংলা বেতারের তৎকালীন সার্বিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। কামাল লোহানী সেই সময়ের বেতার কেন্দ্রের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন তার লেখায়, “সেকি দূরবস্থা, স্টুডিও যাকে বানিয়েছি সেখানে কোনো এসি নেই, এমনকি সাউন্ড প্রুফেরও কোনে ব্যবস্থা নেই। তাই রেকর্ডিং করার সময় ফ্যান পর্যন্ত খোলা যেত না, দরজা জানালা বন্ধ রাখতে হতো। এভাবে সংবাদ রেকর্ড করতেন হাসান অর্থাৎ সালেহ আহমদ। কিছুক্ষণ পড়ার পর যখন ঘর্মাক্ত কলেবর তখন দরজা খুলে ফ্যানের তলায় গা জুড়িয়ে ঘাম মুছে একটু বিশ্রাম সেরে আবার রেকর্ড করতে হতো। রেকর্ড করা গণসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত কিংবা সুকান্তের গান, যেসব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ব্যবহার হতো, সেগুলোতো ছিলই। আবার যারা গান লিখতেন, তারাতো গান লিখেছেনই কিন্তু যারা কোনোদিন লিখেননি তারাও গান লিখলেন, সে গান সুর দেয়াও হয়েছিল।”[৩২]

প্রথমদিকে স্বাধীন বাংলা বেতারে যে সকল সঙ্গীতশিল্পী উপস্থিত ছিলেন, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো:

কল্যাণী ঘোষ বলেন, আমরা ১৫-২০ জন শিল্পী, ছোট্ট জায়গা, দাঁড়ানোরও সুযোগ ছিল না, ওই অবস্থায় গান করেছি। খাওয়া দাওয়া নেই, একটা সিঙ্গারা অথবা মুড়ি। তাই ছিল সারাদিনের জন্য অমৃত। বিশ্রাম বা ঘুমানোর কথা ভাবতাম না। ধ্যান-জ্ঞান ছিল দেশের মুক্তি। কবে কখন

---

৩১. নমিতা ঘোষ, সাক্ষাৎকার, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, তাকের মাহমুদ, আগামী প্রকশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬৩-৬৭

৩২. *মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার*, দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৬, পৃ. ২৩

মুক্ত হব। ৯ মাসে আমরা স্বাধীন হবো এটাতো স্বপ্নেরও অতীত ছিল। ঐ সময়ে আমাদের মাঝে ঐশ্বরিক কোনো শক্তি ছিল নয়তো এত শক্তি নিয়ে আমরা এভাবে কাজ করতে পারতাম না। আমরা শিল্পীরা তখন সরাসরি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারিনি, কিন্তু আমাদের কণ্ঠটা আমাদের অস্ত্র ছিল। কণ্ঠ দিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছি। সেই একটা ভাব-আবেগ নিয়ে করেছিলাম। কোনো কিছু পাওয়ার জন্যে নয়। অর্থ, বাড়ি সম্পত্তি এসব কিছু না। শুধু দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমরা এক হয়ে গিয়েছিলাম। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই আমরা এক হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিলাম। জুন মাস থেকে প্রতিদিন আমরা গান গাইতাম। আমাদের প্রথম গান ছিল বোধহয় 'আয়রে চাষী মজুর কুলি' গানটা। সব গানই ছিল সমবেত। সমরদাস, সুজেয় শ্যাম, অজিদ দা গানের জন্য আমাদের তিন ভাই-বোনকে রাখতেনই। গণসঙ্গীত গাইবার জন্য যে খোলা কণ্ঠের দরকার আমি একা গাইলে অন্তত ৯/১০ জন মহিলা কণ্ঠের মধ্যে আমার কণ্ঠটাই বেশি শোনা যায়। সেখানে ছিল তখন ১০টা মেয়ে আর ২০টা ছেলে। সমর দাসের পরিচালনায় একটা লং প্লে হয়েছিল। সেখানে একটি গানে শুধু আমার কণ্ঠটাই বেশি শোনা যায়। একটা ছোট্ট রুম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের। একটা মাইক্রোফোন, যন্ত্রী আছে, বাঁশি, তবলা, বেহালা বাদক ছিলেন। সুবল দত্ত ও তার ভাই বাবুল দত্ত আমাদের সাথেই ছিলেন।[৩৩]

মালা খুররম বলেন, আমরা পরিবারের সাথে ছিলাম। বাসার কাছেই ছিল বালিগঞ্জ। আমরা হেটে হেটে বেতার কেন্দ্রে যেতাম। বাইরে থেকে মনে হতো না এখানে গান রেকর্ড হচ্ছে। ওটাকেই আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বলতাম। প্রথম দিনেই যেয়ে পেয়েছিলাম সমর দাস, অজিত রায়, আশফাক ভাই, কামাল ভাইকে। সমর দাস, অজিত রায়, সুজেয় শ্যাম সকলের সুরে আমরা গান গাইলাম। সুজেয়দার প্রথম গান 'স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে', 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম' এই গানগুলির কথা মনে আছে। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটিতে ঢুকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গণের অনেককেই দেখতে পেয়ে মনে হয়েছিল ওরা কখন আসলো এখানে। কিভাবে আসল। সবাইতো আমার আগে চলে এসেছে। আমরা সবাই এক। সবার উদ্দেশ্যই ছিল এক। আমাদের দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশা অনেক কিছুই ছিল, তারপরও সব ভুলে গিয়েছিলাম। একটা সুন্দর দেশ পাওয়ার আশায় আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। কণ্ঠ দিয়ে। একটা দেশ অর্জন করতে হলে কত কিছু ত্যাগ করতে হয়। নতুন প্রজন্ম হয়তো জানে না, সেই ত্যাগের মধ্য দিয়েই আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি।'[৩৪]

কাদেরী কিবরিয়া বলেন, সেখানে যেয়ে প্রথমে আবদুল জব্বার ভাইকে পাই। তারপর মান্না হক, রথীন্দ্রনাথ রায়, মনসুর আহমেদ, সুরকার আলউদ্দীন, আহমেদ শাহ, অনুপ ভট্টাচার্য সবার সাথে একত্রে নীচে থাকতাম। প্রথম সারিতে আপেল ভাই, তারপর মান্না হক, তারপাশে রথীন্দ্রনাথ রায়, তার পাশে মনসুর আহমেদ, তার পাশের সিটটা আমার জন্য বরাদ্দ ছিল। সেই রাতেই গান

৩৩. সাক্ষাৎকার, তারেক মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আগামী প্রকাশনী, ২০১৩ পৃ. ৯৪, ৯৫
৩৪. সাক্ষাৎকার, তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

রেকর্ড হলো ‘পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে’ গানটি। স্টুডিওতে ছিলেন রূপা খান, মালা খুররম, নমিতা ঘোষ, প্রমীলা, কল্যাণী ঘোষ, উমা খান, প্রবাল চৌধুরী এরা সবাই। সবাই মিলে গানটি করলাম। আমার জীবনের পরম পাওয়া ও সৌভাগ্য যে, এই গানটি আমি গাইতে পেরেছি। তখন অনেক গান রেকর্ড হয়েছে এরই মধ্যে। ‘নোঙ্গর তোল তোল’ এরকম আরো গানে সকলের সাথে অংশ নিয়েছিলাম।[৩৫]

মলয় কুমার গাঙ্গুলী বলেন, আমাদের গান গাওয়ার সঠিক কোনো দিক-নির্দেশনা ছিল না। এই মুহূর্তে দরকার, বসে যাও। যন্ত্র নেই, কিছু নেই এমনি একটা হারমোনিয়াম দিয়ে প্লেটের মধ্যে বাজিয়ে বা কয়েন দিয়ে পানি খাওয়ার গ্লাসে টুং টুং করে প্রথম গান করি। পরবর্তীতে বেহালা, গিটার এসব পাওয়ার পর আমরা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছি। তাছাড়াতো অনেক কষ্ট হয়েছে। আমি এস এম আবদুল গণি বোখারির লেখা ‘বাঙালি আর কতকাল থাকবি ঘুমেতে বিভোর, এবার উঠতে হবে মারতে হবে’ গানটি সলো করেছিলাম।[৩৬]

বুলবুল মহলানবিশ বলেন, আমি আকাশবাণী কোলকাতায় অনুষ্ঠান করতাম। কিন্তু সেখানে আমার মন বসছিল না। আমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করতে আগ্রহী ছিলাম। ঠিকানা যোগাড় করে ওখানে গেলাম। সেখানে সমরদা, আজিতদা, রথীন্দ্রনাথ রায়, কল্যাণীদিসহ আরো অনেকেই ছিলেন। সবাই ছিল পরিচিত মুখ। সেদিনই বিখ্যাত গান গোবিন্দ হালদারের রচনা আর সমরদার সুরে ‘পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্তলাল’ গানটির রিহার্সাল শুরু হলো। আমি যোগ দিলাম। ‘নোঙ্গর তোল তোল’ গানটির রিহার্সেলেও অংশ নেই। সন্ধার দিকে গানটি রেকর্ড হয়। আমাদের উল্লেখযোগ্য গানগুলো ছিল ‘বিজয় নিশান উড়ছে ঐ’, ‘নোঙ্গর তোল তোল’, ‘পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে’, ‘রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম’, ‘জনতার সংগ্রাম চলবেই’, ‘কারার ঐ লৌহ কপাট।’[৩৭]

শিলা ভদ্র বলেন, আমরা তিনবোনই স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে ছিলাম। আমার মেজবোন শিপ্রা ভদ্র, তৃতীয় বোন শুক্লা। আমরা আমাদের কণ্ঠটাকে নিজের দেহের থেকেও অনেক বড় মনে করে এখানে বিলিয়ে দিয়েছি। স্বাধীন বাংলা না থাকলে হয়তো এই জিনিসগুলো আসতো না, মুক্তিযুদ্ধ যে কি জিনিস, সেটা আমরা প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করি। এই মুক্তিযুদ্ধে আমি অন্য কোনভাবে দেশকে কিছু দিতে পারি নাই, আমি কণ্ঠ দিয়েছি। এই কণ্ঠটা আছে বলে আমি আজও বেঁচে আছি।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দিনগুলো আমরা নানাভাবে কাটিয়েছি। কেউ সিঁড়ির চট বিছিয়ে ঘুমিয়েছি। খাবার ডাল শেষ হয়ে গেছে তার মধ্যে ভাতের মার মিশিয়ে খেয়েছি। এত কষ্টের

---

৩৫. সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১, ১৪২
৩৬. সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
৩৭. সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

মাঝেও আমাদের অনুভূতি ও স্পৃহা ছিল যে, আমাদের গান গাইতে হবে। সে গানটা গাইতে হবে যে গানটা পৌঁছে যাবে যোদ্ধাদের কাছে। সে গান শুনে তারা গতি পাবে– এই বিষয়টিই আমাদের মাঝে বেশি কাজ করেছিল।[৩৮]

সুজেয় শ্যাম বলেন, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে গিয়ে সবাইকে পেয়ে মনে হয়েছিল আমার পুনর্জন্ম হয়েছে। পরের দিনই একটা গান করলাম। কবি দিলওয়ারের লেখা ওটাই ছিল আমার প্রথম গান। ঐ গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন কল্যাণী ঘোষ, নমিতা ঘোষ, মালা, উমা, কাদেরী কিবরিয়া, রূপা, অনুপ ভট্টাচার্যসহ অনেকেই ছিলেন। ছোট্ট একটা রুমের মধ্যে আমরা কাজ করতাম। মাইক্রোফোন একটা, হারমোনিয়াম, তবলা ১টা। তারপর ২/১টা ইন্স্ট্রুমেন্ট কেনা হলো। ছোট্ট একটা রুমের মধ্যে এতগুলো মানুষ–যা ছিল সত্যিই অলৌকিক ব্যাপার। এটা ঈশ্বরের দান। এত কষ্টের মাঝেও আমরা সুখ পেতাম। খাবার-দাবার তেমন ছিল না, বাইরে হয়তো খাবার এনে রেখেছি–খাব বলে। অন্য একজন এসে সব খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু তারপরেও ঐ নয়টা মাস আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। আমি ঈশ্বরকে বলি, আমার ঐ নয়টা মাস ফিরিয়ে দাও। এত প্রেম– এত ভালোবাসা ছিল–কিসের ধর্ম, কিসের কী? আমরা সব এক কাতারে কাজ করেছি, এক বিছানায় ঘুমিয়েছি, এক প্লেটে খেয়েছি। আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ দেশের মানুষের যে ভালোবাসা পেয়েছি—সেটাই অনেক বড়।[৩৯] সুজেয় শ্যাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে মোট ১০টি গানে সুর করেছেন। তার সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রথম সুরারোপিত গান এবং শেষ গানটির সুরকারও সুজেয় শ্যাম। যিনি একাধিক গান রচনা করেছেন যুদ্ধের সেই দিনে। সর্বশেষ গানের কথা, সুর আর সমবেত কণ্ঠে গাওয়ার মধ্যদিয়ে সুরে সুরে জন্ম নিয়েছিল বাংলার স্বাধীনতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

যন্ত্রশিল্পী সুবল দত্ত বলেন, স্বাধীন বাংলা বেতারে শিল্পীদের একটা ক্ষেত্র হয়েছে। সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমাকে যেতে হবে। রাস্তাঘাট সব বন্ধ কিভাবে যাব ভেবে ভেবে দূর্বোধ্য পথ বেয়ে সেখানে পৌঁছাই। সেখানে আমি, অবিনাশ, অরুণ কুমার গোস্বামী, রুমু খান, আমার ছোট ভাই বাবুল ছিলেন। তবলায় সুনীল কুমার গোস্বামী ছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের রেডিও থেকে অনেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন। অনেকের নাম মনে নেই। অজিত রায় রংপুর থেকে যোগ দেন। সেখান থেকেই তার সাথে আমাদের পরিচয় ও বন্ধুত্ব। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যে সব গান প্রচারিত হয়েছে এবং সেই গানগুলো আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। এমন একটা গানও যায়নি যেটা উদ্বুদ্ধ করে নাই, কিন্তু সঙ্গীত শিল্পী যারা তাদের কেউ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করে না।[৪০]

---

৩৮. সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, ১৭১-১৭৩

৩৯. সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, ৭০-৭১

৪০. সাক্ষাৎকার, তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬, ১৫৭

গিটার বাদক রুমু খান বলেন, সকালে আমরা যেতাম, রাত পর্যন্ত আমরা কাজ করতাম। প্রতিদিন যত গান হতো সব গানের সঙ্গে আমাদেরই বাজাতে হতো। মিউজিশিয়ান ছিলেন ৭-৮ জন। ভায়োলিনে ছিলেন সুবল দত্ত ও তার ভাই বাবুল দত্ত, তবলায় ছিলেন অরুণকুমার গোস্বামী ও সুনীলকুমার গোস্বামী দুই ভাই। গিটারে আমি ছিলাম, সুজেয় শ্যামও ছিলেন, অবিনাশ ছিল। একটা ছোট্ট ঘরে রেকর্ডিং করতাম। একটা মাইক্রোফোন, তাতে শিল্পীরা দাঁড়াতো, পাশে আমরা সবাই যন্ত্রীরা বসতাম। আগে থেকেই আমরা রিহার্সাল করতাম। সকাল থেকেই রিহার্সাল শুরু হয়ে যেতো। প্রতিদিন অজিত রায়ের একটা গান, সমর দাসের একটা গান। যে গানটা চলে আসত, ওটাই রিহার্সাল করতে শুরু করতাম। দুপুর থেকে শুরু হত রেকর্ডিং। আবার সারাদিন রিহার্সাল করে পরের দিন সেটার রেকর্ডিং হতো, খুব কষ্ট হতো একটা গান রেডি করতে কিন্তু যখন গানটা প্রচার হতো তখন আনন্দে সব কষ্ট ভুলে যেতাম।[৪১]

অনুপ ভট্টাচার্য বলেন, 'জুন মাসে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে যাই। ফ্লোরিং করতাম। প্রথম দুটো গান সুর করতে হয়েছে। একটির রচয়িতা সুব্রত সেনগুপ্ত আরেকটির প্রয়াত আনোয়ার আবেদিন। যন্ত্র বলতে ছিল দোতরা, হারমোনিয়াম, তবলা। স্টুডিও ছিল লেপ তোষক দিয়ে সাউন্ড প্রুফ করা। সে অবস্থায় গান দুটো করেছি। গানের কথা ১) ছুটছে সবাই বাঁধভাঙ্গা বাঁধ, ২) সাড়ে সাত কোটি স্বোচ্চার হও সংগ্রাম সংগ্রাম। গানদুটি করে সত্তর টাকা পেলাম। কোরাস করলে চল্লিশ টাকা করে পেতাম। আমি মুক্তিযোদ্ধা আমার কাছে কোনো সার্টিফিকেট নেই। সার্টিফিকেট কেন নেব! দেশকে ভালোবেসে যুদ্ধে গিয়েছি।' মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস, ত্যাগ ও বীরত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বলেন যে, 'আমি দেখেছি ক্যাম্পে ক্যাম্পে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের গায়ে পোকা পড়েছে। তাদের চেয়েতো আমরা ভালো ছিলাম। আমাদের লাইফে একটা সিকিউরিটি ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশনে যেত। এই চিন্তাগুলো কিন্তু সবসময় আমি করেছি। এই যে তাদের গায়ে পোকা হয়েছে সেদিক থেকে আমরা ভালোই ছিলাম। এটাকে কষ্ট মনে করাটাই আমি পাপ বলে মনে করি।[৪২]

একের পর এক শিল্পী, সঙ্গীতাঙ্গনের মানুষের অন্তর্ভূক্তিতে দিন দিন সঙ্গীত শাখাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। দেশের নানা কেন্দ্র থেকে আসা বেতার কর্মী, মুক্তি পাগল সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, কবি, শিল্পী, নাট্যকারদের মিলনক্ষেত্র হয়েছিল বেতার কেন্দ্রটি। সবাই যেন শিল্পী, সবাই সুরকার আর সবাই গীতিকার। যারা কোনোদিন গান লিখেন নাই তারাও লিখলেন গান আবার সুরও দিলেন। এমন অনেক গীতিকারের জন্ম হয়েছিল স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে। পুরোনো গীতিকার আর সুরকাররা তো ছিলেন, তাদের সাথে নতুনরা মিলে সৃষ্টি করেছেন অনেক গান। নতুন, পুরনো সকল গানই গাওয়া হতো এবং তা সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। কোনো বাদ্যযন্ত্র ছিল না একটি হারমোনিয়াম ছাড়া, প্রথম দিকে পূর্বে রেকর্ডকৃত গানই প্রচার

৪১. সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০,১২১
৪২. সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫৩

করা হতো, নতুন গানের প্রয়োজনে গান লিখেছেন শহীদুল ইসলাম, টি এইচ সিকদার, সরদার আলাউদ্দীন, মোশাদ আলী, শফি বাঙালি।[৪৩] অখ্যাত মোহাম্মদ শফিউল্লাহ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এসেছিলেন গান গাওয়ার জন্যে। তাকে নিয়ে লিখেছেন বেলাল মোহাম্মদ। 'মোহাম্মদ শাহ বাঙালি প্রকৃত নাম ছিল মোহাম্মাদ শফিউল্লাহ। সন্দ্বিপের বাসিন্দা,চারণ কবি। প্রথম জীবনে মাইকে ছড়াগান গেয়ে হাটবাজারে কৃমির ঔষধ ফেরি করতেন। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ. আজিজ তাঁকে আবিষ্কার করেছিলেন। পরে পার্টির প্রচার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন মোহাম্মদ শফিউল্লাহ। পাকিস্তান আমলে তিনি বেতার শিল্পী হওয়ার কোনো আগ্রহ দেখান নাই। বেলাল মোহাম্মদকে তিনি বলেছিলেন, "আপনাদের পাকিস্তান রেডিওতে তো থুথু ফেলতেও যাইনি। এখন এসেছি অনুরোধ নিয়ে, দাবি নিয়ে। ... তবে ছদ্মনামে প্রোগ্রাম করবো। দেশের বাড়িতে বৌ বাচ্চারা আছে। আমার জন্যে যেন ওদের বিপদ না হয়। নামের সাথে বাঙালি শব্দটা থাকবে। আপনি একটা নাম ঠিক করে দিন।" বেলাল মোহাম্মদ নাম দিয়েছিলেন মোহাম্মদ শাহ বাঙালি।[৪৪] শিল্পীর শরণার্থী শিবিরে গাওয়া কয়েকটি গান: ১. মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম ছাড়বোনা, ২. জয়ধ্বনি কর, ৩. নিজের পায়ে নিজে হেটে চল, ৪. সূর্য উডেরে লাল মারি, ৫. কইয়োনা কইয়োনা, ৬. মুজিব বাইয়া যাও রে।[৪৫] শিল্পীদের জন্য সেইদিনগুলিতে আরো যারা আগুনঝরাা গান লিখেছেন তাদের মধ্যে আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, সারোয়ার জাহান, মোকসেদ আলী সাঁইসহ অনেকের গান ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল।

একসময় প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে অধিবেশন ২টি থেকে তিনটিতে বাড়াতে হয়েছিল। স্টুডিও ২টি হয়েছিল কিন্তু যন্ত্রপাতির অভাব মেটানো সম্ভব হয়ে ওঠে নাই। গানেরও সংকট অনুভূত হয়। এগিয়ে আসেন ভারতের গীতিকার গোবিন্দ হালদার। তার লিখা অসংখ্য গানের মধ্যে দুটো গান বাছাই করে একটিতে সুর করলেন সমর দাস 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে' আরেকটি গানে সুর করলেন আপেল মাহমুদ 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি।'[৪৬]

স্বাধীন বাংলা বেতারের গান অবরুদ্ধ বাংলাদেশসহ সর্বত্র ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। বেতার প্রচারিত গান শুনে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে অনেক শিল্পী সঙ্গীত শাখায় অংশগ্রহণের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে স্বাধীন বাংলা বেতারে অংশ নেয়। তাদের মধ্যে ড. অরুপ রতন চৌধুরী, তপন মাহমুদ, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, নাসরিন আহমাদসহ আরো অনেক শিল্পী পরবর্তীতে যোগদান করেন। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শিল্পীরাও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য স্বাধীন বাংলা বেতারে উপস্থিত হন। কষ্টের, সংগ্রামের কথাগুলো জানা যায় তাদের বক্তব্যে :

---

৪৩. তারেক মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১১
৪৪. বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৩, পৃ. ১২৫-১২৬
৪৫. সাইম রানা, বাংলাদেশের গণসঙ্গীত বিষয় ও সুর বৈচিত্র, বাংলা একাডেমি, ২০০৯ পৃ. ২৭২
৪৬. কামাল লোহানী, তারেক মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আগামী, ২০১৬, পৃ. ১১-১২

তপন মাহমুদ বলেন, আমি যে ক'মাস বাংলাদেশে ছিলাম, তখন মনে হতো, স্বাধীন বাংলা বেতারই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আশ্বাস দিয়েছে যে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, দেশ স্বাধীন করতে হবে, সবাইকে বেঁচে থাকতে হবে। এই যে দেশের প্রতি তাড়না, ভালোবাসা এগুলো সবার মধ্যেই ছিল। কিন্তু এ বিষয়গুলোকে জাগিয়ে তুলেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমি আপেল মাহমুদের কণ্ঠে 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' গানটি যেদিন শুনেছি, সেদিন অনেক কেঁদেছি। এই গান শুনলে এখনও আমার শরীরের মধ্যে শিহরণ দিয়ে ওঠে।[৪৭]

অরূপ রতন চৌধুরী

সেখানে গিয়ে আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, তপন মাহমুদ, রথীন্দ্রনাথ রায়, সত্যসাহা, আজমল হুদা মিঠুসহ সবাইকে পাই। ছোট একটা রুম, চট লাগিয়ে একটা স্টুডিও বানানো হয়েছে। ওইরকম কোনো স্টুডিও না। হারমোনিয়াম তবলা এবং একটা দোতরা– ইন্সট্রুমেন্টের মধ্যে। মাইক্রোফোন দেখলাম একটা। পাশে একটা বড় হলরুম। সেখানে আমরা ফ্লোরিং করতাম। কোনোদিন আনন্দ বাজার পত্রিকা পেতে শুয়েছি। কোনোদিন মাথায় ইট দিয়ে শুয়েছি। কোনোদিন বালিশ ছিল, কোনোদিন ছিল না। এই ছিল আমাদের জীবনের নয়টা মাস। আর এখান থেকেই 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে' বা 'স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে'– এ সকল ঐতিহাসিক গান সৃষ্টি হয়েছে–ভাবলে অবাক হতে হয়।[৪৮]

ফকির আলমগীর বলেন, আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রের শব্দ সৈনিক। আমার অস্ত্র হলো গান। সে গান দিয়ে মানুষকে উজ্জীবিত করা। স্বাধীন বাংলা বেতারের গানগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট বলে খ্যাত ছিল। এই বেতারের অবিস্মরণীয় ভূমিকা এবং কালুরঘাট থেকে বেতারকেন্দ্র সেট করা– তারপর এটাকে আগরতলা নিয়ে যাওয়া–তারপর বালিগঞ্জ। টাঙ্গাইলের জননেতা মান্নান সাহেব যার দায়িত্বে ছিলেন এবং তাজউদ্দীন আহমদ এবং আম্রকাননের সেই শপথস্থান এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যেন কালজয়ী একটা চরিত্রে একাকার হয়ে গেছে।[৪৯]

রূপা ফরহাদ বলেন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আমরা যুদ্ধ করতেই গেছি। মনে হচ্ছিল দেশে থেকে কিছু করতে পারবো না। কিন্তু আমাদের এখন দেশের জন্য কিছু করতেই হবে। সে লক্ষ্যে পরিবারের প্রায় সবাই চলে যাই। সমবেত সব গানের সাথে কণ্ঠ দেয়ার পাশে একটি একক গানে কণ্ঠ দেই। শহীদুল ইসলামের লেখা আর অজিত রায়ের সুরে 'ও চাঁদ তুমি ফিরে যাও।' ঐ সময়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন 'ঈদ' হয়েছিল। আমরা এত কষ্ট, এত শোকের মাঝে ঈদ করতে পারি

---

৪৭. তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
৪৮. সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
৪৯. সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬, ১০৭

না– সে কথাই গানে গানে বলা হয়েছিল। সেক্টরে সেক্টরে যারা যুদ্ধ করেছিল, তারা আমাদের গানগুলো শুনে একাত্ম হতো, আবেগাপ্লুত হতো। সংগ্রামী আর দৃপ্ত সে গানগুলো তাদেরকে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখাতো, উজ্জীবিত করতো আর মুক্তির হাতছানি দিত।'[৫০]

শব্দ সৈনিকেরা একদিকে যেমন ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আবার ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের নিরন্তর অনুপ্রেরণার উৎস। অস্ত্র হাতে যারা যুদ্ধ করেছেন তারাই শুধু মুক্তিযোদ্ধা নন, যারা নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে তাদের চারপাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রেখেছিল–মানসিক সহায়তা দিয়েছিল তারাও কোনো অংশে কম না। কেউ তথ্য আদান-প্রদান করেছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। এমন হাজারো ঘটনা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ঘটেছিল বলেই বাঙালি স্বাধীন দেশ পেয়েছিল, স্বাধীনতার সূর্যোদয় দেখেছিল। অনেক ছেলেমেয়েরা মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্যে বাড়ি ছেড়েছিল বাবা-মায়ের অজ্ঞাতে, কিন্তু বয়সের স্বল্পতার কারণে যুদ্ধের মাঠে যাবার অনুমতি পায় নাই কিন্তু ক্যাম্পে থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করে তাদের অতৃপ্ত হৃদয় শান্তি পেয়েছে। তারাও মুক্তিযোদ্ধা। যারা দেশত্যাগ করে বাইরে গিয়ে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল, যারা পেছন থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমস্ত কিছু যোগান দিয়েছিল, তারা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। শতকরা নব্বই জন বাঙালি যারা দেশের ভেতরে ছিল, তারা সবাই স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিতে উপদেশ, নির্দেশ এবং আদেশ মেনে নিয়েই যুদ্ধ করেছে, নিজেদের করণীয় সম্পর্কে সতর্ক হয়েছে–সকলের জন্যই পথ দেখিয়েছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। শিল্পীদের আগুন ঝড়ানো গান বাঙালিকে যেমন দিয়েছে ত্যাগের উৎসাহ তেমনি যোদ্ধাদের দিয়েছে সাহস। গীতিকারের অনবদ্য কথার গানে, সুরকারের প্রাণস্পর্শী সুর, উত্তাল সাহস ও শক্তিতে শিল্পীর গায়কী এক অনবদ্য হৃদয়স্পর্শী প্রেরণা যুগিয়েছিল। অবরুদ্ধ বাঙলার ঘরে ঘরে অতি গোপনীয়তায় সে গান প্রচারিত হয়ে দেশপ্রেমকে জাগিয়ে দিয়েছিল নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সকলের। জাত-ধর্ম, গোত্র, বর্ণ নির্বিশেষে সংগ্রামী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সর্বস্ব ত্যাগে। প্রতিটি গানই ছিল সুরকার, গীতিকার আর শিল্পীর কঠিন পরিশ্রম আর কর্মযজ্ঞের ফসল। বাঙালির প্রাণ, মন, হৃদয় তোলপাড় করেছিল। সবকিছু তুচ্ছ হয়েছিল গানের পাগল করা সুরের আহবানে।

মুক্তিযোদ্ধা, শিল্পী, সুরকার ও গায়ক আপেল মাহমুদ বলেন, "আমাদের গান রচনা ও সুরারোপের মূল উদ্দেশ্যই ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখা। কাজটা ছিল খুবই দুরূহ। কিন্তু আমরা নির্ভিক সৈনিকের মতো সে কাজটি পালন করেছি। তাই আমরা শব্দ সৈনিক। আমি গান লিখেছি। সুর দিয়েছি, গান গেয়েছি। আমার সুরে শিল্পীরা গান গেয়েছেন। আমি ফ্রন্টে গেছি, ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরেছি। স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের একটা সংস্থা গড়ে ব্যাপক প্রচার আর অর্থ সংগ্রহ করেছিল। স্বাধীনবাংলা বেতার মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি যুদ্ধ করেছে। শিল্পীরা যুদ্ধ করেছে গানের অস্ত্র দিয়ে। তারা ছিল শব্দসৈনিক।"[৫১]

---

৫০. সাক্ষাতকার, তারেক মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৬

৫১. মোবারক হোসেন খান, মুক্তিযুদ্ধের গান, শোভা প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ১০৯

গীতিকার যে অনুভূতি নিয়ে গান লিখেছেন, সুরকার যে অনুভূতি নিয়ে সুর করেছেন, শিল্পীরা যে অনুভূতিকে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তা বাঙালিকে পুরোপুরি আবিষ্ট করেছিল। প্রতিটি গানই বাঙালির রক্তে যুদ্ধের নেশা ধরিয়েছিল। এই মেলবন্ধন পুরোপুরিই ছিল সফল ও স্বার্থক। গানের এমন ব্যবহার পৃথিবীর আর কোনো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিরল। রফিকুল ইসলাম বলেন, 'গানের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্ব বহন করে, তা হলো নতুন সৃষ্ট গানগুলো একই সাথে যুদ্ধের মাঠে ও অবরুদ্ধ শত্রু কবলিত বাংলার ভয়ার্ত মানুষের মনে সাহস যোগানো, হতাশা থেকে মুক্তি, পাকিস্তানের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সত্য জানানোর এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা। পুরাতন গানগুলোও একই লক্ষ ও উদ্দেশ্যে বারংবার প্রচারিত হয়ে তৃষিত বাঙালিকে প্রশান্তি যুগিয়েছে। ইতিহাস থেকে সে গানগুলো কোনোদিনই মুছে যাবে না। 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানটি তার জনপ্রিয়তার কারণে স্বাধীনবাংলা বেতারের 'সিগনেচার টিউন' বা প্রতীকি ধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[৫২]

স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রচারিত গানে উদ্দীপনা ছিল আর ছিল যুদ্ধ জয়ের তেজ। কলম আর শব্দ সৈনিকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল তাদের শানিত লেখা দিয়ে দেশের মানুষকে উদ্দীপনায় প্রাণীত করতে, যা শরণার্থীদের দিয়েছিল আশা আর দিনরাত রণস্নাত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও উদ্দীপনা।

শিল্পীরা শরণার্থী জীবনে কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে স্বীকার করতো না। সব কষ্টকে তারা জীবনের স্বাভাবিকতা মেনে নিয়ে নিমগ্ন হয়েছিলেন দেশের মুক্তির লক্ষে। শিল্পী শীলাভদ্র তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন, "ভেবো নাগো মা তোমার ছেলেরা হারিয়ে গিয়েছে পথে' গানটি রেকর্ড করার সময় খবর পেলাম আমার এক মাসতুতো ভাইকে পাক আর্মিরা মেরে ফেলেছে–সেই মুহূর্তে ভেবেছিলাম, ভাইটি মারা গেলো– মাসি হয়তো খবরটা আদৌ জানেন না। ভাইটা জীবন উৎসর্গ করলেন, আমরা তাকে দেখতেও পেলাম না। ওরা যদি রক্ত না দিত তাহলে হয়তো আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জন করাটা কঠিন হয়ে যেত।"[৫৩]

সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মনোবল ও প্রেরণা সৃষ্টির জন্য গানের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং সুকান্তের রচনাসহ বহু খ্যাত-অখ্যাত কবিদের গান-কবিতা বাঙালিকে যুগিয়েছিল অসীম প্রেরণা। মুক্তিবাহিনী পেয়েছিল রণউম্মাদনা। বাংলার মাটি আর বাঙালি সেদিন এক বাঁধনেই আবদ্ধ হয়েছিল। মাটির ঋণ শোধ করতে বাঙালি নিঃশঙ্কচিত্তে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছিল যুদ্ধের ময়দানে বিরাট বিক্রমে। কণ্ঠে ছিল তাদের 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি', 'তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবরে।' শিল্পীদের সাথে রণযোদ্ধারা কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছিল 'বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নেইকো শেষ– বাংলাদেশ', প্রাণের আকুতি মেশানো সে গান সাধারণ বাঙালিকেও করেছিল মোহবিষ্ট।

---

৫২. রফিকুল ইসলাম, লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে, এ টেল অব মিলিয়নস, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ২২২

৫৩. শীলা ভদ্র, সাক্ষাৎকার, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, তারেক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

ফজলে এ খোদা বলেন, "১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র বিনোদন ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। যেদিন শুনলাম 'শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণি-বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ' এবং 'বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিষ্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি'—এই গান দুটি শুনে আমাদের প্রেরণা ও উদ্যম বেড়ে গেল কোটিগুণ। প্রচণ্ড কৌতূহল জেগেছিল গানগুলির রচয়িতা কে? পরে জেনেছি এই গানের কবি গৌরি প্রসন্ন মজুমদার। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"[৫৪]

পশ্চিম বঙ্গের লোক গায়ক অংশুমান রায়ের সুর ও কণ্ঠে গীত 'শোন একটি মুজিবরের থেকে' গানটি ১০ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় প্রবাসী মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল আকাশবাণী কোলকাতা থেকে। অবরুদ্ধ বাঙালি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রথম গানটি শুনে আবেগ সংবরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল– আবার একই সাথে উল্লসিতও হয়েছিল। কত যে মানুষ পাকিস্তানিদের হাতে জিম্মি অবস্থাতেও গানটি শুনে কী যে উল্লাস প্রকাশ করেছিল–তা বর্ণনাতীত।[৫৫]

স্বাধীন বাংলা বেতারের কী গভীর ভূমিকা ছিল অবরুদ্ধ দেশের মানুষের কাছে তা ব্যক্ত করেছেন মুক্তিযোদ্ধা সিরু বাঙালি, 'রাতে আমার মনে খুশির বন্যা বয়ে গেল। বহুদিন পর বড় ভাইয়ের বাসায় আজ নতুন করে আবার স্বাধীনবাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুনলাম। বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধের খবরাখবর শুনলাম। শুনে দারুণ আনন্দ লাগল। দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ যে সময়মতো বড় আকার ধারণ করবে এটা নিশ্চিত ছিলাম আমি। 'জয় বাংলা বাংলার জয়/ হবে হবে হবে হবে নিশ্চয়/ কোটি প্রাণ একসাথে মিলেছে অন্ধরাতে নতুন সূর্য ওঠার এইতো সময়' নতুন করে এই গানটি শুনলাম আজ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। এই গানটির মর্মবাণী রক্তে বিদ্রোহের বাণ ডাকে। এ গান শুনে ইচ্ছে হয় সবকিছু ভেঙ্গে গুড়িযে দেই। 'জয়বাংলা' সিনেমার গানটি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের হৃদয়কে নতুন উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করেছে। হৃদয়কে করেছে বারবার আপ্লুত।[৫৬]

মৃত্যু ছিল অতি তুচ্ছ সেই সময়ে। দেশের মাটির মূল্য ছিল জীবনের চেয়ে মূল্যবান। আর সে লক্ষে শিল্পীরা গান গেয়ে ধন্য হয়েছেন নিজেরা, ধন্য করেছেন বাংলার মাটি ও মানুষকে। সঞ্জীবনি সুধার ন্যায় বাঙালি আর মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি দিয়েছে সঙ্গীত। গানের সুরে জীবনকে তুচ্ছ করতে সাহস পেয়েছিল বাঙালি। ভয়ভীতিকে জয় করার প্রাণছোয়া গান লিখেছে গীতিকার, সুর দিয়েছে সুরকার আর সেই গানে প্রাণ দিতো শিল্পীরা। 'সন্ধা হলেই প্রধান কার্যালয়ের সবাই স্কুল মাঠে জমায়েত হতো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনার জন্য। ঐ দিন সন্ধা বেলাতেই শাহানশাহকে গান গাইতে বললাম। শুধু একটা দোতরা বাজিয়ে শাহানশাহ

৫৪. ফজল এ খোদা, সঙ্গীত ভাবনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৩৮
৫৫. কামাল লোহানী, মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার, দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৬, পৃ. ২৫
৫৬. সিরু বাঙালি, আমার যুদ্ধ আমার একাত্তর, আদিগন্ত প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৮২

স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের দেশাত্মবোধক গানগুলো গাইতে শুরু করলো। তাঁর গলা এতো সুন্দর আর গভীর যে আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো গানগুলো শুনছিলাম।... সেদিন শাহানশাহকে প্রধান কার্যালয়ে থাকার অনুমতি দিলাম এবং তাঁকে বললাম বিভিন্ন কোম্পানিতে গিয়ে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে হবে।'[৫৭]

সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক সমর দাস বলেন, 'আমি যোগ দিলাম শব্দ সৈনিক হিসেবে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে। আমার যুদ্ধ শুরু হলো দুই সীমান্তে। শত্রুদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ এবং অবরুদ্ধ দেশবাসীর নৈতিক বলকে সমুন্নত রাখার লক্ষে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত রাখার জন্যে দেশাত্ববোধক গানে সুরারোপ করা শুরু করলাম। শিল্পীদের কণ্ঠে সে গান বেতারে প্রচারিত হতে লাগলো।'[৫৮]

সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক অজিত রায় বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধে শব্দ সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করার জন্যে যোগ দিলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। আমার কণ্ঠ দুর্বার হয়ে উঠলো। সারাদিন সুরের কাজে ব্যস্ত। গান গাইছি একদিকে, সুর দিচ্ছি অন্যদিকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে কোনো কোনো কবিতায় আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে সুরারোপ করতে হয়েছে। আমাদের দেশাত্ববোধক গান ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। সে গান মুক্তিপাগল দামাল ছেলেদের কাছে ছিল উদ্দীপনার মূল উৎস। মুক্তিযুদ্ধের গান আর তখন গান নয়, যেনো যুদ্ধের হাতিয়ার।'[৫৯]

প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক সমরদাস এবং অজিত রায় সঙ্গীত অনুষ্ঠানগুলোকে সফল করার জন্য অমানসিক পরিশ্রম করেছেন। সীমিত সংখ্যক বাদ্যযন্ত্র ও শিল্পী নিয়ে শুধু আন্তরিক চেষ্টার জন্য এ সম্ভব হয়েছিল। এম.আর.আখতার মুকুল বলেন, "স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে কোনো সাউন্ডগ্রুপ রেকর্ডিং স্টুডিও ছিল না। কোলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের নির্দিষ্ট বাড়ির যে ছোট্ট কক্ষে একসময় মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ থাকতেন, আমরা সেই ছোট্ট কক্ষটার চারদিকের দেয়ালে বিছানার চাদর আর কাপড় ঝুলিয়ে, আর দরজা জানালার ছিদ্রগুলো বন্ধ করে বেতারের জন্য রেকর্ডিং স্টুডিও বানিয়ে ছিলাম। সেখানেই ছিল আমাদের দুটো ভাঙ্গা টেপরেকর্ডার। এ সময় আমরা ছিলাম সবাই অভিন্ন প্রাণ, সবার চোখের সামনে সব সময়ই দুটো জিনিস জ্বল জ্বল করে ভাসতো। প্রথমটা হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনের মুক্তিযুদ্ধ। আর দ্বিতীয়টা শত্রু দখলিকৃত এলাকার মানুষের দুর্বিসহ জীবনযাত্রা।... অন্যান্য অনুষ্ঠানের কথা ছেড়ে দিলেও শুধু বাংলা সঙ্গীতের জগতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।"[৬০]

---

৫৭. আনোয়ার উল আলম শহীদ, একাত্তর আমার শ্রেষ্ঠ সময়, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৮০
৫৮. মোবারক হোসেন খান, মুক্তিযুদ্ধের গান, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১০৮,১০৯
৫৯. মোবারক হোসেন খান, ঐ, পৃ. ১০৯
৬০. এম আর আখতার মুকুল, স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের ধ্বনি, সম্পাদনা সেলিম রেজা, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃ. ১০৩

হাজারো বাধা বিপত্তির মাঝে স্বাধীন বাংলা বেতার পৌঁছে গিয়েছিল ১৯৭১ এর ডিসেম্বরে তার সফল প্রচারণা দিয়ে। স্বাধীন বাংলা নামটি পরিবর্তন হয়েছিল ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ। ভারত যখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। স্বাধীন বাংলা বেতারের নাম হলো বাংলাদেশ বেতার। নভেম্বর মাসে ভারত সরকার জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে স্বীকৃতি দেয়।[৬১] ভারতের স্বীকৃতির পর শিল্পীরা আত্মগোপন করা থেকে (তারা পূর্বে কখনো নিজেদের নাম প্রচার করতে পারেন নাই নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে), স্বনামে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিলেন, জানা যায় নাসরিন আহমাদ-এর সাক্ষাৎকার থেকে।

মুক্তির সংগ্রামে সঙ্গীত শিল্পীরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের গান প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিলেন। তাদের স্বদেশী গান ও দেশাত্মবোধক উদ্দীপনা জাগানো গানগুলো শিল্পীরা এমন আবেগ দিয়ে পরিবেশন করতেন যে, মনে হতো মুক্তিযুদ্ধ '৭১ এর জন্যই গানগুলো রচিত হয়েছিল। বেলাল মোহাম্মদ বলেন, "কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে কার্যত গৃহীত হয়েছিল ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের কোনো এক সময়ে। এর প্রামাণিকতা এবং মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের নিদর্শন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঐ সময়কার প্রোগ্রাম মেটেরিয়ালস ফাইলে (দৈনন্দিন অনুষ্ঠান সম্ভার) সন্ধান করা হলে পাওয়া যাবে। লক্ষ করা যাবে ঐ বেতারকেন্দ্রের প্রতিদিনের অধিবেশনগুলোতে সূচনাকাল থেকে প্রারম্ভিক ও সমাপ্তিক সিগনেচার টিউন (প্রতীকসুর) হিসেবে যথাক্রমে 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গ্রামোফোনে রেকর্ডের গানটির 'প্রথম পিঠ' ও 'দ্বিতীয় পিঠ' বাজানো হয়ে আসছিল, নভেম্বর মাসের কোনো একদিন হঠাৎই এর ব্যতিক্রম ঘটে। তখন থেকে অধিবেশনের সমাপ্তিক প্রতীকী সুর হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' জাতীয় সঙ্গীত প্রচার প্রবর্তন করা হয়। বস্তুত গানটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে বরাবরই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন অধিবেশনে সে যাবৎ বেজে আসছিল। এবং ঐ দিনটি থেকে এর যত্রতত্র ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।"[৬২]

১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর। ভারতের স্বীকৃতি দেয়ার দিনটিকে বেগম মুশতারী শফি স্মরণ করেছেন যেভাবে "অফিসেও প্রচণ্ড ভির, উত্তেজনা, নানা জল্পনা কল্পনা, আনন্দ এর মাঝে কাজও চলছে। রেকর্ডিং এর তারা, দেরি হলে চলবে না। ঘড়ির কাটার মত ঠিক সময়ে প্রোগ্রাম মেটেরিয়ালস নিতে আসবেন সেই ডিটেকটিভ গোয়েন্দার মতো লোকটা। গাজী ভাই তখনো এসে পৌঁছাননি তাঁর কাব্য নিয়ে। ইতিমধ্যে জাহিদ সিদ্দিকী বললেন, 'আসুন এই ফাঁকে উর্দু ফিকশনটা করে ফেলি। তবে মনে হচ্ছে এটাই শেষ ফিচার। আর করতে হবে না। আমরা রিহার্সাল করতে করতেই গাজী ভাই এসে পড়লেন। নীচে তখন জোড় রিহার্সাল চলছে আপেল মাহমুদের পরিচালনায় 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবো না' গানটির। কথা ও সুর এমন চমৎকার হয়েছে যে, শুনতে শুনতে আমার

---

৬১. বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৬২. বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৮৩, পৃ. ১৬৬

দুচোখ ভরে এলো পানিতে। পাওয়ার আনন্দ আর হারানোর বেদনায় মিশ্র অনুভূতিতে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রইল।'[৬৩]

স্বাধীন বাংলা বেতারের কবি, গীতিকার, বর্তমান জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের মনোনিত সদস্য কাজী রোজী বলেন, 'একটি গান যত তারাতারি জনগণের কাছে আকর্ষণ তৈরি করতে পারে, একটা কবিতা ততটা পারে না। যে কারণে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গানগুলো আজও আমাদের বুকের মধ্যে আগুনের মতোই জ্বলতে থাকে।'[৬৪]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নয়টি মাসের উৎকণ্ঠা, উদ্বিগ্নতা আর অনিশ্চিত জীবনের স্মরণীয় দিন হয়ে উঠেছিল ১৬ ডিসেম্বরের দিনটি। তথ্য বিভাগ আর সঙ্গীত বিভাগের সকলের কাছেই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে আজও। সেই দিনের স্মৃতিচারণে কামাল লোহানী লিখেছেন, "বিজয় লাভের চূড়ান্ত খবর সম্বলিত বিশেষ সংবাদ বুলেটিন তৈরি করতে সবাই এক নম্বর ষ্টুডিওতে হাজির হলাম। দায়িত্ব অর্পিত হলো আমারই ওপর। আমি লিখলাম কিন্তু কি লিখেছি মনে করতে পারছি না তবে স্মরণ করতে পারি একটি মাত্র বাক্যে সব ক্রোধ, সব দেশপ্রেমের আবেগ, বিজয়ের আনন্দ আর বিপুল রক্তক্ষরণের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, সাথে ছিল ঘৃণার উদগিরণ আর ব্যক্ত হয়েছিল দৃঢ় প্রত্যয়। সব কিছু মিলিয়ে যে সংবাদ সেদিন রচনা করেছিলাম সেটি আমার পড়ার কথা ছিল না, তথাপি সকলের অনুরোধে আমাকেই পড়তে হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় সংবাদ আর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর দম্ভকে চুর্ণ করার গর্বিত ঘোষণা সম্বলিত বুলেটিন। রাশেদ রেকর্ডার অন করেছিল। স্পুল চলছে। চড়া গলায় হেঁকে উঠলাম: স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে খবর পড়ছি।...তারপর যা পড়েছিলাম তা কেবল মাইক্রোফোনেই জানে। একদমে দুটো সেনটেন্স পড়ে শেষ করলাম। রেকর্ডিং শেষ। দরজা খুলে দেখি-সবাই ষ্টুডিওর দোড়গোরায় দাঁড়িয়ে কান পেতে আছে। রেকর্ড বাজানো হলো। সমস্বরে চিৎকার করে উঠল সবাই। ওয়ান্ডারফুল। চমৎকার। সেই সময়ের শব্দচয়ন ও গঠন, অভাবিত কণ্ঠ, উচ্চারণ, স্বরগাম সবই এখন স্মৃতি। কোনোভাবেই শত চেষ্টাতেও আজ মনে করতে পারি না সেই ভাষা ও শব্দগুলো। সেটা ছিল তারুণ্য দিপ্ত বিজয়ী সৈনিকের অগ্নি শপথের রুদ্র শব্দাবলী।"[৬৫]

কামাল লোহানীর লিখা থেকে ১৬ ডিসেম্বরের আরো কিছু স্মৃতিচারণায় জানা যায় যে, ১৬ ডিসেম্বর, বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পন করবে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রস্তুতি নিয়েছে। বিজয়ের বুলেটিনের পরেই রচিত ও সুরারোপিত হয়েছিল বিজয়ের গান। অনন্য সাধারণ মহিমায় রচিত হয়েছিল সে গান। লেখা, সুর আর পরিবেশনার কারণে গানটি 'ইতিহাস' হয়েছিল। বিজয়ের সংবাদ বুলেটিন স্বাধীন বাংলা বেতারে ধ্বনিত হবার পরপরই বেজে উঠেছিল 'বিজয় নিশান উড়ছে ঐ...।' গীতিকার সাংবাদিক শহিদুল ইসলাম

---

৬৩. স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭

৬৪. মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র, তারেক মাহমুদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৭৯

৬৫. কামাল লোহানী, আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, আগামী, ১৯৯৪, পৃ. ১৬৩-১৬৫, কামাল লোহানী, মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীনবাংলা বেতার, দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৬, পৃ. ৪৮-৪৯

দু'লাইন করে লিখছেন, তাৎক্ষণিক সুরারোপ করছেন সুরস্রষ্টা সুজেয় শ্যাম। গানটিতে ফুটে উঠেছে তাদের অসাধারণ দেশপ্রেম ও মাতৃভক্তি। মনে হয়েছিল বিজয়ের আনন্দে রনাঙ্গনের আমরা আর অবরুদ্ধ বাংলার সকল মানুষ এক কণ্ঠে যেন গাইছি 'বিজয় নিশান উড়ছে ঐ।' সমবেত কণ্ঠের গানটিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সংগ্রামী শিল্পী অজিত রায়।'[৬৬]

পঞ্চকবির গানসহ নতুন পুরানো অসংখ্য গান বেজেছে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে। কিছু গান সংরক্ষিত আছে, আবার কিছু গান হারিয়ে গেছে। গবেষক সাইম রানার মতে, স্বাধীন বাংলা বেতারে মোট ১২৫টি গানের সন্ধান পাওয়া গেছে যা ওখানে প্রচারিত হয়েছিল। এর মধ্যে নতুন সৃষ্ট গানের সংখ্যাই বেশি। একশতেরও অধিক নতুন গান সৃষ্ট যার আবার অনেকগুলোর সুরকার, গীতিকার বা শিল্পীর নাম তথ্যের অভাবে পাওয়া যায় নাই।[৬৭]

শিল্পী রফিকুল আলম তার অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন যে 'পৃথিবীর কোনো মুক্তিযুদ্ধে বেতার শিল্পীদের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের মতো ছিল না।'[৬৮]

বিভিন্ন স্কোয়াডের বিশিষ্ট নামিদামি শিল্পীরাও বেতার শিল্পীদের সাথে স্বাধীন বাংলা বেতারের ডাকে একই সাথে গান করেছেন। নতুন লিখা গানেও তারা একত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন, যা জানা যায় শিল্পী ডালিয়া নওশান ও শাহীন সামাদের সাক্ষাৎকারে।

স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পীদের বেতারের বাইরেও অনেক অনুষ্ঠান করতে হয়েছে বিশিষ্ট শিল্পীদের সাথে। বাংলাদেশের নাম না জানা অনেক শিল্পীরাও ঘুরে ঘুরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান করেছেন যার মাধ্যমে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন। তারা সকলেই পূর্ববাংলার শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের গান শুনিয়ে ব্যাপক উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। পাকিস্তানি বর্বরতার চিত্র তুলে ধরে বহির্বিশ্বের কাছে সাহায্য সহযোগীতা ও সহানুভূতি তৈরিতে সচেষ্ট ছিলেন। এতে করে আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের গণহত্যার ব্যাপারে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়– বিশ্ববাসী জেনেছিল কতটা ভয়াবহ, নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছিল অবরুদ্ধ বাংলাদেশে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চার ধরনের সঙ্গীত প্রচার হয়েছিল। ১) মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে বেতার কেন্দ্রে বসেই রচিত হওয়া দেশাত্ববোধক, আধুনিক, পল্লীগীতি ও জারি গান। ২) ঐ সময়ে রচিত দেশাত্ববোধক আধুনিক সমবেত কণ্ঠের সঙ্গীত। ৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ রচিত জনপ্রিয় গানগুলি শিল্পীদের কণ্ঠে পুনরায় রেকর্ড করে প্রচার করা হয়। সলিল চৌধুরী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচিত এবং গণনাট্য সংঘ পরিবেশিত গানগুলিও শিল্পীদের কণ্ঠে ধারন করে প্রচারিত

---

৬৬. কামাল লোহানী, মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার, দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৬, পৃ. ৪৯

৬৭. সাইম রানা, বাংলাদেশের গণসঙ্গীত বিষয় ও সুর বৈচিত্র, বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ. ২২৭-২৮

৬৮. রফিকুল আলম, স্বাধীন বাংলা বেতারের কণ্ঠ সৈনিক, চতুরঙ্গ, DBC News, youtube.com/dbcnews24/ 7.10.6.17, শনিবার, রাতঃ ১১.০০।

হয়েছে। ৪) ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে পালিত অসহযোগ আন্দোলনের সময়কালের ঢাকা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত গানগুলি পুনঃপ্রচার করা হয়েছিল।[৬৯]

স্বাধীন বাংলা বেতারের গানগুলো বাঙালিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল। ক) রণসঙ্গীতসহ আগুনঝরা বিপ্লবী গানগুলি রণযোদ্ধাদের মাঝে রণউন্মাদনা সৃষ্টি করতো। খ) নিখাদ দেশ প্রেমের গানগুলি বাঙালির দেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা জাগাতো। গ) বাউল সুরের পল্লীগীতি, লোক সুরের বিভিন্ন গান বাঙালিকে দেশের মাটির মায়ায় স্মৃতি কাতর করতো। সে গানে মুক্ত স্বাধীন দেশের জন্য বাঙালি কষ্ট যাতনা ভুলে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, জীবনকে তুচ্ছ করেছে। রথীন্দ্রনাথ রায়, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, মোসাদ আলী, বিপুল ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীদের জোয়ারী গলায় সাত কোটি সাধারণ বাঙালির মুক্তির অব্যাক্ত ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতো। ঘ) গণসঙ্গীত বাঙালিকে পাকিস্তানি শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। ঙ) রবীন্দ্রনাথ, নজরুলসহ পঞ্চকবির গান, বাঙালিকে তার ঐতিহ্যের কথা স্বরণ করিয়ে দিয়েছে। গানগুলোর মাঝে বাঙালি শোষকের হাত থেকে মুক্তির দিশা খুঁজে পেয়েছিল। প্রতিটি গানের শব্দ কখনও দেশপ্রেম, কখনও শত্রুর প্রতি ঘৃণা, দ্রোহ, বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। সুরকারের সৃষ্ঠ সুর গীতিকারের গানের কথা শিল্পীর পরিবেশনায় শোষকের প্রতি তীব্র হুংকার, অপমান, লাঞ্ছনা, তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতো। সাধারণ বাঙালি প্রবল আবেগে গানগুলো গ্রহণ করেছিল। গান শুনেই তারা প্রতিশোধের নেশায় পাক-পাষণ্ড নিধনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শিল্পীদের গান রণযোদ্ধাদের 'সিগনাল' হিসাবেও কাজ করেছে। গানের প্রচারের সময় ধরে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ অপারেশন পরিচালনা করতেন নৌ-যোদ্ধারা।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের বাইরেও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের একাধিক গানের সফল উদ্যোগ পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ শুরু হলে প্রগতিশীল শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বাড়ি-ঘর সহায় সম্পদ সব ফেলে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দ্যেশ্যে পাড়ি জমান। ছায়ানটের অনেক শিল্পী ও কর্মী প্রাণ বাঁচানোর জন্য ওপারে চলে যায়। ৫ মে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সনজিদা খাতুন পরিবার পরিজন নিয়ে কোলকাতা আশ্রয় নেন।[৭০] তাঁর নেতৃত্বে ছায়ানটের শিল্পীদের একত্রিত করে কোলকাতার বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় ১৪৪ লেনিন স্মরণীতে গানের মহড়া করা হতো। উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল করা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রচার কাজ চালানো। শুধু কোলকাতা শহর নয়, ভারতের নানা জায়গায় দিল্লির আন্তর্জাতিক সেমিনারে পর্যন্ত এ দল গানে গানে বাংলাদেশের যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছে। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প, শরণার্থী শিবিরে কথা ও সুরে সুরে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিবৃত্তান্ত উপস্থিত সবাইকে শুনিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল করতো শিল্পীরা।[৭১]

---

৬৯. এম আর আখতার মুকুল, স্বাধীন বাংলা বেতারের ধ্বনি, সেলিম রেজা সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৮-১৯

৭০. সনজিদা খাতুন, স্বাধীনতার অভিযাত্রা, নবযুগ প্রকাশনী-২০০৪, পৃ. ১৫১-১৫২

৭১. সনজিদা খাতুন, সংস্কৃতি কথা সাহিত্য কথা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ ২০০৪ পৃ. ৮০

সনজিদা খাতুন বলেন, জাস্টিস মাসুদের বাড়িতে বসে সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এপার বাঙলা ওপার বাঙলার শিল্পীদের উপস্থিতিতে, শরণার্থী শিল্পীদের একত্রিত হবার ব্যবস্থা হয়েছিল ১৪৪ লেনিন স্মরণীতে। শিল্পীদের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, লোকগীতি, পল্লীগীতি, আধুনিক গানের শিল্পীদের সমন্বয় ঘটেছিল। পল্লীসুরের অসাধারণ গান লিখতেন শিল্পী মোসাদ আলী, দরাজকণ্ঠে পল্লীর সুর তুলে সে গান গাইতেন বিপুল ভট্টাচার্য। শ্রোতা, দর্শক মুগ্ধ হয়ে যেত তাদের গানে। সকল ধরনের শিল্পীরা মিলে মুক্তিযুদ্ধের গান গেয়েছেন দলীয়ভাবে। পরিচিত-অপরিচিত সব শিল্পী একত্র হয়েছিলেন মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে।[৭২]

এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান লিখেছেন, মে মাসেই সনজিদা খাতুনের সভাপতিত্বে এবং ওয়াহিদুল হকের পরিচালনায় গড়ে উঠে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা। শতাধিক শিল্পী ছিলেন এই সংগঠনে। তারা দায়িত্ব নিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থী শিবিরে সঙ্গীত পরিবেশনের। মুক্তির গান ছবিতে দেখা যায় মাহমুদুর রহমান বেণুর নেতৃত্বাধীন একটি স্কোয়াডের তৎপরতা। আরো স্কোয়াড গঠন করা হয়েছিল আগস্ট মাসের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব বাংলাদেশ উপলক্ষে শিল্পী বাছাই করা হয়েছিল এই সংস্থা থেকে।[৭৩]

মঞ্জুলা দাস গুপ্ত তার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন, 'আগরতলা এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে পেপারে দেখলাম বাংলাদেশের শিল্পীদের নিয়ে একটি সংগঠন করেছে ১৪৪ নং লেলিন সড়কে। গানের উদ্দেশ্যে কোলকাতা রওনা হলাম, আমার জ্যাঠা মশাইয়ের বাড়ি থেকে প্রতিদিন রিহার্সেলে হাজির হতাম, ওখানে সবাই ছিলেন। ওয়াহিদ ভাই, মাহমুদুর রহমান বেনু, সনজিদা আপা, শাহীন মাহমুদ। আমরা ভাগ করে বিভিন্ন জায়গায় যেতাম, দিল্লীতে গেলাম একবার। সেখানে গিয়ে মাস খানেক ছিলাম। ওখানে কালী ব্যানার্জির বাড়িতে আমরা থাকতাম। ওখান থেকেই আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গান শোনাতে যেতাম। একবার যশোর গিয়ে গান শোনালাম। ওরা যে কী খুশি হতো, বলত দিদি আপনারা আবার আসবেন। এরকম গান শোনাবেন। গান শুনে ওরা যুদ্ধ করতে উৎসাহ পায়। আমাদেরও তখন রক্ত টগবগ করত।' তিনি আরো উল্লেখ করেন, 'একবার একটা ক্যাম্পে গেলাম। ঐ সময় ক্যাম্পের সবাই রেস্ট নিচ্ছিল। ওদেরতো রেস্ট বলে কিছু ছিল না, যখন তখন ডাক আসতো। আমাদের দেখে ওরা খুব খুশি হতো। ওরা বলতো 'আপনারা না থাকলে আমরা যুদ্ধ করতে পারতাম না। আমাদের সব সময় মনে হতো—এই ছেলেগুলোর মধ্যে কে মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারবে আর কে পারবে না। ওদেরকে মনে হতো ঘরের ছেলে—আমাদের নিজেদের ভাই।'[৭৪]

সরকারি নির্দেশে ওয়াহিদুল হককে শিল্পীদের নিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বেশ অনেকগুলো অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হয়েছে। অত্যন্ত সফল সেই অনুষ্ঠানগুলি দীর্ঘসময় ধরে মহড়া করে সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয় বিখ্যাত শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে শরণার্থী শিল্পীরা

---

৭২. স্বাধীনতার অভিযাত্রা, পূর্বোক্ত, ২০০৪, পৃ. ১৩৮-১৪০

৭৩. আনিসুজ্জামান, আমার একাত্তর, সাহিত্য প্রকাশ-১৯৯৭, পৃ. ৭৫

৭৪. তারেক মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৯

মহড়া করেছেন। শিল্পীদের গায়কী, পরিবেশনা সব কিছু ভারতীয় জনগণকে যেমন মুগ্ধ করেছিল তেমনি প্রবাসী সরকারও শিল্পীদের উপস্থাপনায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ওয়াহিদুল হক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তেসরা জুন একাত্তর।' বাংলাদেশের যুদ্ধরত শিল্পীদের প্রথম অনুষ্ঠান 'রূপান্তরের গান', রচনা শাহরিয়ার কবির, প্রযোজনা-উপস্থাপনা–বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা যার সভানেত্রী সনজিদা খাতুন। ভাস্য পাঠ-হাসান ইমাম, শিল্প নির্দেশক- মোস্তফা মনোয়ার। সমস্তই ছিল সম্মেলক গান, একটি বাদে– ফ্লোরা আহমদের 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।' যুগল নেতৃত্ব বেণু ও শাহীনের, স্থান—কোলকাতার ভারত বিখ্যাত রবীন্দ্রসদন। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলে উপস্থিত ছিলেন। তারা ধন্য ধন্য করলেন। এমন অনুষ্ঠান হয় না। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ের প্রেরণা সৃষ্টির আদর্শ অনুষ্ঠান।[৭৫] ওয়াহিদুল হক আরো লিখেছেন, 'রূপান্তরের গানের ওপরে দুইটি জরুরি প্রয়োজন মেটাবার দায় পড়ল। কোলকাতার মুসলমান ভাইয়েরা জঙ্গী পাকিস্তানবাদী। ভয়ানক বাংলাদেশ বিদ্বেষী। তাদের ভয়ে মুক্তিযোদ্ধারা একা চলতে ভয় পায়। বিপরীতে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের যুদ্ধকে একান্ত আপন করে নিয়েছে। 'রূপান্তরের গান' প্রয়োজন এই বিদ্বেষ প্রশমনের। অপরকে প্রেরণাদানে, শরণার্থী শিবিরে লক্ষ লক্ষ দেশত্যাগী বাঙালি মনুষ্যেতর জীবন-যাপন করছে। মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে তরুণ যোদ্ধারাও অনশনে–অর্ধাশনে এ্যাকশনের অপেক্ষায়। এই দুই জায়গায়ও প্রয়োজন 'রূপান্তরের গান।' মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার গানের স্কোয়াড শরণার্থী শিবির ও মুক্তিবাহিনীর আড্ডায় দিনে দুটো-তিনটে করে অনুষ্ঠান আরম্ভ করল। নেতৃত্ব দিল ছায়ানটের বেনু-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য গণিত বিভাগের প্রভাষক। তার পাশে থাকল সহধর্মিনী শাহীন আকতার। দুটি গান সর্বত্র আদৃত হলো রবীন্দ্রনাথের 'চল যাই চল যাই পদে পদে সত্যের ছন্দে' এবং গুরু সদয় দত্তের 'আবার তোরা মানুষ হ।'[৭৬]

দিল্লিতে তখন দুর্গাপূজার আবহ। কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা শিল্পীদের নিয়ে। 'কালীবাড়ির বড় অনুষ্ঠানটির শেষে সাজঘরে বাঙালি শিল্পীদের অভিনন্দন জানালেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়–ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠাতা দুই প্রবাদ পুরুষ। বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদের চাপে তাঁরা দুজন একটি গান করলেন-বটুকদারই (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) গান 'এসো মুক্তিরণের সাথী।' শরণার্থী শিবিরে, মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে ক্যাম্পে। শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে বেনু গানটিকে মুক্তিযুদ্ধের গান হিসেবে অমর করে তোলে। দিল্লীতে 'গানে গানে মুক্তিযুদ্ধ' ষোল কলায় পূর্ণ হয়।'[৭৭]

একাধিক গানের ভ্রাম্যমান স্কোয়াড ছিল। শিল্পীরা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে গান পরিবেশন করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আবেগকে হৃদয়ে ধারন করতেন। তারা একাত্ম হয়ে যেতেন রণযোদ্ধাদের

---

৭৫. ওয়াহিদুল হক, স্বদেশ সাধনা, সেলিম রেজা সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ৩৯০

৭৬. ওয়াহিদুল হক, স্বদেশ সাধনা, সেলিম রেজা সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ৩৯-৪০

৭৭. ওয়াহিদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

সাথে। গান গেয়ে শিল্পীরা যোদ্ধাদের রণাঙ্গনে পাঠিয়ে আবেগ সংবরণ করতে পারতেন না। দু'চোখ ভরে উঠতো কান্নায়। কোনো যোদ্ধা রণাঙ্গন থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসে তা কারোই জানা ছিল না। ভ্রাম্যমান গানের স্কোয়াড সম্পর্কে নূরজাহান মুরশিদ লিখেছেন, "ছোট মেয়ে শারমিন গানের স্কোয়াডে যোগ দিয়েছে। তারা দলবদ্ধ হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে গান শোনাতো। বর্ষায় চারদিকে প্লাবন। তারা নৌকা নিয়ে সীমান্ত থেকে সীমান্তে পাড়ি দিত। মুক্তিযুদ্ধে বীর সেনানীরা যখন দলবদ্ধ হয়ে তাদের সমরাস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে রওনা হতো, তখন গানের স্কোয়াডের ছেলেমেয়েরা গান গাইতে গাইতে তাদের এগিয়ে দিত। এক পর্যায়ে তারা থেমে যেতো আর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে যেতো। মেয়ে বলল, 'তাদের চলার ভঙ্গির দিকে আমরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। আমাদের চোখ পানিতে ঝাপসা হয়ে আসতো এবং আমরা আরো জোরে জোরে গান গাইতাম যেন তারা শুনতে পায়। এক পর্যায়ে তারা আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যেতো।"[৭৮]

গানের শিল্পী, গণশিল্পী স্বভাব গায়ক সকলেই সমানভাবে গান করে যুদ্ধ করেছে। এই সময় শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রচলিত গানের পাশাপাশি অপ্রচলিত আরও কিছু গান গেয়েছেন। তার মধ্যে একটি গান ছিল গুরু সদয় দত্তের 'বাংলা মার দুর্নিবার আমরা তরুণ দল, শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন সংকটে অটল। হোসেন শাহ্, ঈশা খাঁর শক্তি মহিমা, লালন শাহ্ নজরুলের ছন্দ ভঙ্গিমা। ঢেউ তাদের দেয় মোদের চিত্তে অবিরল।'[৭৯] শিল্পীদের পাশাপাশি এ সকল গানের স্রষ্টারাও মুক্তিযোদ্ধা। তারা বহুকাল পূর্বে আন্দোলনের এ সকল গান লিখে নিজেরাও বাংলাদেশের স্বাধীনতার যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে গেলেন। ২৩ বছরের আন্দোলন সংগ্রামে যে সকল সুরকার, গীতিকার আর শিল্পীদের গান নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে গীত হয়েছে নতুন করে, তারা সকলেই হয়ে উঠেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা।

নয় মাসের সংগ্রামী জীবনের দুঃখ, কষ্ট, শোক, আর্থিক অনটনের মাঝে বাঙালিকে শুনতে হয় বুদ্ধিজীবী হত্যার নামে স্বজন পরিজনদের নিখোঁজ হওয়ার খবর। হৃদয় ভাঙ্গা সে শোক শেষ না হতেই তারা শুনতে পান বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতার খবর। একদিকে হারানোর শোক, আরেকদিকে জীবনের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। শোক আর অনাবিল আনন্দে শিল্পীরা শরণার্থী জীবনে স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করেছেন কেউ কেঁদে, কেউ হেসে। তাদের সেই অবর্ণনীয় অনুভূতির সবটুকুই ভাগ করে নিয়েছিলেন প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রের সুহৃদদের সাথে।

১৬ ডিসেম্বর সঙ্গীত শিল্পী সনজিদা খাতুন আর্থিক সংকটের মাঝেও প্রতিবেশী কন্যার আবদারে মিষ্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। শত কষ্টের মাঝেও স্বাধীনতার আনন্দকে তারা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন এপার বাংলা ওপার বাংলার সকল বাঙালির মাঝে।[৮০]

---

৭৮. আমার কিছু কথা, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৩৬
৭৯. সনজিদা খাতুন, স্বাধীনতার অভিযাত্রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
৮০. সনজিদা খাতুন, প্রাগুক্ত, ১৫৯

এর বাইরেও আরো কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার জন্য। নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো :

'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা' নয় মাসব্যাপী প্রায় শতাধিক শিল্পী কর্মী নিয়ে ভারতের বিভিন্নস্থানে, মঞ্চে, ট্রাকযোগে সঙ্গীতানুষ্ঠান করেছে, সীমান্ত অঞ্চল শরণার্থী ক্যাম্প, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ও মুক্তাঞ্চলের মানুষকে দেশপ্রেম ও আত্মশক্তিতে বলিয়ান করতে শিল্পীরা বিপুল উদ্যমে কাজ করেছেন। মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তার জন্য 'বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ' ও ভারতের 'বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতির' যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে, শরণার্থী শিবিরে, কোলকাতায় ও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ও দিল্লিতে রূপান্তরের গানসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনমত সংগঠন করে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। এই গোষ্ঠীর অনেক সদস্যই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে যুক্ত ছিলেন। এর শিল্পীরা যারা ছিলেন তাদের নাম :

> ১. ওয়াহিদুল হক ২. সনজিদা খাতুন, ৩. বুলবুল মহলানবীশ, ৪. শুক্তি মহালানবীশ, ৫. তপন কান্তি বৈদ্য ৬. দেবব্রত চৌধুরী, ৭. ফ্লোরা আহমেদ, ৮. বিপুল ভট্টাচার্য, ৯. সুকুমার বিশ্বাস, ১০. মহিউদ্দীন খোকা, ১১. এনায়েত মওলা জিন্নাহ, ১২. শারমিন সোনিয়া মুর্শিদ, ১৩. ডালিয়া নওশিন, ১৪. দীপা বন্দোপাধ্যায়, ১৫. মঞ্জুশ্রী নিয়োগী, ১৬. মঞ্জুলা দাসগুপ্তা, ১৭. অমিতাভ সেনগুপ্ত, ১৮. মৃম্ময় দাসগুপ্ত, ১৯. ঝর্না ব্যানার্জি, ২০. অর্চনা বসু, ২১. তৌহিদুর রহমান, ২২. মাহমুদুর রহমান বেনু, ২৩. শাহীন সামাদ, ২৪. আজহারুল ইসলাম, ২৫. এনামুল হক, ২৬. অরুণা রাণী সাহা, ২৭. কালিপদ দাস, ২৮. স্বপন চৌধুরী, ২৯. শান্তি মুখার্জী।

বঙ্গবন্ধু শিল্পী গোষ্ঠীঃ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তহবিল সংগ্রহের জন্য সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। এদের শিল্পীরা পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হন। শিল্পীরা হলেনঃ ১. মঞ্জুর আহমেদ, ২. সরদার আলাউদ্দীন, ৩. শহিদুল ইসলাম, ৪. দিলীপ সোম, ৫. রথীন্দ্রনাথ রায় ৬. মান্না হক, ৭. কাদেরী কিবরিয়া, ৮. স্বপ্না রায়, ৯. রমা ভৌমিক, ১০. নমিতা ঘোষ, ১১. মাধুরী আচার্যী, ১২. অরুণা সাহা, ১৩. সুমিতা দেবী, ১৪. অবিনাশ চন্দ্র শীল।

বিপ্লবী সাংস্কৃতিক পরিষদঃ এই পরিষদের শিল্পীরা ছিলেন ১. মোশাররফ হোসেন মশু, ২. মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন, ৩. বদরুন্নাহার তানি, ৪. মোঃ শাহজাহান, ৫. মোঃ শাহজামাল (তোতা), ৬. রতন লাল সাহা, ৭. আবু বকর সিদ্দিক প্রধান, ৮. শমসের ৯. কে কে সিদ্দিক, ১০. মোজাম্মেল হক, ১১. শামীম আরা (বিউটি), ১২. সাজেদা খাতুন (মনান), ১৩. আলম আরা ইকবাল বানু (হেলেন), ১৪. খামেরুল ইসলাম, ১৫. ধীরেন্দ্রনাথ নমদাশ।

মুক্তিযুদ্ধ শিল্পী গোষ্ঠী: সংরক্ষণ ও তথ্যের অভাবে এই গোষ্ঠীর অনেক শিল্পীর নাম জানা সম্ভব হয় নাই। শিল্পীদের অধিকাংশই স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্রের সাথে জড়িত ছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন শিল্পীর নাম: ১. অমিতাভ সেনগুপ্ত, ২. অর্চনা বসু, ৩. ঝর্ণা ব্যানার্জি, ৪. তৌহিদুর রহমান, ৫. দীপা বন্দোপাধ্যায়, ৬. ডালিয়া নওশীন, ৭. মাহমুদুর রহমান বেনু, ৮. মঞ্জুলা দাসগুপ্তা, ৯. মৃম্ময় দাসগুপ্ত, ১০. শান্তি মুখার্জী, ১১. শাহীন সামাদ।

মুক্তির গান: শিল্পীরা ট্রাকে করে বিভিন্ন এলাকার শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে বিপন্ন মানুষকে গান শুনিয়ে উজ্জীবিত করেছেন। ১. শাহীন সামাদ, ২. লুবনা মরিয়ম, ৩. তারেক আলী, ৪. মাহমুদুর রহমান, ৫. দুলাল চন্দ্র শীল, ৬. বিপুল ভট্টাচার্য, ৭. দেবু চৌধুরী, ৮. এনামুল হক প্রমুখ ছিলেন শিল্পী হিসেবে।

স্বাধীনতা সঙ্গীত দল: মুক্তিযুদ্ধকালে কুমিল্লার পশ্চিম নোয়াবাদী শরণার্থী শিবিরে গঠিত হয় দলটি। শিল্পীরা গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তারা গান পরিবেশন করতেন পশ্চিম নোয়াবাদী শরণার্থী শিবির, গোমতী যুব শিবির, দুর্গা চৌধুরী পাড়া যুবশিবির, ইছামতি যুব শিবিরসহ বিভিন্ন স্থানে। যাদের নাম জানা যায় তারা হলেন ১. ওস্তাদ ফুলেন্দু দাস, ২. কল্যাণ দাস. ৩. কনিকা দাস, ৪. বেবি দাস, ৫. কৃষ্ণ দাস, ৬. লিপিকা দাস, ৭ হেনা, ৮. দীপালি রায়, ৯. উমা, ১০. শান্তি, ১১. মুরারী সাহা, ১২. মিসেস মুরারী সাহা, ১৩. শেফালী রায়।

স্বাধীন বাংলা মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক সংঘ: ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থানীয় বিক্ষুব্ধ শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীরা গণসঙ্গীত শিল্পী সুখেন্দু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় একটি স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র গঠনের চেষ্টা করেন। এ কে এম হারুনুর রশিদ ও হীরণ বর্মনের কন্ঠে দুটি গানও বাণীবদ্ধ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই পাক-হানাদার বাহিনী বেতার কেন্দ্রটি ধ্বংস করে দেয়।

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের অভ্যন্তরে, মুক্তাঞ্চলে ও মুজিব নগরের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বেশ কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠনের সন্ধান পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধকালে এই সংগঠনগুলি স্থানীয় জনগণ, মুক্তিযুদ্ধ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরণার্থী শিবির, যুবশিবির, মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করা ও তহবিল সংগ্রহের জন্য গণসঙ্গীত, জাগরণী গান, দেশের গান, মুক্তিযুদ্ধের গান, কবিতা, নাটক, নৃত্যনাট্য, গীতিনকশা পরিবেশন করে জনগণকে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন।[৮১]

১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এভাবেই শিল্পীরা গান গেয়েছেন। আলোকচিত্র সাংবাদিক লিয়ার লেভিন মুক্তিযুদ্ধকালে তার ক্যামেরায় বিশাল ফুটেজে ধারণ করেছেন শিল্পীদের পরিবেশনা। যা 'মুক্তির গান' নামক তথ্যচিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ ও তাঁর স্ত্রী ক্যাথরিন মাসুদের সৌজন্যে দেখেছে বর্তমান প্রজন্ম। শিল্পীদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে, শরণার্থী শিবিরে মুক্তিযোদ্ধাদের গান শুনিয়ে প্রেরণা

৮১. কামাল লোহানী, মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার, দেশ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৯০-৯৬

যোগানোর দৃশ্য। লিয়ার লেভিন ধারণকৃত সে দৃশ্যচিত্র দেখে নতুন প্রজন্ম কিছুটা হলেও যুদ্ধ সময়ের করুণ নির্মম বাস্তবতা উপলব্ধি করেছে। শিল্পীরা ট্রাকে চড়ে, এক কাপড়ে, বিনিদ্র রজনী, জীবনের স্বাভাবিকতা ভুলে গিয়ে যুদ্ধের মাঠে শামিল হয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা বেতারের শিল্পী ও গানের স্কোয়াডের শিল্পীরা ছাড়াও আরো নাম না জানা অনেক শিল্পী, সুরকার, গীতিকার অংশ নিয়েছেন যার অনেক তথ্য সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে। কিন্তু সত্যি কথা হলো দেশে, দেশের বাইরে এমন অনেক উদ্যোগ অনেকেই নিয়েছিলেন যা ঐ সময়ে বিশেষভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করেছিল কিন্তু প্রচারের অভাবে জনসমক্ষে আসতে পারে নাই। তারাও মুক্তিযুদ্ধের শিল্পী সৈনিক হিসেবে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। গানে গানে গ্রাম জনপদের শংকিত মানুষের মনে জাগিয়েছিলেন তারা অভয়বাণী, জাগিয়েছিলেন আশা। শত্রুকে করেছেন গানের মধ্য দিয়ে হুঁশিয়ার। শরণার্থী শিবিরেও তারা উদ্বাস্তু বাঙালিকে সুন্দর, সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। ক্ষণিকের জন্য হলেও তাদের দুঃখ, কষ্টকে প্রশমিত করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন শিল্পীরা। উত্তর জনপদের তেমনি দুই প্রতিভাধর সংস্কৃতিকর্মী মহেশচন্দ্র ও কছিমউদ্দীন। উভয়েই ভাওয়াইয়া গানের অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পী ও গীতিকার। যুদ্ধকালে তারা দেশের জন্য গান রচনা করেছেন, গেয়েছেন শরণার্থী শিবিরের কষ্টের দিনগুলিতে। নিঃস্ব, অসহায় মানুষগুলোর জীবনে শান্তি ও স্বস্থি ফিরিয়ে দিতে। যুদ্ধের স্বপক্ষে ভাওয়াইয়া গানের ঢংয়ে রচিত সে গান গণমানুষের অধিকারবোধকে জাগিয়ে তুলেছিল। **১৯৭১** সালে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে শিল্পী মহেশচন্দ্র বেশ কিছু দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছিলেন। সে সময়ে তিনি ভারতের বন্ধু নগর শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গান শুনিয়ে শরণার্থী শিবিরের উদ্বাস্তু বাঙালিদের প্রাণে আশার সঞ্চার করেছিলেন। সে সময়ে রচিত শিল্পীর জনপ্রিয় একটি গানের কিছু অংশ:

বাংলা হামার নাড়ি পোঁতা জাগারে
বাংলা হামার নাড়ি পোঁতা জাগা।
এরি লাগি সাত কোটি ভাই
পাঁইনো মেলা দাগারে
পাঁইনো মেলা দাগা।

কছিম উদ্দিন মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা আর শরণার্থী শিবিরের ছিন্নমূল মানুষের মনে আশা আর স্বপ্নের ভবিষ্যৎ কল্পনা তৈরিতে গান লিখে আর সুর করে পরিবেশন করতেন। তাছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি গান গেয়েছেন।

তার গানের কিছু অংশ:

১) মুক্তিফৌজ কি যুদ্ধ করে বাপরে
মুক্তিফৌজের বিচ্ছুগুলা খান মারিয়া করল সাড়া
খানের বৌ দিশাহারা, বিহারি কয় বাপরে।

২) সোনার বাংলার মানুষগুলা কোথায় তোমরা যাও

দেখছো নাকি মোর প্রিয়ারে, আমায় কইয়া যাও।
সোনার গাঁয়ে ছিলরে ভাই আমার কুঁড়ে বাড়ি
হঠাৎ সেদিন দুপুরি ঝড়ে নিয়ে গেল কাড়ি।...
কোথায় গেলে তাদের পাব আমায় বলে দেও
দেখছো নাকি মোর প্রিয়ারে আমায় কইয়া যাও॥

এ ছাড়াও তাঁর লেখা—১) ও মাঝিরে জয় বাংলা বলিয়া নৌকায়, ২) নদীর ওপার ভাঙ্গে এপার কান্দেরে, ৩) আমি এপার ওপার নই, ৪) সইবো না সইবো না চোখ রাঙানি সইবো না, ৫) ওরে ও বিদেশি ভাইরে, ৬) শুনে যা বাংলাদেশের ঘটনা, ৭) আমরা ভারতবাসি ভাই, ৮) কান্দেরে ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে বন্ধি করিয়া। গানগুলো সে সময় অনেক জনপ্রিয় হয়েছিল।[৮২]

শরণার্থী শিল্পী রাম কানাই দাশ নিজের শিল্পী সত্তাকে দেশের কাজে লাগাতে সচেষ্ট ছিলেন। দেশের কঠিন সে দুঃসময়ে কিভাবে কোন পথে নিজেকে কাজে লাগানো যায় বিষয়টি শিল্পীকে ভাবিয়ে তোলে। পরিবারের দায় কাঁধে নিয়ে তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তার অনুভূতির কথা তিনি যেভাবে ব্যক্ত করেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের সময় কতজন কতভাবে বিপন্ন আর সমস্যাগ্রস্থ মানুষের সেবা করেছে প্রকাশ করা কঠিন। কেউ অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করেছে, কেউ রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে যুক্তছিল, কেউ সাহিত্য সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে গণমানুষের চেতনায় বিদ্রোহ আর আত্মত্যাগের শক্তিকে শাণিত করেছে এবং যুগিয়েছে সাহস। কিছু মানুষ শরণার্থী শিবিরে ঘুরে বেড়িয়েছে কার কি সমস্যা আছে এবং সামান্য হলেও কিছু করা যায় কিনা সেজন্যে। কেউ নিজ নিজ পেশাগত অঙ্গনের মানুষের প্রতি বিশেষ সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছে। এঁদের সকলের অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন।’ তিনি লিখেছেন, ‘ভাবলাম যা করার পরিবারের সঙ্গে থেকেই করতে হবে। করতে হবে শরণার্থী শিবিরকে কেন্দ্র করেই। মনে হলো সঙ্গীতকে নিয়ে যদি অসহায় বিপন্ন মানুষের আত্মবিশ্বাস, সাহস আর উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলা যায়, তবে সেও হতে পারে আরেক যুদ্ধ।... শুধু সঙ্গীত আছে সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে মিশে একাত্ম অচ্ছেদ্য বন্ধনে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায়। তাই তারুণ্যের দিপ্তিতে সমুজ্জল এক নামহীন গ্রুপের একজন হয়ে কাজ শুরু করে দিলাম। ওস্তাদ গোপাল দত্ত, দেওয়ান মহসিন রাজা চৌধুরি, মৃণাল তালুকদার, ফটিক চন্দ্র, মনোরঞ্জন চন্দ, বজু দাস, রানা দাস, দিগ্বিজয় চৌধুরি প্রমুখ সে দলের উজ্জল মুখগুলোর অন্যতম।... নবগঠিত দলের একজন হয়ে এলাকার ক্যাম্পে ক্যাম্পে সাহস জাগানিয়া গানের উন্মুক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে যেতে লাগলাম শরণার্থী জীবনের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত।... আমার সঙ্গীত প্রচেষ্টা যদি বালাট-মৈলাম, পানছড়ি, গোমাঘাট অঞ্চলের অযুত দূর্গত শরণার্থীদের একজনের চিত্তেও খানিক আশা আর

৮২. জেসমিন বুলি, উত্তরের তিন গীতি কবি ও তাদের লোকগান, অচীন পাখির কলগীতি: লোকগীতি কবিদের দৃষ্টি ও সৃষ্টিবিদ্যা, সম্পাদনা-সনজিদা খাতুন, আবুল হাসনাত, ছায়ানট, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৬৩-১৬৫ ও ১৭১-১৭৩

সাহস যোগাতে সক্ষম হয়ে থাকে, তবে সঙ্গীতের পেছনে আমার আজীবনের শ্রম সার্থক, এটাই আমার সঙ্গীত জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।'[৮৩]

শরণার্থী ক্যাম্পে গান ছাড়াও শিল্পীদের মানবিক বোধ জেগে উঠেছিল অসামান্য এক আবেগে। তারা হাত বাড়িয়েছিলেন রোগ,শোক, জরা,ব্যাধী আক্রান্ত মানুষের প্রতি। মানবতার সেই গভীর টান, অনাত্মীয়কে আত্মীয় করেছিল। স্বজন পরিজনের দুর্দশাকে লাঘব করেছিল, ছিন্নমূল মানুষের অন্তরের গভীরে ভালোবাসার প্রলেপ হয়ে তাদের শক্তি যুগিয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য গান রচনা হয়েছিল বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে। জীবনের সর্বোচ্য ত্যাগের মধ্যদিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির প্রকৃত বন্ধু। জেল, জুলুম, গ্রেফতার, হুলিয়া কোনো কিছুই তাকে দমাতে পারে নাই বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে। তার অদম্য মনোবল পাকিস্তানের দুশাসনের বুকে কাঁপন ধরিয়েছিল। গ্রাম বাংলার সহজ সরল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সোচ্চার কণ্ঠ শেখ মুজিবকে বাঙালি ভালোবেসে কেউ জাতির পিতা, কারো কাছে বঙ্গবন্ধু, কারো কাছে ঘরের অতি আদরের সন্তান সমতুল্য ব্যক্তিটি, সে ছিল তাদের সব সুখ দুঃখের নিরাপদ আশ্রয়। তাঁর আঙ্গুলি নির্দেশে সাড়ে সাত কোটি জনতা সাড়া দিতে প্রস্তুত ছিল। ৭ মার্চের ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাঙালি দেখেছিল তাঁর প্রত্যয়দৃপ্ত অঙ্গিকার। বাঙালির স্বার্থে আপোষহীন, অনমনীয়, সোচ্চার কণ্ঠকে বাঙালি অন্তর থেকে উপলদ্ধি করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস মুজিবের অবর্তমানে বাঙালি তার পক্ষেই যুদ্ধ করেছে। কবি সাহিত্যিকরা লিখেছেন মুজিব বন্দনা। অন্নদা শংকর রায় ২৫ মার্চ শেখ মুজিবের গ্রেফতারের খবর পেয়ে লিখলেন,

> যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা যমুনা গৌরী বহমান,
> ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবর রহমান।[৮৪]

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই মুক্তি পাগল বাঙালির প্রধান শ্লোগান ছিল 'জয় বাংলা,জয় বঙ্গবন্ধু।' শেখ মুজিব দিনে দিনে একজন কর্মী থেকে সাড়ে সাতকোটি বাঙালির নেতা হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালির অন্তরের সকল ভালোবাসা নিয়ে শেখ মুজিব শুধু এই বাংলায়ই নয় পার্শ্ববর্তী পশ্চিম বাংলায়ও তিনি আরাধ্য পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন ত্যাগ আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। কঠিন সে পথে নিজে হেটেছেন, সংগ্রামী জীবনে কারাবরন করেছেন বারবার কিন্তু আপোষের পথে হাটেন নাই। পশ্চিম বঙ্গের গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদার লিখেছেন অসামান্য কথার গানটি। সমরদাসের সুরে বাংলাদেশের শিল্পীরা গেয়েছেন সমবেত কণ্ঠে—

> 'বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিষ্টান
> বাংলার মুসলমান,আমরা সবাই বাঙালি
> তিতুমীর, ঈশা খাঁ, সিরাজ সন্তান এই বাংলাদেশে

---

৮৩. রাম কানাই দাশ, সঙ্গীত ও আমার জীবন, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ১০৬-১০৮

৮৪. সালাম আজাদ, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১২৫

ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, নেতাজী সন্তান এই বাংলাদেশে
এই বাংলার কথা বলতে গিয়ে বিশ্বটাকে কাঁপিয়ে দিল
কার সে কণ্ঠস্বর, মুজিবর সে যে মুজিবর
জয় বাংলা বলেরে ভাই।'

সরদার আলাউদ্দীনের কথা ও আবদুল জব্বারের সুরে ও কণ্ঠে—

'মুজিব বাইয়া যাওরে...
নির্যাতিত দেশের মাঝে জনগণের নাওরে...'

তোরাপ আলী শাহের কথা, সুর ও কণ্ঠে 'মুজিব সত্যযুগের', হাফিজুর রহমানের লেখা ও সুরে 'আমার নেতা, শেখ মুজিব' শহীদুল ইসলামের লেখা 'মুজিব এই বাংলার উন্নত শিরে', তেভাগা আন্দোলনের দোতরাবাদক শিল্পী টগর অধিকারীর লিখা একটি গানের প্রথম লাইনের সাথে মিল রেখে এস এম আবদুল গনি বোখারী লিখেন,

'দিনের শোভা সুরুজরে ভাই রাইতের শোভা চান,
ওরে বাংলার শোভা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।'

মোকসেদ আলী সাঁই লিখেছেন

'বাংলাদেশের খাঁটি মানুষ শেখ মুজিবুর জেনো ভাই
তার মতো আর বাংলার বন্ধু নাই।'

শিল্পী মমতাজ আলী খানের কথায়, শিল্পী মোস্তফা জামান আব্বাসীর সুরে

'জয় বাংলা জয় বাংলা বলে সব আয়রে বাঙালি ----
এবার সাতকোটি লোক টানছে বৈঠা বঙ্গবন্ধু হাল ধইরাছে।'

রথীন্দ্রনাথ কণ্ঠ দিয়েছেন

'ও আমার বাংলাদেশের মাঝি ভাই,
জয় বাংলা বলিয়া আইস রঙ্গিন পাল উড়াই।'

১৯৭১ সালে গানটি হিজ মাষ্টার্স ভয়েজ কর্তৃক রেকর্ড করা হয়েছিল। গৌরী প্রসন্ন মজুমদার রচিত নির্মলেন্দু চৌধুরী গীত ও সুরারোপিত

'বঙ্গবন্ধু ডাকেরে মুজিব ভাই ডাকেরে'

শ্যামল গুপ্তের লেখায়

'সাড়ে সাতকোটি মানুষের আরেকটি নাম মুজিবর'

কার্তিক কর্মকার লিখেছেন

'শোন ঐ শোন বাংলাদেশের শিকল ভাঙ্গার গান,

জয়তু মুজিব কোন মন্ত্রে জাগালে লক্ষ প্রাণ।'

চারণ কবি মোঃ সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন,

'বাঙালির জানের জান রাখতে বাঙালিদের মান
ওরে বাঙালের দরদী এলো, শেখ মুজিবুর রহমান।'

সিরাজুল ইসলামের আরেকটি গান

'হারে ও আমার বাংলার শেখ মুজিব
বাংলাদেশকে কইরাছ সজিব।'

গনেশ ভৌমিকের গান

'বাংলার স্বাধীনতা আনলো কে?
মুজিব মুজিব মুজিব।'

বিচার গানের কবি আবদুল হালিম লিখেছেন

'জাতির পিতা মহান নেতা(তারে) ছাড়বি কিনা বল
বন্দিশালায় ভাঙ্গবো তালা বাঙালি ভাই চলরে চল।'

নড়াইলের জারিয়াল মোসলেম উদ্দীন লিখেছেন,

'হে মহান! তুমি আদর্শ মানব তুমি পুরুষ প্রধান
তুমি সত্যের প্রতীক তুমি ধার্মিক ও নির্ভিক,
তুমি সার্বভৌমিক তুমি ন্যায় নিষ্ঠাবান।'

কবিয়াল মোসলেম উদ্দিন মুজিব বন্দনার পাশাপাশি তাঁর গর্বিত মাতার প্রতি বন্দনা গান লিখেছেন। তিনি যেন দেশ মাতারই প্রতীক।

'ভাগ্যবতী মেয়ে তুমি, মা ভাগ্যবতী মেয়ে
তোমার বুকে বঙ্গবন্ধু এলো দয়াল রূপ ধরিয়ে।'

আবদুল হালিম বয়াতি লিখেছেন

'বাঙালি জাতির পিতা মহান নেতা শেখ মুজিবর
বিনাদোষে শেখ সাহেবের বন্দি করল জেলের ভিতর।'

বিখ্যাত শিল্পীদের কণ্ঠে এ সকল গান হয়তো গাওয়া হয় নাই বা ব্যাপক জনগণের প্রশংসা ধন্য হয় নাই। তারপরও অবিসংবাদিত নেতার প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, মমতায় মেশানো বাণীতে যে গান তারা লিখেছেন তা স্থানীয় জনগনের ভালোবাসায় ধন্য হয়েছিল, কিছুটা প্রভাবও ফেলেছিল নিশ্চয়ই। তারা নিজ দায়িত্বে গান লিখে নেতার প্রতি, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সম্মান জানিয়েছেন। সে গান গেয়ে স্থানীয় মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করেছেন। জানা যায় যে আবদুল হালিম বয়াতি, শাহ আবদুল

করিম, শাহ আলী বাঙালি, মহিন শাহ, কাঙ্গাল কেবর, আবদুল গনি,সাইদুর রহমান বয়াতিদের অসংখ্য গান রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবের অসামান্য কীর্তিকে কেন্দ্র করে। যা আমাদের গানের দেশ, প্রাণের দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। যাকে উপেক্ষা করা যায় না।[৮৫]

এভাবেই বাংলাদেশের সকল গ্রাম জনপদেই জানা-অজানা শিল্পীরা স্থানীয়ভাবে অথবা আত্মরক্ষার্থে শরণার্থী হয়ে উদ্বাস্তু জীবনে গানের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতাকে তুলে ধরে মানুষকে প্রাণীত করেছেন। মুক্তির ইতিহাসের তারা অচ্ছেদ্য অংশ। জাতির শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর জন্য হয়তো সকলের নাম ও পরিচয় আলাদাভাবে পাওয়া না গেলেও এমন অনেক শিল্পীর ত্যাগে ও ভালোবাসায় বাংলাদেশ পেয়েছে স্বাধীনতা- যা আজ সর্বজন স্বীকৃত। আর এই স্বীকৃতিই জানা-অজানা শিল্পীর আত্মদানকে গর্বিত করেছে। তারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।

মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতাকে উপজিব্য করে লিখা আর সংগ্রামের অগ্নিঝরা সুরের গান সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। গানের সুরকার, গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল গাফফার চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুন, মহাদেব সাহা, আসাদ চৌধুরী, টি এইচ সিকদার, সারওয়ার জাহান, মাহবুব তালুকদার, শহীদুল ইসলাম, বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, মুস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ শাহ বাঙালি, প্রণজিৎ বড়ুয়া, এস.এম. আবদুল গণি বোখারী, মিজানুর রহমান চৌধুরী, নওয়াজেশ হোসেন, গণেশ ভৌমিক পরবর্তীকালে খাজা সুজন, মোকসেদ আলী সাঁই, সবুজ চক্রবর্তী, বিপ্লব দাশ, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, শফিক নওশাদ, অধ্যাপক অমিত রায় চৌধুরী, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, প্রণব চৌধুরী, অরূপ তালুকদার, নাসিম চৌধুরী, কাজী রোজী এবং আরো অনেকে। অনেক কবির কবিতাকে গানে রূপান্তর করা হয়েছিল। এছাড়াও অনেক গীতিকার স্বাধীনবাংলা বেতারে যোগদান করেন নাই কিন্তু তাদের গান স্বাধীনবাংলা বেতারে প্রচার হয়েছে। তাদের মধ্যে গাজী মজহারুল আনোয়ার, গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার, আবদুল লতিফ, ফজল-এ-খোদা, গোবিন্দ হালদার, নঈম গহর, সলিল চৌধুরী, শ্যামল দাসগুপ্ত, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কবি আজিজুর রহমান, হাফিজুর রহমান ও আরো অনেকে।

সঙ্গীত পরিচালনা আর শিল্পী হিসেবে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে সমর দাস, আবদুল জব্বার, অজিত রায়, আপেল মাহমুদ, রথীন্দ্রনাথ রায়, মান্না হক, এম এ মান্নান, শাহ আলী সরকার, সনজিদা খাতুন, কল্যাণী ঘোষ, অনুপ কুমার ভট্টাচার্য, মনজুর আহমেদ, কাদেরী কিবরিয়া, সুবল দাস, হরলাল রায়, এস এম এ গণি বোখারী, শাহীন মাহমুদ, অনিল চন্দ্র দে, অরূপ রতন চৌধুরী, মোসাদ আলী, শেফালী ঘোষ, হেনা বেগম, মফিজ আঙ্গুর, লাকী আখন্দ, স্বপ্না রায়, নাসরিন আহমাদ, মালা খান, রূপা খান, মাধুরী আচার্য, নমিতা ঘোষ, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, আবু নওশের, রমা ভৌমিক, মনোয়ার হোসেন, অজয় কিশোর রায়, কামাল উদ্দীন, ইকবাল আহমেদ,

---

৮৫. সাইম রানা, বাংলাদেশের গণসঙ্গীত বিষয় ও সুর বৈচিত্র, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৫৮-২৬৬

রঞ্জন ঘটক, মনোরঞ্জন ঘোষাল, নায়লা জামান, বুলবুল মহলানবীশ, এস এ খালেক, মকসুদ আলী সাঁই, ফকির আলমগীর, মলয় কুমার গাঙ্গুলী, মলয় ঘোষ দস্তিদার, মনজুলা দাসগুপ্তা, সুব্রত সেনগুপ্ত, উমা চৌধুরী, মোশাররফ হোসেন, ঝর্ণা ব্যানার্জী, দীপা ব্যানার্জী, সুকুমার বিশ্বাস, তরুণ রায়, প্রবাল চৌধুরী, তোরাপ আলী, রফিকুল আলম, কল্যাণ মিত্র, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী, লীনা দাস, সকিনা বেগম, রেজওয়ানুল হক, অনিতা বসু, নীনা, কনা, মহিউদ্দীন খোকা, রিজিয়া সাইফুদ্দিন, রেহানা বেগম, মিহির নন্দী, অমিতাভ সেনগুপ্ত, ভক্তি রায়, অর্চনা বসু, মোস্তফা তানুজ, সাধন সরকার, মুজিবুর রহমান, মিনু রায়, রীতা ব্যানার্জী, শান্তি মুখার্জী, জীবন কৃষ্ণ দাস, শিব শঙ্কর রায়, সৈয়দ আলমগীর, ভারতী ঘোষ, শেফালী স্যান্যাল, মদন মোহন দাস, শহিদ হাসান, অরুণা সাহা, জয়ন্তী ভূঁইঞা, কুইন মাহজাবিন, মৃণাল ভট্টাচার্য, শাফাউন নবী, প্রদীপ ঘোষ, মিহির কর্মকার, শক্তি শিখা দাস, মিহির লালা, গীতশ্রী সেন, গৌরাঙ্গ সরকার, প্রনব চন্দ্র ঘোষ, সাইদুর রহমান, কাঞ্চন তালুকদার, মুকুল চৌধুরী, মলিনা দাস, ইন্দু বিকাশ রায়, বাসু দেব, পরিতোষ শীল, মিতালী মুখার্জী, শ্যামল মুখার্জী, তপন ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন ভূঁইঞা, শক্তি মহলানবীশ, তিমির নন্দী, মামুনুল চৌধুরী, আফরোজা মামুন এবং আরো অনেকে। যে সকল শিল্পী স্বাধীন বাংলা বেতারে যান নাই কিন্তু তাদের গান স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন শাহনাজ রহমতুল্লাহ।

যন্ত্র সঙ্গীত ছিলেন সুজেয় শ্যাম, কালাচাঁদ ঘোষ, গোপী বল্লভ বিশ্বাস, হরেন্দ্র চন্দ্র লহিড়ী, সুবল দত্ত, বাবুল দত্ত, অবিনাশ শীল, সুনীল গোস্বামী, তরিৎ হোসেন খান, দিলীপ দাসগুপ্ত, দিলীপ ঘোষ, জুলু খান, রুমু খান, বাসুদেব দাস, সমীর চন্দ্র, দীপক মুখার্জী, শতদল সেনসহ আরো অনেকে।[৮৬] অনেক নাম সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে কিন্তু তারা সবাই শব্দসৈনিক মুক্তিযোদ্ধা।

মুজিব নগরে এক বৈঠকে সংগ্রামী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (মরহুম) স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। উদ্যোক্তাদের সাহসের প্রশংসা করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোমরা এমন এক সময় আমাদের জনমনে আশার আলো সঞ্চারিত করেছিলে, যখন আমাদের দেশ জনপদে আলো ছিল না।'[৮৭]

---

৮৬. শামসুল হুদা চৌধুরী, একাত্তরের রণাঙ্গন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৭০-৭৪

৮৭. বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, প্রাগুক্ত, ২২

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী সুহৃদদের ভূমিকা

ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সঙ্গীত শিল্পীদের ভূমিকা

মার্চের আক্রমনের পরই দলে দলে বাঙালি নিরাপদ জীবনের আশায় আশ্রয় নেয় ভারতে। ভারতের জনগণ উদ্বাস্তু ছিন্নমূল বাঙালিদের নির্বিঘ্নে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। আগরতলা, সোনামূড়া, বিলোনিয়া, বিশ্রামগর, সাবরুম, মুক্তিনগর, মেলাঘর, ত্রিপুরার স্থানীয় মানুষ অকৃত্রিম সহমর্মিতা ও বন্ধুত্ব নিয়ে অসহায় বাঙালির প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়। বাঙালি তাতে ফিরে পেয়েছিল নির্ভরতা ও ভয়হীন নিশ্চিত আশ্রয়। বিশেষ করে ত্রিপুরা, আগরতলা, পশ্চিম বাংলার কোলকাতায় বাঙালি শরণার্থীদের সংখ্যা ছিল সব চাইতে বেশি। ভারতের জনগণের সাথে সেদিন বাঙালিদের যে একাত্মতা গড়ে উঠেছিল তা বাঙালির সাহসী স্বত্তাকে শক্তি যুগিয়েছিল শতগুণ।

একাত্তরে আগরতলা ছিল বাঙালির যুদ্ধ রাজধানী। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের 'মুজিবনগর' নাম ঘোষণা হলেও সকল রাজনৈতিক তৎপরতা চালানো হয়েছিল আগরতলা থেকেই। বাংলাদেশের অত্যন্ত নিকটবর্তী সীমান্ত ও সহজ যোগাযোগের কারণে ত্রিপুরার ভিতর দিয়ে নিরাপদে ভারতের সর্বত্র যাতায়াত সম্ভব ছিল। ত্রিপুরার তৎকালীন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ যিনি বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের নির্ভরশীল ও পরীক্ষিত বন্ধু-যেভাবে উদার হস্ত প্রসারিত করে স্কুল, কলেজ, বাড়িঘর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, বিশাল পতিত জমি মুক্তিযোদ্ধা ও শিরণার্থীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ছেড়ে দিয়েছিলেন তা সেদিন বাঙালির জন্য ছিল একমাত্র ভরসা। অগণিত ছিন্নমুল বাঙালি, শিল্পী, সাহিত্যিক এখানে আশ্রয় নেয়, প্রশিক্ষণ নেয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে যোগাযোগ তৈরি আর মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রশাসন সবই তৈরি হয়েছিল আগরতলায়। আগরতলার জনগণ তাদের সবটুকু অধিকার, সুযোগ সুবিধা স্বেচ্ছায় ভাগ করে নিয়েছিল প্রায় সমান সংখ্যক উদ্বাস্তু বাঙালির সাথে। আসাম, মেঘালয় রাজ্যও শরণার্থী বাঙালির আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। ভারতের সাধারণ জনগণের অকৃত্রিম ভালোবাসার পাশাপাশি ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সহযোগীতা ও অংশগ্রহণ। সেনাবাহিনীর জওয়ানরা মুক্তিযুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর অংশ হয়ে যুদ্ধে জীবন দান করেছেন অকাতরে। তাঁদের অকৃপন আন্তরিক সহযোগিতা বাঙালির স্বাধীনতা প্রাপ্তীকে সহজতর করেছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার বিভিন্ন শহরে বিশেষ করে আগরতলায় যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসা সিক্ত করেছিল মরণপণ সৈনিকদের, শিল্পী, সাহিত্যিক আর শরণার্থীদের। সরকারি, বেসরকারি প্রচেষ্টা চলেছিল একই সাথে। স্থানীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে শিল্পীদের অসহায়ত্ম যেমন ঘুচিয়েছিল একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের প্রচার কাজও সমানভাবে এগিয়েছিল। পাকিস্তানি বর্বরতা ও নৃশংসতা প্রচার করে স্থানীয় ভারতীয়দের সহানুভূতিশীল করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিশ্বেও তা প্রচার করা সম্ভব হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুবিমল ভট্টাচার্য লিখেছেন, “১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে যখন আগরতলার পথে ঘাটে সর্বত্র বাংলাদেশের শরণার্থীদের ভিড়। একদিন আকাশবানীর দিল্লী কেন্দ্র থেকে প্রভাতী বাংলা খবরে প্রচার করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত গায়ক মুহম্মদ আবদুল জব্বার আগরতলা এসে আশ্রয় নিয়েছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে আবদুল জব্বারের গানের ভক্ত ছিলাম। তাঁর কণ্ঠে ‘ভবের নাট্য শালায় মানুষ চেনা দায়’ ও ‘বন্ধু প্রেমে হইলাম পাগল বন্ধু আমার কোথায় রইল হায়’, গান দুটি শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এমন একজন বিখ্যাত শিল্পী আমাদের শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন জেনে চুপ থাকা অসম্ভব। শরণার্থী সহায়তা কেন্দ্রে গিয়ে খোঁজ করবো স্থির করলাম। প্রখ্যাত তবলাবাদক বিশ্বদেব ভট্টাচার্যকে সাথে নিয়ে অল্প খুঁজেই জব্বার ভাইকে ঐ বাড়িটির নিচতলায় একটি গ্যারেজে পাওয়া গেল। এক বস্ত্রে তিনি চলে এসেছেন জানতে পারলাম। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন নামি দামী সঙ্গীত শিল্পী ও সংস্কৃতি জগতের গুণীজনও আছেন। তারা হলেন আপেল মাহমুদ,স্বপ্না রায়, প্রখ্যাত কবি ও গীতিকার প্রয়াত শহিদুল ইসলাম ছাড়াও রেডিও টেলিভিশনের কয়েকজন কর্মীও ছিলেন। এই শিল্পী দলটির তখন অন্ন বস্ত্র ও উপযুক্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা নাই। প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছদ্মবেশে খালি হাতে চলে আসায় সাধারণ চলার খরচও তাদের নাই। আমরা তখন আর্থিক দিক থেকে ততটা সচ্ছল না হলেও তাদের আশ্বস্ত করেছিলাম যে তাদের দুর্দিনে আমরা তাদের পাশে আছি। আমরা তাদের নিয়ে আগাতেই প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার রবীন সেনগুপ্তকে দেখতে পাই তার গাড়ি নিয়ে এদিকে আসছেন। তাকে সব কথা জানালাম। তিনি সবাইকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে আখাউড়া রোডের উপর একটি বাড়ির কাছে গিয়ে থামলেন। তিনি তখনই তাদের দুটো ঘর খুলে দিয়ে তাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গীতপ্রেমী আমার এক বন্ধু বিমল কুমার সিনহা কোথা থেকে বিরাট আকারের ৩/৪টি শতরঞ্জি ও কয়েকটি মশারি নিয়ে হাজির। এখন আহার ও অন্যান্য খরচের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম কয়েকদিন আত্মীয় বন্ধুদের বাড়িতে আপ্যায়ন ও নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা হলো। প্রথম কিছুদিন আমি ও বিশ্বদেব হাত খরচের যোগান দিলাম তারপর শুরু হলো নানা জায়গায় ঘড়োয়া অনুষ্ঠান করে অর্থ সংগ্রহ করে তাদের খরচপত্র চলতে থাকে।”[১]

১. সুবিমল ভট্টাচার্য,মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি চর্চা, বিধানরায়,আগরতলা একাত্তর, পারিজাত প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ২৯-৩০

ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সীমিত পরিসরে নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রচার করে সংগ্রামরত মুক্তিফৌজ, মুক্তিবাহিনী আর শরণার্থী বাঙালিদের মাঝে দেশপ্রেম জাগানোর জন্য সচেষ্ট ছিল। শরণার্থী শিবিরে প্রায় প্রতিদিন শিল্পী আব্দুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, রেজা শহীদ, স্বপ্না রায়দের নিয়ে নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হতো-ছিন্নমূল মানুষের মাঝে জাতীয় চেতনা ধরে রাখা আর দেশাত্ববোধক গান শুনিয়ে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে শত্রুমুক্ত দেশোদ্ধারে তাদের কাজে লাগাতে। শরণার্থী জীবনের দুঃখ কষ্ট, গ্লানী দূর করে মানসিকভাবে তাদের মনে দেশপ্রেম জোরালো করার জন্যই তা করা হতো।

সুবিমল ভট্টাচার্য লিখেছেন, "আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সাংবাদিক, শিল্পী, লেখক ও ফটোগ্রাফাররা সকলেই মুক্তিযুদ্ধে সৈনিকের মতো কর্তব্য পালন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলি ভয়ংকর হলেও আমাদের হৃদয়ে তা স্বর্নাক্ষরে চিরকাল লিখা থাকবে। অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে ভোলা যায় না। ব্যাথা বেদনার দিনগুলির স্মৃতি এক অর্থে আমাদের সুখ স্বপ্নের মতো হাতছানি দিয়ে ডাকে।"[২]

এক সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কার্যক্রম চালু হলে শরণার্থী শিল্পী, কলাকুশলীদের কোলকাতায় চলে যেতে হয়। বেতারের মাধ্যমে এবং ভ্রাম্যমান স্কোয়াড়ের মাধ্যমে পরবর্তীতে শিল্পীরা সরকারি বেসরকারিভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রায় সাড়ে আট মাস আগরতলা ত্রিপুরার মানুষ অন্তরের টানে, ভাবের টানে, প্রাণের টানে, পূর্ব পূরুষের মাটির ঋণ, সংস্কৃতির উত্তরাধীকার আর স্বাধীনতার টানে বাঙালিদের সাথে যে নিবিড় ও প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিল তা উদ্বেল আবেগে সবাইকে ভারাক্রান্ত করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপর অসংখ্য শিল্পী কলাকুশলী কোলকাতা শহরে আশ্রয় নেয়। বাঙালি শরণার্থী শিল্পীদের অসহায়ত্ব ঘুঁচেছিল পশ্চিমবঙ্গ ও কোলকাতার শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের সহযোগীতার উদার হস্তপ্রসারে। তারা বাঙালি শিল্পীদের শিল্পীসত্ত্বা কাজে লাগিয়ে শিল্পীদের দুর্দশা যেমন ঘুচিয়েছেন আবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রচার কাজ চালিয়ে ভারতের স্থানীয় জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল করেছেন। যা বহির্বিশ্বেও প্রচার হয়ে পাকিস্তানি শাসকের গণহত্যার নৃশংসতা প্রকাশ করেছিল। ভারতীয় শিল্পীদের চেষ্টায় বিচ্ছিন্ন বাঙালি শরণার্থী শিল্পীদের একত্রিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে 'বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতির' সহায়তা খুব কাজে লেগেছিল। সেই সংস্থার সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। নিরলশ কর্মী ছিলেন দীপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রসূন বসু এবং আরো অনেকে। বাংলাদেশের সহায়তায় তখন এরকম আরো বহু সংস্থা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী দেবী, গৌরী আইউব, জাষ্টিস এস এ মাসুদ, দিলীপ চক্রবর্তী প্রমুখ।[৩]

---

২. সুবিমল ভট্টাচার্য, মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি চর্চা, বিধান রায়, আগরতলা একাত্তর, পারিজাত প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৩৪-৩৫

৩. সনজিদা খাতুন, সংস্কৃতি কথা সাহিত্য কথা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৪; পৃ. ৪৩

ভারতীয় শিল্পীরা সঙ্গীতের মহড়া করে শরণার্থী শিল্পীদের প্রস্তুত করেছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করার জন্য। প্রথম দিকে ভারতীয় বিখ্যাত শিল্পীদের সাথে শরণার্থী শিল্পীদের গান গাওয়ানো হতো। পরে শরণার্থী শিল্পীরা নিজেরাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দিতেন। বাঙালি শিল্পীদের গান ভারতীয় জনসাধারণের কাছে প্রশংসাধন্য হয়েছিল। টিকেট কেটে ভারতের মানুষ শিল্পীদের পরিবেশনা শুনে তাদের যেমন উৎসাহ দিতো, আবার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তহবিলে অর্থ যোগানে ভূমিকা রাখতো। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাঙালি শিল্পীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাপক সাহায্য করেছে ভারতবর্ষের সরকার, শিল্পী ও সাধারণ জনতা।

ভারতীয় শিল্পীদের চেষ্টায় একটার পর একটা গানের সফল অনুষ্ঠান হয়েছিল। দুই বাংলার শিল্পীরাই তাতে অংশগ্রহণ করেছে। যাদের উদ্যোগ আর প্রচেষ্ঠায় এ কাজ সফল হয়েছিল তাদের প্রসঙ্গে জানা যায় বীরেন সোম-এর লেখা থেকে, 'মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে যেভাবে পেরেছিলেন কাজ করেছেন। সভাপতি তারা শঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, দীপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদক। তারা বাংলাদেশের শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে তাদের সংগঠিত করছেন। দীপেন দার কাছে জানতে পারলাম ১৪৪ লেনিন স্মরণীতে বাংলাদেশের শিল্পীদের নিয়ে গানের দল গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের শিল্পীরা নিয়মিত গানের মহড়া করছেন। লেনিন স্মরণীতে গিয়ে ওয়াহিদুল হক ও সনজিদা খাতুনকে পেলাম। ওয়াহিদুল হক আমাদের পূর্ব পরিচিত। বললেন বীরেন আমাদের সঙ্গে কাজ করুন। শিল্পী মুস্তফা মনোয়ার, স্বপন চৌধুরী ও গোলাম মওলাও আমাদের সঙ্গে আছেন। দেখলাম গানের মহড়া চলছে। শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন স্বপন চৌধুরী, আলোকময় নাহা, রফিকুল আলম, মাহমুদুর রহমান বেনু, শাহীন মাহমুদ, নায়লা জামান, ফ্লোরা আহমদ, বিপুল ভট্টাচার্যসহ আরো অনেকে। প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ওয়াহিদুল হক ও সনজিদা আপা। এই সংগঠন ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং মুক্তি যোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে গানের অনুষ্ঠান করে তাদের মনোবল চাঙ্গা করে তুলতে সহায়তা করত এবং ভারতীয় জনগণকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহনশীল করে তুলেছিল। চিত্রশিল্পীদের কাজ ছিল অনুষ্ঠানের মঞ্চ সজ্জা ও পেছনের দৃশ্যপট আঁকা। মুস্তফা মনোয়ারের নির্দেশনায় আমি ও গোলাম মওলা মঞ্চ সজ্জা করতাম।"[৪]

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির প্রতিটি কর্মী দিন রাত পরিশ্রম করতেন। শিল্পীদের মনোবলকে কাজে লাগানোর জন্য ব্যাপকভাবে তাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজে লাগানো হয়। জানা যায় যে সমিতির পক্ষ থেকে শিল্পীদের একটা করে প্রশংসা পত্র দেওয়া হয়েছিল যা দিয়ে শিল্পীরা বাস, ট্রাম, রেল গাড়িতে বিনা ভাড়ায় ভ্রমনের সুবিধা পেতে পারে।[৫]

---

৪. বীরেন সোম, মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীসমাজ, পপি চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা, প্রিতম প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫৪-৫৫

৫. আবুল হাসেম চৌধুরী, যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয় মাস, কাকলী প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১৬২-৬৩

নজরুল গীতি শিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল লিখেছেন নিজের উদ্বাস্তু সেদিনের কথা “কোলকাতায় তখন বিশাল সব বড় বড় শিল্পী। যাই হোক আকাশবাণী কোলকাতায় তখন গেলাম। বিরেন বসু নামে একজন বিশিষ্ট নজরুল গীতির শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় ঘটল আমার। তিনি বললেন, আমাকে তুমি একটি দরখাস্ত লিখে দিয়ে যাও। কয়েকদিন পরেই আমাকে চিঠি দিয়ে ডেকে আধা ঘণ্টা প্রোগ্রাম দিলেন, ৩টা নজরুল গীতি, ৩টা আধুনিক গান।” শিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল আরো বলেন, “স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পী, সুরকার, গীতিকার সব মিলিয়ে সব থেকে বড় অনুষ্ঠান যেটা হয়েছিল সেটা বাংলাদেশের ইতিবৃত্ত যেখানে কথিকা, নাটক, গীতি কবিতা এবং এখানে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকারের বড় বড় এমনকি উত্তম কুমারের মতো শিল্পীরাও টিকেট কেটে গান শুনতে এসেছিলেন।”[৬] এভাবে ভারতীয় শিল্পীদের সহযোগীতায় শরণার্থী শিল্পীদের আর্থিক সংকট ঘুঁচেছিল।

বাঙালি উদ্বাস্তু শিল্পীদের যখন ভারতীয় শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে মহড়া চলতো তখন সার্বিক খোঁজ খবর নেয়া এবং শিল্পীদের উৎসাহ যোগাতে হাজির হয়ে যেতেন সংস্কৃতি অঙ্গনের বিখ্যাত ব্যক্তিরা। এদের মধ্যে থাকতেন সিদ্ধেশ্বর সেন, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তরুণ স্যান্ন্যাল, দেবেশ রায়, শঙ্খ ঘোষ, সন্তোষ কুমার ঘোষ, কনিকা বন্দোপাধ্যায়সহ বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিত্বরা। ১৪৪ লেনিন স্মরণীতে তারা হাজির হতেন। তাদের উদ্যোগেই বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিলের সাথে মিলে তৈরি হয়েছিল ‘মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা।’ এর সভাপতি হয়েছিলেন সনজিদা খাতুন আর সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বেনু।[৭] ভারতীয় শিল্পীদের উদার, আন্তরিক আর অকৃত্রিম সহযোগীতা বাঙালি শিল্পীদের নয় মাসের পথ চলা সহজ করেছিল। ভারতের মতো দেশের উদার সহযোগীতার কারণে আন্তর্জাতিক মানবিক বিশ্ব এগিয়ে এসেছিল বাংলাদেশকে সহযোগিতা দিতে। যা বাঙালিকে তার দুঃসময়ে প্রেরণা হয়ে সাহসী পথ চলতে বলিয়ান করেছে।

পূর্ব বাংলার বাঙালির প্রতি ভারতবাসীর আন্তরিক টান বাঙালিকে ভারত টেনে নিয়েছিল। তারা আত্মার আত্মীয় হয়ে তাদের সামর্থের সবটুকুই করার চেষ্টা করেছিলেন যুদ্ধের বিভিষিকায় মোড়ানো বাঙালির অসহায় দিনগুলোতে। সরকারি প্রচেষ্ঠার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ, ব্যক্তিগত উদ্যোগ সবদিক থেকেই তারা সচেষ্ট ছিলেন যুদ্ধদিনের ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে। গোটা নয় মাস মানবতার টানে, সংস্কৃতির টানে, ধর্মনিরপেক্ষ নীতির টানে সর্বপরি আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা তারা দিয়েছিলেন, তা আজীবন বাঙালি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ রাখবে।

ভারতের বিখ্যাত শিল্পী যাদের অবস্থান সাধারণ বাঙালির কাছে ছিল দূর আকাশের নক্ষত্রসম। তাদের অকৃপণ, উদার সহযোগীতা বাঙালিকে নিরন্তর সাহস যুগিয়েছে। বাঙালির চরমতম

৬. তারেক মাহামুদ, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র, আগামী প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ১৩১-৩২
৭. সনজিদা খাতুন, স্বাধীনতার অভিযাত্রা, ছায়ানট, ২০০৪, পৃ. ১৫৪-৫৬

দুঃসময়ে যা ছিল অসমান্য প্রাপ্তী। অসহায় দুর্দিনে তাদের গান সম্মুখে বসে শুনতে পাওয়া ছিল সাধারণ শরণার্থী বাঙালির কল্পনাতীত পাওয়া।

গোলাম মুরশিদ লিখেছেন, 'যাদের গান শোনার জন্য দিনের পর দিন উন্মুখ হয়ে থাকতাম, বাংলাদেশ মিশনের সামনে তারা সব জীবন্ত হয়ে দেখা দিলেন একের পর এক। সাগর সেন, অর্ঘ্য সেন, প্রমুখ এক একজন মঞ্চে উঠলেন। এক সময় উঠলেন কোলকাতা ইয়ুথ কয়ারের শিল্পীরা। রুমা গুহঠাকুরতা গাইলেন বিখ্যাত বিস্তির্ণ দুপারে গঙ্গা বইছ কেন'? পল রবসনের বিখ্যাত গানের ওপর ভিত্তি করে ভুপেন হাজারিকার রচনা। মানবতার বাণী সম্মলিত সে গান সবার হৃদয় স্পর্শ করল। রুমা গুহঠাকুরতার পূর্ব পুরুষ বরিশালের। পূর্ব পুরুষের টানে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তার হৃদয়ে বাড়তি আবেগ ছিল। আরো কিছু শিল্পী, গায়ক গায়িকা আর সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমাদের রাজশাহীর ছাত্র রফিকুল আলম, কাদেরী কিবরিয়া, শাহীন মাহমুদ, রথীন রায়, মান্না হক প্রমুখ অনেকেই ছিলেন। তারা গেয়েছিলেন আমাদের দেশের গান।"[৮]

বাংলাদেশের কঠিন সেই দুর্দিনে বাঙালির আবেগ ভর করেছিল ভারতীয় শিল্পীদের মাঝে। তারা এগিয়ে এসেছিল বাঙালির দুর্দশা ঘুঁচাতে। দেখে মনে হতো তারা বাঙালিকে নয় নিজেদেরকেই সাহায্য করছে। তাদের সেই আবেগ কখনও কখনও বাঙালির প্রতি ভালোবাসার কান্না হয়ে ঝড়ে পড়তো। কোলকাতার তৎকালীন পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব হোসেন আলী তাঁর ৭১ জন বাঙালি কর্মচারীসহ বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। দেশে বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ঘটনাটি। প্রচার মাধ্যম, দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের মাঝেও উত্তেজনা তৈরি করেছিল তা। তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশাল দেশ প্রেমিক। পরদিন সকালে মুষলধারে বৃষ্টিতে ভিজে হাই কমিশনে লাখো লোকের জনসমুদ্রে হেমন্ত মুখার্জি ও সুচিত্রা মিত্রের দল অবিরাম গান গেয়েছিলেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'—হাইকমিশন ভবনে তখন উড়ছিল বাংলাদেশের পতাকা।[৯] প্রকৃতির কান্না আর মানুষের আবেগের বন্যা একাকার হয়েছিল সেইদিন। কোলকাতার বিখ্যাত সব শিল্পীরা যখন সম্মানী হিসাবে বড় অংকের টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইতেন সেই পর্যায়ের শিল্পীরাও কোনো প্রকার সম্মানী ছাড়াই গেয়েছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। শিল্পীদের এমন উদারতা যা ছিল মুক্তিসংগ্রামের প্রতিই তাদের দৃঢ় অবস্থান। বাঙালির প্রতি পাকিস্তান সেনা শাসকের অন্যায় অত্যাচারকে ঘৃনা করে বাঙালির বিপন্ন, অসহায় দুর্দিনে ভালোবাসার পরশ বুলিয়েছেন ভারতের শিল্পীরা। বঞ্চিত বাঙালির প্রতি মানবিক, নৈতিক সমর্থন দিয়ে তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

বাংলাদেশের যুদ্ধ পরিস্থিতি আর পাকিস্তান সরকারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতীয় শিল্পীরা ঘৃনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন গানে গানে। যা ছিল শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক, অনুদার,

---

৮. গোলাম মুরশিদ, যখন পলাতক মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, সাহিত্য প্রকাশ,ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৬-৬৮
৯. এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, অনন্যা, ১৯৮৫, পৃ. ৭৭

অমানবিকতার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক, উদারতা, মানবতাবাদের পক্ষে সর্বপরি বাঙালির ন্যায্যতার পক্ষে। গোলাম মুরশিদ লিখেছেন, 'অন্ধ রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী স্বপন গুপ্ত, দেবব্রত বিশ্বাসের ছাত্র, ইংরেজিতে ডিগ্রি নিয়েছেন। গাইতে এসেছেন অনুষ্ঠান যখন শেষ প্রায়, তবলা বাদকও চলে গেছেন। শ্রোতা, দর্শক আসর শেষ করে চলে যাচ্ছেন প্রায়। শিল্পী হারমোনিয়াম সামনে নিয়ে গেয়ে উঠলেন কাউকে পরোয়া না করে। 'বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই, মরতে হবে, পথ জুড়ে কি করবি বরাই সরতে হবে'-কোথা থেকে চলে এলেন তবলা বাদক, দর্শকও ফিরে আসলো শিল্পীর গানের আহবানে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের গানের পর তিনি দর্শক শ্রোতাদের জন্য উদার কণ্ঠে গাইলেন 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদুরেরও পিয়াসী'- রবীন্দ্রনাথের গান সার্থক হয়েছিল বাঙালির কণ্ঠে এবং বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে।'[১০] বাঙালির আবেগ, ক্রোধ, কষ্ট, দ্রোহ, ঘৃণা, ভালোবাসা, ভারতীয় শিল্পীরা অন্তরে ধারণ করে কণ্ঠের সুরে সুরে বিপন্ন বাঙালিকে শক্তি যুগিয়েছেন।

প্রথম দিকে গানের সংকট ছিল। ভারতীয় গীতিকার, সুরকারগণ এগিয়ে এসেছিলেন সংকট মোচন করতে। ভারতের শিল্পী,সুরকার,গীতিকারগণ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অনেক জনপ্রিয় গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন এবং গেয়েছেনও। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া শিল্পীরা যতটুকু নিয়ে গিয়েছিলেন সাথে করে তা অল্প সময়েই বার বার বেজে পুরনো হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে প্রয়োজন হয় নতুন গানের নতুন সুরের। সেই প্রয়োজন মিটিয়েছেন ভারতের সুরকার ও গীতিকারগণ। গোবিন্দ হালদার তার দুটি খাতা ভরে ফেলেন বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে গান লিখে। তার তিনটি বিখ্যাত গান মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি যাতে সুর দিয়েছেন শিল্পী ও কণ্ঠযোদ্ধা আপেল মাহমুদ। নিজেই গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে সমরদাসের সুরে সমবেত কণ্ঠে গানটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল সেই সময়ে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে গানটি সুর দিয়েছেন আপেল মাহমুদ আর কণ্ঠ দিয়েছেন সপ্না রায়। ফকির আলমগীর গানগুলোর পাশাপাশি আরো কিছু গানের কথা লিখেছেন গোবিন্দ হালদার রচিত—(১) পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা, (২) লেফট রাইট লেফট লেফট; নওজোয়ান সব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, পথে পথে বাঁধার পাহাড় বিদ্যুৎ গতিতে পায়ে দলো।[১১] তাঁর রচিত গানগুলি যেমন মানুষের হৃদয় পটে সহস সঞ্চার করেছিল তেমনি রনাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধারা প্রেরণা পেয়েছিল হায়েনা শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।

গৌরী প্রসন্ন মজুমদার এ বাংলার মানুষ ছিলেন। তিনি পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি অনেক গান লিখেছেন। তাঁর বিখ্যাত গান 'শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ স্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রনি, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।' গানটির প্রতিটি শব্দে বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু আর বাঙলার প্রকৃতির যে অসাধারণ উপস্থাপনা তা যে কোনো মুক্তিপাগল বাঙালিকে আবেগে আচ্ছন্ন করেছে। বাঙলার মুক্তির সাথে শেখ মুজিবের সংগ্রাম আর সপ্নকে অসাধারণ ভালোবাসায় বাঙময় করেছেন গীতিকার গৌরি প্রসন্ন মজুমদার।

---

১০. গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৮

১১. ফকির আলমগীর, মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুরা, অনন্যা, ঢাকা,২০১৫, পৃ. ১৮১

গানটি সুরকার ও শিল্পী অংশুমান রায়ের মমতা মেশানো সুর আর আবেগী গায়কীতে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তুঙ্গস্পর্শী। আকাশবানীর সংবাদ বিচিত্রার প্রযোজক তাঁর স্মৃতিকথায় অংশুমান রায়ের জনপ্রিয় এই গানটির জন্মকথা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তখন বাংলাদেশে সবেমাত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। চায়ের দোকানে বসেছিল আড্ডা। আড্ডার বিষয়টি ছিল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। উপস্থিত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু প্রখ্যাত গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদার। লোকসঙ্গীত শিল্পী সুরকার অংশুমান রায়। তিনজনের মধ্যে ছিল দারুণ বন্ধুত্ব। মাটির ভাড়ে চা খাওয়ার মধ্যেই হঠাৎ গৌরী প্রসন্ন মজুমদার পকেট থেকে একচিলতে কাগজ বের করে কি যেন একটা লেখা শুরু করেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা কিছু লিখে ফেলেন তিনি। তারপর গৌরী প্রসন্ন লেখা কাগজটা হাতে নিয়ে অংশুমান ও দীনেন্দ্রকে বলেন, দেখোতো গানটা কেমন হলো? পড়া শেষ করে লাফিয়ে ওঠেন অংশুমান রায়। দারুন! দারুন! এটা গৌরীদা কাউকে দিতে পারবেন না। আমি সুর দেব, আমি গাইব। তারপর অংশুমান সেই চায়ের দোকানে বসেই সুর দিয়ে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর গেয়ে ওঠেন, 'শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ স্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রনি, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ'।[১২] সুরটি যেমন গানটিকে অসাধারণ জনপ্রিয় করেছিল গানের কথাও ছিল ততটাই শক্তিশালী। আজও গানটি শুনলে মুক্তি পাগল বাঙালি শিহরিত হয়। অদ্ভুত আবেগে আপ্লুত করে সাধারণ বাঙালিকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দেশপ্রেম, নীতি, আদর্শ আর বাঙালির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা সর্বপরি অসাম্প্রদায়িক সংগ্রামী আন্দোলন ভারতবাসীর কাছে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। ঠাঁই করে নিয়েছিলেন অতি সাধারণ ভারতীয়দের বুকের গভীরে। মুক্তিযুদ্ধকালে যার প্রকাশ ঘটেছিল ব্যাপক পরিসরে।

কোলকাতায় বাঙালিরা শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর পাশে স্থান দিত। তাদের পরে শেখ মুজিবকে ত্রাণকর্তা হিসাবে মনে করে অনেকেই বঙ্গবন্ধুকে পূজা দিত। তারা শুধু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অসংখ্য গানই লিখেন নাই, মুক্তিযুদ্ধকালে দুর্গাপূজার সময় প্রতিমার রূপ পরিবর্তন করে দুর্গার আসনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আর কার্তিকের আসনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর অসুরের স্থানে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খানের মূর্তি তৈরি করেছিল। দুর্গাপূজা হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। **১৯৭১** সালের দুর্গোৎসব পাকিস্তানের অসুর হত্যাযজ্ঞে পরিণত হয়েছিল। শারদীয় পূজামণ্ডপে দূর্গা বন্দনার ভক্তিমূলক গানের পরিবর্তে বেজেছিল, 'জয় বাংলা বাংলার জয়', 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে', 'শোন একটি মুজিবরের থেকে', 'ছোটদের বড়দের সকলের ... আমার দেশ সব মানুষের' মতো বাংলাদেশ বন্দনার অসংখ্য গান। পূজামণ্ডপে সারা কোলকাতার নারী-পুরুষসহ সর্বস্তরের মানুষ উপচে পড়েছিল, তৈরি হয়েছিল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ধর্মীয় অনুভূতির সাথে উদ্ভাসিত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবোধ আর ভ্রাতৃত্ববোধের এক বিরল দৃশ্য।[১৩]

---

১২. ফকির আলমগীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

১৩. নজরুল ইসলাম, একাত্তরের রণাঙ্গন, অকথিত কিছু কথা, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ৯৮

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি ভারতের জনগণের এই ভালোবাসা ছিল স্বতঃপ্রণোদিত। অকৃত্রিম অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ। শরণার্থী বাঙালিরা আপ্লুত হয়েছে ভারতবাসীর সেই অন্তর নিসৃত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভারতের কোথাও ছিলেন না। রনাঙ্গনের সহযোদ্ধাদের মাঝেও ছিলেন না। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র দেখা গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে। কোলকাতার জনাকীর্ন সড়কের স্থানে স্থানে ফুটপাতের এক প্রান্তে একটি বস্ত্রখণ্ড ইট দিয়ে চাপা দেয়া, একধারে ফ্রেমে বাঁধানো আলোক চিত্র; সামনে ধুপকাঠির ধোয়া উড়ছে। টাঙ্গাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা, পথচারী সবাই পয়সা ছুঁড়ে ছুঁড়ে স্তূপ তৈরি করেছে। সেই সঞ্চিত পয়সার প্রতি কারো বিন্দুমাত্র কোনো আগ্রহ নাই। সন্ধ্যায় স্বেচ্ছাসেবীরা এসে তুলে নেবেন এই পয়সা যা জমা হবে বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের ত্রান তহবিলে। পশ্চিমবঙ্গ ও আগরতলায় বঙ্গবন্ধুর অসংখ্য প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয় সড়কের পাশে।এভাবে সংগৃহীত হয় অনেক টাকা। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে কোলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় সার্বজনীন দুর্গোৎসব চলেছে। প্রায় প্রতিটি মণ্ডপেই বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি টাঙ্গানো হয়েছিল। এছাড়া মণ্ডপের প্রবেশ পথের দু'ধারে অপটু হাতে রচিত বঙ্গবন্ধুর ছবির ছড়াছড়ি। বক্তৃতারত বঙ্গবন্ধু, মিছিলের অগ্রভাগে বঙ্গবন্ধু, নৌকার মাস্তুলে বঙ্গবন্ধু, বন্দুক তাক করে যুদ্ধরত বঙ্গবন্ধু, কুস্তিগীর বঙ্গবন্ধু, পরাজিত ইয়াহিয়ার বুকে চেপে বসে আছেন। এসব দেখতে দেখতে প্রতিমার সামনে গিয়ে বিস্মিত হয়েছে সবাই। মা দুর্গার পাশে কার্তিকের পরিচ্ছদে মৃৎ শিল্পীর নিপুন হাতে বঙ্গবন্ধুর মুখাবয়ব নির্মিত হয়েছে। আর কালিপূজার মঞ্চে খড়গ তলে ইয়াহিয়ার মুখচ্ছবি। পূজামণ্ডপের মাইকে নাম সংকীর্তন কিংবা শ্যামা সঙ্গীতের চেয়ে বেশি বাজানো হয়েছে 'আমার সোনার বাংলা', আর 'শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের' গানসহ অসংখ্য মুজিব বন্দনার গান ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গান। বাঙালির প্রাণ পুরুষ মুজিব নয় মাস বাঙালির কাছে ছিলেন নিখোঁজ। কিন্তু ভারতবাসীর অনুভূতি প্রবণতা আর বাঙালির অনূভূতিকে মূল্য দেয়ার কারণে শরণার্থী বাঙালি অধ্যুসিত এলাকা যেমন পশ্চিমবঙ্গ, আগরতলা এবং ভারতের অন্যান্য যে কোনো এলাকায় বাঙালি মুজিবের দর্শন আর আশিস থেকে সামান্য সময়ের জন্যেও বঞ্চিত ছিল না।[১৪]

সরকারি কোনো নির্দেশ বা আদেশ নয়, কোনো বাধ্যবাধকতা নয়, শিল্পী-সাহিত্যিক থেকে সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া ভারতীয় সাধারণ জনতাও আত্মিক ভালোবাসা আর সহানুভূতিতে একাত্ম হয়েছিল বাঙালি ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে। এমন নজির ছিল সত্যিই বিরল ঘটনা। ভালোবাসার এমন টান পুরো নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকালেই ছিল বাঙালির বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। শরণার্থী জীবনে বাঙালি না চাইতেই এমন অনেক মানবিক সহায়তর পরশ পেয়েছিল ভারতের শিল্পী সুহৃদদের কাছ থেকে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদার সহযোগিতা দিয়েছিলেন। তাছাড়াও আকাশবাণী কোলকাতা থেকে শরণার্থী শিল্পীদের গান গাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছিল।

---

১৪. বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলাবেতার কেন্দ্র, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৮৩, পৃ. ১৭৯-৮০

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে ও প্রতিবেদন প্রচার করে যুদ্ধকে ব্যাপক সহযোগীতা করা হয়েছে। তাদের অকৃপন সহযোগীতা যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতিকে দূর্বার গতি সঞ্চার করেছিল।

পশ্চিম বঙ্গের গণশিল্পী দীপংকর চক্রবর্তীর লেখা ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের সুরকরা একটি গান' আমার বাংলাদেশ, সোনার বাংলাদেশ, রোশেনারার বাংলাদেশ,বাংলাদেশ কথা দিলাম,শুধবো ঋণ, লক্ষ প্রাণ, রক্ত বারুদ,কথা দিলাম, বীর জননী বাংলাদেশ, অহল্যামা বাংলাদেশ' ।[১৫]

মুক্তিযুদ্ধা মোঃ শাহজাহান কবির বীর প্রতীক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশেষ করে সুইসাইডর নৌ-কমান্ডোরা অপারেশনের গোপনীয়তার স্বার্থে সবসময় জনসাধারণসহ সাংস্কৃতিক জগতের শিল্পীদের সহিত অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যায় সমন্বয় সহযোগীতা পায় নাই, তবে **১৫** আগস্টের মধ্যরাতে 'অপারেশন জ্যাকপটের সিগন্যাল সংকেত এর জন্য যে দুইটি গান গেয়েছিলেন ভারতের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী সন্ধা মুখোপাধ্যায় ও পংকজ মল্লিকের কণ্ঠে সেই দুইটি গান হলো :

১. আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান, ও
২. আমার পুতুল আজকে যাবে প্রথম শ্বশুরবাড়ি

এই দুইজন শিল্পীর সহযোগীতা পেয়েছি বলে আমরা চারটি বন্দরে একসাথে ২৬টি দেশি ও বিদেশি জাহাজ গভীর পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর জলপথে চলাচল বন্ধ করে দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিলাম। এই দুইজন শিল্পীর অবদান অবিস্মরণীয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাণ পুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান যিনি ভারতবাসীর কাছে অতি আপন জন আবার সম্মানের পাত্র। তিনি জানতেন ভারতবর্ষের জনগণ কতটা ত্যাগ, নিষ্ঠা, সহমর্মিতা, ভালোবাসা দিয়ে সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দিনগুলিতে তাঁর দেশ ও জনগণের প্রতি তারা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি তাঁর অন্তরের গভীরতা দিয়ে তা উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু গভীর কৃতজ্ঞার সাথে তা স্মরণ করেছিলেন। তিনি বলেন, "আমরা আগরতলাবাসীর কাছে কৃতজ্ঞ। ভুলবো না আপনাদের কথা। তিনি আরো বলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের গান যারা রচনা করেছিলেন এবং গেয়েছিলেন তাদের সবাইকে আমি সৈনিক বলে মনে করি।"[১৬]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এমন কিছু মানুষ যারা ভারতীয় হয়েও বাঙালি। যাদের সীমাহীন সহযোগিতা প্রাণসঞ্চার করেছিল মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠযোদ্ধাদের মাঝে। এদের মধ্যে প্রণবেশ সেন, দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, অংশুমান রায়, গোবিন্দ হালদার, উপেন তরফদার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, উৎপলদত্ত, সুরজিৎ সেন, কে কে নায়ার, যশদেব সিং, মৃনাল সেন, কালী ব্যানার্জী,জ্ঞানেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, অমিতাভ দাসগুপ্ত, তরুন স্যান্নাল, মান্না দে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্য ও সঙ্গীত জগতের আরো অনেকে।[১৭]

---

১৫. সাইম রানা, বাংলাদেশের গণ সঙ্গীত বিষয় ও সুর বৈচিত্র, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৬৭
১৬. সুবিমল ভট্টাচার্য, মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতি চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
১৭. কামাল লোহানী, মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার, গ্রন্থকানন, ২০১৪৫, পৃ. ১৮

জানা না জানা শিল্পী, সাহিত্যানুরাগী সংস্কৃতজনদের অকৃত্রিম, আন্তরিক ভালোবাসা, বাঙালির অসহায় সেইদিনের একমাত্র ভরসাস্থল হয়ে ওঠেছিল যা বাঙালির ইতিহাসে স্মারণীয় হয়ে থাকবে আজীবন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগীতা, আন্তরিকতা আর তাদের উদার বন্ধুত্ব বাঙালি স্মরণ করবে গভীর শ্রদ্ধার সাথে।

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদের ভূমিকা

বিশ্বমানবতার ভালোবাসা সহযোগীতা আর আশীর্বাদে ধন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বিশ্বের মানবিক হৃদয়ের মানুষ স্তম্ভিত হয়েছিল পাকিস্তানি জান্তার বর্বর নৃশংস হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞে। যে যেখানে যেভাবে সম্ভব হয়েছে সেভাবেই সাহায্য সহযোগীতা করেছে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে। শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসী আন্তরিক সহযোগীতা আর সহমর্মিতা নিয়ে বাঙালির দুঃসময়ে বন্ধুর মতো পাশে থেকে শক্তি সাহস যুগিয়েছে। সব শ্রেণি পেশার মানুষই দলমত নির্বিশেষে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে মানবতার টানে হাত বাড়িয়েছিল। বিশ্বের শিল্পীসমাজ বিবেকের দায়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যা ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়, একই সাথে অনুকরণীয়।

বিশ্ববরেণ্য শিল্পীসমাজ গান গেয়ে বাংলাদেশের যুদ্ধাক্রান্ত মানুষের দুর্দশা আর মানবেতর অবস্থানের সার্বিক চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়। তাদের সেই প্রচেষ্টার ফলে বিশ্ববাসী উপলব্ধি করেছিল বাঙালির প্রতি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর স্মরণকালের নৃশংস বর্বর পৈশাচিকতা। শিল্পীদের উদ্যোগগ্রহণ ও প্রচেষ্টার পূর্বে এতোটা প্রকাশ্যভাবে বাঙালির করুণ বাস্তবতাকে সেই সময়ে তুলে ধরা সম্ভব হয় নাই।

সীমান্তের মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করার পাশাপাশি স্বাধীন বাংলা বেতার ও বিভিন্ন স্কোয়াডের শব্দ সৈনিক শিল্পীরা গানের অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছে। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের জন্য আরেক যুদ্ধ হয়েছে বিদেশের মাটিতে। সে যুদ্ধ ছিল সঙ্গীতের যুদ্ধ, সঙ্গীতের বিনিময়ে অর্থসংগ্রহের যুদ্ধ। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধ তহবিলে সে অর্থ দান করেছেন বিদেশি শিল্পীরা অকৃত্রিম ভালোবাসায়।

পাকবাহিনী যখন নির্বিচারে চালিয়ে যাচ্ছে গণহত্যা, মুক্তিযোদ্ধারা দখলদার পাকবাহিনীকে পরাস্ত করতে প্রাণপন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই পশ্চিমা রনাঙ্গনে ভিন্ন এক যুদ্ধ করেছিলেন ভারতের বিখ্যাত সেতার শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তাঁর অনবদ্য সেতার বাদনে সেদিন শুধু আমেরিকা নয় বিশ্ব বিবেকও জেগে উঠেছিল। পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সেনাশাসকের অন্যতম মিত্র আমেরিকার ক্ষমতাসীন সরকারের নাকের ডগায় বসে যে আয়োজন করেছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর তার বন্ধু, সুহৃদদের নিয়ে, তা বিবেকবোধ সম্পন্ন মানুষকে জাগিয়ে দিয়েছিল, সোচ্চার করেছিল স্বৈরাচারের দোসর আমেরিকার প্রতি সমালোচনা মুখর হতে। আমেরিকাবাসী মানবিক হৃদয় নিয়ে সেদিন যেভাবে সেই আয়োজনে সাড়া দিয়েছিল তা ছিল অভূতপূর্ব। আশানুরূপ সাড়া পেয়ে অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন একাধিক আয়োজনের উদ্যোগ নিয়ে।

পণ্ডিত রবিশংকর বাঙালির প্রতি পাকিস্তানের নিষ্ঠুর নির্যাতনের খবরাখবর রাখতেন। অসহায় বাঙালি লাখে লাখে ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে জীবন সম্ভ্রম বাঁচিয়েছিল যা তাকে পীড়িত করেছিল, ব্যথিত করেছিল। তিনি আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাঙালির পাশে দাঁড়াতে। এই মহতী ও সাহসী উদ্যোগে তিনি একা ছিলেন না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওস্তাদ আলী আকবর খাঁও তার সঙ্গে সমান সহযোগীতা ও আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে একাত্ব হয়েছিলেন। তাদের সেই উদ্যোগকে সফল বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে এসেছিল বিশ্বনন্দিত ও জনপ্রিয় খ্যতিমানরা। অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত লাঞ্ছিত মানুষের সাহায্যে হাত বাড়িয়েছিলেন ত্রাণ ও আর্থিক সহায়তার। বাংলাদেশ নামক পৃথিবীর এককোণে পরে থাকা ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের ছোট একটি দেশে ভয়াবহ নারকীয় হত্যা আর তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছিল পাকিস্তানের একটি প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী। আবার তাদের পাশে থেকে পরাশক্তি আমেরিকা পাকিস্তানের অন্যায় কর্মকাণ্ডের সার্বিক সহযোগীতা করেছিল বাংলাদেশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অন্যায় যুদ্ধকে। বিশ্ব-বিবেককে জাগানোর জন্য আর দ্রুত এই নিধনযজ্ঞ বন্ধ করতে কার্যকর সহযোগীতা পেয়েছিলেন রবি শঙ্কর।

যখন বাংলাদেশ পাকিস্তানের প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছিল, নগর-বন্দর জনপদে পাকিস্তানিদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ঘটে যাচ্ছিল তেমনি সময়ে পাকিস্তানি বাহিনী ভারতের প্রশিক্ষিত বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের মুখোমুখী হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে বীরদর্পে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে শুরু করে। চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে গেরিলা কায়দায় হানাদারদের নির্বিচার গণহত্যার জাবাব দিয়ে যাচ্ছিল যখন বাঙালিরা সেই সময়ে ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরের মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল কনসার্ট যার নাম দেয়া হয়েছিল 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। বিশ্বের প্রায় সকল মানবতাবাদী কণ্ঠশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, কবি, সাহিত্যিকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় সফল সেই আয়োজনটি।[১৮]

'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজন সম্পর্কে পণ্ডিত রবি শঙ্কর সাক্ষাৎকারে বলেন "আমি তখন লস এঞ্জেলস ছিলাম। আমি সব সময় খবর শুনতাম। শুনতে পেলাম পূর্ববঙ্গের লোকদের ওপর কঠোর আক্রমন করা হয়েছে। আমি আমার বাঙালি আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতদের কাছে গেলাম পূর্ববঙ্গের লোকদের ওপর আক্রমণ ও নির্যাতনের খবর জানতে। যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন সাধারণ নিরীহ জনতা সহায় সম্বল ত্যাগ করে অজানার উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়লো। একথা শুনে খুবই ব্যথিত হলাম। জর্জ হ্যারিসন ছিল আমার ছাত্র এবং ছেলের মতো। আমাকে উদ্বিগ্ন দেখে বললো, আমাদের একটা কিছু করা দরকার। পরবর্তীতে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম বড় ধরনের শো আয়োজনের ব্যাপারে। এখান থেকে যা আয় হবে তা শরণার্থী শিশুদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হলো ইউনিসেফকে। দুই সপ্তাহের মধ্যে আয়োজন সম্পন্ন করা হলো।

---

১৮. রবিশঙ্করের বিশ্রুত মুক্তিযুদ্ধের গান, মুহাম্মদ সবুর, উৎস: আহমেদ ফিরোজ, মুক্তিযুদ্ধ একাত্তর, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১২৩-১২৪

বিখ্যাত সব শিল্পীদের যেমন বব ডিলান, হ্যারিক ক্রফটন এবং আমার চেনা জানা অনেক শিল্পী এবং জর্জ হ্যারিসনসহ আমি ছিলাম। ওস্তাদ আলী আকবর খান, আল্লারাখা খান যন্ত্রসঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হলেন। অনুষ্ঠানটি খুবই সফলভাবে সম্পন্ন হলো। যেখানে একটা অনুষ্ঠান করার কথা সেখানে আমরা দুটি প্রোগ্রাম করলাম। জর্জ হ্যারিসন নতুন একটা গান লিখলেন, 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ ...।'[১৯]

পণ্ডিত রবী শঙ্করের ছাত্র, কনসার্ট ফর বাংলাদেশের সফল সংগঠক জর্জ হ্যারিসন নিজের অভিজ্ঞতা যেভাবে ব্যক্ত করেছেন "১৯৭১ সালের ঘটনা। রবি শঙ্কর আমার সাথে কথা বলেন সেই সময়ে। একটা কনসার্ট কিভাবে আয়োজন করা যায় সেই ব্যাপারে। তিনি চাইছিলেন সাধারণের চাইতে বড় আকারের হোক কনসার্ট, যাতে বাংলাদেশের না খেয়ে থাকা মানুষের জন্য ২৫ হাজার ডলার ওঠানো যায়। আমি যে কোনোভাবে সহযোগীতা করতে পারি কিনা তিনি জানতে চাইলেন। এরপর তিনি আমাকে যুদ্ধ পরিস্থিতি অনুধাবন করার জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় ও ম্যাগাজিন যাতে যুদ্ধ সংক্রান্ত লেখা ও প্রতিবেদন ছিল সেগুলো দিলেন। আমি সহযোগীতা করা যেতে পারে ভাবলাম। বিটলস কোনো কিছু করতে চাইলে সেটা বড় করেই করে যাতে অযুত ডলার কমানো যায়। আমি এর সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম। পরবর্তী তিনটি মাস নানা মানুষকে এর সাথে যুক্ত করার জন্য চেষ্টা করতে পারি নাই। নানা রকম প্রতিবন্ধকতার ভেতরে আমরা অনুশীলন করতে পারি নাই। সবাইকে একসাথে নিয়ে বসতে পারি নাই। ভারতীয় একজন জ্যোতিষী আমাদের নির্ধারিত দিনটিকে সমর্থন দিলেন ভালো সময় বলে। আগস্টের প্রথম মেডিসন স্কয়ার ফাঁকা ছিল। আমরা সেটা ভাড়া করলাম। আমরা দারুণ সাড়ার মধ্যে দুটি অনুষ্ঠান করলাম। সব ভালোভাবেই সাড়া হলো। আমাদের লক্ষ্য সফল হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্র পাঠাচ্ছিল। হাজার হাজার মানুষ মরার খবর পত্র পত্রিকায় প্রকাশ হচ্ছিল না। আমরা ব্যাপক গণসংযোগ করে পরিস্থিতির মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছিলাম। যার প্রতিদান আমি এখনও পাই। কনসার্টটি বাঙালির জন্য প্রয়োজন ছিল। তাদের মনোবল বেড়ে যায় আর পাকিস্তানি হিটলার মানুষের নজরে চলে আসে।"[২০]

দৃঢ় প্রত্যয়ী সফল সংগঠক, বিশ্ববিখ্যাত মানবতাবাদী সঙ্গীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন নিউ ইয়র্কের মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে, বিটলস এর পরিবেশনায় জর্জ হ্যারিসনের কনসার্ট ফর বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানকে যারা প্রাণবন্ত করে ঐতিহাসিক করেছিলেন নিজ নিজ পরিবেশনায় তারা হলেন রবিশঙ্কর সেতার এবং সারোদ ওস্তাদ আলী আকবর খান। তবলাসঙ্গত করেন আল্লারাখা এবং তানপুরায় কমলা চক্রবর্তী। যারা গান করেছিলেন ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েছিলেন তাদের মধ্যে জর্জ হ্যারিসন গান করেছেন এবং গিটার বাজিয়েছেন, বিল প্রেস্টন গান গেয়েছেন এবং অর্গান বাজিয়েছেন, লেয়ন রাসেল কণ্ঠ-পিয়ানো ও বেইজ গিটার বাজিয়েছেন, ক্লাউস ভুরমেন- বেইজ

১৯. আসাদুজ্জামান আসাদ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী শিবির, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫৩৫-৫৩৬

২০. ফকির আলমগীর, মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুরা, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬

গিটার, ববডিলান- কণ্ঠ-গিটার ও হারমোনিকা বাজিয়েছেন, এরিক ক্লাপটন- লিড গিটার, ব্যাড ফিঙ্গার- রিদম গিটার, পীট হ্যাম, টম ইভানস, জেওয়ে মোলান্ড এবং মাইক গিবনস পারকাশন, জিম কেল্টনার ড্রামস, জিমহর্ন, কার্ল রাডেল, জেসে অ্যান্ড ডেভিস লিডগিটার, ডন প্রিস্টন লিড গিটার ও কণ্ঠ এবং কার্ল র‍্যাডল বেইজ গিটার।[২১]

কনসার্ট ফর বাংলাদেশের বিশাল সেই আয়োজনকে সফল করেছিলেন ৪০ হাজার শ্রোতা দর্শক সমবেত হয়ে। উদ্যোক্তারা ২৪৩৪১৮.৫০ ডলার সংগ্রহ করেন, যা ইউনিসেফের বাংলাদেশের শিশু সাহায্য তহবিলে প্রদান করেছিলেন। ৮০টি মাইক্রোফোনে অনুষ্ঠানের গান ও কথা রেকর্ড করে ৩টি লংপ্লে নিয়ে একটি বড় এ্যালবাম প্রকাশ করা হয়েছিল। আরো ছিল বহু রঙে মুদ্রিত অনুষ্ঠানের সচিত্র বর্ণনাসম্বলিত সুন্দর পুস্তিকা। অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছিল পণ্ডিত রবি শঙ্করের একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে। এই কনসার্টটির জন্য রবি শংঙ্কর তৈরি করেছিলেন 'বাংলাদেশ ধুন' বলে নতুন একটি সুর। তার সাথে যুগলবন্দী হয়ে বাজিয়েছিলেন ওস্তাদ আলী আকবর খান। গোটা অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন প্রতিবাদী গানের রাজা ববডিলান। তিনি গেয়েছিলেন ৬টি গান। তাম্বুরিন ম্যান থেকে শুরু করে তার লেখা ও সুর করা বিখ্যাত গান 'এ হার্ড ব্রেন ইজ গোন না ফল।'[২২]

বাংলাদেশ কনসার্ট মুক্তিযুদ্ধের জন্য আয়োজিত, যা পরিনত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের মতই বিশাল ইতিহাসে। জর্জ হ্যারিসন পরিবেশিত একটি বিখ্যাত গান যা এই আয়োজনে পরিবেশন করা হয়েছিল :

My friend come to me with sadness in his eyes.
Told me that he wanted help,
Before his country dies
Although i couldn't feel the pain,
I knew i had to try.
Now I am asking all of you
Help us save some lives
Bangladesh Bangladesh.

জোয়ান বায়েজ যুদ্ধবিরোধী, মানবতাবাদী শিল্পী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার করুন চিত্র এই শিল্পীকে আবেগাক্রান্ত করেছিল। তাঁর অসাধারণ কথার একটি গানে মর্মস্পর্শী সুর দিয়ে সেই সময়ে তিনি বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছিলেন প্রবল আবেগে। নিজের সুর করা গানটি শিল্পী নিজেই গেয়েছিলেন। গানটির কয়েকটি লাইন :

Bangladesh Bangladesh Bangladesh Bangladesh
When the sun sinks in the west

---

২১. সাইম রানা, বাংলাদেশের গণসঙ্গীত, বিধ ও সুর বৈচিত্র, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৬৭-২৬৮
২২. মতিউর রহমান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্ববরেণ্য শিল্পীসমাজ, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান, সম্পাদনা সেলিম রেজা, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ৮৪

Die million people of Bangladesh
The Story of Bangladesh
Is an ancient one again made fresh
By Blindmen who carry out commands
Which flow out of the laws upon which nation stands
which is to sacrifice a people for a land.[২৩]

'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' এর বিশাল এই আয়োজনে ইউরোপের জনপ্রিয় যে সকল গান গাওয়া হয়েছিল তা হলে Wah Wah, My Sweet lord, Awaiting on you All, That's the way god planned It, It don't come Easy, Beware of Darkness, While My Guitar Gently Weeps, Jumpin, Jack Flash, Here comes the sun, A hard rains Gonna Fall, It Takes a lot to Laugh, It Takes a train to Cry, Blowin in the Wind, Just Like a woman, something,Bangladesh, Mr Tambourine Man, Love Minus Zero /No Limit, If not for you , come on in my kitchen.[২৪]

অর্ধ লক্ষ উপস্থিত দর্শক শ্রোতা মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনের আয়োজনে উপভোগ করেছিল ভারতীয় সঙ্গীত, যার সাথে ছিল পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মেলবন্ধন। তারা একাত্ম হয়েছিল বাংলার মানুষের সাথে। একই সাথে তারা সমর্থন আদায় করেছিল ইউরোপের সচেতন, বিবেকবান, মানবতাবাদী মানুষের। সাম্রাজ্যবাদী ঔপানিবেশিক শাসকের পৃষ্ঠপোষক বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রশাসকগণ তাদের নিজ ক্ষুদ্রস্বার্থে অমানবিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে কলকাঠি নেড়েছিল। বিশেষভাবে যারা এদের মধ্যে সক্রিয় ছিল যুক্তরাষ্ট্র, চীন, বৃটেন যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেই তারা তাদের ক্ষমতাকে অপব্যবহার করেছে মানবতার অবমাননায়। বিশ্ববিবেক তাদের এ অপকর্মে স্তম্ভিত হয়েছে, বিস্ময় প্রকাশ করেছে। ভয় ভীতির উর্ধ্বে উঠে তারা বাংলার অসহায় মানুষের পাশে সম্ভব সবটুকু মানবিক, আর্থিক সাহায্য নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর তার কনসার্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজনের মাঝেই তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি আরো কিভাবে বাঙালির সেই অসহায় মুহূর্তে পাশে থাকা যায় সেই চেষ্টায় কনসার্ট সংগৃহীত অর্থের একটা অংশ নিয়ে আলী আকবর খান, আল্লারাখা খানসহ সেপ্টেম্বরের কোনো একসময় কোলকাতায় আসেন। কোলকাতায় অবস্থানকালে রবি শঙ্কর শরণার্থী শিবিরে গিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের তহবিল সংগ্রহের জন্য ঐ সময়ে রবি শঙ্কর গ্রামোফোন রেকর্ডও বের করেছিলেন। এইচ এম ভি জয়বাংলা শীর্ষক ১৫ মিনিটের একটি ইপি রেকর্ড বের করেন। রেকর্ডটি বাজারে আসার সাথে সাথে বিক্রি হয় এবং ফুরিয়েও যায়। এর থেকে পাওয়া পুরো অর্থটাই পণ্ডিত রবিশঙ্করের আগ্রহে শরণার্থী কল্যাণ তহবিলে প্রদান করা হয়েছিল। রেকর্ডটির ১ম পিঠের দ্বিতীয় গানটির শিরোনাম 'ও ভগবান' গানটি পণ্ডিত রবিশঙ্কর শরণার্থী ক্যাম্প

২৩. সাইম রানা, প্রগুক্ত, পৃ. ২৬৯
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

পরিদর্শন করে সেখানকার নিদারুন মানবেতর করুণ অবস্থাকে অনুভব করে গানের কথায় ফুটিয়ে তোলেন। আর মর্মস্পর্শী সুর দিয়ে স্বকণ্ঠে গেয়েছিলেন গানটি। গানের চারটি লাইন:

ও ভগবান খোদা তাল্লা,
মোদেরকে ছেড়ে কোথা গ্যালা,
কেন ইয়েই অবিচার ইয়েই অবহেলা,
আর কতো বল সাইবো জ্বালা॥

গানটি বাংলার ঐতিহ্যের সুর বাউল, কীর্তন আর ভাটিয়ালির মিশ্রণে যেমন মর্মস্পর্শী হয়েছিল তেমনি গানের কথা ও নির্যাতীত বাঙালির আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল দারুণভাবে। যার কারণে গানটি মহৎ অন্যান্য গানের মতোই হৃদয়স্পর্শী হয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষের উপর যে অমানবিক অত্যাচার আর পাশবিকতার ঝড় বয়ে গিয়েছিল তা অত্যন্ত বাস্তব ও নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছিল গানটিতে। গানটি শুনলেই অনুভব করা গেছে বাংলাদেশের প্রতি নিষ্ঠুরতার মাত্রা কোন পর্যায় পৌঁছেছিল। আর লক্ষ কোটি নিরস্ত্র অসহায় নর-নারীর আর্তনাদ করুণ থেকে করুণতর ব্যাকুলতায় বাংলাকে ভারাক্রান্ত করেছিল।[২৫]

বাঙালির নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবস্থান নিয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা কবি, শিল্পী, গায়ক, বিজ্ঞানী ও অন্যান্য সংস্থা ও সেবিরা। বাংলাদেশের অসহায় নিরস্ত্র মানুষ মুক্তিযুদ্ধের একটা পর্যায়ে এসে পাক হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে বীরত্ব দেখানোর ঘটনা যেমন বিশ্ববাসীকে সহমর্মী করেছিল একই সাথে বাঙালির আত্মত্যাগ বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন মানুষের মাঝে তাদের প্রতি সহানুভূতি জাগানোর পথ প্রশস্ত করেছিল। বাঙালির জীবনের চরমতম দুঃসহ সেই দুর্দিনে আরও অনেকেই ভালোবাসার সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে ইউরোপ, আমেরিকার সুপ্রশস্ত রাস্তায় মিছিল করেছিল। আবৃত্তিতে অংশ নিয়েছেন লন্ডনের এ্যালবার্ট হলে, বার্লিনের আকেজান্ডার প্লাৎসায়। একাধিক আয়োজন হয়েছিল বাঙালির প্রতি নিষ্ঠুরতা বন্ধ করার জন্য। শিল্পীরা উচ্চকণ্ঠ হয়েছিল অসহায় বাঙালির সাহায্য ও সহযোগীতায় এগিয়ে আসার জন্য। বিশ্বখ্যাত শিল্পীরা স্বউদ্যোগে আয়োজন করে গান গাইতে এগিয়ে এসেছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে যশোর রোড একাত্তরের মার্চ থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই সড়কটি বারবার সেই সময়ে সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল। বাঙালির মুক্তি আর প্রত্যাশার এই বাংলার সড়কটি একাত্তর সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ্যালেন গিন্সবার্গ সফর করেছিলেন। নিউ ইয়র্কে জন্ম নেয় এ্যালেন গিন্সবার্গ (১৯২৬-১৯৯৭) বেড়ে উঠেছেন পারিবারিক পরিমণ্ডলের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে। অনবদ্য ভাষায় লিখেছেন বিশ্বের আর্তমানবতাকে উপজীব্য করে কবিতা। মানবতাবাদী এই কবি ১৯৭১ সালের ১৪-১৬ নভেম্বর নিউ ইয়ার্কে বসে বাংলার মানুষের যুদ্ধকালীন চরম দুর্দশা নিয়ে রচনা করেন দীর্ঘ এক কবিতা। সে কবিতার নাম 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'।

২৫. রবি শঙ্করের বিশ্রুত মুক্তিযুদ্ধের গান, মহাম্মদ সবুর, আহমেদ ফিরোজ, মুক্তিযুদ্ধে একাত্তর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫,১২৬

পরে তিনি কবিতাটাকে গানের সুরে সুরারোপিত করেন এবং নিজের কণ্ঠে পরিবেশন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা, আর নৃশংসতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার নিবেদন ছিল সেই কবিতায়। 'September On Jessore Road' কবিতার কটি লাইন উদ্ধৃত করা হলো :

Millions of babies walching the skies
Bellies swollen with big round eyes,
On Jessore Road long Bamboo huts,
No place to shit but sand channel ruts.

১৯৯৩ সালে কবি তাঁর কবিতার জন্য আমেরিকার ন্যাশনাল বুক এ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।[২৬]

গণশিল্পী, মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীন বাংলাবেতার কেন্দ্রের অন্যতম সঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীরের লেখা থেকে আরো জানা যায় যে এ্যালেন গিন্সবার্গ এর মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ২০ নভেম্বর ১৯৭১ সেইন্ট জজ চার্চে 'বাংলাদেশের জন্য মার্কিনীরা' শীর্ষক এক কবিতার আসরের আয়োজন করেন। সেই সময়ে কবি গিন্সবার্গের স্বকণ্ঠে স্বরচিত কবিতা উপস্থিত সকলের হৃদয় ছুয়ে যায়। এই কবিতাই পরে তিনি সুর দিয়ে গানে পরিণত করেন। বন্ধু বব ডিলান ও অন্যান্য বিখ্যাত গায়কের অংশগ্রহণে আয়োজিত কনসার্টে সেই গান পরিবেশন করেন। কনসার্টের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য প্রদান করেন।[২৭] মানবতাবাদী এই শিল্পী ২০১৬ সালের ১০-১২-১৬ তারিখে সাহিত্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানীত হন।

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির উপর সীমাহীন অত্যাচার আর রক্তপাতের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বত্র নানাভাষা, নানা বর্ণের কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সোচ্চার হয়েছিলেন। কবির কবিতা আর শিল্পীর গানে মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ হয়েছে উন্মুক্ত জনসমাবেশে। আমরা তার অনেকটুকুরই খবর জানিনা। বিশ্ব সাহিত্যের দিকপাল মানুষের ভাগ্য ও মানুষের আশা গ্রন্থের রচরিতা আঁদ্রে মালরো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে এক প্রবীন অবসর ভোগী বর্ষিয়ান বুদ্ধিজীবী, যিনি গর্জে উঠেছিলেন প্রচণ্ড শক্তিতে। বাংলাদেশের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রয়োজনে রক্তদেয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মালরো। প্রয়োজনে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক বাহিনী এবং যোগ দিতে চেয়েছিলেন শ্বশরীরে।[২৮]

সারা বিশ্বের মানবিক সহযোগীতার অনবদ্ধ নজির সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে। বাঙালির স্বাধীনতা তরান্বিত করেছিল বিরাট শক্তি হয়ে। বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম মানবতাবাদী মানুষের সংগ্রাম। বিশ্বের মানবতাবাদী প্রতিটি মানুষ তার ভালোবাসার জায়গা থেকে বাঙালির প্রতি সহযোগীতার হাত প্রসারিত করেছিল। শিল্পীদের সাথে কবি, সাহিত্যিক সংস্কৃতিজনরা উচ্চকণ্ঠ হয়েছিল বলেই বিশ্ববাসী অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল বিশ্বের পরাশক্তির বিরুদ্ধে। বাঙালির চেতনার সাথে তাদের চেতনা একাত্ব হয়েছিল।

---

২৬. সাইম রানা, প্রগুক্ত, পৃ. ৩৬৭
২৭. ফকির আলমগীর মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুরা, অনন্যা ২০১৫, পৃ. ১৮৬
২৮. মফিদুল হক, আরও একটি বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বই, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২ পৃ. ১১৫

এইভাবে তারা শুধু বাঙালির যুদ্ধকেই সম্মান করেন নাই করেছেন বাঙালির জাতিগত চেতনাকে, বাঙালির ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে। তাই মালরো বাঙালির ঐতিহ্যকে সম্মান জানান এক তাৎপর্যময় উক্তিতে। তিনি বলেন 'দুই হাজার বছরের সভ্যতা বুকে লালন করে বাংলাদেশের যোদ্ধারা মুক্তির জন্য লড়াই করেছেন।'[২৯]

পরাক্রমশালী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ততোধিক দুর্বল অসহায় অনুন্নত অবস্থান থেকে মুক্তি পাগল বাঙালির সেই যুদ্ধ ছিল তাদের অস্তিত্বের লড়াই। বাঁচার লড়াই মানুষ হিসেবে টিকে থাকার লড়াই। অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে বাঙালির অস্তিত্বকে নির্মূল করার অন্যায়, অন্যায্য সেই লড়াইয়ে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকের সাথে বিশ্বের মানবতাবাদী প্রাণগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল বাঙালির অসহায় মুহূর্তে তাদের পাশে দাঁড়াতে। সমগ্র বিশ্বকে জাগানোর জন্য তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র নির্মাতা লিয়ার লেভিন ও তার শুটিং দল মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সীমান্তে চলে এসেছিলেন। অনেক ঘুরে ফিরে তারা বাংলাদেশ মুক্তিকামী শিল্পী সংস্থাকে বেছে নিয়ে চিত্র গ্রহণের কাজ শুরু করেন। শিল্পী সংস্থার গানে গানে প্রচার কাজ চালানো, শরণার্থী শিবিরে গাওয়া আর মুক্তিযোদ্ধের ক্যাম্পে ক্যাম্পে গান গাওয়ার উপর প্রায় ২০ ঘণ্টার ছবি তারা তুলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রমাণ্য দলিল হিসেবে।

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে যুক্তরাজ্যের সাতটি শহরে বাংলাদেশ, ভারত ও ব্রিটেনের শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কনসার্ট ইন সিমপ্যাথি। ভারতীয় শিল্পী লতা মঙ্গেশকর, ওয়াহিদা রহমান ও শর্মিলা ঠাকুর ছিলেন এই কনসার্টের প্রধান উদ্যোক্তা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে প্রচার চালানো এবং অর্থসংগ্রহ করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ।[৩০]

বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য আরো বেশকিছু সংগঠনের কথা জানা যায় যারা বাংলাদেশের মানুষের পাশে সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছিল। ফ্রেন্ডস অব দ্য বাংলাদেশ মুভমেন্ট (শিকাগো), ফ্রেন্ডস অব ঢাকা ইউনিভার্সিটি (লন্ডন), বাংলাদেশ স্টুডেন্টস এ্যাকশন কাউন্সিল (লন্ডন), আউট টু দ্য পিপল (শ্রীলংকা), বাংলাদেশ গ্রীন ক্রস (লন্ডন), এমন অসংখ্য সাহায্য সংস্থা সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩১]

সারাবিশ্বের স্টার সুপারস্টার সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সোচ্চার কণ্ঠে মুক্তির লাড়াইয়ে বাঙালিকে সমর্থন দিয়েছিলেন। একাত্তর সালের ১১ জুন আর্জেন্টিনার নামকরা লেখক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ প্রমুখের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করে একটা দাবিনামা পেশ করেন। তাতে ভারতে আশ্রিত পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য

২৯. মফিদুল হক, প্রগুক্ত, পৃ. ১১৭

৩০. ড. বিশ্বজিৎ ব্যার্নাজী, বাংলাদেশের মুক্তসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা, অনুপম প্রকাশনী ২০১৩, পৃ. ৩৮৯

৩১. সাইম রানা, প্রগুক্ত, পৃ. ২৬৬

জরুরি সাহায্য পাঠানোর দাবি জানানো হয়। এই দাবিনামা স্বাক্ষরকারীদের নামের তালিকায় প্রথমেই দেখা যায় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর নাম। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ছিলেন রবীন্দ্র অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা থেকেই তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।[৩২]

এমনি অনেক জানা না জানা ঘটনার সমারোহ বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ, যার কিছুটা আলোচিত আর কিছুটা অনালোচিত। তাদের ত্যাগ, তাদের আন্তরিক ভালোবাসার সেই উদ্যোগ বাঙালিকে আপ্লুত করে। বিশ্বের দুই পরাশক্তি যারা অবস্থান করেছে বৈরী দুই প্রান্তে। আমেরিকা রাশিয়ার শত্রুভাবাপন্ন দুই দেশের শিল্পী সাহিত্যিকরাও ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুগলবন্দীতে বাঙালির পাশে সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছিলেন। তাদের সেই সহযোগীতার প্রসারিত দুই হাতের শক্ত বাঁধন বাঙালিকে শক্তি দিয়েছে, সাহস দিয়েছে, বিজয়ী করেছে। কিন্তু পীড়াদায়ক হলেও সত্য, তাদের সেই ত্যাগ, তাদের সেই আন্তরিক অনুভূতির প্রতি যথাযথ স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব হয় নাই। মুক্তিকামী মানুষের পাশে প্রাণবন্ত সেই মানুষগুলোর উপস্থিতি মানবিক পৃথিবীর চেহারাকে পাল্টে দিয়েছিল আর উজ্জ্বল করেছিল। বিশ্ববাসী প্রাণীত হয়েছিল মানবিক মানুষের মানবীয় ভূমিকায়। তাদের সহযোগীতার সেই ঋণ কোনো কিছুর বিনিময়ে শোধ করতে না পারলেও তাকে স্বীকৃতি দিয়ে কিছুটা হলেও আত্মতুষ্টি লাভ করা সম্ভব। এই গবেষণা কাজের মধ্যদিয়ে জাতিগতভাবে আন্তর্জাতিক বিশ্বের প্রতি থাকবে গভীর কৃতজ্ঞতা। শিল্পী-সাহিত্যিকদের অবস্মরণীয় ভূমিকাকে শ্রদ্ধা বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে।

৩২. মতিউর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান সম্পাদনা সেলিম রেজা, প্রগুক্ত, পৃ. ৮১

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও শিল্পীদের গান

দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা,
কারো দানে পাওয়া নয়।
দাম দিছি প্রাণ লক্ষ কোটি
জানা আছে জগতময়।

মুক্তিযোদ্ধা গণসঙ্গীত শিল্পী আব্দুল লতিফ রচিত গানটিতে বাঙালির কয়েক শত বছরের সংগ্রাম, আন্দোলনের ধারাক্রম বর্ণিত হয়েছে। শিল্পীদের সচেতন অংশগ্রহণে প্রতিটি আন্দোলনই পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। যার ধারাবাহিক পথপরিক্রমায় বাঙালি পেয়েছিল স্বাধীনতা **১৯৭১** সালের **১৬** ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মধ্যদিয়ে। বিজয়ী বাঙালি গানে গানে, প্রাণে প্রাণে, চেতনা জাগরণে স্বার্থক করেছিল মুক্তিযুদ্ধকে। পাকিস্তানের পরাজিত পরাশক্তি যখন যুদ্ধদলিলে স্বাক্ষর করছিল তখন বেজে উঠেছিল অসামান্য আবেগে তাৎক্ষণিক রচিত হওয়া 'বিজয় নিশান উড়ছে ঐ খুশির হাওয়ায় ঐ উড়ছে...।' প্রতিটি মুক্তিপাগল বাঙালির অন্তর সুরে-বেসুরে শিল্পীদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে গানটির সাথে একাত্ম হয়েছিল। সাতকোটি বাঙালির ত্যাগে, সংগ্রামে, রক্তদানে, সম্ভ্রমের বিনিময়ে মুক্তির আলো হয়ে আর দীপ্ত মশাল জ্বেলে জীবনের জয়-উল্লাসের মাঝে বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতার অভ্যুদয় ঘটে। শতবছরের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, জুলুম আর লুটেরার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছিল বাঙালি আর বাংলার মাটি।

অসংখ্য গান লেখা হয়েছিল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে। কালজয়ী সেই গানের মতো একই আবেগে পরবর্তীতে সুরকার, গীতিকারগণ গান লিখেছেন। গানগুলোতে ত্রিশ লক্ষ প্রাণ, মা-বোনের সম্ভ্রম হারানো, বাঙালির প্রতি নিষ্ঠুর গণহত্যার বর্বরতার কথা গভীর আবেগে গীতিকারগণ তুলে এনেছেন। সুরকারদের হৃদয় উৎসারিত আবেগ শিল্পী কণ্ঠে গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় ঝংকৃত হয়েছে সেই গান। গানগুলো বাঙালিকে গভীর দেশপ্রেমে নিমগ্ন করে, বাঙালির মুক্তির ইতিহাস হয়ে বেজে যায় প্রতিটি বাঙালি হৃদয়ে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে নতুন শিল্পীদের কণ্ঠে স্বাধীন বাংলাদেশে গীত হবে স্বাধীন জন্মভূমির গান। শিল্পীদের ত্যাগ, সংগ্রাম আর আন্দোলন স্বার্থক হবে। মুক্ত স্বাধীন দেশে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে কণ্ঠ যোদ্ধারাও বেঁচে থাকবেন সাধারণ বাঙালির শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায়।

বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাসে রয়েছে অসংখ্য ঘটনার সমাহার। অভূতপূর্ব সে ঘটনা বিস্ময় সৃষ্টি করেছে একের পর এক। নানা কারণে তা তাৎপর্য বহন করে। একটি জাতিগোষ্ঠীর সারাজীবনের আরাধ্য স্বাধীনতা বাঙালি জীবনে সেই স্বাধীনতা এসেছে দুইবার। প্রথম স্বাধীনতা এসেছে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট আর দ্বিতীয়বার এসেছে ২৬ শে মার্চ ১৯৭১। ১৪ আগস্ট এর স্বাধীনতা যা ছিল পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তীর মতো আড়ম্ভরপূর্ণ। আর ২৬ মার্চের স্বাধীনতা অনেকটাই আকস্মিক আর অনাড়ম্ভর ছিল যা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল পূর্ব বাংলার বঞ্চিত বাঙালির সর্বস্বহারানোর কান্না আর পাকবাহিনীর গণহত্যার মধ্য দিয়ে। ২৬ মার্চ এর স্বাধীনতার সূর্য উঠেছিল বাঙালির রক্তে ভিজে। অধিকারহীন বাংলায় কারফিউ জারি, বাঙালির মনে ভয় আর শঙ্কার মাঝে এই স্বাধীনতা এসেছিল। বাঙালি জাতিসত্তার নবজন্ম হয়েছিল বাঙালির ভয়ঙ্কর আর্তচিৎকারে। বাঙালির স্বাধীনতা শুধু নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের ফসল নয়। সংগ্রামের বিশাল আর বিস্তৃত ইতিহাসের সর্বশেষ ধাপ ছিল নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ। ফারুক চৌধুরী লিখেছেন, “আমাদের স্বাধীনতা দিবস বহুল দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যতিক্রমধর্মী। স্বাধীনতা এই বাংলায় এসেছে দুই কিস্তিতে। ১৯৪৭ এ আর ১৯৭১ এ। ১৯৪৭ এর ১৪ আগস্ট যে প্রক্রিয়ায় শুরু হয়েছিল, ১৯৭১ এর ২৬ মার্চ তা যেন সম্পূর্ণতা লাভ করলো।” তিনি আরও বলেন, “২৬ মার্চ কোনো গোল টেবিলের বৈঠকে স্থির করা দিন নয়, যেমনটি রয়েছে অনেক দেশেরই স্বাধীনতা দিবস। যেমনটি ছিল ১৯৪৭ এর ১৪ আগস্ট। এই স্বাধীনতা দিবসের সুপ্রভাতে হয়নি কোনো আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন। হয়নি কোনো প্যারেড আর কুচকাওয়াজ। এই স্বাধীনতার সূর্যোদয় হয়েছিল একটি রক্তস্নাত কালোরাত শেষে কারফিউ জারিকৃত নগরে-বন্দরে। সেই ভোরে আমাদের স্বাধীনতা জন্ম হয়েছিল এই দেশের অযুত মানুষের মনের গভীরে। সেই ভোরে সারা দিয়েছিল লক্ষ মানুষ একটি বজ্রকণ্ঠের উদাত্ত আহবানে–এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আরো রক্তদানের সংগ্রাম। ২৬ মার্চের সেই ভোরে শুধু মানুষ জাগেনি, জেগে উঠেছিল একটি জাতি।”[১]

শামসুল হুদা চৌধুরী লিখেছেন, “১৭৫৭ সালের ২৩ জুনকে যদি আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা হারানোর দিবস হিসেবে চিহ্নিত করি, তবে সর্বনাশা পলাশীর প্রান্তরে অস্তমিত বাংলার হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সময় লেগেছে পুরো দুশো চৌদ্দ বছর পাঁচ মাস তেইশ দিন। তবে বাংলার স্বাধীনতা আর বাঙালির স্বাধীনতা এক কথা নয়। বাঙালি কখনও স্বাধীন ছিল না। ইতিহাস তার প্রমাণ দেয় না। বাঙালি হিসেবে এই স্বাধীনতা আমরা প্রথম লাভ করেছি হাজার বছরের সংগ্রাম শেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে।”[২]

বাঙালির স্বাধীনতা যেমন নয় মাসের যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ না তেমনি শুধুমাত্র রণযোদ্ধার রণাঙ্গনের যুদ্ধেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয় নাই, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ঐক্যবন্ধ চেষ্টায় দানব

১. ফারুক চৌধুরী, দেশ-দেশান্তর, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৩৩০-৩৩১
২. শামসুল হুদা চৌধুরী, বরেন্দ্র থেকে বাংলাদেশ, অনুপম প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ৪৪

শক্তিকে পরাজিত করে হাজার বছরের বঞ্চনা, নিপীড়ন, শোষনের অবসান ঘটিয়েছিল চিরতরে বাঙালি। প্রতিটি বাঙালি এই যুদ্ধে শরীক হয়েছিল। মুনতাসির মামুন বলেন, "যারা শুধু প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করেছিলেন তারাই মুক্তিযোদ্ধা নয়, দেশে যাঁরা ছিলেন তারাও মুক্তিযোদ্ধা, যারা গান গেয়েছিলেন, ছবি একেঁছিলেন তারাও মুক্তিযোদ্ধা।"[৩]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে সঙ্গীত শিল্পীদের অংশগ্রহণ এতোটা প্রবল ছিল না। বাঙালি সংস্কৃতির অগ্রসেনা হিসেবে শিল্পীদের গান বাংলা সংস্কৃতিকে আগলে রেখেছে প্রতিটি সংকটে। বাঙালির সংস্কৃতির শেকড় গেঁথে আছে বাংলার মাটির গভীরে, আর মাটির সুর উঠে আসে শিল্পীর গানে। সে গান মিলনের গান, শৃঙ্খল ভাঙ্গার গান। আপাদমস্তক সঙ্গীতের সাধক, বাউল লালন ফকির জমিদারদের অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন হাতে লাঠি তুলে নিয়ে, যা বাঙালির প্রতিবাদী স্বত্ত্বার প্রতীক।[৪] লালন থেকে শুরু করে নজরুল সকলেই ছিলেন 'দেশ প্রেমিক।' দেশকে দেশের মাটি আর মানুষকে তারা ভালোবাসতেন। দেশকে ভালোবেসে তারা প্রতিবাদের গান লিখেছেন, নিজেরা প্রতিবাদী হয়েছেন। প্রজন্মের জন্য প্রতিবাদের পথ তৈরি করে দিয়ে গেছেন।

বাংলা গান বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত। সেই ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা আর বাংলার মাটি ও মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে শিল্পীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বাংলায় যতবার দস্যু এসে হানা দিয়েছে ততবারেই শিল্পীদের গান শানিত হয়েছে। আঘাত যত কঠিন হয়েছে শিল্পীদের গানের কথা আর সুরও তত প্রতিবাদী হয়েছে। শিল্পীরা তাদের সংগ্রামী আবেগ দিয়ে তা ছড়িয়ে দিয়েছে সাধারণ বাঙালির মাঝে। শিল্পীদের আবেগ জাগানো গানে মানুষ সচেতন হয়েছে, সাহসী হয়েছে। শিল্পীদের কন্ঠের গান একুশের চেতনাকে শানিত করেছে, উনসত্তরের আন্দোলনকে লক্ষে পৌছানোর শক্তি দিয়েছে আর মুক্তিযুদ্ধে জীবনবাজি রাখার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে। করুণাময় গোস্বামী বলেন, 'ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার একটা প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়। সে প্রস্তুতি পাকিস্তানি শাসনের ঔপনিবেশিক মতলবকে মোকাবিলা করার। তার জন্যে রাজনৈতিক স্তরে দানা বাঁধতে থাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও স্বাধীকারের ধারণা। সাংস্কৃতিক স্তরে বিশেষ করে সঙ্গীতের স্তরে উম্মোচিত হতে থাকে আবহমান বাংলার বোধ। রাজনৈতিক ব্যাপারটা থাকে সংগ্রামের উপরিস্তরে। সেখানকার আন্দোলিত অবস্থা সহজেই চোখে পরে। সঙ্গীতের ব্যাপারটা থাকে অন্তস্তরে, কাজ করে দৃঢ়ভাবে কিন্তু সঙ্গোপনে।"[৫]

শিল্পী সনজিদা খাতুন যথার্থই বলেছেন "গান সব দেশে সব সময়ে 'মৃদু সুরের খেলা' মাত্র নয়। গান দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা যায়।"[৬]

---

৩. মুনতাসির মামুন, মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র, দুই, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৭২

৪. ম. মনির উজ্জামান, সাধক কবি লালন কালে উত্তারকালে, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৮, ১৯

৫. করুণাময় গোস্বামী, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের সঙ্গীতকলা ১৯৫২-২০০০, আনু মাহমুদ, একুশ থেকে স্বাধীনতা, ঝিঙেফুল, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭৯

৬. সনজিদা খাতুন, প্রবন্ধ সংগ্রহ, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ২৬৫

শিল্পীদের কণ্ঠে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়েছিল বাংলার গান। শিল্পীদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের গান অসহায় সেই মুহূর্তে বাঙালির বড় অস্ত্র হয়ে উঠেছিল। গানের হাতিয়ার দিয়ে তারা বাঙালির সব অসহায়ত্বকে দূর করেছে। কবির চৌধুরী বলেন, "আজ যে ভুখণ্ড স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে বিশ্ব সমাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত সেখানে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাগান গৌরবদীপ্ত ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন গণআন্দোলনের সময়। এ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে সবার মনে পড়ে ১৯৫২ সালে তুঙ্গে ওঠা বাংলা ভাষা আন্দোলন। ১৯৬৯-৭০ সালে স্বাধীকার আদায়ের লক্ষে উত্তাল গণ-আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর মরণপন করা স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে গানের ভূমিকা ছিল অসামান্য প্রেরণাদায়ী।"[৭]

যুদ্ধকালে শিল্পীদের গান যখন শোনার সুযোগ থাকতো না, মুক্তিযোদ্ধারা তখন নিজেরাই শিল্পী হয়ে উঠতেন। শিল্পীদের প্রতিবাদী গান নিজেরাই গেয়ে নিজেদের সাহস যোগাতেন। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের গণহত্যার বিভিষীকার মাঝেও বাঙালি তাদের কষ্টকে ভুলেছে, অসহায়ত্ব দূর করেছে, নিজেরাই শিল্পী হয়ে। নিজেদের মতো করে তারা সুর করে গাইতেন যুদ্ধ দিনের উদ্দীপনা জাগানো গান। মনজুরুল আহসান খান তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন, "ভোর থেকে শুরু হতো ট্রেনিং, যুদ্ধ কৌশল, অস্ত্র পরিচালনা, অস্ত্র খুলনা জোড়না, মেরামত, পরিস্কার, দৌর-ঝাঁপ, ক্রলিং, এ্যাম্বুশ, রেইড, এক্সপ্লোটিভ, গ্রেনেড, মর্টার, এমনি সব নানা ট্রেনিং। কয়েক কিলোমিটার দৌড়াতে হোত। সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়তো। তারপরও বিকেল থেকে সন্ধা গড়িয়ে যেত। সবাই মিলে আড্ডা হোত, গল্প হোত আর হোত গান, দেশাত্নবোধক গান, গণসঙ্গীত এবং ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, লোকসংগীত এবং আধুনিক গান। গান ছিল আমাদের প্রাণ। দুঃখ-বেদনায়, আনন্দে-উৎসাহে, যুদ্ধে-বিশ্রামে গান ছিল আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমাদের সকল মুক্তিযোদ্ধা যেন শিল্পী হয়ে উঠেছিল। 'আমার সোনার বাংলা', 'ধন্য ধান্য পুস্পে ভরা', 'ও আমার দেশের মাটি', 'নওজোয়ান নওজোয়ান', 'ধিতাং ধিতাং বোলে', ' কারার ঐ লৌহ কপাট', 'এই শিকল পড়া ছল', এমনি কত গান। এছাড়াও হিন্দি, গণসঙ্গীত, আইপিটি এর গান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লাল ফৌজের মার্চ সঙ্গীত 'ভেদী অনশন মৃত্যু তুষার ও তুফান......., কমরেড লেলিনের আহ্বান ইত্যাদি গাওয়া হত। কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল, 'জাগো জাগো সর্বহারা, অনশন বন্দী ক্রিতদাস, নিয়মিত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে গাওয়া হতো। অনেক যোদ্ধা যুদ্ধে যাওয়ার সময় তাদের শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, মৃত্যুর পর যেন তাদের স্মরণে জাতীয় সঙ্গীত এবং ইন্টারন্যাশনাল গাওয়া হয়। শহিদ আজাদ যুদ্ধে যাওয়ার আগে তার শেষ ইচ্ছে হিসেবে আমাকে সেই কথাই বলেছিলেন। বেতিয়ারার যুদ্ধে আজাদসহ আরো আটজন শহিদ হওয়ার পর তাদের লাশ উদ্ধার করতে না পেরে আমরা যুদ্ধ এলাকার মধ্যেই কল ইন করে জাতীয় সঙ্গীত এবং ইন্টারন্যাশনাল গেয়েছিলাম। তেজপুরের সেই ক্যাম্পেই অনেকে

৭. কবির চৌধুরী, গানের আগুন, সম্পাদনা সেলিম রেজা, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩১

কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন। সেখানে বিকেলে বা সন্ধার আড্ডার অনুষ্ঠানে গান, কবিতা ইত্যাদির পর আমরা গাইতাম 'গেরিলা আমরা, আমরা গেরিলা' এই গানটি। কমিউনিষ্ট আমরা, আমরা কমিউনিষ্ট সুরে ক্যাম্পের সকল গেরিলা যোদ্ধাদের আবেগের মধ্যদিয়ে রচিত। আজ চল্লিশ বছর পরও গানটির জনপ্রিয়তা দেখে মুগ্ধ হই। সঙ্গীত ছিল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের শক্তিশালী হাতিয়ার।"[৮]

গানের অপার্থিব শক্তি, সুরের গভীর ইন্দ্রজাল কিভাবে মোহবিষ্ট করে, যা মানুষের জীবনকে তুচ্ছ করে দেয়। চাওয়া থাকে একটাই যেন মৃত্যুর পরে তাদের আত্মার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় সেই গান। সঙ্গীতের না দেখা শক্তি সেখানেই। সকলকে এক প্রাণে এক মনে বাঁধে। মৃত্যু হয়ে যায় তুচ্ছ। প্রাণ উৎসর্গ করা রণযোদ্ধারা জীবন দিয়ে তার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সাত কোটি বাঙালির আবেগ, অনুভূতি উঠে এসেছিল গীতিকারের লিখা গানে আর সুরকারের সুরে। গীতিকার, সুরকার আর শিল্পীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সার্থক হয়েছিল, তেমন কিছু প্রাণ ছোঁয়া গান:

১। 'আয়রে যাদু দেখরে যাদু'- কথা ও সুর : আব্দুল লতিফ

২। 'ও ভাই মোর বাঙালিরে'-কথা: আবদুল করিম

৩। 'জয় বাংলা জয় বাংলা বলে সব'-কথা: মমতাজ আলী খান, সুর: মুস্তফা জামান আব্বাসী,

৪। 'ফান্দে পরিয়া ইয়াহিয়া কান্দেরে'- কথা: হরলাল রায়,

৫। 'ক'জনকে তুই দিবি ফাঁসি বন্দি করবি কর' : কথা ও সুর: আব্দুল লতিফ

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ প্রাণবান বাঙালির লড়াই-সংগ্রামের প্রাণবন্ত ইতিহাস। লুংগী, গামছা, কাস্তে, লাঠি হাতে চেতনার জোড়ে লড়েছে বাঙালি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে। গেরিলা কায়দায় লড়ে যাওয়া বাঙালির সেই যুদ্ধ ছিল পুরোটাই মনস্তাত্বিক যুদ্ধ। সঙ্গীতের শক্তি অপ্রতিরোধ্য শক্তি হয়ে সাহস আর নিরাপত্তার জ্বালে জড়িয়ে রেখেছিল নয়টি মাস সাতকোটি বাঙালিকে। ভয় শূন্য হৃদয়ে, উন্নত শীরে বাঙালি গানের শক্তিতে জীবনকে তুচ্ছ করেছে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য।

এগারোটি সেক্টরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন। নয় মাসের যুদ্ধকালে শিল্পীরা যেভাবে গানে গানে যুদ্ধ করেছে তা মুক্তিযোদ্ধাদের তুলনায় কোনো অংশ কম নয়। যদিও অস্ত্র হাতে তারা যুদ্ধ করেন নাই বা সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে তাদের যেতে হয় নাই। কিন্তু তাদের প্রতিবাদী গানে সাধারণ মানুষ যুদ্ধে যাবার দুর্জয় সাহস সঞ্চার করেছে পরিপূর্ণভাবেই। যার জন্য শিল্পী আলতাফ মাহমুদ, গীটার বাদক হাফিজুর রহমানদের পাকসেনাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে প্রাণ

৮. মনজুরুল আহসান খান, মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণপর্ব, উৎস: সেলিম রেজা সম্পাদিত, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১১৫, ১১৬

দিতে হয়েছিল। জানা-অজানা শিল্পীদের জীবনদানের মধ্যদিয়ে বাঙালির স্বাধীনতার সূর্যোদয় হয়েছিল। তাদের সংগ্রামের কারণে অবরুদ্ধ দেশের বাঙালি ঘোর অমানিশায় আশার আলোর সন্ধান পেয়েছিল। তাদের অবদান বিভিন্ন সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। সঙ্গীত শিল্পীদের সার্বিক কার্যক্রম একটি পৃথক সেক্টরের মতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

বাঙালি সঙ্গীত প্রিয় জাতি। শ্রোতা হিসেবেও তাদের অবস্থান সর্বোচ্চে। শিল্পীদের গানের বার্তা আত্মস্থ করতে তাদের সময় লাগেনা। শিল্পীদের সুর তাদের মনে প্রেম জাগায়, মমতা, ভালোবাসা তৈরি করে, আবার দ্রোহ, সংগ্রাম আর যুদ্ধের উম্মাদনাও সৃষ্টি করে শিল্পীদের পরিবেশনা, জীবনবাজি রেখে স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। সনজিদা খাতুন লিখেছেন, "স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সমর্থন সৃষ্টির জন্য ছায়ানট বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছে। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংস্কৃতি উৎসব পালন করে পুরনো বাংলা গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি শুনিয়েছে মানুষকে, এক একদিন সমস্বরে এক একটি গান গেয়ে বাঙালি জাতীয়তাবোধে প্রাণীত হয়েছি আমরা সম্মিলিতভাবে। একই সাথে বাঙালিয়ানা সংস্কৃতি তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। যা সহজে চোখে পরে না বা দেখা যায় না। সংস্কৃতি কাজ করে সঙ্গোপনে ভেতরে ভেতরে। আজ যারা নজরুল গীতি শিল্পী, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা তাদের সাধনাতে বাঙালির সঙ্গীত ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। তাদের এই সাধনাই হচ্ছে সাংস্কৃতিক আন্দোলন।"[৯]

স্বাধীনতার স্বপ্নে যে যুদ্ধে নেমেছিল শিল্পীরা সেখানে কণ্ঠই ছিল তাদের একমাত্র যুদ্ধাস্ত্র। গানের কথা, সুর উঠে আসতো গভীর দেশপ্রেম থেকে। বৈরী পরিবেশে তারা কন্ঠের শক্তিতে একাধিক গানকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাত কোটি বাঙালির চেতনার বন্দরে। প্রতিটা গান কামান আর ডিনামাইটের শক্তি নিয়ে সব অন্যায়, অত্যাচারকে ভেঙ্গে চুঁড়ে দিতো।

তপন মাহমুদ বলেন, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র একটা **১২** ফুট বাই **১৬** ফুট রুমের মধ্যে গান করেছি এবং সামান্য কয়েকজন মিউজিশিয়ান ছিলেন। একটা বাঁশি, একটা বেহালা আর একটা মাইক। এই একটা মাইকেই কিন্তু কালজয়ী যতগুলো গান আপনারা শুনেছেন সব গান হয়েছে। ছোট্ট একটা টেপ রেকর্ডারে ধারন করা। স্বাধীনতার পর এসব গান কিন্তু আমরা এখানে এসে করেছি। ব্যাপক সুবিধা নিয়ে। পরে আমরা রি-রের্কড করেছি। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে একটা লং প্লে বের হয়েছিল। সমরদার নেতৃত্বে সেটা হয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সব শিল্পী সেখানে উপস্থিত হয়েছিল; কিন্তু ঐ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যে আবেগ, স্পীড সেটা ছিল না। এত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও।'[১০]

---

৯. সনজিদা খাতুন, আমাদের সঙ্গীত, সংস্কৃতির আন্দোলন, উৎসঃ সম্পাদনা সেলিম রেজা, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৭৬

১০. সাক্ষাৎকার, উৎস-তারেক মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আগামী প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ১৫১-১৫২

বাঙালি স্বাধীনতার দুয়ারে পৌঁছেছিল অপর্যাপ্ত GUN নিয়ে অর্থাৎ যুদ্ধাস্ত্র বলতে তেমন কিছুই ছিল না কিন্তু শিল্পীর কণ্ঠের বাংলা গান অজস্র সুরের যাদুতে বাঙালির যুদ্ধ যাত্রাকে ছন্দময় আর দুর্বার করেছিল। পৃথিবীর কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীদের অংশগ্রহণ এতোটা ছিল কিনা জানা যায় নাই। আর সঙ্গীতের যাদুকরী সুর বাঙালিকে যেমন শক্তি যুগিয়েছে, প্রাণবান করেছে, শত্রু বিতাড়নে তেমনই জোড়ালো ভূমিকা রেখেছিল। মানুষের মনোজগতকে সঙ্গীতের শক্তি কতটা প্রভাবিত করতো তা লিখেছেন ফজল এ খোদা। যেদিন শুনলাম,

‘শোনো একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি–
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ’॥
এবং
‘বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ বাংলার খ্রিষ্টান
বাংলার মুসলমান
আমরা সবাই বাঙালি।’

এ দুটি গান, আমাদের প্রেরণা ও উদ্যাম বাড়িয়ে দিয়েছিল কোটিগুণ।[১১]

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে রনাঙ্গনের যোদ্ধারা বিভিন্নভাবে গানকে কাজে লাগিয়েছেন। গান শুধু তাদের রক্তে জয়ের নেশা, মরণ নেশাই জাগাতো না, গানকে সমরযুদ্ধের নৌযোদ্ধরা কখনো কখনো সিগন্যাল হিসেবেও ব্যবহার করতো। এ কে খন্দকার লিখেছেন “সঙ্গীত বা গানের মাধ্যমে অভিযানের সিগন্যাল পাওয়ার জন্য প্রতিটি কমান্ডো দলের দল নেতাকে একটি করে ছোট রেডিও বা ট্রানজিস্টার দেওয়া হয়। শুধু দল নেতাকে জানানো হয় যে নির্ধারিত রেডিও স্টেশন থেকে কমান্ডো আক্রমণের আগে সাংকেতিক দুটি গান বাজানো হবে। গানগুলো নির্দিষ্ট দিনে আকাশবানী কোলকাতা ‘খ’ কেন্দ্রের সকাল বেলার অধিবেশনে বাজানো হবে, এই গানকে দলনেতা আক্রমণের নির্দেশ বা গানটি যথাসময়ে বাজানো না হলে আক্রমন থেকে বিরত থাকার বার্তা হিসেবে গন্য করবে। প্রথম গানটি ছিল পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে ‘আমি তোমায় যত শুনিয়ে ছিলেম গান/ তার বদলে আমি চাইনি কোনো দান।’ এই গানের মর্মার্থ ছিল যে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন সম্পন্ন করার সব প্রস্তুতি নিতে হবে, আর দ্বিতীয় গানটি শোনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। দ্বিতীয় গানটি ছিল সন্ধা মুখোপাধ্যায়ের ‘আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুরবাড়ি/ওরে তোরা সব উলুধ্বনি কর’, এর অর্থ ছিল যে এখন থেকে ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টার্গেটে আঘাত হানতে হবে। তবে প্রথম গানটি বাজানোর ২৪ ঘণ্টা পর যদি দ্বিতীয় গানটি বাজানো না হয়, তাহলে কমান্ডোরা অভিযানে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ে দ্বিতীয় গানটি শোনার জন্য অপেক্ষা করবে।’ একই বই থেকে আরো জানা যায় “১৯৭১ সালের ১৩ আগস্ট আকাশবানী কোলকাতা ‘খ’ কেন্দ্র থেকে সকালে কাঙ্ক্ষিত প্রথম

১১. ফজল এ খোদা, সঙ্গীত ভাবনা, বাংলা একাডেমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

গানটি প্রচারিত হলো। 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান/তার বদলে আমি চাইনি কোনো দাম' সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। এরই মধ্যে নৌ কমান্ডোদের পুরো দল বিভিন্ন পথ ধরে গোপনে চট্টগ্রাম বন্দরের কাছাকাছি তাদের গোপন আস্তানায় এসে অবস্থান নিয়েছে। ১৪ আগস্ট দ্বিতীয় গানটি বাজানোর কথা থাকলেও তা বাজানো হয়নি। জানা যায় পাকিস্তানিরা জাতীয় দিবস উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে। তাই অপারেশন জ্যাকপটের চূড়ান্ত আক্রমণের সময় ২৪ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। ১৫ আগস্ট সকালে আকাশববানীর 'খ' কেন্দ্রের নিয়মিত অনুষ্ঠানে 'আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুরবাড়ি/ওরে তোরা সব উলুধ্বনি কর' গানটি বাজানো হয়, নৌ কমান্ডোরা ১৫ আগস্ট দিবাগত রাতে বন্দরে অভিযান পরিচালনা করে কর্ণফুলি নদীর ওপাড়ে চলে যায়।"[১২]

নৌকমান্ডো মোঃ শাহজাহান কবির বীর প্রতীক এর সাক্ষাৎকার (যা পরিশিষ্ট ১-এ দেয়া আছে) থেকে জানা যায় যে, গানের সিগনাল মতো যোদ্ধারা অপারেশন চালিয়ে পাকবাহিনীর সশস্ত্র প্রস্তুতি গুড়িয়ে দেয়। ব্যাপক ধ্বংসাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে ৪টি বন্দরে ২৬টি দেশি-বিদেশি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে পাকহানাদার বাহিনীর জলপথে চলাচল বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয় যা বাঙালির বিজয়কে বাস্তবিকই ত্বরান্বিত করেছিল।

বাঙলার স্বাধীনতা, বাঙালির হাজার বছরের প্রতীক্ষার ফসল। সংগ্রাম, ত্যাগ আর রক্তের বন্যায় ভেসে বাঙালি পৌঁছেছিল স্বাধীনতার সীমানায়। অসংখ্য ঘটনার সংমিশ্রনে আর সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণপণ করা সংগ্রামের ফসল স্বাধীনতা। শিল্পীদের সচেতন অংশগ্রহণ এই স্বাধীনতার সৌন্দর্যকে শিল্পীত ছোঁয়া দিয়েছে। নান্দনিক মাত্রা যুক্ত করেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্য, অমানবিকতার বিরুদ্ধে মানবতার জয় আমাদের স্বাধীনতা। ফারুক চৌধুরী লিখেছেন, "অন্ধকার থেকে আলোয়, বঞ্চিত থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশা থেকে আশায়, অসত্যের ওপর সত্যের, উম্মাদনার ওপর প্রকৃতিস্থতায়, কাপুরুষত্বের উপর শৌর্যের, অবিচারের উপর ন্যায়বিচারের, অমঙ্গলের উপর মঙ্গলের জয় হয়েছে।"[১৩] নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি হয়েছিল শুদ্ধ মানুষ সকলের লক্ষ্যবিন্দু মিলিত হয়েছিল একই গন্তব্যে। বাঙালির মাঝে ছিল না বিভেদ, কোন বিদ্বেষ। এক প্রাণ এক হৃদয় হয়ে বাঙালি নিমগ্ন হয়েছিল স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছাতে। ত্রিশ লক্ষ প্রাণ আর রক্তের বন্যা বাঙালিকে ভীত করতে পারে নাই। বাঙালি মাটির মায়ায় সর্বস্ব ত্যাগে লড়েছিল সেই জনযুদ্ধে। সাত কোটি বাঙালির আবেগ আর ভালোবাসা দৃঢ় শক্তি হয়ে শত্রুকে হটিয়েছিল বাংলার মাটি থেকে। বাংলার মাটি স্বাধীন হয়, শত্রু মুক্ত হয় প্রথমবারের মতো।

মুনতাসির মামুন বলেন, '১৯৭১ সালে একবারই আমরা হয়েছিলাম শুদ্ধ মানব। মুক্তিযুদ্ধ ছিল নির্ভয়ে পথ চলা, লক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং অন্যায় আপোষকে বিসর্জন দেয়া।'[১৪]

---

১২. এ কে খন্দকার, ১৯৭১ ভেতরে বাইরে, প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা,২০১৪, পৃ. ১৬২-১৬৪

১৩. ফারুক চৌধুরী, দেশ দেশান্তর, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১১৪

১৪. মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র দুই, সবর্ণ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৭৩

মার্কিন চিত্র গ্রাহক লিয়ার লেভিন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে সীমান্তে চলে আসেন। অনেক ঘুরে ফিরে, দেখে শুনে তিনি একটি সাংস্কৃতিক গ্রুপকে বেছে নিয়েছিলেন। এই গ্রুপের কর্মকাণ্ডের উপর লিয়ার প্রায় ২০ ঘণ্টা ছবি তুলে ছিলেন। প্রায় দুই যুগ পরে চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ লিয়ার লেভিনকে খুঁজে বের করেন। তারেক মাসুদ ও তার মার্কিন স্ত্রী সেই ফুটেজকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।মুক্তির গান নামের চলচ্চিত্রটি পাবলিক লাইব্রেরীতে প্রদর্শিত হলে 'হাউজ ফুল' ছিল প্রতিটা প্রদর্শনী। ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রামান্য তথ্য ভিত্তিক চলচ্চিত্রটি। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালিকে কতটা আবেগপ্রবণ করে আর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত করে তা মুক্তির গানের উপস্থিত দর্শক মাত্র প্রত্যক্ষ করেছে। প্রদর্শনী শুরু হওয়ার আগে ষ্টেজে মুক্তির গানের শিল্পীদের উপস্থিত করানো হতো। শিল্পী শাহীন সামাদ সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তার অভিজ্ঞতার কথা, যা পরিশিষ্ট ১-এ দেয়া আছে।

লিয়ার লেভিন তাঁর সংগৃহীত ফুটেজ সম্পর্কে বলেছেন, "আমি ছিলাম স্বাধীন। ছিল বুক ভরা স্বপ্ন আর সাহস। তখন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের জন্য কাজ করতাম। বিজ্ঞাপন তৈরি করতাম। যুদ্ধের দৃশ্য ধারন করে টিভি চ্যানেলের কাছে বিক্রি করব, অর্থ উপার্জন করব, এমন কোনো ভাবনা আমার মধ্যে ছিল না। মানবতার বিপর্যয় আমাকে তাড়িত করেছিল। তাই এখানে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম অন্যভাবে যদি বিশ্ব বিবেককে জাগানো যায়। একজন নৃতাত্ত্বিকের চোখে সব কিছু দেখলেও বুকের ভেতর বোধহয় একজন দার্শনিক বাস করতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবিস্কার করলাম, আমি একজন চিত্র-গ্রাহক মাত্র। বুকের ভিতর সব সময় অনুভব করি এ দেশটা যেন আমারও।" তারেক মাসুদ তাঁর লেখার মাধ্যমে লিয়ার লেভিনকে আমাদের মুক্তির সারথী বলে সম্মান জানিয়েছেন।[১৫]

এই চলচ্চিত্রের মাঝে শরণার্থী শিল্পীদের নয় মাসের চালচ্চিত্র উঠে এসেছে। একটি ট্রাক যার সামনে ছিল লাল সবুজের ব্যানার। ট্রাকের ওপরে উড়ত মানচিত্র আঁকা বাংলাদেশের পতাকা। ঘুরে ঘুরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শিল্পীরা গান গেয়ে আনন্দ আর উৎসাহ যোগাতেন সর্বস্ব হারা শরণার্থী বাঙালি আর মুক্তিযোদ্ধাদের। শিল্পীদের শরণার্থী জীবনের কষ্ট, দুঃখ সব কিছু ছাঁপিয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের প্রতি শিল্পীদের আবেগ ভালোবাসা আর দেশের মাটিতে ফিরে যাওয়ার গভীর আকাঙ্খা আর প্রত্যয়। শেষ দৃশ্যে দেখা গেছে শিল্পীরা মুক্তাঞ্চলের মাটি কপালে মেখেছেন যা ছিল দেশমাতার প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা আর আবেগের বহিঃপ্রকাশ। লিয়ার লেভিনের কাছ থেকে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের আবেগ ভরা সেই ফুটেজ বহু কষ্টে বর্তমান প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে যে অসাধ্য সাধন করেছেন তারেক মাসুদ আর তার মার্কিন স্ত্রী ক্যাথরিন মাসুদ তার প্রতি বাঙালি জাতির গভীর কৃতজ্ঞতা। এরমধ্য দিয়ে তারা সম্মানিত করেছেন প্রথমবারের মতো শিল্পীদের অবদানকে। অসামান্য এই কাজ দিয়ে তারা নিজেরাও সম্মানিত হয়েছেন। আর সকলের কাজের পিছনে ছিল গভীর দেশপ্রেম। বাঙালির সঙ্গীত প্রীতি বাঙালির জাতিস্বত্তার অংশ। বাঙালি সঙ্গীতের মাঝে বিশ্ব দেখে, মিলনের কথা বলে, যুথবদ্ধ জীবনের কথা বলে, অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা বলে, বিশ্ব মানবতার কথা বলে। গণতান্ত্রিক মুক্তির কথা বলে।

---

১৫. ফকির আলমগীর, মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুরা, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২১৮

বিশ্ব ভ্রাতৃত, সাম্য, মৈত্রীর কথা বলে। বাঙালি শিল্পীদের গানে গানে মুক্তিযুদ্ধ দেখেছে বিশ্ববাসী। আর দেখেছে মুক্তির গানের মধ্য দিয়ে সঙ্গীতের মানবিক ঐকতান-সঙ্গীত কতটা অভেদ্য অস্ত্র হতে পারে মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীদের পরিবেশিত গান তার প্রমাণ। পরবর্তীতে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের আবেগ নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশেও একাধিক গান রচিত হয়েছে, সুর করা হয়েছে। সেই গানেও ছিল দেশপ্রেম আর অনুভূতির গভীর প্রকাশ। স্বাধীনতা প্রাপ্তীর পরে বেশ কিছু কাল এই ধারা অব্যাহত ছিল। যার কারণে এই সময়কার গানগুলিও মুক্তিযুদ্ধের গান বলেই স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সময়ের তেমন কিছু গান : ১. 'ও আমার বাংলা মা তোর আকুল করা রূপের সুধায়' গানটি লিখেছেন আবুল উমরাহ ফখরুদ্দীন। গানটি প্রথম ছিল কবিতা, যা লিখা হয়েছিল ১৯৭১ সালের উত্তাল অসহযোগকালীন সময়ে লেখকের রোজনামচার খাতায়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সংগীত পরিচালক আলাউদ্দীন আলী অসাধারণ সুরে গানটিকে বাঙালির সঙ্গীতাঙ্গনে স্থায়ী আসন করে দিয়েছেন। টেলিভিশনে ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রথমে শিল্পী লিনু বিল্লার কণ্ঠে জনপ্রিয় হয়েছিল। পরে সাবিনা ইয়াসমিনের মিষ্টি কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়। গানটির কথা আর সুরের কারণে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছে।[১৬] ২) নাসিমা খানের 'যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে', ৩) আবদুল লতিফের 'সোনা সোনা সোনা', ৪) খান আতাউর রহমানের 'এক নদী রক্ত পেরিয়ে' ও 'হায়রে আমার মন মাতানো দেশ' ৫) মোস্তাফিজুর রহমানের 'ভেব নাগো মা তোমার ছেলেরা', ৬) গাজী মাজহারুল আনোয়ারের 'একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়ে', ৭) শহিদুল ইসলামের 'একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার', ৮) নজরুল ইসলাম বাবুর 'সব কটা জানালা খুলে দাওনা', ৯) মোঃ মনিরুজ্জামানের 'তারা এদেশের সবুজ ঘাসের শীষে', ১০) রুমী আজনবীর 'এই দেশে আমার এই মাটি আমার' ; ঐ সময়কালের গানের মধ্যে সবচাইতে দীর্ঘ, সবচাইতে বিস্তৃত পরিসরে বাঙালির হাজার বছরের পরাধীন জীবনের সংগ্রাম, আন্দোলনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে বাংলার জারি গানের ঢংয়ে সুর করা অনবদ্য কথার গানটি লিখেছেন গণশিল্পী, সুরকার, গীতিকার আবদুল লতিফ। গানটির প্রথম চার লাইন দিয়ে এই অধ্যায়টি শুরু হয়েছে। গানের মাঝখানে বিবৃত হয়েছে বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রামী অধ্যায়। সমাপ্তীর চার লাইনে বাঙালির গানে গানে যুদ্ধ জয়ের কথা দিয়ে শেষ করেছেন মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী আবদুল লতিফ। গানের শেষ চার লাইন :

উনিশ শ একাত্তর সালে, ষোলই ডিসেম্বর সকালে,
অবশেষে দুঃখিনী এই বাংলা মা'যে আমার হয়।

গানটিতে শিল্পী আব্দুল লতিফ ১৭৫৭ সালের পর থেকে বাঙালির আত্মত্যাগের ১৯০ বছরের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে তুলে এনেছেন। সার্থক হয়েছিল শিল্পীদের গানে গানে মুক্তিযুদ্ধ, সফল হয়েছিল বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম।

স্বাধীনতা নিরন্তর সাধনার বিষয়। আঘাতের পর আঘাতের মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির চড়াই উতরাইয়ের ইতিহাস তা প্রমাণ করে। শিল্পীদের আন্দোলন সংগ্রামের গীতিময় পথচলা পূর্ণতা পেয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে।

---

১৬. দিনু বিল্লাহ, সুরের বরপুত্র, শহীদ আলতাফ মাহমুদ, অনন্যা, ২০১৫, পৃ. ১২৪

উপসংহার

বাঙালির শত হাজার বছরের পরাধীন জীবনের শৃঙ্খল ভাঙ্গার যুদ্ধ ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। চাপিয়ে দেয়া সেই যুদ্ধে বাঙালি লড়েছিল হার না মানার দৃঢ়তায়। অবরূদ্ধ বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর শেষ সৈন্যটি পর্যন্ত পরাজয় মানতে বাধ্য করেছিল দৃঢ় চেতনার বাঙালি। সাত কোটি বাঙালির প্রাণের আকাঙ্খা পূর্ণতা পেয়েছিল স্বাধীনতার সূর্যোদয়ে। নয়টি মাস সর্বস্তরের বাঙালি বিরাট বিক্রমে লড়েছিল পাক বাহিনীর বিরূদ্ধে। সঙ্গীত শিল্পীদের গান নয়মাসের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মাঝে বাঙালিকে স্বস্থি দিয়েছে, প্রশান্তি দিয়েছে, সাহস দিয়েছে। যুদ্ধে যাবার প্রেরণা হয়ে নিরস্ত্র বাঙালিকে শত্রুর মুখোমুখী হবার শক্তি যুগিয়েছে। বাঙালির জীবনের নষ্টতম কঠিন সময়ে শিল্পীরা গানে গানে প্রাণের স্পর্শ দিয়ে গেছেন। অসম্প্রদায়িক, মানবিক চেতনার মশাল জ্বালিয়ে তারা সম্ভব সবটুকু দিয়ে বিপন্ন মানুষের মনে আশা জাগিয়েছেন।

শুধু বাঙালি শিল্পীরাই গান লিখেছেন, সুর করেছেন আর গেয়েছেন তা নয়। ভারতের শিল্পীরা একই চেতনায় মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে গান লিখেছেন, সুর করেছেন এবং শিল্পী কণ্ঠে তুলে দিয়েছেন সে গান। এক সময়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বের মানবিক শিল্পীরাও নিজ উদ্যোগে গানের হাতিয়ার নিয়ে বিশ্ব মানবতার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল বাঙালির প্রতি পাক-হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের বাস্তব কাহিনি।

বাঙালি জাতিস্বত্তার সাথে মিশে থাকা সঙ্গীত ঐতিহ্য সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে। অসাম্প্রদায়িক, মানবিক, উদার, স্বাধীনচেতা বাঙালির যুথবদ্ধ জীবনে সঙ্গীত মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে সূচনাকাল থেকেই। চর্যা থেকে যার শুরু। সপ্তম শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালি গীতিকবিদের ধারাবাহিক পথ চলা। চর্যা গীতির পর মধ্যযুগে গীতি গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, তারপর পাঁচালি। এর পরবর্তীতে রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, লালন, হাসন, রাধারমন, রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অধ্যায়টি প্রাক আধুনিক যুগ বলে পরিচিত-যাদের দেশপ্রেমের গান পরিচিত পায় স্বদেশীগান হিসেবে। নিজেদের রচিত গানে নিজেরাই সুর বসিয়েছেন, আবার নিজেরাই গেয়েছেন। বাঙালির পরাধীন জীবনের বঞ্চনাবোধকে তারা গানের মধ্য দিয়ে জাগিয়েছেন, উপলব্ধি করিয়েছেন। বাঙালির পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গতে প্রেরণা জুগিয়েছে তাদের গান। প্রতিটি পর্যায়ে শিল্পীর গান হয়েছে প্রথম হাতিয়ার। মুক্তি সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তৈরিতে শিল্পীদের নিরন্তর সচেতন প্রয়াস বাঙালির মুক্তির আকাংখ্যাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, পরিচর্যা করেছে অতন্ত্র প্রহড়ির মতো জাগ্রত রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের নয়

মাস শিল্পীরা মুক্তির নেশায় বাঙালিকে তাড়িত করেছে। সাত কোটি বাঙালির লক্ষ্যবিন্দু মিলিত হয়েছিল 'স্বাধীনতা' শব্দটির মাঝে। সেই সমৃদ্ধ সঙ্গীত ঐতিহ্য সংরক্ষণের অভাবে আর লিখিত রূপ না থাকার কারণে অনেকটাই আজ হাড়িয়ে গেছে। প্রাচীনকাল ও মধ্যযুগের গান বাংলার অসামান্য ঐতিহ্যের অংশ। সেই সকল গান চর্চার অভাবে আমরা হাড়িয়ে ফেলেছি। যেই শিল্পীরা গাইতেন সেই গান তাদের নামও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় নাই। এর পেছনে অনেকাংশে দায়ী বিজাতীয় শাসকদের শাসনকাল। বাঙালির ঐতিহ্যের সবকিছুই তারা বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছে। অথচ তার চেয়েও কম সময়ের সঙ্গীত যা পাশ্চাত্য বিশ্ব শিল্পীদের নাম, গানের সুরসহ অক্ষত রাখতে পেরেছে। তাদের চার পাঁচশত বছর আগের সঙ্গীতের নিদর্শনগুলো বেঁচে আছে লিখিত রূপ আর নিয়মিত পরিচর্যার কারণে।

বাঙালি তার প্রাচিন ঐতিহ্য সংরক্ষণে সব সময়ই উদাসীন। বাঙালির সমৃদ্ধ সঙ্গীত, সুরকার আর শিল্পীদের নামসহ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। আজ সেই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হলে পাশ্চাত্যের শিল্পীদের কীর্তি ও নামের চেয়ে বাঙালি সমৃদ্ধ বাংলা গানের ঐতিহ্য নিয়ে সভ্যতার বিচারে এগিয়ে থাকতো নিঃসন্দেহে।

সুদূর অতীতের অনেক কিছু হাড়িয়ে ফেললেও বাঙালির নিকট অতীতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সর্বোচ্য প্রাপ্তী বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে লিখা হয়েছে অসংখ্য গান। যার অনেকটাই সংরক্ষিত হয় নাই। নামি দামি শিল্পীরা বাঙালির নিষ্ঠুরতম সেই দিনের কথা লিখেছেন গানের কথায়। প্রতিটা গান ছিল মুক্তিযুদ্ধের নির্মম বাস্তবতাকে উপজিব্য করে। শহর, গ্রাম, জনপদের অনেক অখ্যাত-অজানা ভাবগায়ক, স্বভাব গায়ক, বাউল, জাড়ি-সারি গানের গায়ক গান বেঁধেছেন পাকিস্তানি হায়েনাদের নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতাকে তুলে ধরে। করুন ও বুকে হাহাকার তোলা সেই সকল গান বাঙালিকে দেশ প্রেমে ব্যাকুল করেছে। শত্রু সেনার হাত থেকে দেশ মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গের শপথ নিতে সাহসী করেছে। যেমনঃ ১ 'এইনা সোনার বাংলার গান গাইতেরে, দয়াল দুঃখে আমার পরান কান্দেরে' কথা মোশাদ আলী-২ মোঃ শুকুর মোড়ল লিখেছেন, 'মায়ের কান্দনে কান্দে বনের পশু পাখীরে', ৩. শহিদুল ইসলাম লিখেছেন, 'জগৎবাসী একবার আসিয়া সোনার বাংলা যান মোর দেখিয়ারে', সহ বিভিন্ন জনের অসংখ্য গান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যের সুরে মানুষকে কাতর করতো। প্রতিটি গানের মাঝে যুদ্ধের বাস্তব চিত্র অত্যন্ত সার্থক ও সফলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। গানগুলো সংরক্ষণ করা গেলে ১৯৭১ সালের নিষ্ঠুর ও কঠিনতম বাস্তবতাকেই সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো। বাঙালিরা খুব বেশি বিস্মৃতপ্রায় জাতি। আবার এই বাঙালিই নিজ স্বার্থে বাঙালির গর্বিত ইতিহাসের বিকৃতি ঘটায়। সংকীর্ণ এই প্রবণতা থেকে ইতিহাস আর ঐতিহ্যকে সুরক্ষা করা গেলে বাঙালি তার ভয়ংকর ১৯৭১ সালকেই বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। প্রতিটি গান, গানের গীতিকার, সুরকার আর শিল্পীর নাম, পরিচয় সংরক্ষণ করা সম্ভব হলে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অনেকটাই সুসংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

যদিও মুক্তিযুদ্ধের অনেক কিছুই হাড়িয়ে গেছে। হাড়িয়ে গেছে অনেক গান, শিল্পীর নাম পরিচয়। তথাপি এখনও যতটুকু আছে ততটুকুই যদি গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ করা যায়, তাহলেও বিকৃতির হাত থেকে সুরক্ষা পাবে বাঙালির ইতিহাসের গর্ব করার মতো কিছু অংশ। বাঙালির সঙ্গীত ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত হবে মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠ শিল্পী, সুরকার ও গীতিকারদের অসামান্য কীর্তি–যা

বাঙালির সংগ্রামী ইতিহাস, গানে গানে বাঙালির প্রানীত ইতিহাস সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করবে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক মানবিক অর্জনকে।

একটা দেশের সংস্কৃতি সেই দেশের জাতি স্বত্তা, ইতিহাস ঐতিহ্য দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে। আর ভ্রান্ত ইতিহাস জাতিকে দিকভ্রাত্ত করে। অতীত গৌরব ভুলিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় স্বার্থান্বেষী মহল ইতিহাস বিকৃতি ঘটায়। সংস্কৃতির মুক্ত, উদার পরিবেশ অব্যাহত থাকলে বিকৃতির হাত থেকে সুরক্ষা পায় সার্বিক ইতিহাস। বাংলার জনপদের হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সংরক্ষিত হয়েছে শিল্পীদের দ্বারা। সাংস্কৃতি সুরক্ষিত হয় নানা ধরনের নির্মাণে, সাহিত্যে, সঙ্গীত, যাত্রা লোকনাট্যে, মন্দির গৃহনির্মাণ, নৌকা নির্মাণ, হস্ত শিল্প, বস্ত্রবুনন, অলংকার শিল্পে এবং বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে সুরক্ষিত হয়। পরাধীন বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্খা দমন হয় নাই। স্বতন্ত্র স্বত্তা নির্মাণে বাঙালির ক্লান্তি ছিল না, আজও নাই। শিল্পীরা তাদের নিরন্তর পথ চলায় সংস্কৃতির সে ভীত তৈরি করেছেন, তাই বাঙালি সংস্কৃতি বেঁচে আছে যুগ যুগ ধরে।একটি জাতির মুখশ্রী তার সংস্কৃতিরই পরিপূর্ণ অবয়ব, যা কাজ করে অত্যন্ত নিরবে কিন্তু গভীরভাবে। সংস্কৃতি বয়ে চলে বংশ পরম্পরায়। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে তা ছাড়িয়ে যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীদের সংগঠিত শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে কঠিন দামে স্বাধীনতা অর্জন করতে সহায়ক হয়েছিল। জয় হয়েছিল বাঙালির মানবিক, সংস্কৃতিক, উদার ও অসাম্প্রদায়িক হাজার বছরের ঐতিহ্যের। শুদ্ধতম আবেগে সিক্ত হয়েছিল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। জয় হয়েছিল বাঙালির মানবিক, সাংস্কৃতিক, উদার ও অসাম্প্রদায়িক হাজার বছরের ঐতিহ্যের।

তথ্যপুঞ্জি

১. কামাল লোহানী, আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪

২. কামাল লোহানী, রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলা বেতার, ভূমিকা, ২০১২

৩. শাহরিয়ার কবির, সম্পাদনা, একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি, প্রকাশক- কাজী মুকুল, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গ-১৬, মহাখালি, ঢাকা, ১৯৯৯

৪. মুনতাসির মামুন, পাকিস্তানি জেনারেলদের মন, বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ, সময় প্রকাশ, ২০১০

৫. সুফিয়া কামাল, একাত্তরের ডাইরি, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯

৬. তারেক মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আগামী প্রকাশনী, ২০১৩

৭. কলিম শরাফী, ভরা থাক স্মৃতি সুধায়, ঐতিহ্য, ২০০৯

৮. সালাহ উদ্দিন আহমদ, বঙ্গবন্ধু বাঙালি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সমকালীন ভাবনা, আগামী প্রকাশনী, ২০১৪

৯. ড. জাহিদ হোসেন প্রধান, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ ২০০5

১০. কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী, কারাগারের ডায়েরি (১৯৮২-৮৩), ম্যাগনাম ওপাস, ২০০৯

১১. দিনু বিল্লাহ, সুরের বরপুত্র শহীদ আলতাফ মাহমুদ, অনন্যা, ২০১৫

১২. রোজিনা কাদের, ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সুবর্ণ, ১৫০ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ২০০৪

১৩. এম আর আখতার মুকুল, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা, শিখা প্রকাশনী, ১৯৯৯

১৪. মুনতাসির মামুন, মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র দুই, সুবর্ণ, ২০১১

১৫. হুমায়ুন আহমেদ, ১৯৭১, অনিন্দ্য প্রকাশন, ১৯৮৬

১৬. এ কে খন্দকার, ১৯৭১ঃ ভেতরে বাইরে, প্রথমা, ২০১৪

১৭. সুব্রত রুদ্র, সম্পাদক, গণসংগীত সংগ্রহ, প্রকাশক সমীর কুমার নাথ, নাথ পাবলিশিং, ২৬/বি পণ্ডিতিয়া প্রেস ১৯৯০, কোলকাতা, ৭০০০২৯

১৮. আবদুশ শাকুর, বাঙালির মুক্তির গান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭

১৯. কামাল লোহানী, লড়াইয়ের গান (বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কালের গান) জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮

২০. আতিউর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭

২১. মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, বাংলাদেশ চর্চা অষ্টম খণ্ড, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ২০১২

২২. আহমদ রফিক, বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধ, অন্য প্রকাশ, ২০১২

২৩. খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, মুক্তির সংগ্রাম ও মহানায়ক, মুক্তদেশ প্রকাশনা, ২০১০

২৪. আনোয়ার উল আলম শহীদ, একাত্তর আমার শ্রেষ্ঠ সময়, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯

২৫. আনিসুজ্জামান, কাল নিরবধি, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩

২৬. মোহাম্মদ সাদাত আলী সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধ ৭১, বাঙালি জাতিসত্তার ইতিহাস, শব্দরূপ, ২০১২

২৭. জহিরুল ইসলাম, একাত্তরের গেরিলা, মিলন নাথ, ৩৮/4 বাংলা বাজার, ১৯৯৭

২৮. সঙ্গীত ভাবনা, ফজল এ খোদা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২

২৯. রেহমান সোবহান, বাংলাদেশের অভ্যুদয় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮

৩০. অন্নদা শঙ্কর রায়, আমার ভালোবাসার দেশ, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১

৩১. সাইম রানা, বাংলাদেশের গণ সঙ্গীত বিষয় ও সুর বৈচিত্র, বাংলা একাডেমি, ২০০৯

৩২. ড. বদিউজ্জামান, সংস্কৃতির রাজনীতি, বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৯৭

৩৩. শামসুল হুদা চৌধুরী, বরেন্দ্র থেকে বাংলাদেশ, অনুপম প্রকাশনী, ২০০০

৩৪. আব্দুল মতিন আহমদ রফিক, ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯১

৩৫. সালাউদ্দীন আহমদ, ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৫

৩৬. আতিউর রহমান, ভাষার লড়াই বাঁচার লড়াই, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৭

৩৭. আনু মাহমুদ, একুশ থেকে স্বাধীনতা, ঝিঙে ফুল, ২০০৯

৩৮. সেলিম রেজা সম্পাদনা, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৮

৩৯. আসাদুজ্জামান আসাদ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী শিবির, আগামী প্রকাশনী, ২০০৯

৪০. নূরজাহান মুরশিদ, আমার কিছু কথা, অন্য প্রকাশ, ২০০৮

৪১. হাসান আজিজুল হক সম্পাদক, বঙ্গ বাংলা বাংলাদেশ, সনৎ কুমার সাহা সম্মাননা গ্রন্থ, সময় প্রকাশ, ২০১২

৪২. সালাম আজাদ, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০১২

৪৩. মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, বাংলা গান বিবিধ প্রসঙ্গ, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১১

৪৪. ডঃ বদিউজ্জামান, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুখ, সেন্টার ফর বাংলাদেশ ষ্টাডিজ,২০০৬

৪৫. আহমদ রফিক, ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও উত্তর প্রভাব, সময় প্রকাশ, ২০০২

৪৬. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০

৪৭. মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, অনুবাদ জগলুল আহমদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯২

৪৮. Ayub Khan, friends not masters, Oxford University press, Lahore-1967

৪৯. ড. হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশঃ রাজনীতি সরকার শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৯

৫০. প্রফেসর সালাউদ্দীন আহমেদ, মোনায়েম সরকার ও ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭

৫১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিল পত্র, দ্বাদশ খণ্ড, ত্রয়োদশ খণ্ড, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২

৫২. ড. মুহাম্মদ হবিবুর রহমান, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১

৫৩. Rounaq Jahan, Bangladesh Politics: problems and Issues, University Press Limited Bangladesh, 1980.

৫৪. সেলিনা হোসেন, ঊনসত্তরের গণআন্দোলন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

৫৫. Bangladesh Documents: Ministry of External Affairs,Government of India, New Delhi 1971.

৫৬. ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৪৭-৭১, সময় প্রকাশন, ১৯৯১

৫৭. নজরুল ইসলাম, একাত্তরের রনাঙ্গন অকথিক কিছু কথা, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৯

৫৮. মাহবুব আলম, গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২

৫৯. আবুল হাসনাত, স্বাধীনতা ৭১, শিখা প্রকাশনী, ২০০৯
৬০. ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১২
৬১. আনিসুজ্জামান, আমার একাত্তর, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭
৬২. আব্দুল মোমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বর্ণায়ন, ২০02
৬৩. ড. মোহাম্মদ হান্নান, কারা বাঙালি কেন বাঙালি, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৮
৬৪. মঈদুল ইসলাম, মূল ধারা'৭১, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬
৬৫. শামসুল হুদা চৌধুরী, একাত্তরের রনাঙ্গন, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা, ১৯৮২.
৬৬. গাজীউল হক, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, পুঁথিপত্র প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ভাদ্র, ১৩৭৮
৬৭. শামসুল হুদা চৌধুরী, একাত্তরের বিজয়, বিজয় প্রকাশন, ১৯৮5
৬৮. মোবারক হোসেন খান, মুক্তিযুদ্ধের গান, শোভা প্রকাশ, ১৯৯৯
৬৯. রফিকুল ইসলাম, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এ টেল অব মিলিয়নস, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ১৯৮১
৭০. বিধান রায়, আগরতলা একাত্তর, পারিজাত প্রকাশনী, ২০১৩
৭১. সৈয়দ আবুল মকসুদ, অরণ্য বেতার, প্রথমা, ২০১১
৭২. গোলাম মুরশিদ, যখন পলাতক মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১৯93
৭৩. সালাউদ্দীন আহমদ, বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২
৭৪. নিন্দিত নন্দন, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, শব্দ শৈলী, ঢাকা, ২০১4
৭৫. আহমদ শরীফ সংকলন, বাঙলা বাঙালি বাঙলাদেশ, মহাকাল ২০১৩
৭৬. খান সারওয়ার মুরশিদ, কালের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১
৭৭. এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, অনন্যা, ১৯৮৫
৭৮. শামসুল হুদা চৌধুরী, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০০
৭৯. মোস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পাদনা, বাংলাদেশঃ বাঙালি আত্মপরিচয়ের সন্ধানে, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯90
৮০. তাহের উদ্দীন, আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ, আগামী প্রকাশনী, ২০05
৮১. এম আর আখতার মুকুল, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮
৮২. প্রবীর সেণগুপ্ত, বাংলার গান বাংলা গান, সম্পাদনা ড. অরুণ সরকার, পরিবেশক, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ২০০৬
৮৩. বশির আল হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫
৮৪. মুক্তিযুদ্ধ কোষ, প্রথম খণ্ড, মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫
৮৫. হোসেন উদ্দীন হোসেন, রণক্ষেত্রে সারাবেলা, রোদেলা, ঢাকা, ২০১২
৮৬. ফারুক চৌধুরী, দেশ-দেশান্তর, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯4
৮৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিল পত্র ১৯০5-১৯৭১, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনায় মাহমুদ উল্লাহ, গতিধারা, ঢাকা, ১৯৯৯
৮৮. জাহানারা ইমাম, একাত্তরের দিনগুলি, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬

৮৯. বেগম মুশতারী শফি, স্বাধীনতা আমার রক্ত ঝড়া দিন, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯

৯০. এম,এ,এস, মোহাম্মদ জাকারিয়া, দেখে এলাম আমেরিকা, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৫

৯১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, দুই যাত্রা এক যাত্রী আত্মজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড পার্ল-পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১১

৯২. রাম কানাই দাশ, সঙ্গীত ও আমার জীবন, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১

৯৩. তারেক মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

৯৪. ফকির আলমগীর, মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুরা, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৫

৯৫. মফিদুল হক, বঙ্গবন্ধু বিষয়ক আরও একটি বই, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

৯৬. পপি চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা, প্রিতম প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

৯৭. রিজিয়া রহমান, নদী নিরবধি, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১১

৯৮. আবুল আহসান চৌধুরী, সুরের চারণ আব্বাস উদ্দীন, সূচিপত্র, ঢাকা, ২০০৫

৯৯. রাবেয়া খাতুন, জীবন ও সাহিত্য, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬

১০০. জিম ম্যাকিনলে, যুদ্ধদিনের কথা, অনুবাদঃ মফিদুল হক, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬

১০১. আব্দুল ওয়াহাব, মহাত্মা লালন মানবতাবাদ ও সঙ্গীত, সাম্প্রতিক প্রকাশনী, ২০১১

১০২. ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, সঙ্গীতে সুন্দর, দেজ পাবলিশিং, কোলকাতা ৭০০০৭৩, ১৯৬৯

১০৩. দ্রোহ ও মুক্তির গান, সম্পাদক লিয়াকত আলী লাকী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০১২

১০৪. আলতাফ মাহমুদ, হেদায়েত হোসেন মোর্শেদ, বাংলা একাডেমি, ১৯৮২

১০৫. হুমায়ুন আজাদ,কত নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী, আগামী প্রকাশনী, ১৯৮৭

১০৬. লড়াকু পটুয়া, হাসনাত আবদুল হাই, আগামী প্রকাশনী, ২০১২

১০৭. ভাষার প্রাণ ভাষার বিতর্ক, সৌমিত্র শেখর, বিভাস, ঢাকা, ২০১১

১০৮. সনজিদা খাতুন, সংস্কৃতি কথা সাহিত্য কথা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪

১০৯. আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৯

১১০. সুচেতা চৌধুরী, সঙ্গীত ও নন্দন তত্ত্ব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা-৯, ১৯৮৮

১১১. আবদুল গাফফার চৌধুরী, ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা, জোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০০

১১২. সানজিদা খাতুন, প্রবন্ধ সংগ্রহ, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০

১১৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নজরুলকে চিনতে চাওয়া, সংহতি, ঢাকা, ২০১৪

১১৪. সঙ্গীত চিন্তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭

১১৫. আবুল আহসান চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ বাউল সংস্কৃতি ও অন্যান্য, রোদেলা, ঢাকা, ২০১২

১১৬. সিরাজুদ্দীন আমেদ, রবীন্দ্রনাথঃ আগুণের পরশমণি, ভূমিকা-অরুণ কুমার বসু, সম্পাদিত ও ভূমিকাকৃত, ফ্যাক্সটন প্রিন্টার্স, ত্রিপুরা, ২০১২

১১৭. মুস্তফা জামান আব্বাসী, জীবন নদীর উজানে, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮

১১৮. কামাল লোহানী, এদেশ আমার গর্ব, গ্রন্থ কানন, ঢাকা, ২০১৬

১১৯. সিরু বাঙালি, আমার যুদ্ধ আমার একাত্তর, আদিগন্ত প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২

১২০. আহমদ রফিক, ভাষা আন্দোলন, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯

১২১. বশির আল হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫

১২২. কাজী মোতাহার হোসেন, স্মৃতিকথা, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪

১২৩. আমার শিল্পী জীবনের কথা, আব্বাস উদ্দীন আহমদ, হাসি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১
১২৪. ড. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩
১২৫. জায়নাব আখতার, ভুলে যাওয়া রাজনৈতিক মঞ্চের আত্মকথন, প্রকাশক, নিলুফার সুলতানা, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম, ২০০৭
১২৬. সাইফুল ইসলাম, স্বাধীনতা ভাষাণী ভারত, প্রকাশক-বর্তমান সময়, ১৯৮৭
১২৭. আবুল হাসেম চৌধুরী, যুদ্ধেযুদ্ধে একাত্তরের নয় মাস, কাকলী প্রকাশনী, ২০০৩
১২৮. বাসন্তী গুহঠাকুরতা, একাত্তরের স্মৃতি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১
১২৯. ড. আবদুল ওয়াহাব, বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সঙ্গীত, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১
১৩০. ফয়েজ আহমদ, 'আগরতলা মামলা' শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪
১৩১. আবদুর রউফ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন, প্যাপীরাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২
১৩২. এ কে এম শাহনাওয়াজ, ভাষা আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও ইতিহাস, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৭
১৩৩. মুহাম্মদ শামসুল হক, স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রস্তুতি, আগরতলা মামলার অপ্রকাশিত জবানবন্দী, বলাকা, চট্টগ্রাম, ২০০৯
১৩৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২ (মোট ১৫ খণ্ড)
১৩৫. সনজিদা খাতুন, প্রভাত বেলার মেঘ ও রৌদ্র, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা ২০১৫
১৩৬. ড. আবদুল ওয়াহাব, বাংলার বাউল, সুফি সাধনা ও সঙ্গীত, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১
১৩৭. ফয়েজ আহমদ, মধ্যরাতের অশ্বারোহী, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩
১৩৮. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ ও লোক সংস্কৃতি, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪
১৩৯. এম আর আখতার মুকুল, কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪
১৪০. সেলিনা হোসেন, ভাষা মুক্তিযুদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতি, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩
১৪১. ম. মনির উজ্জামান, সাধক কবি লালন কালে উত্তর কালে, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০
১৪২. আবুল আহসান চৌধুরী, অন্তরঙ্গ অন্নদা শঙ্কর রায়, শব্দশৈলী, ২০০৪
১৪৩. অন্নদা শংকর রায়, লালন ফকির ও তাঁর গান, কবি প্রকাশনি, ঢাকা, ২০১৭
১৪৪. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, সংস্কৃতিঃ জাতীয় মুখশ্রী, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬
১৪৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ ঢাকা-কোলকাতা কেন্দ্রিক শতবছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, কথামালা প্রকাশন, ২০০৭
১৪৬. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম, প্রকাশক, চারদিক, ঢাকা, ১৯৮৮
১৪৭. ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, চলতি পথের রেখা-উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০
১৪৮. কল্যাণী ঘোষ, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮
১৪৯. মোনায়েম সরকার সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের গান, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬
১৫০. মুস্তফা জামান আব্বাসী সম্পাদিত স্বাধীনতা দিনের গান, বর্তমান সময়, ঢাকা, ২০০৯
১৫১. বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, জয়পুরহাট, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪
১৫২. সনজিদা খাতুন ও আবুল হাসনাত সম্পাদিত, অচিনপাখীর-কলগীতি লোকগীতি কবিদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি বীক্ষা, ছায়ানট, ঢাকা, ২০১৫

১৫৩. নির্মলেন্দু গুণ, আত্মকথা ১৯৭১, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

১৫৪. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ও আমি, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭

১৫৫. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, একাত্তরের দশ মাস, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭

১৫৬. মেজর জেনারেল কে.এম. সফিউল্লাহ বীর উত্তম, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫

১৫৭. MAJ GEN K M SAFIULLAH, Bir Uttom Psc, Bangladesh, AT WAR, AGAMEE PRAKASHANI, 1989.

১৫৮. 15th August A National Tragedy, Major General KM Safillah BU, Psc (Retd), Agamee Prakashani, 2014.

১৫৯. সনজিদা খাতুন, স্বাধীনতার অভিযাত্রা, ভাষা আন্দোলন নববর্ষ ছায়ানট মুক্তিযুদ্ধ, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪

১৬০. সনজিদা খাতুন সম্পাদিত, জগতে আনন্দ যজ্ঞে, ওয়াহিদুল হক, ছায়ানট, ২০০৭

২৬১. ওয়াহিদুল হক, গানের ভিতর দিয়ে, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫

১৬২. আবুল হাসনাত সম্পাদিত, স্থির প্রত্যয়ে যাত্রা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৬

১৬৩. সেলিনা হোসেন, নিজেরে করো জয়, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০১৩

১৬৪. Live @ facebook/ Raj kahon , dbc news 24*7

১৬৫. D B C News , Youtube . com / dbc news 24/7 , 10.6.2016 রাতঃ ১১.০০

১৬৬. মুক্তিযুদ্ধের গান, শাহারিয়ার কবির, প্রামাণ্য চিত্র ১৯০৫-১৯৭১, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্রের নিবেদন, প্রযোজনা ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড।

১৬৭. তাহমিদা সাঈদা, জাহানারা ইমাম, বাঙালি সমগ্র প্রকাশনা, ২০০৪

১৬৮. গণগ্রন্থাগার, আগারগাত্ত, দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক আজাদ।

পরিশিষ্ট-১

সাক্ষাৎকার

মুক্তিযোদ্ধা/বুদ্ধিজীবীদের জন্য প্রশ্নমালা

১। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন কিভাবে?

২। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের গান আপনাকে কিভাবে অনুপ্রাণীত করেছে?

৩। শিল্পীদের সঙ্গীত মুক্তিযুদ্ধকে কতটা প্রভাবিত করেছিল?

৪। সঙ্গীত সংশ্লিষ্টদের (শিল্পী, সুরকার, গীতিকার) মুক্তিযুদ্ধকালীন অবদানকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

৫। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের বিশেষ কোনো গানের কথা বলুন যা আপনাকে যুদ্ধদিনের শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছিল?

৬। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সংস্কৃতি জগতের কাদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন? তাদের অবদান উল্লেখ করুন।

কে এ শফিউল্লাহ
সেক্টর কমান্ডার

১. দেশভাগ হয় ১৯৪৭ সালে। স্বাধীন দেশের স্বপ্নে আমি স্কুলে থাকাকালেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছি। রেফারেন্ডামে আমরা অংশ নিয়েছি- স্বাধীন দেশ চাই কিনা, আমি তার পক্ষের অর্থাৎ সমর্থক ছিলাম। আমার বাবা কাজী আবদুল হামিদ। তিনি রিপন কলেজের 'পার্শি'র শিক্ষক ছিলেন। ঐ সময় মসজিদে জুম্মার নামাজের পরে 'খুতবা' পরা হতো। বাবা খুতবা পড়তেন। ব্রিটিশরা চাইতো খুতবাতে যেন কুইন ভিক্টোরিয়ার নাম বলা হয়। তা কোনোভাবেই সম্ভব না বাবা জানিয়ে দেন। শাস্তিস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার বাবাকে বার্মাতে পাঠিয়ে দেয়। কিছুদিন বার্মায় থেকে বাবা ফিরে আসেন। ব্রিটিশ সরকার জানতে পেরে পুনরায় আগের প্রস্তাব দেয়। বাবা অপারগতা প্রকাশ করলে বাবাকে এবার ইরান পাঠিয়ে দেয়। কিছুদিন পর বাবা ইরান থেকে দেশে ফিরে বাড়িতে না যেয়ে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং এ আত্মগোপন করে থাকেন। বাবার সেই রক্ত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।

আমাদের চোখের সামনে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান নেতৃবৃন্দ আমাদের সমতার চোখে দেখতো না। ৫৬% বাঙালি হওয়া স্বত্ত্বেও বাকিরা লঘিষ্ট হয়েও আমাদের সহ্য করতে পারতো না। ঠাট্টা, বিদ্রুপ করতো। ক্যাডেট হিসাবে আমি যখন কোয়েটা, কাকুল গেলাম তখন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের প্রতি তাদের তাচ্ছিল্য অনুভব করেছি। আমাদের উৎপাদিত পণ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র চলতো। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত দুই থেকে আড়াই হাজার। বাঙালিরা সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় নবম ব্যাচ থেকে।

২. আমাদের মূল কাজ ছিল যুদ্ধ। কিন্তু যখনই সময় পেয়েছি রেডিও খুলে গান শুনেছি। রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি আমি খুব মনোযোগসহ শুনতাম। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি লগ্নে আমি ছাত্র হিসাবে (হরগংগা কলেজ) বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছি। ১৯৫২ তে আমি ISSB তে অংশ নেয়ার কারণে ভাষা আন্দোলনে আর সরাসরি যুক্ত থাকতে পারি নাই। ঐ বছরেই আমি কলেজের ফলাফল বের হবার আগেই আর্মিতে ক্যাডেট হিসাবে যোগ দিলাম। ১৯৫৫ সালে কমিশন প্রাপ্ত হই। আর্মিতে থাকাকালীন আমরা ঘরোয়াভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতাম। কিন্তু পাকিস্তানিরা তা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারতো না। প্রতিটি গান আমাদের রক্তে শিহরণ জাগাতো। বিশেষ করে 'জয় বাংলা' শব্দটিতে আমরা যে কিভাবে প্রাণীত হতাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। যুদ্ধের ময়দানে এ সকল গান আমাদের আবেগাক্রান্ত করতো। শক্তি দিত, সাহস যোগাতো।

আকাশবাণীর কিছু গান আমরা Select করেছিলাম যুদ্ধের সময়ে ‘সিগন্যাল’ হিসাবে। সেই গানগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন সাংকেতিক কাজ করতাম। বড় বড় ‘অপারেশন’ পরিচালিত হতো নির্দিষ্ট গানের মধ্য দিয়ে।

৩. আমরা যখন রণক্ষেত্রে যেতাম, তখন আমরা চল চল চল, তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর, এই শিকল পড়া ছল মোদের প্রভৃতি গানগুলো শোনাতাম আমাদের যোদ্ধাদের। রক্তে তাদের শিহরণ জাগতো। গান শোনার পর শত্রুর মোকাবিলা করতে আমরা ভয় শূন্য হয়ে যেতাম। জীবনকে তুচ্ছ করে শত্রুর গোলার মুখে সাহসী বুক বাড়িয়ে দিতাম যুদ্ধ ময়দানে।

৪. গানের সাথে সংশ্লিষ্টরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। আমরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছি। শিল্পীরা তাদের কণ্ঠ দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। কখনো হয়তো তারা আমাদের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছেন। ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তা অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। আমরা মাঝে মাঝে অবসরের সময় পেতাম। তারা হয়তো তাও পান নাই। সুতরাং আমরা যারা রনাংগনের যোদ্ধা, তারাও ঠিক তেমনই যোদ্ধা। আমরা যখন যোদ্ধাদের গ্রামে গ্রামে ‘অপারেশনে’ পাঠিয়েছি। তারা তাদের জায়গা ছেড়ে যোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে। আমরা মেয়েদের দুর্বল বলি, যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেখেছি তারা কতটা সাহসী। তারা তাদের সাহস আর যোগ্যতা দিয়ে অনেক সময় পুরুষদের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

৫. জয় বাংলা বাংলার জয়, একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, আমার সোনার বাংলা, বাঁধ ভেঙ্গে দাও ইত্যাদি অসংখ্য গান যার অনেকগুলোর কথা স্মরণ করতে পারছি না।

৬. শিল্পী ও সংস্কৃতি জগতের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা মুক্তিযুদ্ধকে গতি দিয়েছিল। তারা তাদের পরিবেশনা দিয়ে বাঙালির মাঝে যেমন দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছেন আবার সাহস নিয়ে দেশের পক্ষে লড়তে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

কামাল লোহানী

স্বাধীন বাংলা বেতারের ঘোষক

১. অনুপ্রাণীত হয়েছি আমি আমার স্বদেশ থেকে। আমার স্বদেশকে শাসন-শোষণ করে যাচ্ছিল ঔপনিবেশিক শক্তি, যারা আমাদের অধিকার অস্বীকার করে আমাদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছিল এবং নিজেদের আঞ্চলিক উন্নয়নসাধন করে, আমাদের উপেক্ষা করে যা আমার মনে সাধারণ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। এই শাসকগোষ্ঠী আমাদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে প্রথমেই আমাদের মাতৃভাষার উপর আক্রমণ চালায়। এখান থেকেই অধিকারহীনতা এবং অবমাননার একটি প্রতিক্রিয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়। সেটাই আমাদেরকে এই শাসন-শোষণ থেকে অব্যাহতি পাবার তাগিদ জাগায়। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ২৩ বছর আমাদের লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে। বৈষম্যের স্বীকার আমরা সবসময় ছিলাম। যার কারনে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ বিস্ফোরন ঘটেছিল ১৯৭১ এ।

২. মুক্তিযুদ্ধকালের গান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, যে রাজনৈতিক দুঃশাসন চলছিল তার পরিপূরক হিসেবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চলে আসছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কিছু গান সংগ্রহ করেছি। ১৯৫২ সালের মাতৃভাষা আন্দোলনে কিছু গান লিখা হয়েছিল। সেগুলো দারুনভাবে প্রভাব ফেলেছিল মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নিতে। ৬০ এর দশকে পূর্ববঙ্গে বেশ কিছু গণসঙ্গীত রচনা করা হয়েছিল আন্দোলনকে ভিত্তি করে; যেমন—'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা- আজ জেগেছে সেই জনতা', 'জনতার সংগ্রাম চলবে', 'বিপ্লবের রক্ত রাঙ্গা ঝান্ডা ওরে আকাশে', 'মার্কিনী লাল ইয়াংকিরা' প্রভৃতি গান আমাদের প্রাণীত করেছে আন্দোলন সংগ্রামে।

৩. অবরুদ্ধ বাংলায় আলতাফ মাহমুদ, আবদুল লতিফ, শেখ সাদি খান গান লিখেছেন। সে গান সুর করে রেকর্ড করে আমাদের জন্য ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতারে পাঠিয়েছেন। আলতাফ মাহমুদ শুধু সঙ্গীতের মাঝেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নাই। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন- এভাবেই তিনি পাকিস্তান আর্মীর হাতে ধরা পরে যান। তাঁর করুণ মৃত্যুকে বরণ করে নেয়ার মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি।

মুক্তিযুদ্ধের হাজারো হৃদয় বিদারক ঘটনার মাঝে অবরুদ্ধ বাংলায় মনে পড়ে আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী বারীন মজুমদার যার গ্রামের বাড়ি আমার এলাকাতেই। তিনি হারিয়েছেন তাঁর অত্যন্ত আদরের কন্যা মধুমিতা যার ডাক নাম মিতু। পাকিস্তান আর্মীর

হাত থেকে বাঁচার জন্য গোটা দেশবাসী যখন জীবন নিয়ে পলায়নপর তখন তিনি তার পরিবারসহ নদীর ওপাড় (বুড়িগঙ্গা) যাচ্ছিলেন। সাথে ছিল তাঁর ছাত্র ধর্মদর্শী বড়ুয়া। বুড়িগঙ্গা নদী পাড় হবার সময় শুরু হয় বোম্বিং, প্রাণভয়ে দৌড়াদৌড়ির মাঝে ধর্মদর্শী বড়ুয়ার হাত থেকে ৬/৭ বছরের মিতু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর থেকে মিতুকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নাই। সন্তানকে না পেয়ে কিযে কষ্টে ছিলেন পরিবারটি। প্রতিটি পরিবারের স্বজনহারানো কষ্ট, দুঃখ বেদনার বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল স্বাধীনতা। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বারীন মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী ইলা মজুমদার ও পরিবারটি কন্যা মিতুর জন্য প্রতীক্ষায় ছিল। দেশে ফিরে এসে স্বাধীন দেশে তাদের দেখেছিলাম সন্তান হারানোর কঠিন শোক বুকে চেপে তারা বেঁচেছিলেন। কত কঠিন ছিল তাদের বেঁচে থাকা। প্রতিটি দিন তারা অপেক্ষার প্রহর গুনেছেন হয়তো মেয়ে ফিরে আসবে।

ষাট দশকের গানগুলোও মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীরা গাইতেন। IPT এর গানগুলো আমি নিজে সংগ্রহ করেছি। তখন গানগুলো খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। 'মানবো না এ বন্ধনে' গানটি সলিল চৌধুরীর লিখা। পূর্ববঙ্গে গানগুলো নতুন করে সুর দিয়ে গাওয়া হতো। সলিল চৌধুরী একবার এলেন পূর্ববঙ্গে আলতাফ মাহমুদের সুরে নতুন করে যখন গানগুলো শুনলেন, তখন তিনি বললেন 'আদর্শ যদি ঠিক থাকে, আর লক্ষ যদি স্থির হয়, তাহলে সুরেও কোনো ফারাক হয় না। এ দুটো গান তার প্রমাণ।' গান দুটো ছিল (১) 'মানবো না এ বন্ধনে' (২) 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা' এ গানটি আমি একজন কৃষকের কাছ থেকে সংগ্রহ করি। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলামের গানও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অনেক গাওয়া হতো। টিএইচ সিকদার, সন্দ্বীপ এরা নতুন গান লিখেছেন, অনেকের কথাই স্মরণ করতে পারছি না- যারা গান লিখেছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য। আবার অনেকেই গান লিখেছেন প্রথমবারের মতো, যাদের পূর্বে গান লিখার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সুজেয় শ্যামের সুর করা 'বিজয় নিশান উড়ছে ঐ' লিখেছেন শহিদুল ইসলাম। গানের ১ লাইন লিখা হচ্ছে ১ লাইন সুর করা হচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে অজিত রায় এর কণ্ঠে ধারণ করছিল। মাত্র ক' মিনিটের মধ্যে ঐতিহাসিক গানটি তৈরি হয়েছিল। আমরা তার প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী। 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে' অসাধারণ গানটি আমাদের আবেগে আপ্লুত করেছিল। 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা আমরা তোমাদের ভুলবো না' গানটি ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর মনে হয় লিখা হয়েছিল। আমরা অনেকেই তখনও দেশে ফিরে আসি নাই তখন গানটি তৈরি হয়েছিল।

৪. অবশ্যই তারা মুক্তিযোদ্ধা। পরিবার পরিজন ছেড়ে তারা যেভাবে গান গেয়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে, শরণার্থী শিবির ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানে গান গেয়ে তহবিল সংগ্রহ করেছে তা কোনোভাবেই মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে কম নয়। পুরো যুদ্ধকালীন সময়ে তারা দেশের জন্য গান গেয়েছেন। মানুষকে আশা-আকাঙ্খা আর স্বপ্নে বিভোর করে ভবিষ্যতের জন্য বাঁচিয়ে

রেখেছিল শিল্পীরা। অবরুদ্ধ দেশে বাঙালিরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান শুনে ভবিষ্যতের জন্য বাঁচার শক্তি পেয়েছে।

৫. রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, অতুল প্রসাদ এর গান, গণসঙ্গীত সব গানই আমাকে সাহস দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে দেশের স্বাধীনতার জন্য উদ্যাম নিয়ে কাজ করার প্রেরণা যুগিয়েছে।

৬. আমরা সবাই একত্রিত হয়েছিলাম স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে। সবাই সেখানে আমরা একপ্রাণ হয়ে দেশের জন্য কাজ করেছি। কাজের ক্ষেত্রে ছোট-খাট ভুল হয়তো ছিল তবে স্বাধীনতার প্রশ্নে আমরা সবাই ছিলাম এক লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ। যুদ্ধকালীন সেই কষ্টের সময়ে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ ছিল বলেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছেছিলাম নয় মাসে; আমরা ৯ মাসের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পেয়েছিলাম আমাদের স্বাধীন দেশ-বাংলাদেশ।

শাহরিয়ার কবির

১. অনুপ্রাণীত হবার কিছু ছিল না, পাকিস্তান সেনা শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিকে দীর্ঘ তেইশ বছরের বেশি সময়ব্যাপী শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার বাঙালিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। বাঙালি মাত্র সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। যারা অবরুদ্ধ বাংলাদেশে ছিল তারা, যারা প্রবাসে শরণার্থী হয়েছিলেন তারা, প্রায় দেড়লক্ষ সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা, প্রবাসী বাঙালি সবাই এক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিসংগ্রামে যার যার অবস্থান থেকে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে সবধরনের সাহায্য সহযোগীতা করেছেন।

২. বাঙালির প্রতিটি সংগ্রামে-আন্দোলনে সঙ্গীত শিল্পীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ পর্যায়ে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে, পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর দীর্ঘ সংগ্রাম মুখর অধ্যায়ে শিল্পীদের অগ্রণী অবস্থান ছিল। তারা শাসক গোষ্ঠীর অন্যায় দুঃশাসনকে গানে গানে সোচ্চার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সাধারণ বাঙালিকে সচেতন করে তুলেছেন।

৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুধু নয় মাসের সশস্ত্র লড়াই ছিল না। যারা মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন, যাদের প্রতিবাদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিস্বত্তার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তাদের মধ্যে শিল্পীদের ছিল অগ্রণী ভূমিকা। পাকিস্তান শাসনামলে বিজাতীয় শাসন চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হলে শিল্পীরা প্রতিবাদী হয়েছিল। একের পর এক সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে তখন বাঙালি সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে। ছায়ানট এক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করেছে। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ও গবেষক ওয়াহিদুল হক, সনজিদা খাতুনসহ অনেকেই নিরলস পরিশ্রম করে বাঙালি সংস্কৃতির ভীত তৈরি করে একে সুদুর প্রসারী করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং আজও তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। মনে পরে শিল্পী ফেরদৌসী রহমানের প্রতিবাদের কথা। পূর্ব পাকিস্তান টেলিভিশন ১৯৬৪ সালে প্রথম যাত্রা শুরু করে। প্রথম দিনের গানের শিল্পী ছিলেন ফেরদৌসী রহমান। ফেরদৌসী রহমানকে জানানো হয়েছিল কপালে টিপ দেয়া যাবে না। শিল্পী ফেরদৌসী রহমান জানিয়েদেন টিপ ছাড়া তিনি অনুষ্ঠান করবেন না। পরে শিল্পী টিপ পরেই অনুষ্ঠান করেছিলেন। শিল্পীর সেদিনের টিপটি অন্যান্য সময়ে ব্যবহৃত টিপের চাইতে কিছুটা বড়ই ছিল। শিল্পীদের প্রতিবাদ এতটাই দৃঢ় ছিল যা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এক সময় তা মেনে নিতে বাধ্য হতো। যেমন ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবর্ষ উৎযাপন সব কিছুই সম্ভব হয়েছিল শিল্পী ও সংস্কৃতি অংগনের মানুষদের দৃঢ় অবস্থানের কারণে। শাসকগোষ্ঠী বার বার বাঁধা দিয়েও বাঙালিকে দমাতে পারে নাই। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল একটু একটু করে এভাবেই। ঐ সময়ের গানগুলিও শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস গেয়ে প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল প্রতিটি

বাঙালির অন্তরে। রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, গণসঙ্গীতসহ বিভিন্ন গান শিল্পীরা গেয়েছেন। সাথে ছিল যুদ্ধের সময়ে লিখা ও সুর করা অসংখ্য নতুন গান। গানগুলো সাধারণ বাঙালিকে সাহসে, শৌর্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছে। মুক্তিযোদ্ধা, শরণার্থী শিবির, স্বাধীনবাংলা বেতার থেকে প্রচারিত শিল্পীদের গান দেশে বিদেশে ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি করেছিল।

৪. শিল্পীদের অবদানকে মুক্তিযোদ্ধাদের সমান হিসেবেই মূল্যায়ন করবো। শুধু যারা দেশের বাইরে গিয়ে গান করেছেন অর্থাৎ প্রবাসে শরণার্থী শিল্পীরাই গান গেয়েছেন তা নয়। অরক্ষিত বাংলাদেশে যারা অবস্থান করেছিলেন তাদের ত্যাগ, তাদের অনিশ্চিত জীবনে তারা যেভাবে শত্রুকে পাশে নিয়েও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন, তাদের অবদানকেও মূল্যায়ন করতে হবে। অরক্ষিত বাংলাদেশে কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না প্রশাসনের বিপক্ষে যাওয়া। তারা দেশে থেকেই কৌশলে নিজের জীবন বাঁচিয়েছে, আবার মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে অত্যন্ত ঝুঁকির মাঝেও কাজ করে গেছেন। শিল্পীরা ২৫ মার্চ রাত পর্যন্ত পাকিস্তান শাসনের বিরুদ্ধে গানে গানে সোচ্চার ছিল। তাদের কিছু অংশ ভারতে শরণার্থী হয়েছিল আর কিছু অংশ দেশেই অবস্থান করেছে। সবার পক্ষে পরিবার পরিজন ছেড়ে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। তাদের জীবন ছিল প্রতিমূহুর্তে মৃত্যুর আশংকার মাঝে। আর যারা দেশান্তরী হয়েছেন তাদের অন্তত: মৃত্যুর ঝুঁকি ছিল না। তাদেরও অনেক কষ্ট করে শরণার্থী জীবনের অনিশ্চয়তার মাঝে জীবন কাটাতে হয়েছে। সেটাও কোনোদিক থেকেই কম ছিল না। আবার বিদেশি শিল্পীরাও মুক্তিযুদ্ধে সহযোগীতার জন্য যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন তাকে আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধা নিয়ে স্মরণ করি। সুতরাং তাদের অবদান অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তারাও মুক্তিযোদ্ধা।

৫. মুক্তিযুদ্ধকালে যত গান লিখা হয়েছে, আর সুর করা হয়েছে শিল্পীদের কণ্ঠে তা অনন্য অসাধারণ হয়ে ঝংকৃত হয়েছে। পুরোনো গান ও নতুন সৃষ্ট গান সবগুলোই আমাদের শক্তি ও প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

৬. আমরা সবাই একসাথে কাজ করেছি। রূপান্তরের গানের স্ক্রীপ্ট লিখেছি আমি। সাথে ছিলেন মুস্তফা সারোয়ার, হাসান ইমাম, ওয়াহিদুল হক, সনজিদা খাতুন, কামাল লোহানীসহ আরো অনেকেই একসাথে কাজ করেছি। মুক্তির গানে একটি স্কোয়াডকে দেখানো হয়েছে, আসলে এমন কয়েকটি স্কোয়াড ছিল। যারা ভ্রাম্যমান স্কোয়াড হিসাবে ট্রাকে ট্রাকে করে বিভিন্ন স্থানে দর্শনীর বিনিময়ে গান করেছে, আবার প্রচার কাজও চালিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, যা জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে শিল্পী, গীতিকার, সুরকার, ক্রীপ্ট লেখকরা মুক্তিযুদ্ধের সময়োপযোগী করে স্ত্রীপ্ট লিখে পাঠাতেন তা সীমান্তের ওপারে প্রচার হতো। লেখক সৈয়দ সামসুল হক এর লেখা স্ক্রীপ্ট বিচিত্রার শাহাদাত চৌধুরী অত্যন্ত গোপনে তা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। তাদের সকলের প্রচেষ্টাতেই মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে বাংলাদেশ একমাত্র দেশ, যা নয় মাসের যুদ্ধে স্বাধীন হয়েছে। যে যুদ্ধ কোনো অভিধান মেনে হয় নাই। নিরস্ত্র, চাষা, ভুষা, কামার, জেলে, অশিক্ষিত নারী-পুরুষ, নৌকার মাঝি সবাই দুর্বার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বলেই বাংলাদেশ আনতে পেরেছিল স্বাধীনতা।

মুনতাসির মামুন

১. আমি তখন অবরুদ্ধ বাংলাদেশেই ছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ছি। অনেকবার পাকিস্তানি সৈন্যের মুখোমুখি হয়ে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছি। অত্যাচার করেছে। আমি একসময়ে ঢাকা ছেড়ে চিটাগাং চলে যাই। শেখ মুজিবের আদর্শ, ত্যাগ, বাঙালির মুক্তির প্রশ্নে অটল অবস্থান সবকিছু বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণীত করেছে।

২. আমাদের ঐ সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতারের গান সবাইকে দারুনভাবে অনুপ্রাণীত করতো। প্রতিটা গান, কথা ও সুর ছিল দারুন অনুপ্রেরণার উৎস।

৩. পূর্ব বাংলায় বসে মুক্তিযুদ্ধের গান প্রকাশ্যে লিখা, সুর করা বা গাওয়ার সুযোগ ছিল না। অনেক শিল্পী পূর্ব বাংলায় থেকেছেন তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেই ছিলেন। ঐ সময় সব ছেড়ে তাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয় নাই। তাই বলে তারা রাজাকার ছিলেন বা পাকিস্তানিদের সাথে সহযোগীতা করেছেন বিষয়টা তেমন ছিলনা। এখানে অনেকেই পাকিস্তান সরকারের চাকরি করেছে কিন্তু গোপনে পাকিস্তানিদের বিরোধীতা করেছে সর্বান্তকরনে। প্রতিটি মুহূর্ত তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কিছু করার চেষ্টা করেছে। সবাই ছিল পাকিস্তানিদের সন্দেহের আওতায়। তাই যে যতটুকু করেছে প্রানের টানে করেছে। অবরুদ্ধ বাংলার মানুষ পাকিস্তানিদের বিপক্ষে মানসিকভাবে অবস্থান নিয়েছিল। ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা দেশে এসে অপারেশন পরিচালনার জন্য স্থানীয় বাঙালিদের সহযোগীতা পেয়েছে। সুতরাং সবাই প্রতিটি মুহূর্ত আতংকের মধ্যে থেকেও যার যার অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগীতা করেছে।

আর যারা শরণার্থী হয়েছিলেন তারা অন্তত জীবনের নিশ্চয়তাটুকু পেয়েছিলেন। স্বাধীনবাংলা বেতারের প্রচারিত গান যা অবরুদ্ধ বাংলায় বাঙালিকে ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাদের প্রচারণার কারনেই পূর্ব বাংলা এবং বর্হিবিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা জানতে পেরেছে বিশ্ববাসী।

১১টি সেক্টরে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছে মুক্তিযোদ্ধারা। স্বাধীনবাংলা বেতারেও যুদ্ধ হয়েছে, শিল্পীদের ভ্রাম্যমান স্কোয়াড বিভিন্নভাবে গানের মধ্য দিয়ে যে যুদ্ধ করেছে তা কোনো অংশেই কম নয়। তাদেরকেও একটা সেক্টরের মর্যাদা দেয়া উচিত। সেখানকার গীতিকারদের লিখা ও সুরকারদের সুর করা গান বাংলাদেশের দুঃসহ বাস্তবতা তুলে ধরেছে। এসব বাদ দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস কখনই লিখা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র অস্ত্রদিয়েই যুদ্ধে জয় করা যায় না। প্রতিটি শ্রেণি পেশার মানুষ প্রানীত হয়েছিল বলেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার লড়াইয়ে বাঙালি জয়ী হয়েছে।

শুধু বাঙালি শিল্পীদের কথা বললেও পুরাটা বলা হবে না। ভারতের শিল্পী, প্রবাসের শিল্পী যেমন রবী শংকর, জোয়ান বায়েজ প্রমুখ শিল্পীরা যেভাবে আমেরিকার সরকারের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে আমেরিকার সাধারণ মানুষকে সোচ্চার করেছিল তা বিরাট ভূমিকা রেখেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে।

৪. মুক্তিযুদ্ধের শিল্পী, সুরকার, গীতিকার যারা গান লিখেছেন, যারা সুর করেছেন আর শিল্পীদের কণ্ঠে সেই গান মানুষকে নতুন আশায় জাগিয়েছে। যুদ্ধদিনের ভয়ংকর নির্মম বাস্তবতা থেকে বাঙালি কিছুক্ষনের জন্য হলেও শান্তি পেয়েছে, স্বস্তি পেয়েছে, সাহস পেয়েছে। শিল্পীদের স্বার্থকতা এখানেই। গান গাওয়া ছাড়াও তারা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ব্যাপক প্রচার কাজ চালিয়েছে। ত্রান সংগ্রহ করেছে আর প্রবাসী সরকারের মুক্তিযুদ্ধ তহবিলে অর্থসাহায্যের যোগান দিয়েছে।

৫. বিশেষ কোনো গান নয় সব গানই ভালো লাগতো। আজও সেসকল গান আমাদের যুদ্ধদিনের শিহড়ন জাগায়। সেই দিনের কাছে ফিরিয়ে নেয়।

৬. আমরা যারা অরক্ষিত বাংলাদেশে ছিলাম তারা গোপনে সবাই সবাইকে সহযোগীতা করেছি। প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কোনো কিছু করার সুযোগ ছিল না। প্রতিক্ষন, প্রতিমুহূর্ত আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে চিন্তা করেছি। পাক সেনাদের ঘৃনা করেছি মনে প্রানে। যখন মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে অপারেশন শুরু করে তখন সকলেই তাদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছে। কেউ তথ্য দিয়ে, কেই চিরকুট পাঠিয়ে, মা বোনেরা অতিরিক্ত রান্না বা খাবার ব্যবস্থা করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অত্যন্ত গোপনে কাজ করেছেন। বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ ছিল বলেই পাক হানাদার বাহিনী একসময়ে কোনঠাসা হয়ে পড়ে। জয় হয় মুক্তিপাগল বাঙালির।

আসাদুজ্জামান আরজু

গেজেট নং

১. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা আন্দোলন ও পাশাপাশি ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

২. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রত্যেকটি গান স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রচারিত হতো। তা দারুনভাবে আমি ও আমাদেরকে প্রভাবিত করেছে এবং যুদ্ধাস্ত্রের মত মনে হয়েছে।

৩. প্রত্যেক শিল্পীর গানই মুক্তিযুদ্ধকে প্রভাবিত করেছে। মনে হয়েছে একেকটা গান এক একটি বুলেট।

৪. সংশ্লিষ্ট শিল্পী, সুরকার, গীতিকার এর মুল্যায়ন একজন মুক্তিযোদ্ধার সমান। যে মুক্তিযোদ্ধাটি অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করেছে তার চেয়ে কোনো অংশ কম নয়।

৫. সরদার আলাউদ্দিন এর ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি, একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি, আপেল মাহমুদের জ্বালাময়ী গান তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর যা দারুনভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে।

৬. ভারতীয় শিল্পী, দেবদুলাল বন্দোপধ্যায়ের খবর পাঠ ও অন্যান্য শিল্পী এবং সুরকার, গীতিকারদের গান এবং এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্র, ইংরেজ গায়ক জন হ্যাড়িসন এদের গান ভালো লাগতো।

মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সামাদ পিন্টু

সেক্টর নং ৭ ও ৮

গেজেট নং-২০৪৮

১. পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনগুলোর সাথে এমনিতে সম্পৃক্ত ছিলাম। অতপর '৭১ এর ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ভাষনের মাধ্যমে জনতাকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার যে আহবান জানান তাতেই মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়ে ছিলাম।

২. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সে সময়ে নিয়মিতভাবে দেশাত্ববোধক সহ নানা প্রকার গান পরিবেশন করা হত। তা ছাড়া বিভিন্নভাবে শিল্পীদের গান মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে নতুন প্রানের সঞ্চার করত।

৩. শিল্পীদের সঙ্গীত নানা ভাবেই মুক্তিযুদ্ধকে প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত করেছিল।

৪. সঙ্গীত সংশ্লিষ্টদের তৎকালিন অবদানকে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের মতনই মূল্যায়ন করে থাকি।

৫. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে আজকের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' ও 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট' গানগুলো আমাকে প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিল।

৬. যুদ্ধকালীন সময়ে অনেক বিদেশি শিল্পীরাও গান গেয়ে এবং ফুটবল খেলোয়ারেরা প্রীতি ফুটবল খেলে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থসংগ্রহ করেছিল।

মোঃ শাহজাহান কবির বীরপ্রতীক

নৌ কমান্ডো

গেজেট নং: ৫৫২

১. ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে যে বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি হয় তাহা স্কুল কলেজে পড়া অবস্থায় আমার মনের গভীরে দাগ কাটে এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দেন, সেই ঐতিহাসিক ভাষনে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে স্বাধীন করার জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি।

২. মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অন্যান্য কবিদের দেশাত্ববোধক গান আমাকে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করতো।

৩. শিল্পীদের দেশাত্ববোধক গানগুলি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেছিল।

৪. আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সঙ্গীত শিল্পীদের অবদান মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

৫. বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অন্যান্য কবিদের গান আমাকে যুদ্ধ করতে শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছিল।

৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশেষভাবে সুইসাইডর নৌ-কমান্ডোরা এ্যাকশানের গোপনীয়তার স্বার্থে সবসময় সংস্কৃতি জগতের শিল্পীদের সহিত অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যায় সবসময় সহযোগিতা পান নাই। তবে ১৫ই আগস্ট এর মধ্যরাতে অপারেশন জ্যাকপটের সিগনাল সংকেত এর জন্য যে দুইটি গান গেয়েছিলেন ভারতের প্রখ্যাত কণ্ঠ শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও পংকজ মল্লিকের কন্ঠে সেই দুইটি গান হলো ১) আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান ২) আমার পুতুল আজকে যাবে প্রথম শশুরবাড়ি। এই দুজন শিল্পীর সহযোগিতা পেয়েছি বলে আমরা ৪টি বন্দরে একজোটে ২৬টি দেশি বিদেশি জাহাজ গভীর পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর জলপথে চলাচল বন্ধ করে দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিলাম। এই দুইজন শিল্পীর অবদান অবিস্মরণীয়।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোঃ মাহমুদুল হক *এনডিসি*

১. পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ মার্চ, ৭১ রাতে ইতিহাসের মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের পর বাঙালির ঘুম হারাম হয়েছিল। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি যখন ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনীর আক্রমনে দিশেহারা, শোকাতুর, কামানের গোলায় পুলিশ লাইন ভস্মীভূত এবং, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর এর কিছু বঙ্গ শার্দুল সম্পূর্ণ অন্ধভাবে স্ব স্ব দায়িত্বে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছিল। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রতিরোধের সংগ্রামে। সেই সাথে যখন শুনতে পাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা, তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি। তাই জাতিকে আবার উঠে দাঁড়ানোর গভীর আত্মবিশ্বাসে শত্রুর উপর আঘাত হানাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত হই।

২. স্বাধীনতা যুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে মনোবল ও প্রেরণা সঞ্চয়ের জন্য গানের ভূমিকা ছিল অবিস্মরনীয়। শিল্পীদের ক্ষুরধার গান মুক্তিযুদ্ধের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সর্বাত্মকভাবে। শিল্পীর গান সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী বাঙালির মনোবলকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য সর্বাত্মক কাজ করেছে। আমি যেহেতু বাঙালি। গানের বানী, প্রতিটি শব্দ আমাকে সাহস ও শক্তি এনে দিয়েছে।

৩. শিল্পীদের চিরায়ত গানসমূহ মুক্তিযুদ্ধকে এতই প্রভাবিত করেছে যে, মনকে চাঙ্গা করে দেয়। মনে সাহস সঞ্চার হয়। যা ছিল সব সময় চিরন্তন আবেদনবাহী।

৪. সমর দাসের নেতৃত্বে কোরাশ পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল, আপেল মাহমুদের সুরারোপিত একক কণ্ঠে গীত একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি এবং আপেল মাহমুদ ও স্বপ্না রায়ের দ্বৈত কণ্ঠে গীত এক সাগর রক্তের বিনিময়ে-এ গানগুলো ছিল চিরন্তন আবেদন বাহী।

৫. সমর দাসের 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল', আপেল মাহমুদরে 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি'। শাহনাজ রহমত উল্লাহর কণ্ঠে আব্দুল লতিফ রচিত ও সুরারোপিত গান 'সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা, সোনা নয় ততখাঁটি...', পুঁথি পাঠ, শাহ বাঙালি, শিল্পী আব্দুর জব্বার, সেকান্দার আবু জাফর ইত্যাদি সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিদের সহযোগিতা পেয়েছিলাম।

সার্জেন্ট (অবঃ) কমান্ডার আবু সাঈদ

গেজেট নং- ৪৯৬২

১. জাতীর জনক বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ হইয়া মাতৃভূমি রক্ষার স্বার্থে অনুপ্রাণিত হইয়া ছিলাম।

২. মুক্তিযুদ্ধের সময় গান আমাদের উৎসাহিত ও আনন্দ দিত। কবি নজরুলের বিদ্রোহী গানে শক্তি দিয়েছিল; উৎসাহিত ও প্রভাবিতও করেছিল।

৩. 'কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙ্গে ফেল, কররে লোপাট', আঃ জাব্বার ও আপেল মাহমুদের গানে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ যোগাত।

৪. 'চল, চল, চল উর্দ্ধগগনে বাজে মাদল, অরূন প্রাতের তরুন দল' যুদ্ধ কালিন শক্তি ও প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে।

৫. স্বাধীনতাযুদ্ধের স্বপক্ষের সকল সাংস্কৃতি জোটের শিল্পীরা সহযোগীতা করিয়াছেন।

আবুল কাশেম চৌধুরী

গেজেট নং-৬৩০২

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে হত্যাকাণ্ড দেখে।

২. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সব দেশাত্ববোধক গান আমাকে প্রভাবিত করে।

৩. শতভাগ প্রভাবিত করেছিল।

৪. একজন মুক্তিযোদ্ধাকে যেভাবে মূল্যায়ন করা উচিৎ ঠিক সেভাবে আমি মূল্যায়ন করি।

৫. কারার ঐ লৌহ কপাট।

৬. সংস্কৃতি জগতের কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আমার সরাসরি কোনো যোগাযোগ ছিল না।

ফকির শেখ জিয়া উদ্দিন আহম্মেদ

গেজেট নং-১৯২৪

১। শত শত বছরের অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, রাষ্ট্রীয় শোষণ অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি পূর্ব হতেই বিক্ষুব্ধ ছিল। প্রয়োজন ছিল শুধু বাঙালি জাতীয়তাবোধের আলোকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের নিমিত্তে সবাইকে একজোট হয়ে পাকিস্তানি কুশাসনের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া। ঠিক সেই মুহূর্তে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার স্থপতি, বাঙালি জাতির পিতা, বাঙালির জাতিসত্বার আলোকে বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের বজ্র কণ্ঠের দীপ্ত শপথের পর আমরা পূর্ব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করি। কোড করছি- "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি; তোমাদের যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং আরো- এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

২। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের গান দেশ প্রেমরে স্ফ্যুরন ঘটানো ছাড়াও গভীর মমত্ববোধ, মানবিক চরম দায়িত্ববোধ, সকল মানুষকে পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসার বহি:প্রকাশ ঘটায়।

৩। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শিল্পীদের সঙ্গীত স্বকীয়, মুক্ত, স্বাধীন ভূখণ্ড মানচিত্র, জাতীয় সঙ্গীত, শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন দ্বারা জাতীয় ঐক্যের সমন্বয়ে নতুন ভাবের ও চিন্তার জন্ম দিয়েছে। মোট কথা বলা যায় শিল্পীদের সঙ্গীত মুক্তিযুদ্ধকে শতভাগ তারুণ্য- অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

৪। মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীত সংশ্লিষ্টতার (শিল্পী, সুরকার, গীতিকার) অবদান অতুলনীয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন গান, কবিতা, নাটক, দীর্ঘ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখতে ও পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে আগুয়ানভাবে তেজোদীপ্ত শপথে যুদ্ধ করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলো।

৫। (i) মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি।
(ii) পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল।
(iii) ভয় কি মরনে রাখিব সন্তানে মাতঙ্গী সেজেছে সমররঙ্গে।
(iv) সালাম সালাম হাজার সালাম সকল শহীদের স্মরণে।

৬। (i) আপেল মাহমুদ
(ii) তিমির নন্দী
(iii) আব্দুল জব্বার
(iv) কামরুল আলম খান খসরু

তারা আমাদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগীতা করেছে যেমন : খাদ্য দিয়ে, গুপ্তচরবৃত্তি করে, মাঝে মাঝে গান গেয়ে, অর্থনীতি দ্বারা।

Group Interview (৫ জন)

বর্তমান শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা উপজেলার পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা

১. ঢালি মুশাররফ হোসেন, পিতাঃ আবদুস সোবহান ঢালি, গেজেট নাম্বার :৩২৬

২. ঢালি মোহাম্মদ মিন্টু, পিতাঃ সফিক বক্স ঢালি, গেজেট নাম্বার : ৩১১

৩. আবদুর রব বেপারী, পিতাঃ সুলতান আহমদ, গেজেট নাম্বার : ৩৩৪

৪. ছালাউদ্দিন আতশকর, পিতাঃ হাফিজ উদ্দীন, গেজেট নাম্বার : ৪১৬

৫. মোঃ আলতাফ হোসেন আকন্দ, বাবাঃ আনোয়ার হোসেন, গেজেট নাম্বার : ৪১৮

১। ক) আমার ভাই করাচীর মালির ক্যান্টেনমেন্টে ছিল। ভাইকে পাব না ফিরে এই ক্রোধের সাথে ছিল শেখ মুজিবের আহবান। সেই আহবানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে যাই। পাকিস্তানিদের অন্যায় অপশাসনের জবাব দেয়ার জন্য আর আমাদের প্রতি বৈষম্যের অবসান ঘটাতে বঙ্গবন্ধুর ডাকে যুদ্ধের জন্য ভারতে যাই।

খ) বঙ্গবন্ধুর ডাকে

গ) ঐ

ঘ) ঐ

ঙ) ঐ

২। ক) মুক্তিযুদ্ধের গান আমাদের উজ্জীবিত রেখেছে। ঐ সময়ের গান আমাদের মানসিক শক্তি যোগাতো। গানের পাশাপাশি স্বাধীনবাংলা বেতারের ‘ছক্কা মিয়া’ চরিত্র আর ‘চরমপত্র’ ছিল অসাধারণ।

খ) গান প্রেরণা যোগাতো, আমাদের ওখানে ডাবল ফায়ার হতো। সময় পেতাম না, যখন সময় পেতাম তখন গান শোনার চেষ্টা করতাম।

গ) একটি মুজিবরের থেকে, এই শিকল পড়া ছল মোদের, চলচল চল এই গান গুলি আমাদের ভীষণ ভালো লাগতো।

ঘ) আবদুল জব্বারের গান ছালাম ছালাম, তারপর রথীন্দ্রনাথ রায়ের গান অনেক বেশি ভালো লাগতো।

ঙ) গ্রাম্য বয়াতীদের গানও ভালোলাগতো। বরিশালে একজন গায়ক যার নাম মনে নাই, তিনি গেয়েছিলেন ‘মুক্তিবাহিনীর দল, বুক ফুলাইয়া চল, সামনে গণ্ডগোল।’ বরিশালের অপারেশনের সময় স্থানীয় শিল্পীর কণ্ঠে এ গান শুনে উৎসাহ বেড়ে যায় বহুগুন। তাদের অবদান আমাদেরই মতো, কোনো অংশেই কম না।

৩। ক) অবশ্যই শিল্পীদের গান মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ দিয়েছে।

খ) শিল্পীদের গান শুনতে না পেলে কষ্টের সেই জীবন থেকে অনেক যোদ্ধাই পালিয়ে যেতো। কারণ গান ছাড়া সেখানে প্রেরনার আর কোনো উৎস ছিল না।

গ) গ্রেনেড চার্জের দিন আমরা সময় নিয়ে গান গেয়ে নিজেরাই নিজেদের সাহস দিতাম, কেননা তখন গান শোনার অন্য কোনো উপায় ছিল না।

ঘ) পাতার বাঁশী বাজাতেন কুমিল্লার একজন ১৫/১৬ বছরের যোদ্ধা, অদ্ভুত সুরে। সে প্রতিটি গানের সুর তুলতে পারতো। আমরা তার বাঁশীর সুরে ভীষণভাবে বিনোদন পেতাম।

ঙ) ইয়ুথ ক্যাম্পে আমাদের এলাকার ছেলে মুক্তিযোদ্ধা কামাল সে খুব ভালো গান গাইতো। শিল্পীদের গাওয়া গানগুলো সে অসাধারণ সুরে গাইতো। আমরা খুব উদ্বুদ্ধ হতাম তার গায়কীতে। ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু যখন ভেদরগঞ্জ এ রাজনৈতিক সমাবেশে আসেন তখন এই কামাল তার গান শুনিয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুগ্ধ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালেও তিনি তার গান দিয়ে যোদ্ধাদের মুগ্ধ করেছেন। অপরাজনীতির কারনে এরশাদ শাসনামলে তাঁর মৃত্যু হয়।

৪। ক) শিল্পীরাও মুক্তিযোদ্ধা,

খ) সুরকার, গীতিকার ও শিল্পীদের অবদান কোনো অংশেই কম না।

গ) বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা শুনে সকল বাঙালি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেখানে শিল্পী, অশিল্পী ভিন্নভাবে দেখার সুযোগ নাই। সবাই যুদ্ধ করার জন্যই নেমেছিল।

ঘ) তারা হাতে অস্ত্র না নিলেও তাদের কণ্ঠ ছিল অস্ত্র। যারা গান লিখেছেন তাদের গানের কথা ছিল যুদ্ধের অস্ত্র। আর যারা সুর দিয়েছেন তাদের অস্ত্র ছিল গানের সুর। সবাই তাদের অস্ত্র ব্যবহার করেছে যুদ্ধের কাজে।

ঙ) গানের কথা অনেকেই মনে করতে পারেন নাই। কিছু কথা মনে হলে নিজেরা গুন গুন করে গেয়ে উঠেছেন। সবারই বয়স ৭০-৭৫ বছর বা তার অধিক। আব্দুল জব্বার, রথীন্দ্রনাথ রায়, ইন্দ্র মোহন রাজবংশী এদের গান তাদের বেশি মনে দাগ কাটতো। সব শিল্পীর গানই তারা সমান ভালোলাগা নিয়ে শুনেছেন যা তাদের বক্তব্যে উঠে আসে।

৫। ক) অসংখ্য গান যার কথা মনে নাই।

খ) ঐ

গ) ঐ

ঘ) চল চল চল, তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর, একটি ফুলকে,

ঙ) শিকল পরা ছল।

৬। ক) প্রত্যক্ষভাবে কোনো শিল্পীর গান শুনি নাই।

খ) রেডিওতে শুধু শুনেছি।

গ) স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার সুযোগ পেলে গান শুনতে পাই।

ঘ) ঐ

ঙ) ঐ।

সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য প্রশ্নমালা

১। গানের জগতে আসার শুরুটা কেমন ছিল?

২। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি শিল্পীদের জন্য গানের পরিবেশ কেমন ছিল?

৩। সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে বাঙালি সংস্কৃতি আপনাকে কতটা আকৃষ্ট করে বা প্রভাবিত করে?

৪। বাঙালি শিল্পী হিসেবে ঐ সময়ে কোনো বিরূপ পরিবেশের সম্মুখিন হয়েছিলেন কখনও?

৫। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন কিভাবে?

৬। আপনাদের পরিবেশিত গান মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা ও বাঙালিদের কতটা অনুপ্রাণীত করতো?

৭। যুদ্ধকালীন কোনো স্মরণীয় ঘটনা বর্ণনা করুন?

৮। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন বিষয়টিকে কিভাবে অনুভব করেন ও মূল্যায়ন করেন?

৯। সেই সময় আপনাদের সাথে আর কোন্ কোন্ সঙ্গীত শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মী যুক্ত ছিলেন? তাদের ভূমিকা কি ছিল?

সনজিদা খাতুন

১। পারিবারিক পরিবেশ ছিল সাংস্কৃতিক। বাবা কাজী মোতাহার হোসেন। বড় ভাই, বড় বোন তারা গান করতেন, সেতার বাজাতেন, সঙ্গীতে আমার প্রথম শিক্ষাগুরু ঠুমরী গায়ক হেকিম মোহাম্মদ হোসেন।

২। বাঙালি শিল্পীদের জন্য রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়ার পরিবেশ ছিল না। সরাসরি বাধা দেয়া হয়েছে তাও না কিন্তু বাতাসে একটা নিষেধ ভাসতো।

৩। সঙ্গীত বাঙালি সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অংশ। সঙ্গীতের সংগঠক হিসেবে বাঙালি সংস্কৃতির উন্নয়নে প্রবলভাবে যুক্ত হয়েছিলাম। রবীন্দ্র সঙ্গীতের শান্তরস আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে।

৪। ছায়ানট সংগঠন করতে গিয়ে পাকিস্তান আমলে আমাকে শাস্তিমূলক বদলীর আদেশ মাথা পেতে নিতে হয়েছিল। রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ঢাকায় এসে আমি ছায়ানটের অনুষ্ঠানগুলো করে যেতাম। সরকারি কঠিন 'নযরদারীর' মধ্যে আমাকে থাকতে হয়েছে। ঢাকায় গিয়ে কোথায় থাকছি আবার এখানে ফিরে এসে তাদের জানাতে হতো যে আমি এসেছি। আমার নামে অনেক মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছিল। কলেজ অধ্যক্ষও আমার বিরুদ্ধে অসত্য রিপোর্ট দিত। এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্য দিয়েই আমি আমার কাজ করে গেছি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে বহু আগে। সাংস্কৃতিক স্বাধীকার আদায়ের আন্দোলন শুরু হয়েছে পাকিস্তান শাসনামলে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে হয়েছে অনেক বাঁধা অতিক্রম করে। আমি তখন সরকারি চাকুরে। আমাকে সতর্ক থাকতে হতো। ছায়ানটের শুরু থেকেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। আমাদের অনুষ্ঠানগুলো হতো অসাম্প্রদায়িক। ১৯৬৪ তে প্রথম ১লা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। ১৯৬৭ সাল থেকে তা রমনার বটমূলে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আমরা ছায়ানট থেকে করতাম শরতের গান, বসন্ত উৎসব, বর্ষার গান, নজরুল জয়ন্তী, রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী, রবীন্দ্রনাথের প্রয়ান দিবস। অনুষ্ঠানগুলো ছিল বেশিরভাগই ঋতুভিত্তিক। সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। এভাবেই ছায়ানট বাঙালিত্বের চেতনা জাগিয়েছে।

৫। আমরা বাঙালি সংস্কৃতির প্রেমেই মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। তাছাড়া ২৫ মার্চের আক্রমণ শুরু হতেই জানতে পারি আমরা পাকিস্তানের এলিমিনেশন লিষ্টে আছি। তারপর আমাদের দেশ

ছেড়ে পালাতে হয়েছে। কোলকাতায় গিয়ে বাংলাদেশের শিল্পীদের একত্র করে দেশাত্মবোধক গানের মহড়া করিয়েছি। প্রথম অনুষ্ঠান ছিল আমাদের রবীন্দ্রসদনে (২) দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠান। একমাসের দীর্ঘ মহড়া শেষে আমাদের শিল্পীরা তৈরি হয়ে দুইদিনের সেই অনুষ্ঠান করেছে। তখন মহড়া চলাকালীন নজরুল গীতি শিল্পী ডালিয়া নওশিন অনেক কষ্ট করেছে। ডালিয়া পরিবারের সাথে থাকত। ওকে সাথে নিয়ে মানুষের ভীরে আগলে রেখে মহড়া স্থানে আসতাম। ওর অত্যন্ত সুরেলা গলা। খুব মৃদুস্বরে ডালিয়া গাইতো। ডালিয়ার গাওয়া গান আমি উচ্চস্বরে গেয়ে সবাইকে সুর ধরিয়ে দিতাম। বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির আয়োজনে আমরা ১৪৪ লেনিন স্মরণীতে মহড়া করতাম। বাড়িটি অনেক পুরাতন ছিল। ভাঙ্গা সিড়ি দিয়ে উঠতে ভয় পেতাম। সিঁড়িগুলো নড়তো। প্রথম দিকে ডালিয়াকে নিয়ে অনেক পরিশ্রম করে গানগুলো করতে হয়েছে। গণসঙ্গীত শিল্পী শেখ লুতফর রহমান গানগুলো শিখিয়েছেন। শাহীন, বেনু বেশ পরে গেছে।

৬। শিল্পীদের গান অনেকভাবে অনুপ্রাণীত করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দিতে আর শরণার্থী শিবিরে আশ্রিতদের মানসিক শক্তি যুগিয়েছিল শিল্পীদের গান। মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনীর তাণ্ডব আর পাশবিকতা শিল্পীরা গানে গানে প্রচার করতো। শিল্পীদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান করতে হতো। সকালের দিকে অনুষ্ঠান হলে আমরা একটু নরম সুরের গান দিয়ে শুরু করতাম। যেমন ভৈরব, ভৈরবী, রামকেলি মূলতঃ এই রাগের গানগুলো করতাম। তবে প্রয়োজনে আমরা সব গানই সবসময় পরিবেশন করতাম।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল রূপান্তরের গান। প্রতিটি অনুষ্ঠানই হতো সন্ধ্যায়। সেখানে ভারতীয় শিল্পী জ্যোতিরীন্দ্র মৈত্র ও বিনয় রায় মিলে শিল্পীদের গান শিখিয়েছেন। তাদের শিখানো গানসহ আরো অন্যান্য গান শিল্পীরা সেখানে পরিবেশন করেছে। শিল্পীদের গানে শ্রোতা দর্শক সবাই খুব অনুপ্রাণীত হতো।

৭। ১৬ ডিসেম্বর রান্না ঘরে কাজে ছিলাম। কে যেন একজন বললো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। শুনে আমি উচ্চস্বরে কেঁদে উঠেছিলাম, শরণার্থী জীবনের কষ্টের কথা মনে করে সেভাবে কেঁদেছিলাম। কেন অমন হয়েছিল জানিনা, নয় মাসের শরণার্থী জীবনের অসহায়ত্ব সেদিন বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল।

৮। স্বাধীন আমরা হব, এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য ছিল। ভাবতে পারি নাই এত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাব। নিপীড়ন ছিল এত বেশি যার কারণে নিবেদিত ছিলাম অনেক বেশি

আবদুল জব্বার

১। মায়ের কাছে সঙ্গীতের হাতে খড়ি।

২। উর্দু গানের পাশাপাশি ঐতিহ্যগতভাবে বাংলা গানের প্রকাশ বা প্রচারের সুযোগ কম ছিল। নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সংগীত বা বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির গানগুলো গাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বিধি-নিষেধ ছিল।

৩। বাঙালি সংস্কৃতি বাঙালির কাছে সহজাত ব্যাপার। বাংলার সংস্কৃতি দিয়ে আমরা প্রভাবিত হব- সেটাই স্বাভাবিক। আজকে আমরা এর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে আছি। একে নতুন প্রজন্মের কাছে বেশি করে উপস্থিত করা দরকার বা নিয়ে যাওয়া দরকার।

৪। আমরা বাঙালি শব্দটি উচ্চারণ করতে পারতাম না। সেটা কাটাতে আমরা অনেক সংগ্রাম করি। পাকিস্তানের শুরুতেই সেই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল—তা শেষ হয় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে।

৫। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। ওটার ওপর আর কোনো অনুপ্রেরণা হয় না। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নেতার উদাত্ত আহ্বানে আমরা ভয়কে জয় করে যুদ্ধে অংশ নিলাম। আমাদের সেই যুদ্ধ ছিল কণ্ঠ যুদ্ধ যা দিয়ে রনাঙ্গনের যোদ্ধাদের উৎসাহ দিয়েছি।

৬। এর প্রভাব ছিল অসাধারণ। 'ছালাম ছালাম হাজার ছালাম', 'হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে' গানগুলো শ্রোতাদের কতটা আবেগে ভাসাতো তা সেই সময় যেমন আজও তেমনি এ প্রজন্মকেও সমানভাবে আপ্লুত করে। স্বাধীন বাংলা বেতারে আমার কণ্ঠে প্রথম গান ছিল 'অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা' টি এইচ সিকদারের লিখা ছিল গানটি। 'একটি কথা বলি', 'শোন একটি মুজিবরের থেকে' গানটি ভারতের শিল্পী অংশুমান রায় গেয়েছেন, প্রথম দিকে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত এই গানটি শুনে আমি সহ অনেকেই ভেবেছিলাম স্বাধীন বাংলা বেতার ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত। 'মুজিব বাইয়া যাওরে' গানটি শুনে পরে বাঙালিরা বুঝেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত।

৭। আমি এবং শিল্পীরা মিলে 'বিক্ষুব্ধ বাংলা' বলে একটা শিল্পী গোষ্ঠী তৈরি করি। এর মাধ্যমে অনেক অনুষ্ঠান করেছি তহবিল সংগ্রহের জন্য। শরণার্থীদের সাহায্য করেছি। খেয়ে না খেয়ে গান করেছি। দিন-রাত নির্ঘুম কাটিয়ে গান করেছি। সেসব দিন ভুলার নয়।

৮। আমি ব্যক্তিগতভাবে মূল্যায়ন করি কিন্তু আজকে যা দেখছি তা আমাদের লক্ষ্য ছিল না। আজকে এক শ্রেণির মানুষ অনেক ভালো আছেন আর শিল্পীরা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের

সাথে সরাসরি জড়িত ছিল তাদের অনেকেই কষ্টে আছেন। তাদের মূল্যায়ন হওয়া দরকার। আমি নিজে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক, ১৯৮০ সালে একুশে পদক, ১৯৯৬ সালে স্বাধীনতা পদক, মাদার তেরেসা পদক, আফ্রিকার জননেতা নেলসন ম্যান্ডেলা পদক, ভাষাণী পুরস্কার, জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ অনেক পুরস্কার পেয়েছি। সেদিক থেকে আমি তৃপ্ত। কিন্তু অর্থকষ্ট আছে আমাদের।

৯। **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের যে সকল শিল্পীরা আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, পাশে থেকেছেন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কল্যাণী ঘোষ

- শব্দসৈনিক

পূর্ণ নাম, ডাক নাম	:	কল্যাণী ঘোষ (ইরু)
মাতা	:	প্রয়াত লীলাবতী চৌধুরী
পিতা	:	প্রয়াত ইঞ্জিনিয়ার মনমোহন চৌধুরী
স্বামী	:	ইঞ্জিনিয়ার সুরঞ্জন ঘোষ
জন্মস্থান	:	১৬ রহমতগঞ্জ, প্রবাল সড়ক, দেওয়ানজি পুকুর লেন, চট্টগ্রাম।
জন্মতারিখ	:	৫মে ১৯৪৬ ইং
স্থায়ী ঠিকানা	:	ঐ
আদি নিবাস	:	বিনাজুরী, রাউজান, চট্টগ্রাম।
প্রাথমিক শিক্ষা	:	জামালখান কুসুম কুমারী বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ১৯৫২-১৯৫৪।
হাই স্কুল	:	১৯৫৬ সালে ডা. খাস্তগীর গার্লস হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি এবং ১৯৬২ সালে এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ।
কলেজ	:	১৯৬৪ সালে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট এবং ১৯৬৬ সালে বি.এ পাশ।
বিশ্ববিদ্যালয়	:	চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচ হিসেবে বাংলা সাহিত্যে এম.এ (১৯৬৭-৬৮)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরি সায়েন্সে এক বছর অধ্যায়ন (১৯৭৫-৭৬)।
পেশা	:	চট্টগ্রামের পাথরঘাটার সেন্ট প্লাসিড্স হাইস্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে চাকরি জীবন ➲ শুরু (১৯৭০-৭১)। স্কুলে শিক্ষকতা-কালীন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান। পরবর্তীতে কোলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান (১৯৭১-৭২)। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমি, ঢাকায়

অফিসার পদে যোগদান। বাংলা একাডেমির পাঠ্যপুস্তক, গ্রন্থাগার, বিপণন, সংস্কৃতি, গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগে বিভিন্ন সময়ে ৩২ বছর ধরে কাজ করেছেন। ২০০৪ সালের নভেম্বরে বাংলা একাডেমির উপ-পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন।

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্ম। দশ ভাই-বোনের সঙ্গে ৪/৫ বছর বয়সে মা লীলাবতী চৌধুরীর (মা লীলাবতী চৌধুরী ছিলেন ঢাকার রূপগঞ্জের সম্ভ্রান্ত পরিবারের উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা। পিয়ানো ও সেতার বাজানোতে পারদর্শী ছিলেন, গানও গাইতেন চমৎকার) কাছে লেখাপড়া, সঙ্গীত ও নৃত্যে হাতেখড়ি। পরবর্তীতে বাবা-মার উৎসাহে চট্টগ্রামের সঙ্গীত পরিষদে প্রয়াত সৌরীন্দ্রলাল দাসগুপ্ত (চুলুবাবু), ওস্তাদ মোহনলাল দাস, কোলকাতায় মায়াসেন, ধীরেন বসু, পাহাড়ি স্যান্নাল, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুধীন দাশ গুপ্ত প্রমূখের কাছে ক্ল্যাসিকেল, নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, অতুল প্রসাদী, দ্বিজেন্দ্রগীতি, ভজন, রজনীকান্ত, গণসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান, আধুনিক গানের তালিম নিয়েছেন। পরিবারের চার বোন এক ভাই বেতার, টেলিভিশন, মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের সঙ্গীত শিল্পী। বড় বোন রত্না দাশ বেতার শিল্পী ছিলেন। কল্যাণী ঘোষের দুই বোন শব্দসৈনিক উমা খান এবং পূর্ণিমা দাশ। সম্প্রতি অকালে প্রয়াত হয়েছেন ছোট ভাই বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও শব্দসৈনিক প্রবাল চৌধুরী। এছাড়া ছোট ভাই স্বপন চৌধুরী খোকা, বোন দেবী চৌধুরী, বড় ভাইয়ের স্ত্রী অর্চনা চৌধুরীসহ পরিবারের ৭জন মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে গণজাগরণমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

কল্যানী ঘোষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম শব্দসৈনিক। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিশেষ গ্রেডের সঙ্গীতশিল্পী। চলচ্চিত্রেও কণ্ঠদান করেছেন। বিবিসি (রেডিও ও টেলিভিশন), ভয়েস অব আমেরিকা ও আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্র থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। (১) বিবিসি রেডিও থেকে বাংলা সংবাদ ও কথিকা পাঠ করেন (আগস্ট-অক্টোবর ১৯৭৬)। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা বেতারে সঙ্গীতে অংশগ্রহণ ছাড়াও কল্যানী ঘোষ তাঁর পরিচালনায় বাংলাদেশ তরুণ শিল্পী গোষ্ঠী গঠন করে বাংলাদেশের ২৫/৩০ জন শিল্পীদের নিয়ে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে, শরণার্থী শিবিরে বাংলাদেশের স্বপক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ড. সনজীদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক, জহির রায়হানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা, কোলকাতার প্রখ্যাত শিল্পী রুমা গুহ ঠাকুরতার 'ক্যালকাটা ইয়ুথ' কয়ারের সদস্য হয়ে বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৯৭১ সালে সলিল চৌধুরী এবং সমর দাসের সঙ্গীত পরিচালনায় কোলকাতার এইচ.এম.ভি রেকর্ড কোম্পানি থেকে প্রকাশিত লং প্লেয়িং- এ ভাইবোনসহ কণ্ঠদান করেন।

নাসরিন আহমাদ

- প্রো ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নাসরিন আহমাদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত শিল্পী ও সংবাদ পাঠক

১। আমি ছোটকাল থেকে গান করি। পরিবার থেকেই যেমন স্কুলের পাঠ শুরু হয় তেমনি গানেরও শুরু হয়েছিল পরিবারেই। প্রথমে কিছুদিন নাচ শিখেছিলাম। ক্লাস থ্রিতে উঠে আমি গান শুরু করি আর সেটাই অব্যাহত থাকে। আগামসি লেনে যখন রেডিও স্টেশন ছিল তখন আমি ছোটদের আসরে তিনটি প্রোগ্রাম করি। ১টা গান ছিল রবীঠাকুরের শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন এখনও যা স্মৃতিতে ভাসে। তারপর শাহবাগে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমার কোনো না কোনো প্রোগ্রাম থাকতো। গান, কবিতা, নাটক, গীতি নৃত্যনাট্য এগুলোতে অংশগ্রহণ করতাম। বড়দের প্রোগ্রাম শুরু করলাম ৬৫-৬৬ সালের দিকে যখন আমার স্কুল জীবন শেষ। নতুন করে অডিশন দিয়ে বড়দের প্রোগ্রাম শুরু করেছিলাম।

২। আমি যতদিন গান করেছি তখন পরিবেশ খুব উদার উন্মুক্ত ছিল। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিরাজ করতো। কেউ না কেউ গান, নাচ অথবা সাংস্কৃতির যেকোন একটা শাখায় জড়িত থাকতো। তখন জাগো আর্ট সেন্টার ছিল নাচের জন্য। তারপর ছায়ানট যখন হয়, প্রথম থেকেই আমি তার সাথে জড়িত ছিলাম।

৩। বাঙালি সংস্কৃতির মাঝে জন্ম নিয়েছি, বড় হয়েছি সেটা আমাকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে। মানুষ হিসেবে আমাকে তা পূর্ণতা দেয়।

৪। আমি যেহেতু মূলতঃ রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী। রেডিওতে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতাম। তখন প্রোগ্রাম এর একমাস আগে গানের কথা জমা দিতে হত। কথাগুলো কর্তৃপক্ষ নিজেদের মতো করে পরিবর্তন করে দিতেন। যেমন 'সজিব করিব মহাশ্মশান' পরিবর্তীত হয়ে 'গোরস্তান' ইত্যাদি শব্দ বসিয়ে দেয়া ছাড়া তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। ১৯৬১ এর কথা এখন মনে হয় সনজিদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক, সিধু মিয়া, রোজ খালা যারা পরবর্তীতে ছায়ানট প্রতিষ্ঠা করেন তারা পণ করেছিলেন আইউবের নিষেধাজ্ঞার মাঝেও রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালন করবেন। তখন আমরা খুব ছোট ছিলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন এ আমার মায়েদের মধ্যে উৎসাহ দেখেছি। মনে পড়ে। ঘটা করেই তা উদযাপিত হয়েছিল। আমার মা বেগম বদরুন্নেসা আহমদ যিনি লেডি ব্রেবোর্ন, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে পড়তেন। পাকিস্তান সময়ে তার বিয়ে হয়েছে। পূর্ব বাংলায় তারা চলে এলেন তখন আমার জন্ম হলো। বাবার ফরেষ্টের বদলী চাকরী। যার ফলে মা ইন্টারমিডিয়েট শেষ করে চলে এলেন। পরে তিনি

সিলেট এম সি কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আমার হারমোনিয়াম যেটা মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। মা যেমন ছিলেন অগ্রসর চিন্তার তেমনি আমরাও তা পেয়েছিলাম পারিবারিকভাবে। মা সবসময় গুনগুন করে গাইতেন 'আমার সকল দুঃখের প্রদীপ', 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙ্গেছে।' আমি রবীন্দ্র ও নজরুল দুটোই করেছি। উচ্চাঙ্গ ছিল আমার মূল শিক্ষার বিষয়।

৫। আমার মা ১৯৫৪ সালে নির্বাচিত MLA। পরবর্তীতে তিনি আওয়ামী লীগের সাথেই যুক্ত হয়ে যান। বাবা সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। বাবা চাকরীর কারণে রাজনীতি করতে পারেন নাই। মা সবকিছুর ফাঁকে ফাঁকে B.Ed, মাস্টার্স শেষ করেন। লালমাটিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি যখন মন্ত্রী ছিলেন (শিক্ষা সংস্কৃতি ও ক্রীড়া) তখন তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে MP নির্বাচিত হন। আমার স্কুল ভিখারুন্নেসা পরে কলেজ হলিক্রস। ওখানে রাজনীতি করার কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু পারিবারিক পরিবেশটাই ছিল রাজনীতির অনুকুল। যার কারণে আমি রাজনীতি সচেতন হয়ে বেড়ে উঠেছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল ও পরিবেশ নিয়ে পড়তে এসে সরাসরি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যাই। ১৯৬৯-৭০ এ রব-মাখন পরিষদে আমি কমনরুম সেক্রেটারী হিসেবে নির্বাচিত হই। এরপর রাজনীতির বাইরে আর থাকা সম্ভব ছিল না। ভিখারুন্নেসায় যখন পড়তাম তখন এক শিক্ষক কথা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের বা আওয়ামি লীগের প্রসঙ্গ আসলেই তিনি বিরূপ মন্তব্য করতেন। বিষয়টি আমাকে আহত করতো। আমি বাসায় গিয়ে মাকে বললে মা বলেন পূর্ব পশ্চিমের বিরোধের কথা। মা সাহস দিয়েছিলেন এই বলে যে, তুমি ঘাবড়াবে না। তোমাকে এটা শুনতে হতে পারে। স্কুলের এ্যাসেম্বলিতে গানে আমি লীড দিতাম, ছবি আঁকতাম ভালো। কতটা উদার আর প্রসারিত পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলাম তা এখন ভাবি। মুক্তিযুদ্ধে আমাকে যেতেই হবে এর কোনো বিকল্প নেই। এপারে বা ওপারে আমাকে কিছু করতেই হবে।

৬। তখন সবাই BBC, রেডিও Australia, স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতাম, কখন সন্ধ্যা হবে- অপেক্ষায় থাকতাম। স্বাধীন বাংলার শিল্পীদের কণ্ঠ শুনে ভীষণ উৎসাহী হতাম।

৭। May'র শেষ অথবা June এর প্রথম আমার দেশ ছেড়ে যাবার সময় মেঘনা ঘাটে যখন পৌঁছি তখন বোরখার ভেতর থেকে দেখতে পেলাম সবুজ ধান ক্ষেত, উদার নীল আকাশ সেদিন আমার কাছে ভিন্ন রূপে ধরা দেয়। আমি এর আগে অনেকবার এ পথে গিয়েছি এবারের মতো এমন উপলব্ধি আমার মাঝে আর আসে নাই। আবার কি ফিরে আসবো এদের মাঝে- বুকের ভিতর কষ্ট হয়েছিল সব ছেড়ে যেতে। সেই দেশপ্রেম এখনও কাঁদায়। অনেক শিল্পী দেশ ছেড়েছিল কিন্তু তখন কয়জন দেশের জন্য কিছু করার উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিল আর কয়জন জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে বেঁচেছিল, এটাও দেখার বিষয়।

৮। ‘পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে’- এই গান যেই পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে তা আজও আমাদের ৭১ এ নিয়ে যায়। কল্যাণী ঘোষ কোরাসে অন্যরকমভাবে ভয়েস দিত। তা ছিল অনন্য। বালিগঞ্জের সার্কুলার রোডের একটা রুমে প্রথম যে রেকর্ডটি করলাম, রেকর্ডের পরে যখন গানটি শুনলাম তখন আমরা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। পরবর্তীতে Instrument দিয়ে যখন আবার গেয়েছি, রেকর্ড করেছি সেই প্রথমবারের মতো হয় নাই। প্রথমবার শুধু হারমোনিয়াম আর তবলা ছিল, তারপরও তা ছিল আমাদের প্রাণের সুরে গাওয়া অনবদ্য এক সৃষ্টি। স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রতিদিন যেয়ে আমরা কত মামুলি যন্ত্রপাতি দিয়ে গান রেকর্ড করতাম- কারো মনেই তাতে কোনো খেদ ছিল না। সবার লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা। তবে সে স্বাধীনতা খুব অল্প সময়ে অর্জন করেছি বলে আমরা অনেক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছি। যুদ্ধ যদি আরো কিছুদিন চলতো তাহলে মনে হয় অপূর্ণতা বা বিতর্ক এড়ানো সম্ভব হতো। আরেকটু সময় নিয়ে স্বাধীনতা এলে ভালো হত বলে আমার মনে হয়।

Satisfaction এর জায়গাটা খুব অল্প। এত মানুষ জীবন দিয়েছে। মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে সে তুলনায় আমার Contribution কিছুই না। তারপরেও আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের যে সুযোগ পেয়েছিলাম অল্প হলেও কিছু একটু করার সুযোগ আমাকে তা গর্বিত করে।

গানের শিল্পীদের নাম ঘোষণা করা হত না। সমবেত কণ্ঠের গানের শিল্পীদের নাম প্রচার করা হয় নাই। একক কণ্ঠের গানেও ছদ্মনাম প্রচার করা হয়। আমি শিল্পী নাসরিন আহমাদ News Presenter এর সংকট এর কারনে জারিন আহমাদ নামে ইংরেজি সংবাদ পাঠ করতাম। ৬ ডিসেম্বর ইন্ডিয়া স্বীকৃতি দেবার পর নিজ নাম নাসরিন আহমাদ শিলু নামে খবর পাঠ করেছি।

কণ্ঠযোদ্ধা ডালিয়া নওশিন

১। আমার মা-বাবার উৎসাহে গানে আসা। প্রথমে আমার মা, মরহুম হোসনে আরা ইসলাম গীটর বাজাতেন (১৯৫৪-৫৫ সাল)। পরে স্বনামধন্য গবেষক/শিল্পী শ্রী সুধীন দাসের নিকট গান শিখেন। কিন্তু তাঁর একমাত্র কন্যা আমি যখন ৫ বছর বয়সে পড়ি, তখন আম্মা ভাবলেন মেয়েকেই গান শিখানো দরকার। তাই ভয়ভীতিতে ও অনিচ্ছাকৃত ভাবেই শুরু হয় সঙ্গীত শিখা ও সুধীন দাসের কাছে আমার হাতেখড়ি।

২। পাকিস্তান আমলে সঙ্গীত শিল্পীদের (বাঙালি) সংখ্যা ছিল কম। যাঁদের কে শিল্পী বলা হত, তাঁরা সবাই গান বা সঙ্গীত কে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসতেন। তাঁদের গুরু বা শিক্ষককে সম্মান-শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। ফলে গানের পরিবেশ ছিল পরিচ্ছন্ন ও ভক্তির। আর যাঁরা অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ছিলেন তাঁরাও শিল্পীদের সম্মান দিতে বাধ্য ছিলেন।

৩। প্রথমে বাঙালি। তারপর সঙ্গীতশিল্পী। এটা আমার পরিবারের অবদান। আমার বাবা স্থপতি মাজহারুল ইসলাম ও মা হোসনে আরা'র নিকট বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশ- এর কথা শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। শাড়ি পরা; গুরুজনদের শ্রদ্ধা করাই ছিল আমাদের ধর্ম ও কর্ম। নিজ সংস্কৃতি কে শ্রদ্ধা করা, তার সম্বন্ধে পড়াশোনা করা ও পালন করা ছিল আমার পরিবারের নিয়ম। বাঙালির আচার-অনুষ্ঠান, রাজনীতি, সমাজ-সামাজিকতাকে মেনে চলা ছিল আমাদের কর্তব্য। তাই '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল অতি স্বাভাবিক ও আমার জীবনের সবচাইতে বেশি গর্বের। 'বাংলাদেশ' নামে দেশ পাওয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।

৪। ১৯৬৪-৬৫ তে টেলিভিশনে অন্তর্ভুক্ত হই। শিশু শিল্পী থেকে শুরু হয় মিডিয়ায় বিচরণ। নজরুল সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে পরিচিত হওয়ার পথে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছি। সব-চাইতে বড় বাঁধা ছিল 'নজরুলের' গানের বাণী। কোন গানে মন্দির-শ্যাম-হরি শব্দ ব্যবহার করা সম্ভব হত না। মন্দির কে মসজিদ বানিয়েও গাওয়া হয়েছে। না হলে সেই গান বাদ দেওয়া হত। কীর্তন আঙ্গিক বা কীর্তন তো ছিল নিষিদ্ধ। গণ-সঙ্গীত বা দেশমাতৃকা নিয়ে গান গাওয়ার সুযোগ ছিল কম। তার উপর বাবা যখন ছিলেন স্পষ্ট-ভাষী ও বাংলা অনুরাগী, তখন তাঁর সন্তান হয়ে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার সুযোগ বলতে গেলে ছিলই না।

৫। আমার আব্বা'কে বুদ্ধিজীবী হিসাবে 'কালো' তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। তাই ২৫-শে মার্চের কাল-রাত্রির পর ২৭-শে মার্চ পালাতে হলো শহর ছেড়ে গ্রামে। টাঙ্গাইলের

করোটিয়ায়। সেখান থেকে দেড় মাস পর, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে চলে যেতে হলো ওপারে। যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কোনোরকম অনুপ্রেরণা আমাদের কারুরই দরকার ছিল না। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও বাঙালি-নিধন-যজ্ঞের চিত্র সকল দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল পাক-হায়নাদের দেশ ছাড়াতে। তাই বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশ স্বাধীন করতে।

৬। দেশের গান বা গণ-সঙ্গীত যে কিভাবে মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায় তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি দীর্ঘ ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে। ওপার বাংলা'র জনগণ যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বাংলার মানুষ কিভাবে/কেন নিজ দেশ পাবার জন্য লড়ছে, ঠিক তেমনি মুক্তিযোদ্ধারা/বাঙালিরাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার ও কোলকাতায় অবস্থিত "মুক্তি-সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার" ভারতবর্ষ ভ্রমণ থেকে, আমাদের বাংলার ইতিহাস, যুদ্ধের কারণ ও বাঙলার ইতিহাসকে গানে গানে বিশ্লেষণ করা থেকে। আমরা যখন কোলকাতায় অবস্থান করি, তখন খোলা ট্রাক চেঁপে পশ্চিম-বঙ্গের বহু জায়গায় ভারতীয়দের সামনে গান পরিবেশন করে তাঁদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছি, মুক্তি-যোদ্ধাদের খাদ্য/অস্ত্র-র জন্য। যখন মুক্তাঙ্গনে মুক্তি-যোদ্ধাদের সামনে গান গেয়েছি। তখন দেখেছি তাদের রক্তগরম হতে। দেখেছি তাদের কাঁদতে। একসাথে সবাই শপথ নিয়েছি দেশকে স্বাধীন করেই ছাড়ব। স্বাধীন বাংলা বেতারে ২ বার গান রেকর্ড করে দিয়েছি। একবার ৫/৬ টা আরেকবার ১৪/১৫ টার মতো। রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, সহ আরো অনেক গান। জনতার সংগ্রাম চলবে গানটিও রেকর্ড করেছিলাম নতুন করে। আমাদের সেদিনের সে ভূমিকা নিয়ে কেউ কিছু লিখছে না। যারা লিখতে পারেন উদ্যোগটা তাদের নেয়া উচিত নয়তো ইতিহাস থেকে তা হারিয়ে যাবে। পাকিস্তানের কোনো পরিকল্পনাই যখন সফল হতে পারে নাই, ব্যর্থ পাক সেনাবাহিনী পরাজয় স্বীকার করার আগ মুহূর্তে ঘটায় বুদ্ধিজীবী নিধন কার্যক্রম। ১৪ ডিসেম্বর স্বাধীনতা বিরোধীরা পরিকল্পিতভাবে কারফিউ দিয়ে ধরে ধরে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। কোলকাতা ১৪৪ লেনিন স্মরণীতে বসে আমরা এই খবর পাই। আমাদের বাসায় মুনির চৌধুরীর ছেলে ভাষণ অবস্থান করছিলেন। তিনি খবরটা জানতে পেরে উদ্ভ্রান্তদের মতো আচরণ করতে থাকেন বাবাকে হারানোর সংবাদে কোনোভাবেই তাঁকে সান্তনা দেয়া যাচ্ছিল না। তার কষ্ট আমাদেরও কষ্ট হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম আর হয়তো আমরা স্বাধীন হতে পারলাম না। আপনজনের মৃত্যুর খবর একটার পর একটা আসতে থাকে। নিজেদের আর সান্তনা দেয়ার কিছু ছিল না। শোকগ্রস্ত আমরা কান্না আর কষ্টের মাঝে সেই সময়গুলি পার করছিলাম। এরই মাঝে আসে ১৬ ডিসেম্বর। আমরা চারদিকে চিৎকার শুনতে পাই, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা সবাই শোক-দুঃখ ভুলে দৌড়ে বাড়ির বাইরে যাই। পায়ে আমাদের অনেকের স্যান্ডেলও ছিল না উত্তেজনার সেই মূহুর্তে খালি পায়ে বাংলাদেশ এ্যাসেম্বলির কাছে আমরা খুশিতে সেদিনে জমায়েত হয়েছিলাম। সেখানে আমাদের মিষ্টি খাওয়ানো হয়। আমরা গান করেছিলাম মনে আছে। সুখে হেসেছি, কেঁদেছি সারাক্ষণ।

আমাদের সাথে প্রথমদিকে ৭/৮ জন শিল্পী দিয়ে শুরু হয়েছিল মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা। পরবর্তীতে এর সদস্য সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায়। কল্যাণী ঘোষ, উমা খান, প্রবাল চৌধুরী, রফিকুল আলম, রথীন্দ্রনাথ রায়, মোশাদ আলী, এরা সকলেই এর সাথে ছিলেন। পরবর্তীতে অনেকে বিভিন্ন গ্রুপে চলে যান। প্রথমদিকে যান রথীন্দ্রনাথ রায়, তারপর এক এক করে অনেকেই। শিল্পীরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গান করে। সবাইকেতো আর কোলকাতাতে থাকলে হবে না, যার কারণে বিভিন্ন এলাকায় আলাদা আলাদা গ্রুপে শিল্পীরা গান পরিবেশন করে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছে। জনসচেতনতার পাশাপাশি তহবিল সংগ্রহ, ত্রাণ সংগ্রহ সব কাজই আমরা করতাম।

৭। ২৫-শে মার্চের ‘কাল রাত্রি’র মত স্মরণীয় ঘটনা আর কখনও ঘটতে পারে না। রাত্রি ১০-টায় হঠাৎ করে ঢাকা শহর অন্ধকার হয়ে যায়। সকল টেলিফোন-বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়। মর্টার আর শেলের গন্ধে শহর ভরে যায়। শোনা যায় প্রচুর আর্তনাদ ও কান্নার শব্দ। আর থেকে থেকে শোনা যায় জয় বাংলা শ্লোগান। সারা রাত চললো হত্যাযজ্ঞ। ভোরের আলোতে দেখা যায় রাজপথ ও অলিতে-গলিতে বাঙালির লাশ পড়ে আছে। এ দৃশ্য আমাদেরকে সারা জীবনই তাড়া দিয়ে বেড়াবে। দীর্ঘ ০৯ মাসের যুদ্ধের প্রতিদিনই ছিল এক একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা।

৮। আমি ও আমার পরিবার আমাদের ‘স্বাধীনতা’ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম করেছি। এটা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম। তার জন্য আমরা গর্বিত। আমার বাবা তো রাজনীতির সাথেই জড়িত ছিলেন এবং বাঙালি বলে নিজেকে গর্ব বোধ করতেন। আমার বড় ভাই, রফিক মাজহার ইসলাম, পড়া-শোনা ছেড়ে, যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আমেরিকা থেকে চলে এসেছিলেন। আমার মেজ ভাই আমাদের না জানিয়েই যুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন মেজর শাফায়াত জামিলের অধীনে। আমি যুক্ত হলাম ‘মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার’ সাথে। পরে স্বাধীন বাংলা বেতারেও সংগীত পরিবেশন করেছি। আমরা সবাই দেশকে ভালোবেসে, নিঃস্বার্থ ভাবে যুদ্ধ করেছি একটা স্বাধীন দেশ পাওয়ার আশায়, যার নাম হবে ‘বাংলাদেশ।’ যেই বাংলাদেশে থাকবে না কোনো রেষা-রেষী, কোনো হানাহানি। থাকবে না কোনো পার্থক্য, কোনোরকম নাশকতা, কোনো রকম সংহতিনাশক পরিবেশ।

’৭৫-এর পটপরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের সকল স্বপ্ন আশা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেছে। বাঙালিই বদলে গেছে। আমাদের চলা-ফেরা চাহিদা সবই ভারসাম্যহীন হয়ে গেছে। আমাদের মত লোকেরা এখন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, কারণ এই দুঃসহ স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে চলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মানুষের লোভ-লালসা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা একেবারে হয়ে উঠেছে অসহনীয়।

মনে হয় ‘দেশ’ পাওয়া কি আমাদের জন্য অতি দ্রুত হয়ে গেল? আরও কিছু সময় যুদ্ধে রত থাকলে, আরও পরিবার-পরিজন বলিদান হলে কি আমরা ভালো মানুষ হতে পারতাম?

নিজের দেশকে কি তখন সত্যি ভালোবাসতাম? দেশের জনক, বঙ্গবন্ধুকে তাঁর পরিবার শুদ্ধ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আমরা কি খুব ভালো আছি?

৯। মুক্তি সংগ্রামী-শিল্পী সংস্থায় ছিলেনঃ

(১) সনজিদা খাতুন; (২) সাংবাদিক / শিক্ষক / গবেষক ওয়াহিদুল হক; (৩) সৈয়দ হাসান ইমাম; (৪) রং শিল্পী মুস্তাফা মোনওয়ার; (৫) আলী যাকের; (৬) মিলিয়া আলী (৭) কল্যাণী ঘোষ, উমা/প্রবাল (৮) রফিকুল ইসলাম (৯) অধ্যাপক সারওয়ার জাহান (১০) বিপুল ভট্টাচার্য (১১) মোশাদ আলী (১২) দেবু (১৩) জয়ন্তী (১৪) আমি ও আরও অনেকে।

- এই সংস্থা ভারত বর্ষ সরকারের তত্ত্বাবধায়নে ছিল এবং পশ্চিম বঙ্গের শীর্ষ স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা পৃষ্ঠপোশকতা পেয়েছিল। যেমন- শ্রী দ্বীপেন ব্যানার্জী, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দোপাধ্যায়, উত্তম কুমার, অপর্ণা সেন, দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, কবি নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

- স্বাধীন বাংলা বেতারে সমর দাস, অজিত রায়, রথীন্দ্রনাথ রায়, আপেল মাহমুদ, কাদেরী কিবরিয়া, অনূপ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ছিলেন শেষদিন পর্যন্ত।

নমিতা ঘোষ

১. আমার মার অনুপ্রেরণায়ই গানের জগতে আসা। তখন আমার বয়স চার কি পাঁচ, সেই বয়সেই জোড়ালো কণ্ঠে সুরে সুরে গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতাম। দর্শকদের আকৃষ্ট করতাম। আমি জন্মসূত্রেই গান শেখার প্রেরণা পাই আমার মা যশোদা ঘোষের কাছে। আমার বাবা ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী, তাদের অনুপ্রেরণাই আমার সঙ্গীত জগতে আসা। মা-ই গানের প্রথম হাতে খড়ি দেন। পড়ে বিভিন্ন সময়ে ওস্তাদ মুন্সি রইস উদ্দিন, ওস্তাদ বারীন মজুমদার, ওস্তাদ পি, সি গমেজ, শেখ লুৎফর রহমান, বেদার উদ্দিন আহমদ, মফিজুল ইসলাম ও জাহিদুর রহিম এর কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নজরুল গীতি ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের তালিম নেই।

২. তখন পূর্ব পাকিস্তান। আয়ুব খান, ভুট্টো, ইয়াহিয়া খান তাদের হাতে এই দেশ। আমরা শিল্পীরা রেডিও ও টিভিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারতাম না। সরকারি বাঁধা ছিল। বাঙালি সংস্কৃতির টানেই গানে গানে পাকিস্তান স্বৈরশাসকের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি।

৩. তখন ছিল প্রতিবাদী গান শেখ লুৎফর রহমান এর শিখানো ও পরিচালনায় কারার ঐ লৌহ কপাট, আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো, জেলের তালা ভাঙ্গবো, রক্ত রঙিন উজ্জ্বল দিন, মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্যম, চল চল চল এই সব গানগুলো গাইতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, টি,এসসি'র মোড়, রমনা বটমূলে, রমনা বটতলা, ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট, ওয়াপদা হল, কার্জন হল, জিলা পরিষদ, বৃটিশ কাউন্সিল ও স্টেডিয়ামের মাঠে। এরকম বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রামগুলো করতাম, তখন খুব ভয় ছিল, এই ভয়ের মধ্যেই প্রোগ্রাম করতে আসতাম।

৪. ১৯৬৯ এ একবার টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী স্কুল ও কলেজের মাঠে গান গাইতে যাই। আমার সাথে ছিলেন মোঃ আব্দুল জব্বার। বক্তৃতা পর্ব শেষে গানের অনুষ্ঠান শুরু করার সাথে সাথে পাকিস্তান বিরোধী গান মনে করে পুলিশ আমাদের ঘিরে ফেলে। জনপ্রিয়তার কারণে পুলিশ আমাদের চিনতে পারে, তারপর আমাদের ছেড়ে দেয়।

৫. আমি ছোট বেলা থেকেই গান গাওয়ার পাশাপাশি রাজনীতি সচেতন। একই সাথে সামাজিক অনুষ্ঠানেও অংশ নিতাম। ১৯৭১ এ দেশ মাতৃকার টানেই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরেছিলাম। ১৯৬৯ সালে গঠিত হয় বঙ্গবন্ধু শিল্পী গোষ্ঠী। সভাপতি ফজিলাতুন নেসা মুজিব। তিনি নিজে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐ সময় বঙ্গবন্ধু শিল্পী গোষ্ঠীতে সম্পৃক্ত ছিলেন গণসঙ্গীত শিল্পী শেখ লুৎফর রহমান, গাজিউল হক, মাহমুদুন্নবী, অজিত

রায়, খন্দকার ফারুক আহমেদ, আপেল মাহমুদ। আমরা সবাই মিলে ২৫ শে মার্চ রাত পর্যন্ত প্রতিবাদী গান করেছি রাজপথে। ১৯৭১ সালে এ সংগঠনের মাধ্যমে উদ্যোগ নেয়া হয়, সবাই মিলে মুক্তিযোদ্ধাদের গান গেয়ে অনুপ্রেরণা দেয়ার। তখন আমরা গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে আগরতলার বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করে অর্থ ও জামা-কাপড়, খাবার ইত্যাদি সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের ক্যাম্পে পাঠাতাম। শিল্পীরা ছিলাম আমি, আপেল মাহমুদ, আব্দুল জব্বার, চানু রায়, সখিনা বেগম, ছায়া রায়, জয়ন্তি ভূইয়া। সংস্কৃতি কর্মকর্তাদের বেলাতেও তাই, যে যেখানে সুযোগ পেয়েছে সে সেখানেই কাজ করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী হয়ে।

৬. ২৫ ও ২৬ শে মার্চ কালো রাত্রী শেষ হয়ে ২৭শে মার্চ কার্ফু শিথিল করা হলো। সেই সুযোগে বহু লোক ঢাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, বহু শরণার্থী। তখন আমার পরিবারও অনেক মৃতদেহ ডিঙ্গিয়ে সদরঘাটে নৌকায় বুড়িগঙ্গা নদী পার হলো, শুরু হলো অজানা অচেনা পথ, আজ বলতে গেলে অনেক কথাই মনে পড়ে।

আমরা যেদিন বাসা থেকে রওনা হই, সেদিন ছিল ২৭শে মার্চ ১৯৭১। সকাল ১০.০০ টায় বাসা থেকে বেরুবার সময় শুধু লাশের উপর দিয়ে হেটে চলেছি। রাস্তায় পড়ে থাকা মানুষের মৃতদেহ এলোপাথারীভাবে পড়ে ছিল। সেই মৃতদেহের উপর দিয়েই হেটে হেটে গেলাম আমি, মা, বাবা, ভাই-বোন, সদরঘাট লঞ্চঘাটে।

১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল আমি আগরতলা রাজবাড়ি ক্যাম্পের শরণার্থী হই। সেখানে প্রধান কংগ্রেস নেতা প্রিয়দাস চক্রবর্তী ক্যাম্পে এসে আমার শিল্পী পরিচয় পেয়ে নরসিংগর পলিটেকনিক্যাল হোষ্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে কিছু বিশিষ্ট পরিবার ছিলেন- অধ্যাপক জাতীয় প্রফেসর আলী আহসানের পরিবার, সেক্টর কমান্ডার মীর শওকত আলী, দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা খসরু প্রমুখ। রাজবাড়ি ক্যাম্পেই দেখা হয় মোঃ আব্দুল জব্বার ও আপেল মাহমুদ ভাইয়ের সাথে।

পরবর্তীতে সাবেক কেবিনেট সেক্রেটারী তৌফিক ইমাম সাহেব (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা) এর সহযোগিতায় মে মাসে আমাকে ও মাকে বিমানের দুইটি টিকিটের ব্যবস্থা করে দেন এবং তাহের উদ্দিন ঠাকুরের কাছে একটি চিঠি লিখে কোলকাতায় পাঠান। তাহের উদ্দিন ঠাকুর আমাকে কোলকাতায় ভাবানীপুর সংহতী শ্রী হোষ্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে কিছু কলেজের মেয়ে ও শ্রমজীবী মহিলা থাকতেন। সেটি একটি মহিলা হোষ্টেল ছিল। পরে স্বাধীন বাংলা বেতারে কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক আমিনুল হক বাদশা ভাই আমাকে ২৯শে মে স্বাধীন বাংলা বেতারে কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেই থেকেই প্রথম মহিলা শিল্পী হিসাবে বেতার কেন্দ্রে কণ্ঠ দিতে থাকি। পরে আরো

মহিলা শিল্পী যোগদান করেন। বেতারে আমরা 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে', 'জয় বাংলা, বাংলার জয়', 'এ ঘর দূর্গ ও ঘর দূর্গ', 'সোনা সোনা সোনা', 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে', 'আজি বাংলাদেশ', 'আমার জন্মভূমি জননী গো', 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে' ইত্যাদি গান গেয়েছিলাম। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী মরহুম তাজউদ্দিন আহম্মেদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার নির্দেশ দেন। পরে ব্যারিষ্টার বাদল রশিদ, এম.এন.এ এর নেতৃত্বে চিত্রপরিচালক দিলীপ সোমের বিক্ষুব্ধ বাংলা গীতিআলোখ্য নিয়ে ১৪ সদস্যের একটি কালচারাল ট্রুপস নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ফান্ড তোলার উদ্দেশ্যে ভারতের বোম্বেসহ মহারাষ্ট্র, দিল্লী, গোয়া, পুনা, কানপুর, নাগপুর বিভিন্ন জায়গায় সরকারি-বেসরকারিভাবে গণসঙ্গীত পরিবেশন করি। ১৪ জন সদস্যর আমি, আপেল মাহামুদ, স্বপ্না রায়, আব্দুল জব্বার, সরদার আলাউদ্দিন, মঞ্জুর হোসেন, শহিদুল হাসান, মাধুরী আচার্যী, অরুনা সাহা, রমা ভৌমিক, মাজহারুল ইসলাম, অবিনাশ শীল ও ভারতের তবলা বাদক শান্তি মুখার্জী। আমরা মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের জন্য ১৭ লক্ষ টাকা, কম্বল, পুলওভার, শতরঞ্চি, ঔষধ সামগ্রী সংগ্রহ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জমা দেই। এ সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বোম্বের চিত্র অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান, সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, বাপ্পী লাহিড়ী, সবিতা চৌধুরী ও বিশিষ্ট সাংবাদিক যুগ্ম সচিব সলিল ঘোষ। বোম্বে থেকে ফিরে এসে কলিকাতায় জোর বাগান পার্কে, স্কুল, কলেজ, পার্ক সার্কাসের মাঠে এবং বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যকালে রবীন্দ্র সদনে যৌথভাবে বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। সেখানে সমর দাসের পরিচালনায় আমরা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবশেন করি। ভারতীয় শিল্পীরা ছিলেন সন্ধ্যা মুখার্জী, বনশ্রী সেনগুপ্ত, অরবিন্দু বিশ্বাস, দিজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাজী সব্যসাচী, কাজী অনুরুদ্ধ প্রমুখ। তাছাড়া আকাশবাণী কোলকাতা থেকে রাগ প্রধান ও নজরুল গীতি পরিবেশন করেছিলাম। জয় বাংলার শিল্পী ও অতিথি শিল্পী হিসাবে মাঝে মাঝে সেই গানগুলো বাজানো হতো।

কোলকাতা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে দোতলায় যে বাড়িটি ছিল সেটাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এক সময় মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহম্মেদ এখানে থাকতেন। সেই ছোট বাড়িটি চারিদিকে দেয়ালে বিছানার চাদর ও কম্বল ঝুলিয়ে আর দরজা জানালার ছিদ্রগুলো বন্ধ করে বেতারের স্টুডিও বানিয়েছিল। খুব সিক্রেট ব্যাপার ছিল, ৩/৪ জন লোক ছাড়া অন্য কেহ জানতো না। সেখান থেকেই অনুষ্ঠান হতো। প্রথমে কোরান তেলোয়াত, বাংলা খবর, ইংরেজি খবর, চরমপত্র ও তাহের সুলতান এর জাগরণী দেশাত্মবোধক গান। সেই গানগুলি আমরা গাইতাম। মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা সেই গান শুনে একটু একটু করে এগিয়ে যেতেন, সেই গান মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের শক্তি ছিল। পূর্ব বাংলার লোকেরা ছোট্ট রেডিও কানে দিয়ে শুনতেন, শুনে সান্তনা পেতেন, দেশ স্বাধীন হবেই।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যেভাবে স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পীরা কাজ করেছি, তাতে করে মুক্তিযুদ্ধের একটি সেক্টরের মর্যাদা দানের দাবি রাখতে পারি।

৭. বম্বেতে শুভ সিং মেমোরিয়াল হলে একটি সরকারি প্রোগ্রাম হয়েছিল। আমরা ওখানে 'জয় বাংলা' শিল্পীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম টিকেট সিস্টেমে। ঐ হলটির দশ হাজার সিটের বসার ব্যবস্থা ছিল। ঐ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন হেমন্ত মুখ্যার্জী, সলিল চৌধুরী, বাপ্পী লাহিড়ী, সবিতা চৌধুরী, সলিল ঘোষ ও বোম্বের চিত্র অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান। অনুষ্ঠানটি শুরু হওয়ার একটু আগে ৬/৭ জন জুতা পালিশ করা মুচি এসে বললো আমরা ভিতরে যাব। হলের কর্মকর্তারা অনেকেই ছিল, তারা তাদের বাধা দিল, বললো না যাওয়া যাবে না। টিকিট কোথায়? তখন ঐ মুচিরা বললো দেখুন আমরা মুচি, জুতা পালিশ করি, সারাদিন যে টাকা আমরা রোজগার করেছি, সে টাকা জয় বাংলা শিল্পীদের আমরা দিব। তখন কর্মকর্তারা অবাক হয়ে ভিতরে নিয়ে গেল এবং ষ্টেজে গিয়ে আমাদের হাতে সেই টাকা তুলে দিল।

৮. সেদিন সব বাঙালি একস্রোতে মিশে স্বাধীনতা এনেছিল। আবার আমরা বিভক্ত হয়ে গেছি অল্প সময়ের মধ্যেই, যার জন্য স্বাধীনতার সুফল পেতে বঞ্চিত হচ্ছি। এটা আমাদের সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে।

৯. যাদের নাম উল্লেখ করেছি তারা ছাড়াও আরো অনেকে ছিলেন সবার নাম মনে করতে পারছি না।

রূপা ফরহাদ

কণ্ঠযোদ্ধা- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

১. ছোটবেলা থেকেই গান গাওয়ার আগ্রহ ছিল। যখন আমি নিজে নিজে হারমোনিয়াম বাজাতে শিখেছিলাম তখন আমার থেকে হারমোনিয়ামটা বড় ছিল। আমাদের বাসার পরিবেশটা ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশ। আমার আব্বা প্রয়াত আব্দুল জব্বার খান পথিকৃত বাংলাদেশের প্রথম স্ববাক চলচ্চিত্র মুখ ও মুখোশ ছায়াছবি। আমার মা ছিলেন সঙ্গীত প্রেমী। আমার বড় বোনের জন্য গানের শিক্ষক রেখে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গীত চর্চা দেখে আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। তাই দেখে মা আমি এবং আমার ছোট বোন মালা খুররম এর জন্য গানের শিক্ষক রেখে দিলেন। প্রথমে মৃন্ময় দাশ গুপ্ত ও পরে ওস্তাদ পি, সি গোমেজ এর কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেই। রেডিও টিভিতে ছোটদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। ১৯৬৮ সাল থেকে রেডিও টিভিতে বড়দের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আসছি।

২. তখন বাঙালি শিল্পীরা গানের চর্চা করেই সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করতেন। তাই বাঙালি শিল্পীদের দাবিয়ে রাখতে পারে নাই পাকিস্তানিরা। যার জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রেই তৈরি হয়েছিল স্বনামধন্য বাঙালি সঙ্গীত শিল্পী। তবে তাদের ইচ্ছায় বাধ্যগত ভাবে উর্দু গান গাইতে হত।

৩. একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে বাঙলি সংস্কৃতি আমাকে অনেক প্রভাবিত করে এবং আকৃষ্ট করে তবে অন্য সংস্কৃতিতে নিজেকে বিলিয়ে দেবনা, অতিরঞ্জিত রুচিবিহীন এমন কিছু করবো না যা আমাদের সংস্কৃতিকে আঘাত হানে। যা কিছু পালন করবো বাঙালি জাতি, ধর্ম সব এর আয়ত্বের মাঝে রেখে পালন করবো এটাই আমার কাম্য।

৪. তেমন কোনো বিরূপ পরিবেশের সম্মুখিন হতে হয়নি, সবসময় বাংলা গান গেয়েছি। উর্দু গান গাওয়ার চেষ্টাও করিনি। (ইস্ট পাকিস্তান এডুকেশন উইক ১৯৫৭-৫৮ সালে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় দেশাত্ববোধক গান গেয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করি।) ১৯৭১ সালে মার্চ মাসের পর থেকে রেডিও থেকে সঙ্গীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য অনেক চিঠি এসেছিল। আমি প্রতিটি অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলাম। যার জন্য এক সময় আমার নামে তদানিস্তন রেডিও থেকে একটা চিঠি আসলো যে, তোমাকে আমরা কালো তালিকাভুক্ত করলাম যেহেতু তুমি আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছো না।

৫. ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের পর বাঙালি জাতি পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই এর প্রস্তুতি নিচ্ছিল, আমরা, আমি, আমার বোন মালা খুররম ইতিপূর্বে

রাইফেল চালনা প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম এবং ভালো শুটার হিসেবে অনেক সম্মাননা পেয়েছিলাম। যার জন্য একটা মনোবল কাজ করতো যে আমরাও তাদের বিরুদ্ধে রাইফেল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পরতে পারবো। কারণ কণ্ঠ দিয়ে যুদ্ধ করা যায় সে ধারণা তখন ছিল না। ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি পশুরা যখন নানান যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে বাঙালি জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পরলো তখন বুঝতে পারলাম তাদের যুদ্ধের সরঞ্জামের মাঝে আমাদের রাইফেল কিছুই না।

আমার আব্বা আর বসে থাকতে পারলেন না। আমার দু'ভাইকে নিয়ে ইন্ডিয়ায় চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উপদেষ্টা ও অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান ভূমিকা রাখলেন। আমার দু'ভাই রুমু খান গীটার বাদ্যযন্ত্রী এবং জুলু খান নাট্যশিল্পী হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আমি আমার বোন মালা খুররম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করি।

৬. আমাদের পরিবেশিত অগ্নিঝড়া ও হৃদয়বিদারক এ গানগুলি মুক্তিযোদ্ধা ও বাঙালিদের শুধু অনুপ্রেরণা যোগাতো না এ গানগুলো দিক নির্দেশনাও দিত। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গানগুলো রচনা ও সুর দেওয়া হত। সময় বিশেষে প্রচারিত হত। যেমন পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, নোঙ্গর তোল তোল, চল বাঙালি চল, চল মুক্তিসেনা চল, তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পরি দেব রে, স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে, নাই ঈদ নাই ঈদ এ বাংলাদেশে, চাঁদ তুমি ফিরে যাও, এ ধরনের প্রচুর গান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা হয়েছে।

৭. সমগ্র বাঙালি জাতি যখন যুদ্ধে রত, স্বজন হারার বেদনায় মর্মাহত, প্রাণ ভয়ে লুকায়িত, বাড়ি ঘর ছেড়ে গ্রামে গঞ্জে আশ্রয়, শরণার্থী হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে অবস্থানরত। যুদ্ধের দামামা যখন চারিদিকে, অতি সন্তরপণে ঈদ (ঈদুল ফিতর) এসে গিয়েছিল। ঈদের চাঁদকে তাই ফিরে যেতে বলেছিল সমগ্র বাঙালি জাতি। রচনা হলো একটি গান (চাঁদ তুমি ফিরে যাও, দেখ মানুষের খুনে খুনে রক্তিম বাংলা, রূপালী আঁচল কোথায় রাখবে বল) শহীদুল ইসলামের রচনা ও অজিত রায় এর সুরে এ গানটি গাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। হৃদয় বিদারক এ গানটি প্রতিটি বাঙালি ও যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের মনে ভীষণ নাড়া দিয়েছিল। যার জন্য পরবর্তী সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করার জন্য যখন স্বাধীন বাংলা বেতারে গেলাম দেখলাম টেবিলের উপর অনেক প্রশংসাপত্র যা বিভিন্ন সেক্টর থেকে এসেছে। আশফাক ভাই ও তাহের সুলতান ভাই আমাকে ডেকে বললেন, দেখ তোমার গানের জন্য কত অভিনন্দন পত্র এসেছে। আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। সবাই এ গানটি শুনে কেঁদেছে। সে দিনটি আমার জন্য ভীষণ একটি স্মরণীয় ঘটনা।

৮. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরে অনেক গর্ব অনুভব করি। অনেক পরিচয়ের মাঝে এ পরিচয়টি একটি অমূল্য পরিচয়। স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি যেখানে মায়ের ভাষায় কথা বলতে কোনো বাধা নেই। ভবিষ্যতে আমাদের প্রজন্ম সারাবিশ্বে নিজেদের অবদান রাখবে। বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এভাবে সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।

৯. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রায় প্রতিটি গানে আমি কণ্ঠ দিয়েছি। সে সময় আমরা সব সময় যাদের দেখেছি, তাদের কিছু নাম এখানে উল্লেখ করছি। আব্বা আব্দুল জব্বার খান (উপদেষ্ট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র), আশফাকুর রহমান, তাহের সুলতান, কামাল লোহানী কর্মরত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। সঙ্গীতে কণ্ঠদানকারী- মালা খুররম, সপ্না রায়, নমীতা ঘোষ, কল্লানী ঘোষ ও উমা খান, কুইন মাহজেবিন, নাসরীন আহমেদ (শীলু), নীনা, আপেল মাহমুদ, আব্দুল জব্বার, রথীন্দ্রনাথ রায়, মান্না হক, মঞ্জুর, রফিকুল আলম, কাদেরি কিবরিয়া, অনুপ কুমার ভট্টাচার্য, আবু নওশের, অরূপ রতন চৌধুরী, প্রবাল চৌধুরী, কামাল উদ্দিন, মনরঞ্জন ঘোষাল প্রমুখ।

যন্ত্রসঙ্গীত- রুমুখান, সুবল দাশ, অবিনাশ চন্দ্র, অরুণ কুমার, গোপীনাথ, বল্লভ, সুনীল কুমার গোস্বামী প্রমুখ।

সুরকার- সমর দাশ, অজিত রায়, সূজেয় শ্যাম, আপেল মাহমুদ, আব্দুল গনী বুখারি প্রমুখ। এছাড়া আরো অনেকে ছিল বিশেষভাবে যাদের দেখেছি তাদের নাম উল্লেখ করলাম।

মালা খান

১. পারিবারিক ভাবে আমি সংস্কৃতি অঙ্গনে বড় হয়েছি। এছাড়া আমার বড়বোনকে দেখতাম গান গাইতে। তার সাথে সাথে একই ওস্তাদের কাছে গান শিখতে শুরু করি। এইভাবেই গানের জগতে আমার আসা।

২. তৎকালিন পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি শিল্পীদের গানের পরিবেশ তেমন অসুবিধা হয় নাই। যেমন আধুনিক, পল্লীগীতি, নজরুল গীতি এগুলো একই ভাবে চলেছে। তবে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের ক্ষেত্রে অনেকরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রবীন্দ্রচর্চার উপর পাকিস্তানিদের কড়াকড়ি নিষেধ ছিল।

৩. যেহেতু আমি বাঙালি তাই আমার সংস্কৃতি আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। এই ভাষায় গান গাইতে ও কথা বলতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

৪. সেই সময় বাঙালি শিল্পী হিসাবে আমি নিজে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হই নাই। তবে ৭১ এর ২৫ই মার্চের পর থেকে পাকিস্তান টিভিতে অনুষ্ঠান না করার জন্য আমি ও আমার বোন অনেকটা গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতাম। এটা স্বাধীন বাংলা বেতারে যোগ দেওয়া পর্যন্ত।

৫. আমার আব্বা তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম বাংলা সবাক ছায়াছবি মুখ ও মুখোশ তৈরি করেন পাকিস্তানিদের একঘেয়েমি উর্দূ ছবির বিরুদ্ধে লড়াই করে। সেখানে থেকে আমার অনুপ্রেরণা। এছাড়া ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি আর্মিদের অমানবিক আক্রমণ বাঙালিদের উপর। এটা কোনো বাঙালি সেদিন মেনে নেয় নাই। তাই এর উচিত জবাব দেয়ার জন্য যে, যে ক্ষেত্রে ছিল, সে সেইভাবে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। আমরা পুরো পরিবার বর্ডার পার করে কোলকাতায় চলে যাই। স্বাধীন বাংলা বেতারে অংশগ্রহণ করি। সেখানে আমি মালা খান (খুররম), রূপা খান (ফরহাদ) গানে অংশগ্রহণ করি। আমার দুই ভাই এর একজন প্রতিটি সঙ্গীতে গীটারে অংশগ্রহণ করে (রুমু খান) এবং নাটকে দুলুখান অংশগ্রহণ করেন। আমার আব্বা জনাব আব্দুল জব্বার খান সেখানে চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান ও স্বাধীন বাংলা বেতারের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন।

৬. সেই সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রচার মাধ্যম এত উন্নত ছিল না তাই পৃথিবীর মানুষকে জানানোর জন্য মনে হয় একটি মাধ্যম ছিল সেটা এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। যার মাধ্যমে বাংলার মানুষ নিয়মিত জানতে পারতো মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা ইত্যাদি। কখন কোথায় কি হচ্ছে এগুলি বাঙলার মানুষের মনোবলকে আরো শক্তিশালী করেছিল ও বাংলার মানুষ সেই সময় প্রতি মূহুর্তে নতুন করে বেঁচে থাকার শক্তি পেয়েছিল। আমরা নিয়মিত সঙ্গীত

পরিবেশন করতাম। দেশাত্মবোধক সেই সব গানের কথা সুর এতই ক্ষুরধার ছিল যা মুখামুখি যুদ্ধের চাইতে কম ছিল না। যা বাংলার মানুষকে আনন্দিত ও সাহস জোগাতো।

৭. যুদ্ধকালীন সময়ে প্রতিনিয়ত অনেক ধরনের ঘটনাই হয়েছিল। সেই সময় বেঁচে থাকাটাই একটা বড় ব্যাপার। ২৫শে মার্চের পর বাঙালিদের অবস্থা এমন হয়েছিল, যে কোনো মুহূর্তে শত্রুরা আমাদের আঘাত হানতে পারে। আমরা এপার থেকে বর্ডার ক্রস করে ওপারে যাই সেটা ছিল একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। আমার আব্বা অন্য ভাইদের নিয়ে এপ্রিলে চলে গিয়েছিলেন অনেক কঠিন ছিল সেই রাস্তা। তারপর আমার মা আমাকে ও আমার বোনকে ঐ তরুণ বয়সে যেভাবে আগলে রেখে শত্রুর সীমানা থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন সেটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। মুহূর্তে নানারকম বিপদের মুখোমুখি হয়ে আমাদের পাকিস্তানি আর্মী ও রাজাকারদের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল। প্রতিটি মুহূর্ত ভীষণ দুঃসহ ছিল যা এত অল্প জায়গায় বলা সম্ভব নয়।

৮. একজন বাঙালি হিসাবে আমার মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ খুবই স্বাভাবিক ছিল। আমাদের দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা, আমাদের অস্তিত্ব আমরা বিসর্জন দিতে পারি না। আমরা আমাদের সংস্কৃতি অতীত ইতিহাস আমাদের জীবনধারা রাতারাতি পরিবর্তন করে অন্যের সংস্কৃতি ও ভাষায় স্বপ্ন দেখতে পারি না বা জীবন-যাপন করতে পারি না। বাঙালির অধিকার আদায় করে নেয়া খুবই জরুরী হয়ে পড়েছিল। বাঙালিদের উপর অত্যাচার ও প্রতি ক্ষেত্রে দাবিয়ে রাখার কুটকৌশল তাদের এই কঠোর মনোভাব আমাদের সহ্য করতে হচ্ছিল। আমরা অপমানিত হচ্ছিলাম। তাই আমার এই চেতনা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন একটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তবে এটা অর্জন করতে আমাদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩০ লক্ষ ভাই-বোনের রক্ত বন্যা এবং ইজ্জত ও শেষ সম্মান বিসর্জন দিতে হয়েছিল আমাদের এই বাংলার মা-বোনদের। এটা এত সহজ না। যাদের উপর দিয়ে ও জাতির উপর দিয়ে এই অমানবিক পরিস্থিতি হয়েছিল তাদের রক্তের উপর দিয়ে আজকের এই বাংলাদেশ।

আমি অনেক কিছুই অনুভব করি। সব সম্ভব হয় না। এত কষ্টের বিনিময়ে যে দেশ আমরা পেয়েছি সেটাকে আমাদের নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে এবং এদেশকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। যারা এদেশের জন্য এত ত্যাগ করেছেন তাদের আমাদের সম্মান করতে হবে। আমরা তা ভুলে যেতে চাই না।

৯. সে সময় আমি স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে পুরোপুরিভাবে কন্ঠসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করি। সেখানে নিয়মিত উদ্দীপনা মূলক ও দেশাত্ববোধক গানগুলি আমরা গাইতাম। যেমন- সমর দাস, অজিত রায়, সুজেয় শ্যাম, আব্দুল গনি বোখারী এনাদের সুরে তাদের সুরারোপিত গানগুলি আমরা গেয়েছি। এইসব বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে (১) পূর্ব দিগন্তে সূর্য্য উঠেছে, (২) নোঙ্গর তোল তোল (৩) স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে (৪) আজি স্বপ্ত সাগর উঠে (৫) রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি (৬) ওরে শোনরে তোরা শোন (৭) আয়রে চাষী মজুর, কুলি (৮)

চল বাঙালি চল (৯) চাঁদ তুমি ফিরে যাও (১০) আমরা সবাই মুক্তিসেনা। এই রকম অগুনিত গান আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে গাইবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এছাড়া সেই সময় হিন্দুস্তান রেকর্ড থেকে একটা লং প্লের জন্য আমরা গান রেকর্ড করি। সেখানে আমি, রূপা, ফরহাদ, স্বপ্না রায়, নমিতা ঘোস, আব্দুল জব্বার, আপেল মাহমুদ আরো অনেকে কণ্ঠ দিই সেই গানগুলি হলো, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে, এ ঘর দুর্গ ও ঘর দুর্গ, সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের, আমি এক বাংলার মুক্তিসেনা, এবার উঠেছে মহাঝড় আলোড়ন, সোনা সোনা সোনা, হায়রে কৃষান ইত্যাদি।

স্বাধীন বাঙলা বেতার থেকে যেসব শিল্পীরা আমাদের সাথে কণ্ঠে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে যেমনঃ আমি, মালা খুররম, রূপা ফরহাদ, কল্যাণী ঘোষ, নামিত ঘোষ, উমা খান, কুইন মাহজাবিন, মান্না হক, অরূপ রতন চৌধুরী, রথীন্দ্রনাথ রায়, কাদেরী কিবরিয়া, মঞ্জুর আহ্‌মেদ, জমির, কামাল উদ্দিন, আবু নওশের, রফিকুল আলম ইত্যাদি যারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। শিল্পীরা তাদের সবারই একটি উদ্দেশ্য ছিল সেটা একটা স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি করা। এই একটা লক্ষ্য তখন সবার মধ্যে কাজ করছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাই সবার সামর্থ্য নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম। যদিও আমরা তখন শরণার্থী কিন্তু আমাদের মনোবল একটুকুও কম ছিল না আমরা খুব সাদামাটা জীবন যাপন করতাম, যদিও সেটাতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না। তারপরও আমাদের সবার মনে একটা অনুভূতি কাজ করতো আমরা দেশের জন্য কাজ করছি। সারাদিন না খেয়েও কারো কোনো অসুবিধা হতো না। আমাদের কণ্ঠ থেকে সেইসব দিনে রক্ত ঝরা গান বের হতো সেই গানগুলি এখনো বাংলার মানুষকে উজ্জীবিত করে।

রফিকুল আলম

১. পারিবারিক পরিবেশ ছিল cultural. বড় ভাই ড. সরোয়ার জাহান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান। ছোট ভাই হাওয়াইয়ান গীটার বাজাতো। বাবা-চাচারা গান, সাহিত্য চর্চা করতেন, সেই পরিবেশে বেড়ে ওঠায় গানে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণীত হই। গানের শুরুও হয়েছিল সেখান থেকে।

২. রাজশাহী বেতারে যখন গান গাইতে গেলাম তখন জানলাম পূর্ব বাংলার শিল্পীদের সম্মানী ছিল কম, পাকিস্তানিদের বেশি। স্থানীয়ভাবে রাজশাহীতে পরিবেশ ভালোই ছিল তবে বাজেটের দিক থেকে বরাদ্দ ছিল খুব কম। প্রোগ্রাম করার ক্ষেত্রে তেমন কিছু চোখে পড়ে নাই কিন্তু ঢাকাতে হয়তো সেটা বেশি ছিল। বৈষম্যের ব্যাপারটা পরবর্তীতে দৃষ্টিগোচর হয়।

৩. বিষয়টা আমার কাছে ছিল সহজাত ব্যাপার। বাঙালি সংস্কৃতি বাঙালি হিসেবে সবার জন্যই ছিল প্রযোজ্য। এটা ছিল মানসিকতার ব্যাপার এর ব্যাত্যয় হওয়াটাই ছিল অস্বাভাবিক।

৪. বিরূপ পরিবেশের চাইতে রাজনীতিকরণের ব্যাপারটা ছিল বেশি। শিল্পী হিসেবে কিছুটা ছিল, যেকোন গান ভেটিং করতে হতো তারপর তিনদিন পর জানানো হতো সেটা গাওয়া যাবে কিনা!

৫. পশ্চিম পাকিস্তানের নীতি ছিল বিমাতাসূলভ ও বৈষম্যমূলক। জ্ঞান হবার পর আস্তে আস্তে সব বুঝতে পেরেছি। জনগণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। আমরাও সচেতনভাবে পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন হই। আমরা ব্যাপারগুলো বুঝতে পারলাম। ৭ মার্চ এর বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ আমাদের দিব্যচোখ খুলে দেয়। নিরস্ত্র মানুষের ওপর আক্রমণ, নির্বিচার গুলি করে হত্যা করা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. জোহাকে মেরে ফেলা, ৬ দফা, ২১ দফা সবকিছুই আমাদের যুদ্ধে যাবার জন্য বিরাট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিদের অন্যায়ের জবাব দিব যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। শেখ মুজিবের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সীমান্ত পাড়ি দেই।

৬. শিল্পী হিসেবে আমার গান বা আমাদের গান স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধা আর মুক্তিযুদ্ধকেই শুধু প্রেরণা যোগায় নাই, পূর্ব বাংলার আটকে পরা মানুষগুলো যারা সরাসরি অংশ নিতে পারে নাই মুক্তিযুদ্ধে তারাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা প্রশমনের উপায় ছিল আমাদের গান। অরক্ষিত পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য শক্তি ও সাহস যোগাতো সেই গান। কয়েকটি গানের কথা বলছি:

(১) ‘সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ
বাংলার ঘরে জ্বলছে।

কথা ও সুরঃ ড. সারোয়ার জাহান (যিনি আমার বড় ভাই, তিনিও স্বাধীন বাংলা বেতারে ছিলেন)। শিল্পী : রফিকুল আলম

(২) যায় যদি যাক প্রাণ তবু দেব না দেবনা
দেবনা গোলার ধান

শিল্পীঃ রফিকুল আলম, কথা : আবু হেনা মোস্তফা কামাল

৭. প্রতিদিন গান রেকর্ড হতো। একদিন যশোর মুক্তাঞ্চল বর্ডারে আশরাফুল আলম, শহিদুল ইসলাম, আপেল মাহমুদ সবাই মিলে মুক্তিযোদ্ধাদের গান শোনাতে গেলাম। আমাদের সাথে আরো ছিলেন মঞ্জুর আহমদ, মান্না হক সহ আরো অনেকে। অনেকের নাম মনে করতে পারছি না। ঝুঁকি থাকায় মহিলা শিল্পীদের যওয়া সম্ভব হয় নাই। আমাদের সাহায্য করছিল ১২/১৩ বছরের একজন সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা। গান শেষে আমরা ফিরে এলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে, কিছুদিন পর আমরা ঐ এলাকায় আবার গেলাম, ছেলেটিকে খুঁজলাম। পরে জানলাম সেই সাহসী ছেলেটি শত্রুর প্রতি গ্রেনেড চার্জ করতে গিয়ে মারা গেছে। শুনে ভীষণ পিড়িত হয়েছিলাম। সেই কিশোর মুক্তিযোদ্ধার রক্তের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের এই স্বাধীনতা। আমরা আজো তাকে স্মরণ করি। একই সাথে তার আত্মদান সেদিন আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, স্বাধীন আমরা হবোই। এভাবেই ছেলে বুড়ো সকলেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরেছিল। জীবন উৎসর্গ করাটাই ছিল তখন পূর্ব বাংলার বাঙালির কাছে পরম প্রত্যাশিত।

৮. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গান করেছি, উদ্বুদ্ধ করেছি, উৎসাহিত করেছি সবাইকে, এটা আমার কাছে তখন খুব ছোট কাজ বলে মনে হত। কারন লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন হাতে নিয়ে রনাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন, মাঠে-ঘাটে জীবনযুদ্ধে লড়েছিলেন, তাদের সংগ্রামটা ছিল অনেক বেশি সাহসীকতার। তাই নিজের জন্য করুণা হতো যে আমি কেন তাদের মতো করতে পারছি না। গোলাম আবিদ টিপু (আইনজ্ঞ) তিনি রিক্রুটমেন্ট কমিটিতে ছিলেন। আমি তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মাঠে কাজ করার ইচ্ছার কথা যখন বললাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, ‘তোমরা যারা মাঠের যোদ্ধা না কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতারের গান করছো সাথে আরো কাজ করছো, সেটা মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে কোনো অংশে কম না বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি।’ সীমান্ত পার হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করতে গেলাম যখন, তখন ভাবতাম মুক্তিযুদ্ধ করবো কিন্তু গান গেয়ে যে মুক্তিযুদ্ধ করছি তা উপলব্ধি হয় নাই। তার কথায় আবার ফিরে এলাম। এটা আমার জন্য উৎসাহ ও সিদ্ধান্ত নিতে সুযোগ করে দিয়েছিল। কণ্ঠ যোদ্ধা হিসেবে নিজের কাজে আমি গর্বিত। আমি নিজেকে একজন ভাগ্যবান বলে মনে করি দেশের সৃষ্টির প্রক্রিয়ায়

আমি যুক্ত হতে পেরেছি—এই সৌভাগ্য আর কোনো নাগরিকের হবে না। আমার যা হয়েছে এটা আমার বিশাল এক প্রাপ্তি। এই গর্বের প্রাপ্তিটাকে আমি আমার অন্তরে লালন করি।

৯. সারোয়ার জাহান, অনুপ ভট্টাচার্য, লাকি আখন্দ, মোকসেদ আলী সাঁই, শেখ জমির, আলাউদ্দিন সরদার, রুমু (যন্ত্রশিল্পী), বাসু দেব, অনেকেই ছিলেন যাদের নাম মনে করতে পারছি না। তাদের অসাধারণ অবদান স্মরণ করি। কল্যাণী, উমা, প্রবাল, এম এ মান্নান, নাসরিন আহমাদ শেলু স্বাধীন বাংলা বেতারে গান করেছেন। এছাড়াও আরো অনেকেই ছিলেন যাদের নাম উল্লেখ হয় না। অজানা সেই মানুষগুলোও আমাদের সহযোদ্ধা, তাদের স্মরণ করি শ্রদ্ধাভরে।

শাহীন সামাদ

১. আমার বয়স যখন ৫, তখন জলপাইগুড়িতে (আমরা সেখানে বড় হয়েছি) মায়ের বাবার অনুপ্রেরণায় গান শিখতে শুরু করি। তখনকার চারপাশের conservative পরিবেশের মধ্যেও সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিরাজ করতো। ওখান থেকে চলে আসলাম রংপুরে। সেখানে রাম গোপাল এর কাছে এক বছর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম নেই। তারপর গার্লস স্কুলের একটা প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়ে প্রথম হয়েছিলাম। এরপর থেকে গান নিয়েই আমার পথ চলা। ঢাকায় চলে আসি ১৯৬২তে। রেডিওতে গান গাওয়া শুরু খেলাঘর এর মাধ্যমে আর BTV তে ১৯৬৪ তে ছোটদের অনুষ্ঠানে শুরু থেকেই ছিলাম। এভাবেই শুরু। জন্ম কুষ্টিয়ায় ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫১ সালে। আব্দুল লতিফ, শেখ লুতফর রহমান, পিসি গোমেজসহ আরো অনেকের কাছে গান শিখি।

২. আমি ছোট ছিলাম অতটা বুঝতাম না। ১৯৬৬ সালে ছায়ানটে ভর্তি হলাম। তখন ওখানকার ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদ বাসায় এসেও শিখাতেন। তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা বা বৈষম্যের ব্যাপারে অতটা বুঝতাম না।

৩. বাঙালি সংস্কৃতি অবশ্যই আমাকে আকৃষ্ট করে। ছায়ানটে গান শিখার সময় কখনও দেখি নাই রাজনীতি করেছে কেউ। তারা সবসময়ই বাঙালি সংস্কৃতিকে লালন করে আজও তা ধরে রাখার জন্য সচেষ্ট আছে। ছায়ানট থেকেই বাঙালি সংস্কৃতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করি। কথা বলা, ব্যবহার শিখা, আচার-আচরণ, মার্জিত রুচিবোধ, সৌজন্য, শাড়ি পড়তে শিখা, কোন ঋতুতে কোন শাড়ি পড়তে হবে, কোন রঙের পোশাক সবই শিখিয়েছে ছায়ানট।

৪. আমি খুব বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হই নাই। নজরুলকে নিয়ে আমরা এগিয়েছি। তবে গানের কথা পাকিস্তানিরা অনেকসময় পরিবর্তন করে দিত। যেমন- মহাশ্মশানকে বলতে হতো গোরস্তান, জলকে বলতে হতো পানি।

৫. ছায়ানট থেকে অনুপ্রাণীত হই। সারা ঢাকা শহরে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছি। পালাতে হয়েছে সরকারের ভয়ে আবার মঞ্চে উঠে কাজ করেছি। সোহরাব হোসেন, আজাদ রহমানদের মত বিখ্যাত লোকদের সান্নিধ্য পেয়েছি। আলতাফ মাহমুদ, পটুয়া কামরুল হাসান, অজিত রায়দের মত লোকদেরও নিকট সান্নিধ্য পেয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী থাকাকালীন ছাত্র ইউনিয়নের প্রোগ্রামে গান করেছি। অবশ্যই তা ছিল সংগ্রামী, প্রতিবাদী গান, প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই সেই গান গেয়েছি। শামসুন্নাহার হলের নির্বাচিত

সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলাম। পাকিস্তান সরকারের অন্যায়, বৈষম্য দেখে দেখে অনুপ্রাণীত হয়েছি।

৬. আমাদের গান মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছে। গানের কথা, বাণী, সুর সব কিছু তাদেরকে আকৃষ্ট করতো। আর গানগুলো শেখানোর সময় ভারতের বড় বড় যত শিল্পী ছিলেন তাদের উপস্থিতিতে গান কিভাবে ধরতে হবে, কোথায় ছাড়তে হবে, কোন শব্দে জোড় দিতে হবে, কোথায় নরম করে গাইতে হবে সব শেখানো হতো। সব কিছু আত্মস্থ করেই আমাদের গানগুলো পরিবেশন করতে হতো। আমরা সবাই "বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা"র সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। রবি শংকর, উদয় শংকর, তারা শংকর, সম্ভু মিত্র আরো অনেক বিখ্যাত শিল্পীরা আমাদের সাথে ছিলেন। সমর দাসের ডাকে স্বাধীন বাংলা বেতারের জন্য একবার ৮টি আরেকবার ১৪টি গান রেকর্ড করেছিলাম। দিনে কতবার যে বাজতো সে গান, তার হিসাব ছিল না।

৭. খাওয়া-দাওয়া, থাকার কষ্ট, ঘুমের কষ্ট কিন্তু চেতনা এত দৃঢ় ছিল যে কোনো কষ্টকেই কষ্ট মনে হতো না। রাত নাই দিন নাই ডাকলেই রেডি হয়ে যেতাম। গাইতে হবে, যুদ্ধে যেতে হবে। দেশ যখন সঙ্কটে পরে তখন সংস্কৃতি অঙ্গন আর বুদ্ধিজীবীরা সোচ্চার থাকে কথাটা আমরা জানতাম। আমরাও ততটাই সোচ্চার ছিলাম। আমি বাংলাদেশ ছেড়ে যখন পালাচ্ছিলাম তখন দূর থেকে একটা আর্মির ট্রাক আসছিল। আমার স্বামী আমাকে বললেন যে তুমি বোরখার মুখ খুলবানা। আর্মির গাড়িটা কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো কোথায় যাচ্ছো? আমার স্বামী বললেন শ্বশুর বাড়ি। কি মনে করে আমার বোরখার ঢাকনা না খুলে চলে গেল- আমরা বেঁচে গেলাম। আরেকদিনের ঘটনা, ওয়াহিদ ভাই বললেন রবীন্দ্রসদনের সেদিনের প্রোগ্রামটা আমাকে লীড দিতে। তখন ইয়ুথ কয়ারের রুমা গুহ ঠাকুরতার গান পরিবেশন সবাইকে মুগ্ধ করতো। অপর্ণা সেন উপস্থাপনা করবেন অনুষ্ঠানটি। হাসান ইমাম ভাইয়ের বাংলায় অনুবাদ। মঞ্চের ডেকোরেশন করেছিলেন মুস্তফা মনোয়ার। অনবদ্য এক অনুষ্ঠান ছিল সেদিনের গোটা উপস্থাপনা, সব দিক দিয়েই ব্যাপক আকর্ষণ করেছিল শ্রোতাদের। আমাদের পরিবেশনার পর রুমা গুহ ঠাকুরতা কিছুতেই গান করবেন না যদি শ্রোতাদের কাছে ভালো না লাগে তার পরিবেশনা। সেই অনুষ্ঠানে নাচ করলেন উদয় শংকর আর কমলা শংকর। ইয়ুথ কয়ারের বিখ্যাত গান 'মানবো না এ বন্ধনে, মানবো এ শৃঙ্খলে' গানের সুরকে পরিবর্তন করে গণসঙ্গীত সম্রাট শেখ লুৎফর রহমান যে সুর দিলেন তা ছিল সত্যিই প্রতিবাদী এক গণসঙ্গীত। সেই সুরটিই আজ আমরা শুনতে পাই গানটির, যা দিয়েছিলেণ অনেক গণসঙ্গীতের সফল সুরকার লুৎফর রহমান। কথাটি হয়তো অনেকেরই জানা নেই। গণসঙ্গীতের কী ক্ষমতা তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অসংখ্য রক্ত গরম করা গণসঙ্গীত সৃষ্টি করে।

আমাদের কাপড় ছিল না। গান করে সম্মানী পেয়েছিলাম ১৭৫/- (একশত পঁচাত্তর) টাকা। দীর্ঘদিন ভালো খাবার খাই না- টাকা পেয়ে খেতে গেলাম। শাড়ি কিনলাম- ২০ টাকা দাম

চাইলে ১০ টাকা দিয়ে। শাড়িটির রং ছিল সাদা আর বেগুনি কলকী করা। জীবনের সেই দুর্যোগের দিনের উপার্জন করা টাকায় কেনা শাড়ি- আজ থাকলে সেটা জাদুঘরে দিতাম। কিন্তু শাড়িটা রাখতে পারি নাই বা বুঝতেও পারি নাই। এত কষ্টেও আমাদের মুখের হাসি ছিল অমলিন।

৮. অনুভব অবশ্যই করি। সমস্ত দেশের চাওয়া-পাওয়ার জন্যই কাজ করছি। দেশকে স্বাধীন করবো। স্বাধীন দেশের আলো-বাতাসে স্বাধীনভাবে চলবো- এগুলোই ছিল লক্ষ। আমাদের স্বাধীন দেশে ৪৫ লক্ষ মেয়ে গার্মেন্টস্ এ কাজ করছে। আমাদের পাসপোর্ট হলো। সাংস্কৃতিক অঙ্গন বেশি লাভবান হয়েছে। আজ তারা স্বাধীন স্বতন্ত্র পরিচয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি খুশি। তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলেই দেশ এগিয়ে যাবে। মুক্তিযোদ্ধাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দেশপ্রেম নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে পরবর্তী প্রজন্মকে।

৯. ওয়াহিদুল হক, সনজিদা খাতুন, মাহমুদুর রহমান বেনু, মিলিয়া, তারেক আলী, মোসাদ আলী, বিপুল ভট্টাচার্য, গোবিন্দ (কলরেডি), মঞ্জুশ্রী, মঞ্জুলা, নীনা, শিলা ভদ্র, ডালিয়া নওশিন, শারমিন মুর্শিদ, ফ্লোরা আহমেদ, নায়লা, স্বপন চৌধুরী, দেবু চৌধুরী, শর্মিলা বন্দোপাধ্যায়, শিলা আরো অনেকে ছিলেন। আলী যাকের, আসাদুজ্জামান নূর, হাসান ইমাম, লায়লা হাসান, বুলা তপন, তপন মাহমুদসহ আরো অনেকেই ছিলেন। অনেকের নাম মনে করতে পারছি না। প্রথমে ১২/১৩ জন শিল্পী ছিলাম আমরা। শেষে ১১৭/১১৮ জনের মত হয়েছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে তারা যোগ দিয়েছিল। বিপন্ন বাংলাদেশের যুদ্ধের সাহায্য, শরণার্থী ক্যাম্পে সাহায্য, হাসপাতালের ঔষধ, পথ্য, ইনজেকশন কেনার জন্য অর্থ যোগান দেয়ার জন্য আমরা গান গেয়ে ফান্ড সংগ্রহ করতাম। আমরা গান করতাম শরণার্থী ক্যাম্পে, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে তাদের উৎসাহিত করার জন্য আর ফান্ডের জন্য বিরাট আয়োজন করে সকলের জন্য অর্থের বিনিময়ে স্কুল-কলেজ, রাজপথ, সড়কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছি। এক এক দিন ৩/4 টা অনুষ্ঠান করতাম। সারাদিন ১টা সিঙ্গারা খেয়ে দিনের পর দিন নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে ঐ সময়ের সেই শক্তিশালী গানগুলো রোগা-পাতলা শরীরের আমরা কি করে করতাম, ভাবলে এখনও অবাক হই। আসলে সেটাই ছিল আমাদের চেতনা যা দ্বারা সমগ্র বাঙালি উদ্দীপ্ত ছিল, প্রাণবন্ত ছিল। দিল্লীতে ১ মাস, মুক্তাঞ্চলে এক মাস শুধু গানই করেছি। আমাদের সেই গানের ফুটেজ মুক্তযুদ্ধকালে লিয়ার লেভিন ঐ সময় ধারণ করেছিলেন। ৩০ ঘণ্টার ফুটেজকে পরে তারেক মাসুদ আর ক্যাথরিন মাসুদ ১ ঘণ্টা ৪৫ মি. এ 'মুক্তির গান' হিসেবে নবজন্ম দেন। মুক্তিযুদ্ধের ছবি হিসেব 'মুক্তির গান' প্রচার না হলে শিল্পীদের অংশগ্রহণ অনেকের কাছেই অজানা থাকতো। তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ এজন্য নব প্রজন্মের কাছে যেমন, কণ্ঠ যোদ্ধাদের কাছেও তেমন নমস্য হয়ে থাকবেন। আজকের প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে চায়। মুক্তির গান প্রচার হওয়ার আগে এবং পরে তারেক ও ক্যাথরিন আমাদেরকে স্টেজে

উপস্থিত করতেন। মুক্তির গানকে বিপুল সমাদরে গ্রহণ করে তারা প্রমাণ করেছে অহংকার করার মতো, গর্ব করার মতো বিষয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের অহংকার আর গর্বের ইতিহাস হারিয়ে গেলে আমরা হারাবো আমাদের অস্তিত্বকে, আমাদের বীরত্বগাথাকে। কোনোভাবেই তা হতে দেয়া যাবে না। বাঙালির গর্বিত এ ইতিহাস ব্যাপক আকারে প্রামান্য চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরে ইতিহাস বিকৃতি থেকে রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সবাই অবাক বিস্ময়ে আমাদের দেখেছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখেছে আমরা সত্যিই মুক্তিযোদ্ধা কিনা যারা তাদের সামনে উপস্থিত। তারা জানতে চায়, দেখতে চায় মুক্তিযুদ্ধের তথ্যভিত্তিক ইতিহাস। কিন্তু আমরা তাদের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারছি না। আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতারের গানের ক্যাসেট গুলো নাই। দলিল পত্র নাই, ঐতিহাসিক ঘটনার দালিলিক কোনো প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না- আমরা কি রেখে যাচ্ছি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। এ ব্যাপারে সরকারেরও কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না যা সত্যিই দুঃখজনক।

ড. অরুপ রতন চৌধুরী

১. আমার মা ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী গান করতেন। তার কাছ থেকে গানের হাতে খড়ি। মা ছিলেন সিলেটের গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ঐ স্কুলের সঙ্গীত শিক্ষক সুর সাগর প্রাণেশ দাস তিনি ছিলেন আমার প্রথম গানের শিক্ষক। ঢাকায় এসে শ্রি অজিত রায়ের কাছে পাকিস্তান Cultural Academy, Green Road এ আমি গান শেখা শুরু করি। কাদেরী কিবরিয়াও সেখানে গান শিখতেন। এভাবেই আমার যাত্রা শুরু হয় গানের জগতে।

২. তখন আমরা পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে গেলে গানের শব্দ পরিবর্তন করে দেয়া তো। অনেক শব্দ অবিকৃত রেখে গান গাওয়ার সুযোগ ছিল না। হিন্দু কালচার বলে সেগুলি গাওয়ার অনুমতি দেয়া হতো না। পাকিস্তানি কিছু প্রেতাত্মা ছিল যারা এ কাজগুলো করতো।

৩. বাঙালি সংস্কৃতি আমার অস্তিত্বের সাথে জুড়ে আছে। জন্মের পর মাকে যেমন স্বাভাবিক নিয়মে ডেকেছি তেমন স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালি সংস্কৃতি আমার সহজাত চরিত্রের সাথে মিশে আছে। বাঙালি সংস্কৃতির মাঝে জন্ম, লালিত হয়ে আজ আমি এখানে পৌঁছেছি বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবেই। বাঙালি সংস্কৃতি আমার আপাদমস্তক প্রভাবিত করে। একজন সঙ্গীতশিল্পী সবসময় তার সবকিছু দিয়েই তার দেশকে, দেশের সৌন্দর্য, দেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। আমরা সে পথেই চলেছি। যদি আমি সঙ্গীত শিল্পী না হতাম তাহলে আজ আমি এ পর্যায়ে আসতে পারতাম না। আমার জীবন দর্শনকেই সঙ্গীত প্রভাবিত করেছে পুরোপুরি।

৪. বিরূপ পরিবেশে অবশ্যই পড়েছি। আমাদের বিক্ষুব্ধ শিল্পী গোষ্ঠীর ব্যানারে আমরা যতগান গেয়েছি ভয়ভীতির মধ্যে গেয়েছি। আমাদেরকে সবসময় বিজাতীয় পাকিস্তানি প্রশাসনের নজরদারীর মধ্যে থাকতে হতো। বেতার, টিভিতে সে গান গাওয়ার সুযোগ ছিল না কিন্তু মঞ্চ বা সড়ক দ্বীপের প্রোগ্রামে গাইতাম ভয়ভীতি উপেক্ষা করেই। আমাদের জীবন, চলাফেরা সবই হুমকীর মধ্যে ছিল। আত্মগোপনে থাকতে হতো সবসময়। শিল্পীরা সবাই ছিল তাদের কঠিন নজরদারীতে।

৫. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ থেকে। ৬৯, ৭০ এর গণসঙ্গীতগুলো আকর্ষণ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে। পূর্বের প্রতিটি সংগ্রাম মুখর আন্দোলনে আমরা শিল্পীরা সোচ্চার ছিলাম পাকিস্তান সেনাশাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যই সীমান্ত অতিক্রম করেছিলাম। গান মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল না ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ।

৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে, মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণীত করার জন্য এবং অবরুদ্ধ বাংলার বাঙালিদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য, পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত যোদ্ধাদের প্রাণীত করা, সাহসী করা,

উজ্জীবিত করার সবটুকুই করেছে সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলা বেতার। শিল্পীদের প্রতিবাদের ভাষা ছিল সঙ্গীত, আর তা প্রচার করে অবরুদ্ধ বাংলা আর বাঙালিকে সাহস যুগিয়েছে স্বাধীন বাংলা বেতার।

৭. মুক্তিযুদ্ধকালীন আমার নাম কখনও প্রচার করা হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ শ্রি হরলাল রায় আমাকে একদিন বললেন, 'অরূপ তোকে দিয়ে একটা গান করাতে চাই।' আমি বললাম, 'জী করবো; একটা দ্বৈত সঙ্গীত করতে চাইলেন বর্ত্তমান প্রো ভিসি নাসরিন আহমাদ এর সাথে। গানটি লিখেছিলেন শহীদুল ইসলাম সুর দিয়েছিলেন হরলাল রায়। গানটি যেদিন প্রচারিত হয়েছিল সেদিন আমার নামটি প্রথম স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত হয় ১৯৭১ সালের জুলাই-আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সম্ভবত।

আনন্দিত হয়েছিলাম নাম প্রচারসহ গানটি সবাই শুনেছিল বলে। কিন্তু পরক্ষনেই সব আনন্দ শেষ হয়ে যায়। অবরুদ্ধদেশে আমার মা-বাবার প্রতি খড়গ নেমে আসবে ভেবে। সত্যি সত্যিই তা ঘটেছিল। আমার মা তখন ইডেন কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। তাকে এসে পাকিস্তান আর্মি হুমকী দেয়। বাবা-মা আজিমপুরের বাসা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।

৮. স্বাধীন বাংলা বেতারের যত শিল্পী কলা-কুশলী ছিলেন তাদের মধ্যে আমি ব্যতিক্রম। আমি একাধারে ডাক্তার, গায়ক, টিভি উপস্থাপক, সমাজসেবকসহ মুক্তিযুদ্ধের শব্দসৈনিক। এতকিছু ছাপিয়ে আমি যে পরিচয়টা দিতে গর্ববোধ করি সেটা হলো মুক্তিযুদ্ধের শব্দসৈনিক। তখন সারে সাত কোটি বাঙালির মধ্যে আমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। এটা আমার কাছে বিরাট গর্ব আর প্রাপ্তির। স্বাধীন বাংলা বেতারের সাথে জড়িত হওয়া সেটাও আমার বিরাট পাওয়া। সুতরাং যাই বলেন না কেন সবচেয়ে গর্বের জায়গা হলো বাংলাদেশে যুদ্ধ একবার হয়েছে। মানচিত্র একবারই পেয়েছি এবং সেই সময়ের গর্বিত যোদ্ধাদের মাঝে আমিও একজন গর্বিত যোদ্ধা। আমরা অনেকেই হারিয়ে যাব কিন্তু এই পরিচয় আমার হারাবে না। আমি রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার ২১শে পদক (সমাজ সেবা) ২০১৫ সালে পেয়েছি। একজীবনে এর চেয়ে বেশি প্রাপ্তি আর কি চাই।

৯. স্বাধীন বাংলা বেতার ৫৭/এ বালিগঞ্জে সার্কুলার রোডে আমরা যারা ছিলাম তাদের নীচের তলায় ছিল রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা। দোতলায় রেকর্ডিং রুম এবং ফ্লোরিং করার জায়গা। আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, রথীন্দ্রনাথ রায়, কাদেরী কিবরিয়া, মঞ্জুর আহমদ, মান্না হক, রঞ্জন ঘটক, মোকসেদ আলী সাঁই, খোকা, কামাল আহমদ, আশরাফুল (আবৃত্তি), আলি রেজা, শহীদুল ইসলাম, সমর দাস, অজিত রায়, সুজেয় শ্যাম, অবিনাশ শীল, গোপীনাথ বল্লভ, হরলাল রায়। মহিলা শিল্পীরা এখানে থাকতেন না তারা অন্যত্র থাকতেন। শুধু পুরুষ শিল্পীরা এখানে থাকতেন। বেলাল মোহাম্মদ স্বাধীন বাংলা বেতারের তিনিও শুরু থেকেই ছিলেন এখানে। টি এইচ সিকদার, তাহের সুলতান, আব্দুল্লাহ আল ফারুক, আবদুশ শাকের, রাশেদুল হাসান, শরফুজ্জামান, প্রণব রায়, রেজাউল করিম, হাবিবুল্লাহ চৌধুরী, বাবুল আকতার (সংবাদ), আবুল কাশেম, সন্দ্বীপ, সুব্রত বড়ুয়া, আশরাফুল আলম, আঃ মান্নান, মলয় কুমার গাঙ্গুলী প্রমুখ।

ইন্দ্রমোহন রাজবংশী

[ইন্দ্রমোহন রাজবংশী একাধারে কণ্ঠযোদ্ধা, অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক 'ওয়ার্ল্ড মাষ্টার' পদকপ্রাপ্ত লোক সঙ্গীত শিল্পী, সংগ্রাহক, গবেষক, বেতার ও টিভির গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক, ছড়াকার, কলাম লেখক ও শিশুতোষ পল্লীগান রচয়িতা]

১. গানের সাথে আমার শুরুটা পারিবারিক সূত্রে। বলা যায় জন্মসূত্রেই বাংলার লোক গানের সাথে আমার মিতালী। বাবা নবীন চন্দ্র রাজবংশী (নবীন সাধু) লোকগান, পালাগান ও কীর্তন গান গাইতেন এবং রচনা করতেন। ঠাকুরদা কৃষ্ণ মোহন রাজবংশী (কৃষ্ণসাধু) ও লিখতেন, গাইতেন। তাছাড়া ঠাকুরদা'র পূর্ব পুরুষেরাও পল্লীগান রচনায় ও গায়নে পারদর্শী ছিলেন।

প্রতিদিন সন্ধার পর বাড়ির উঠোনে গানের আসর বসতো। পাড়ার কেষ্টদা (কেষ্টদাস রাজবংশী) হারমোনিয়াম, রামগোপাল কাকা দোতারা, রামনাথ জেঠা তবলা, বঙ্কিমদা করতাল বা মন্দিরাম, রামভাই একতারা বা ঢোল, ঠাকুরদা খঞ্জনী আর বাবা খোল নিয়ে উঠোন জুড়ে গোল হয়ে বসে মাঝখানে হেজাক বাতির আলোয় যে জমজমাট গানের আসর বসাতেন, সে স্বর্গীয় দৃশ্য আজও আমর স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে আছে।

মাত্র দু'বছর বয়স থেকে আমি নাকি যে কোনো তালের সাথে মন্দিরা বাজাতে পারতাম। সবাই যন্ত্র বাদনের সাথে সাথে গানও গাইতে পারতেন বলে পালাক্রমে মধ্যরাত পার হয়ে ভাঙ্গতো সে আসর। ছোট্ট সেই আমি নাকি দিব্যি রাত জেগে মন্দিরা বাজাতাম আর গান শুনতাম। ফলে প্রায় সকলের গানই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে নাকি আমি তাঁদের সবার সাথে গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠতাম। কেষ্টদার সন্ধানী চোখ তা এড়াতে পারেনি। তিনি স্বেচ্ছায় মাত্র পাঁচ বছরের আমাকে সঙ্গীতে হাতেখড়ি দিলেন। আমি আমার বাবা-মা (নবীন চন্দ্র রাজবংশী ও পূর্ণশশী রাজবংশী) এর পাঁচ পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে সবার বড় ছিলাম বলে সবার কাছে ছিলাম অতি আদরের।

২. আমার জন্ম ইংরেজি ১৯৪৬ সালের ২৬ জানুয়ারি। তাই ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের সময়ের কথা আমার কিছুই মনে নেই। তবে ১৯৫৭ সালে তৎকালীন "রেডিও পাকিস্তান ঢাকা" কেন্দ্রে ছোটদের আসরে সুযোগ পেয়ে আমার মনে প্রথম খটকা লাগে ছোটদের সাথে একটি সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে গিয়ে। গানটি ছিল আমাদের বর্তমান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি বিখ্যাত গান "চল চল চল।" দেখলাম, আমাদের হাতে গানের যে বাণীটি দেয়া হয়েছিল সেখানে 'নব নবীনের

গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান' এর জায়গায় লেখা রয়েছে 'নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব গোরস্থান।' পরবর্তিতে এই 'গোরস্থান' শব্দটি শুধুমাত্র আমার নয়, সকলেরই মনে খটকা লেগেছে। কারণ মূল কবিতাটি আমাদের সকলেরই ছিল জানা। সবাই বিষয়টি কর্তাদের গোচরিভূত করতে চাইলে তারা সে বিষয়ে মুখ না খুলে শুধু বলেছিলেন 'যেটা দেয়া হয়েছে সেটাই গাও।' বুঝলাম, যখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক কলিমুদ্দিন স্যারের সাথে কথা হলো। তিনি বললেন, 'কেবল একটি বা এটিই নয়, অনেক জায়গায় এরকম বদল তারা করেছে। তোমরা আস্তে আস্তে তা বুঝতে পারবে। এই বাংলা বিদ্বেষকে পশ্চিমারা আড়াল করার জন্য তারা কৌশলে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষকে ক্রমশ উসকাচ্ছে।

৩. পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর সুপরিকল্পিত কুট-চালের ধারাবাহিকতায় বাঙালি শিল্পিরা তখন পরিবেশগত বিরূপতার সম্মুখীন হয়েছিলেন বৈকি। আমাদের কাছে ক্রমান্বয়ে পরিস্কার হয়ে আসছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাংলা বিদ্বেষের ব্যাপারটি। সেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরেই যা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সে ধারাবাহিকতায় ষাট দশকের প্রথমার্ধেই তারা রবীন্দ্র সঙ্গীতের নিষিদ্ধ ঘোষণার দুঃসাহস দেখালো। কষ্টের ব্যাপার হলো যে, তখন তাঁদের সাথে বাঙালি তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবীও জড়িত ছিলেন। কিন্তু পাশ্চিমাদের সে কুট-কৌশল ব্যর্থ হয় বাঙালি শিল্পীদের সম্মিলিত সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায়।

৪. বাঙালি মানেই বাংলা সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। ব্যতিক্রমী কিছু দূর্ভাগা ছাড়া জন্মগত এই বিশ্বাস নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই বাঙালি জাতির মূল লক্ষ্য। আমি ও তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। বাঙালি সংস্কৃতি তাই আমার আজন্ম লালিত মূল আকর্ষণ। আর সে সংস্কৃতি আমাকে অবশ্যই প্রভাবিত করে জীবনের প্রতিটি পদে। হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস একমাত্র বাঙালি জাতিরই আছে। আর এই সংস্কৃতির ইতিহাস রচিত হয়েছে বাঙালি জীবনাচরণের ক্রম-ধারাবাহিক পর্যায় থেকেই। সে ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে বাঙালি জাতির রয়েছে একটি পৃথক জাতিসত্তা, সামাজিক বিবর্তন, সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনেক অজানা তথ্য। আর তাতেই প্রতীয়মান হবে বাঙালি জাতির নানা বিজয়ের গাথা। যেখানে বাঙালি টিকে আছে সর্বত্র। হারেনি কোনোদিন। তারই প্রকৃষ্ট পরিণাম বাঙালি অভূতপূর্ব বিজয়। দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা।

৫. আমরা জানি বাঙালির জীবনে এসেছে নানা জাতির শাসন, শোষণ, বঞ্চনা। দু'শো বছর শাসনের নামে শোষণ করে গেলো ইংরেজরা– সেই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে এসে। একই কায়দায় ১৯৪৭ এ স্বাধীনতার নামে শোষণ করলো পশ্চিমা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। প্রায় দু'যুগ তারা নানা কুট-কৌশলে চেপে রইলো বাঙালি জাতির উপর।

আসলে ১৯৪৭ এ পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্মের পর থেকেই পশ্চিমাদের অপ-শাসন, শোষণ, বঞ্চনা, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর নগ্ন হস্তক্ষেপসহ লাগাতার পক্ষপাতিত্বই আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ এর পর থেকেই বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমানের ধারাবাহিক সুযোগ্য নেতৃত্বই বাঙালি জাতিকে “স্বাধীন বাংলাদেশ” গড়ার স্বপ্ন দেখায়।

আগে ছাত্র ইউনিয়নে যুক্ত থাকলেও ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনের পর আমি মনের অজান্তেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হই। ১৯৬৭ সালে আমার অন্যতম সঙ্গীত গুরু জনাব হাফিজুর রহমানের বাণী ও সুরে কণ্ঠে তুলে নেই আন্দোলনের গান- “ছয় দাঁড়েতে নৌকা চলে মুখে আল্লাজী/পাছানায়ে হাইল ধইরাছে গোপালগঞ্জের মাঝি। গানটি তখন থেকেই আমি দেশব্যাপি প্রায় প্রতিটি মঞ্চে গাইতে থাকি- যা মানুষকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে।

পরে উনসত্তরের গণ আন্দোলনের সময় আমার অনুরোধে জনাব হাফিজুর রহমান আরও তিনটি গান লিখে ও সুর করে দেন। ’৭০ এর নির্বাচনের আগে গানগুলো আমি শহরে ও গ্রামে বহু মঞ্চে গেয়ে বেরিয়েছি।

নির্বাচনের প্রাক্কালে আমি গানগুলো গ্রামোফোন রেকর্ড করার ইচ্ছের কথা জনাব হাফিজুর রহমানকে জানাই। কিন্তু কোনো শিল্পীই সে সময় গানগুলোতে কণ্ঠ দিতে চাইলেন না। সম্মতি দিলেন একমাত্র রথীন্দ্রনাথ রায়। সহশিল্পী হিসেবে নেয়া হলো আমার স্কুল জীবনের একজন শিক্ষকের দুই মেয়ে লিলি হক ও জলি হককে। সাথে রইলেন হাফিজ কাকুও (জনাব হাফিজুর রহমানকে আমি ‘কাকু’ বলেই সম্বোধন করতাম)। প্রসঙ্গক্রমে গানগুলো অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

প্রথম গান– (আমার ও রথীন্দ্রনাথ রায় এর নেতৃত্বে):
আমার নেতা - শেখ মুজিব
তোমার নেতা - শেখ মুজিব
দেশের নেতা - শেখ মুজিব
দশের নেতা - শেখ মুজিব
আজি বাংলা মার কোল কইরাছে উজ্জল–
ওরে, মনের আশা আল্লায় তারে কইরা দিক সফলরে
আশার আলো করতাছে টলমল (ও দ্যাখো) ॥

দ্বিতীয় গান- (আমার ও রথীন্দ্রনাথ রায় এর নেতৃত্বে):
আরে, ও আমার বাংলাদেশের মাঝি ভাই
“জয় বাংলা” বলিয়া আইসো রঙ্গিন পাল উড়াই
আমার, বাংলাদেশের মাঝি ভাই ॥
ও মাঝিও......... ছয় দাঁড়েতে নৌকা চলে মুখে আল্লাজী
ওরে, পাছা নায়ে হাইল ধইরাছে গোপালগঞ্জের মাঝি”॥

তৃতীয় গান: (আমার ও রথীন্দ্রনাথ রায় এর নেতৃত্বে):

'জয়বাংলা', 'জয় বাংলা' বইলারে মাঝি
বাদাম দাও তুলিয়া
আল্লার নাম লইয়া নৌকার
কাছি দাও খুলিয়া মাঝিরে ॥

চতুর্থ গান: (আমার ও হাফিজ কাকুর নেতৃত্বে):

ওরে, দুঃখের নীশি পোহাইলো সকাল
এইবার, গাও তুলি সাদুল্ল্যার মা- মাথায় মাখো ত্যাল্।
(একটি হুলো বিড়ালের ডাক)
হুলো বিড়াল সামাল থাইকো বাবা আর বাড়াইও না
ও বিড়াল, রুই মাছের মাথা খাইওনা ॥
দ্যাখো, শেখের হাতে শক্ত লাঠি বুইঝা আইসো ঘরে (বিড়াল),
আরে, তোমার মত লক্ষ বিড়াল এক বাড়িতে মরেরে–
রুই মাছের মাথা খাইও না ॥

HMV প্রকাশিত

৪৫ আর. পি. এস চারটি গানের এই রেকর্ডটির শিরোনাম রাখা হলো—'আমার নেতা শেখ মুজিব।' সে সময় সেই রেকর্ডের বিক্রি পূর্বের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও কোলকাতা থেকে এই রেকর্ডটি বের হয়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সর্বোচ্চ বিক্রির তালিকায় (অংশুমান রায় সুরারোপিত ও গীত এবং গৌরী প্রসন্ন মজুমদার রচিত "শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি" –গানটির পরপরই) ছিল।

সে সময় করাচি ছাড়া অন্য কোথাও কোম্পানির ডিস্ক রেকর্ড করা হতো না। তবে পূর্ব-পাকিস্তানি অংশের HMV-র প্রধান বরেণ্য শিল্পী জনাব কলিম শরাফী সাহেব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কৌশলে রেকর্ডটি করাচি থেকে প্রিন্ট করে আনান।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে বঙ্গবন্ধুকে (সম্ভবত: ১৯ জানুয়ারি, ১৯৭১) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে সংবর্ধনা দেয়া হয়। সেদিন রেকর্ডটি নিয়ে আমি হাফিজ কাকু সভায় যোগদানের আগে বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেই। সেদিন তিনি আমাদের মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেন। হাফিজ কাকুর ক্যামেরায় সেদিন আমরা তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে ছবি তুলি।

এরপর বঙ্গবন্ধুর হাতে দেশের ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে চলে জেনারেল ইয়াহিয় খানের টাল বাহানা। তাকে ইন্ধন যোগাতে আসেন জুলফিকার আলী ভুট্টো এই টাল বাহানার নামে প্রতিরাতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসতে থাকে অস্ত্র। একই সাথে চলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলন। এদিকে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে রাতের অন্ধকারে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি

জমায় ভুট্টো আর ইয়াহিয়া। উপায়ান্তর না দেখে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে বাঙালি জনতার উদ্দেশ্যে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। আমিও আমার স্কুলের শিক্ষক-ছাত্ররা মিলে সে ভাষণ শুনতে জনসমুদ্রে মিলে যাই স্বাধীনতার স্থপতি ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দিগদর্শনমূলক ভাষণে আপ্লুত, উত্তেজিত, উৎসাহিত বাংলার জনতা। সবাই তাদের করণীয় নির্দেশনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, যে যার মত প্রস্তুতি নিতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা 'অপারেশন সার্চ লাইট' এর নামে ২৫ মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাতে অতর্কিতে হামলা চালায় নিরস্ত্র বাঙালি জাতির উপর। বঙ্গবন্ধুর সুদূর প্রসারী ৭ মার্চের ভাষণ এবং নিরীহ বাঙালির উপর পাক সেনাদের এই বর্বরোচিত হামলাই আমাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রেরণা যোগায়।

৬. ১৯৭১ এর পঁচিশ মার্চ রাতেই চট্টগ্রাম কালুরঘাট থেকে একটি ছোট্ট ট্রান্সমিটার এর মাধ্যমে "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র" নামে একটি বেতার প্রচারণা আমাদের কান খাড়া করে দেয়। রেকর্ডের উদ্দীপনামূলক গান, কবিতা, স্লোগান ও কিছুক্ষণ পরপর বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের অংশবিশেষ প্রচার বাংলার আপামর জন-সাধারণের মনে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করে। জাতির সামনে খুলে দেয় নতুন দিগন্তের দুয়ার। অবাক হয়ে শুনতে পাই আমাদের গাওয়া রেকর্ডের চারটি গানও। প্রথমদিকে কয়েক মাস সেই গানগুলো যে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের কতখানি প্রেরণা যুগিয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। পরে যে নয়জন প্রকৌশলী প্রথম ট্রান্সমিটারটি স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মনি ভাই ও বন্ধু শরফুজ্জামানের মুখে শুনেছিলাম যে, ঢাকা বেতার থেকে উদ্দীপনামূলক গানের টেপগুলোর সাথে তারা ঐ রেকর্ডটিও নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা কালুর ঘাটে স্থাপিত সে ট্রান্সমিটার উড়িয়ে দেয়। পরে ভ্রাম্যমাণ ট্রান্সমিটার দিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুষ্ঠান প্রচার করে কোলকাতার বালিগঞ্জের একটি ভাড়া করা বাড়িতে ২ মে তারিখে কেন্দ্র পুনঃস্থাপিত হয়।

তবে একথা নির্দিধায় বলা যায় যে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে প্রচারিত গান, কবিতা, নাটক, চরমপত্র, সময়োপযোগী স্লোগান ও বিভিন্ন ভাষায় সংবাদ প্রচারই ছিল মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, বাংলা ও বাঙালি জাতির পরমতম প্রেরণার উৎস সে সময় আমি একাধিক একক ও বহু সমবেত গান গেয়েছি, লিখেছি এবং সুর করেছি।

৭. ২৫ মার্চের পর সুযোগ খুঁজছিলাম মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার। বাবা-মা আমার জন্য প্রচণ্ড আতঙ্কগ্রস্থ ছিলেন। তাঁদেরকে কেমন করে তা বলি ভেবে পাচ্ছিলামনা। মা তো আমাকে কাছ ছাড়া করতেই চাইতেন না। চিন্তায় চিন্তায় নাওয়া-খাওয়াও প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। অথচ যেতে হলে আর দেরী করা ঠিক নয়। খান সেনারাও মার্চ মাসের মধ্যেই দেশের প্রায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই সময় যত এগিয়ে যাবে, ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রমও ততটা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই জনা কয়েক যুদ্ধেগামী মানুষকে নিয়ে পরিকল্পনা করলাম, এবার সবাইকে নিয়ে বাবা-মাকে বলা যাক। কয়েকজন মিলে সে

রাতেই বাবা-মার কাছে গিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছেটা জানালাম। এটাও বললাম যে খান সেনারা যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, পরে হয়তো যাওয়াই যাবে না। সবার সাথে যাবো বলায় মা সোজাসুজি বলে ফেললেন, "যা বাবা যা। যেতেই যখন হবে তখন আর দেরী নয়। আগামীকাল সকালেই যা। শুক্রবারে নরসিংদীতে হাট বসে সেই গভীরের মধ্যে কালই যেতে সুবিধে হবে।" আমিতো হতবাক মা বলছেন এই কথা! মা আর স্পষ্ট করে বললেন, "তুই যে গান গেয়েছিস! না গেলে খান সেনারা তোকে আর বাঁচতে দেবে না। তাই যুদ্ধেই যা। মরতে যদি হয় ওদের মেরে মর।" বাবাও অমত করলেন না। তাঁদের পায়ের ধুলো নিয়ে ছোট্ট একটি চামড়ার ব্যাগে আমার নেতা শেখ মুজিব রেকর্ডের একটি কপি, বঙ্গবন্ধুর সাথে হাফিজ কাকুর কাছ থেকে সংগৃহিত একটি সাদাকালো ছবি, লুঙ্গি ও গেঞ্জি দিয়ে ভালো করে ব্যাগের নিচে সেঁটে দিয়ে উপরে একটি পাজামা, একটি পাঞ্জাবি ও একটি শার্ট নিয়ে খুব ভোরে আমরা ৭/৮ জন বেরিয়ে পড়লাম।

গ্রাম্য পথ ধরে কয়েতপাড়া দিয়ে ভুলতা গিয়ে বাসে চড়ে সাড়ে ১০টা নাগাদ নরসিংদী। মিতালী সিনেমা হলের কাছে আমাদের বাসটি থেমে গেলো। আমরা নামার আগেই একজন খান সেনা উঠে সবাইকে নামার নির্দেশ দিলো 'উৎরো' 'উৎরো' বলে। ভয়ে সবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। আমার মনে হচ্ছিলো যেন অজ্ঞান হয়ে যাবো। নামার সাথে সাথে দু'জন খান সেনা আমাদের প্রত্যেকের ব্যাগ নিয়ে একটি স্তূপে রাখলো। তারপর লাইন ধরালো। পরপর ১০/১২টি লাইনের পর আমাদের লাইন প্রত্যেকটিতে কয়েকশো করে মানুষ। অগত্যা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা মৃত্যুর জন্য। কেননা, আমার ব্যাগে যা ছিল, সেটা তল্লাশি চালালে আমাকে ওরা শেষ করে দেবে। আতঙ্কে কাঁদতেও যেন ভুলে গেলাম। কোনো অনুভূতিই যেন কাজ করছে না। আমাদের লাইনটি আসতে বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। কোনো রকমে শরীরটাকে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছি। ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, কিছু বলার শক্তি নেই, শুনার শক্তিও নেই। এক সময় দেখলাম আমরা লাইনে আর কয়েক জন বাকি। আমি ভয়ে ভয়ে ব্যাগ রাখার স্থানটির দিকে তাকালাম। দেখলাম ব্যাগগুলি প্রায় শেষ! খানেরা সব লুট করে নিয়ে গেছে। কারোটা কাউকে দেয়নি। এখনও যারা এসে রাখছে, তাদেরগুলিও নিয়ে যাচ্ছে ! কোথা থেকে যেন বেঁচে থাকার এক ক্ষুদ্র আশা আমাকে সাহস যোগালো। ওরা একেক জনকে একেক প্রশ্ন করছে, আর উত্তর দিতে দেরী হলে লাঠি দিয়ে বাড়ি মারছে।

এবার আমার পালা। তড়িৎ প্রশ্ন 'তুমি কেয়া মুক্তি হায়?' আমি উর্দু বলতে পারতাম খুব! বললাম, 'নেই সাহাব। ম্যায় পাকিস্তানকা এক আম আদ্‌মী হুঁ!' আবার তড়িৎ প্রশ্ন 'কেয়া করতে হো?' আমিও বললাম 'মেরা এক ছোটাসা কারবার হ্যায়। কাপড়ে কা।' আবার বললো 'ইয়াহা কিস্‌ লিয়ে আয়েহো?' 'কাপড়ে খরিদ করনেকে লিয়ে।' আমার এ উত্তরটি শুনে বারবার আমাকে দেখছিল পরনে লুঙ্গি, গায়ে হাওয়াই শার্ট। মোটামুটি নতুন। পকেটে একটি পাইলট কলম। চাইনীজ। কি যেন কী ভেবে আমাকে ওদের সাথেই দাঁড় করিয়ে রাখলো।

একটু পর এক কর্ণেল সাহেব আসলে তাঁর কাছে গিয়ে আমাকে দেখিয়ে সৈনিকটি কি যেন বললো। আমি আবার ভয় পেয়ে গেলাম। মনে মনে এবার কী যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রনা অনুভব করলাম। ততক্ষণে আমার সঙ্গিরা কে যে কোথায় চলে গেছে তাদের কোনো চিহ্নই নেই। তবে ব্যাগটি সাথে নেই বলে মনে একটু সাহসের সঞ্চারও হয়েছে। কর্ণেল সাহেব ইশারায় আমাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে পকেট থেকে পাইলট কলমটি খুলে নিয়ে উপরে লেখা আমার নামের তিনটি আদ্যাক্ষর ইংরেজিতে লেখা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমহারা পেনকে উপরাইয়ে IMR কিউ হ্যায়- "মেরা নামকা তিন পহেলা হরফ।" তৎক্ষণাত আমার উত্তর। ততক্ষনে আমি আমার নামের তিন অক্ষরের নতুন নাম ঠিক করে ফেলেছি। বললাম, "ইমাম মমতাজুর রহমান।" মনে হয় তিনি প্রসন্ন হলেন। বললেন "তব তুমহারা ইমামকা নেশানি কাঁহা হ্যা ?" অর্থাৎ 'তোমার দাড়ি কই!' আমি বললাম, "মেরা খানদানকা হর আদমী- নামকে পহেলে ইমাম ইস্তেমাল করতে হ্যায়।" স্মিত হেসে তিনি আমাকে বললেন "ঠিক হ্যাঁয়। তুম উনকে সাথ বাত করো।" বলে পূর্বোক্ত খান সেনাকে দেখিয়ে দিলেন। পরে খান সেনাটির সাথে কথা বলে জানলাম, আমাকে ওদেরই সঙ্গে থাকতে হবে দো-ভাষী হিসেবে। রইলাম বাধ্য হয়েই। শুধু বেঁচে থাকার আশায়। কাজ ছিল ওদেরকে বাঙালিদের কথা উর্দুতে বুঝিয়ে দিয়া আর ওদের কথা বাংলায় বাঙালিদের বুঝিয়ে দেয়া। বিনিময়ে ওদের সাথে ফ্রি থাকা খাওয়া। পরে বহু অনুনয় বিনয় করে মুক্ত হয়ে কয়েকদিন পর আবার গ্রামে ফিরে যাওয়া।

ঠিক পরের সপ্তাহেই বাবার মামাত ভাই খগেন ও এক দূরসম্পর্কের মাসতুত ভাই সাধনকে নিয়ে কসবা হয়ে আগরতলা চলে যাই। তবে অবশ্যই নরসিংদী দিয়ে নয়।

৮. অত্যন্ত গৌরব ও গর্বের সাথে আমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমার সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে অনুভব ও মূল্যায়ন করি। আমি মনে করি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। বাংলাদেশের পূণ্য মাটিতে জন্ম লাভ করে আমি তাই তৃপ্ত, কৃতজ্ঞ ও ধন্য।

৯. শিল্পীদের তালিকা মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" অপশনে গিয়ে শিল্পীদের গেজেটটি বের করলেই পাওয়া যাবে।

তাঁদের সবার ভূমিকা ও লক্ষ্য কমবেশী একই ছিল। আর তা হলো স্বাধীনতা অর্জন।

কাদেরী কিবরিয়া

১। মূলত গানের জগতে আমার হাতেখড়ি আমার শ্রদ্ধেয় বাবা ডা: গোলাম কিবরিয়ার হাত ধরেই। আমার বাবা সঙ্গীত অন্তপ্রাণ ছিলেন এবং নিজেও গাইতেন। এছাড়া আমার বড় বোনেরা গৃহে সঙ্গীত শিক্ষকের নিকট গানের তালিম নিতেন। বোনদের গান শুনে শুনে ও গোপনে বোনদের হারমোনিয়াম খুলে গান গাওয়ার চেষ্টা থেকেই আমার সঙ্গীতের শুরু।

২। পাকিস্তান আমলে যেহেতু উর্দু গানের প্রাধান্য বেশি ছিল তাই বাঙালি ভাষা ভাষী শিল্পীদের পথ চলা তুলনামূলকভাবে বন্ধুর ছিল বৈকি। আমি প্রধানত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী হিসাবেই গানের জগতে পথ চলা শুরু করি। রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনা পাকিস্তান আমলে যথেষ্ট সীমিত ও নেতিবাচক ছিল। জীবন জীবিকার কারণে বা পরিচিতির প্রয়োজনে যেটাই বলুন না কেন তখন বাংলা ভাষা ভাষী শিল্পীদের উর্দু ভাষায় গান গাওয়ার প্রবণতা ছিল বা গাইতে বাধ্য ও হতেন।

৩। দেখুন প্রথমেই একটি কথা বলি সংস্কৃতি হল এমন একটি বিষয় যেটা একজন ব্যক্তির মা ও মাতৃভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট। একটি শিশু যখন মায়ের ক্রোড়ে বেড়ে উঠে তখন সেই শিশুটি মায়ের সংস্কৃতি নিয়েই বেড়ে উঠে এবং তার প্রতিটি পদক্ষেপে অতি সূক্ষ্ম ভাবে সেই সংস্কৃতি গাঁথা হয়ে যায়।

এছাড়া একজন শিল্পী যিনি সঙ্গীত বা অন্য যে কোন শিল্পের মাধ্যমে বিচরণ করুন না কেন তার নিজস্ব সংস্কৃতির উপর নির্ভর করেই তিনি শিল্পী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। এটা কিন্তু পরীক্ষিত যে নিজের সংস্কৃতি ভিন্ন অন্য সংস্কৃতিতে মানুষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনা। এর মূল কারণ হল আপনি যতো সহজে নিজের ভাষায় আপনাকে প্রকাশ করতে পারবেন বা আবেগ ঢালতে পারবেন তা অন্য ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ হলেও পারবেন না।

অতএব, আমি যেহেতু বাঙালি বাংলা সংস্কৃতি আমার মূল আকর্ষণের স্থান। আমার বাংলা সংস্কৃতি এতো বেশি প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ তাই এর বাইরে অন্য কোন সংস্কৃতি আমাকে আকর্ষণও করেনা। চিন্তা করে দেখুন একজন রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে কি ভাবেই না স্রষ্টা সৃষ্টি কে একত্রিত করেছেন, এছাড়া বাংলা সংস্কৃতি কে আরও অনেকেই সমৃদ্ধ করেছেন যেমন নজরুল, জীবনানন্দ, সুকান্ত, লালন, হাসন...। আমি সারাজীবন এই সংস্কৃতি কে লালন করেছি এবং তা নিয়েই বাকিটা জীবন গর্ব করে যেতে চাই।

৪। অনেক ক্ষেত্রে হয়েছি, বিশেষত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে অনেক বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই সময় আমার বয়স অত্যন্ত কম ছিল, ১৯ বছরের তরুণ আমি। রবীন্দ্র সঙ্গীত

পরিবেশনার সুযোগ ছিল সীমিত। এছাড়া বাঙালি শিল্পীদের সরকারের উদ্যোগে বিদেশে প্রেরণ ও বিভিন্ন বিদেশি স্কলারশিপ প্রদানও ছিল সংখ্যার দিক থেকে অনেক নগণ্য।

এছাড়া যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমার বাবার মোহাম্মদপুর বাবর রোডস্থিত বাসাটি তে পাক হানাদার বাহিনীর নেতৃত্বে স্থানীয় অবাঙালিরা লুটতরাজ শেষে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে আমার পরিবারের সদস্যগণ সবাই নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় পথে নামতে বাধ্য হন।

৫। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম মূলত ২টি প্রধান উৎস থেকে...

প্রথমত: বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের উদাত্ত আহ্বান থেকে "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

দ্বিতীয়ত: আমার বাবার নির্দেশে বাঙালি ভাষা ভাষীকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রদানে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে।

৬। আমাদের বয়সের কাছাকাছি যারা আছেন, এখন যাদের বয়স ৬০/৭০/৮০/৯০ এর কোঁটায় তারা সকলেই জানেন তখন স্বাধীন বাংলা বেতারের গান মুক্তিযোদ্ধাদের কিভাবে প্রতিদিন শত্রুর মুখোমুখি হবার শক্তি যোগাতো। স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রচারিত আমাদের গান গুলির স্পিরিট/উদ্দীপনা হৃদয়ে ধারণ করে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা মা মাটি কে শত্রু মুক্ত করতে জীবন বাজী রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সম্মুখ যুদ্ধের মতই স্বাধীন বাংলা বেতারের কণ্ঠ যোদ্ধারা একই সমান শক্তি সাহস নিয়ে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলো। আমাদের গানগুলো ছিল প্রচণ্ড উদ্দীপনায় ভরা। একটি যুদ্ধকে বেগবান করতে এবং যোদ্ধাদের নব উদ্যাম এবং মানসিক শক্তি যোগাতে আমদের পরিবেশিত ও প্রচারিত গানের কোন বিকল্প ছিল না।

৭। যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি যখন আরিচা পার হয়ে ডাব-বাগান বিশ্বাস বাড়ি নামক স্থানে সাময়িক ঘাঁটি গেঁড়ে অবস্থান করছিলাম ওই সময় এক রাজাকার নেতার নেতৃত্বে পাক হানাদার বাহিনী সেখানে আক্রমণ করে। আমাদের সবাইকে এক লাইন এ সমবেত করে মেরে ফেলার জন্য। সেই সময় আমি তাদের সাথে আমার এক পূর্ব পরিচিত মানুষ কে দেখতে পাই। উনি ছিলেন তৎকালীন মন্ত্রী কাজী কাদেরের ড্রাইভার। কাজী কাদেরের স্ত্রী কানিজ আপা আমার গানের ভক্ত ছিলেন, প্রায়:শ এই ড্রাইভার আমাকে উনার বাসায় নিয়ে যেতেন সঙ্গীত পরিবেশনার জন্য। আমি তখন ১৯ বছরের তরুণ, মনে ভয় এইখানেই আজ জীবনের পরিসমাপ্তি হবে, বাবা মা কোনোদিনও জানতে পারবেন না আমার এই পরিণতি। ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় সেই ড্রাইভারকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করলাম। ড্রাইভার আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন উনার কথা মত কাজ করতে এবং তিনি কিছু প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর উনি একজন আর্মি অফিসার কে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে আসলেন, অফিসার আমাকে বললেন "তুম কেয়্যা করতা? আমি বললাম গান গাই এবং সিনেমায় কাজ করি। অফিসার আবারও জানতে চাইলেন কার গান গাই? বললাম মেহেদি হাসানের গজল গাই,

বললেন শোনাও। আমি সেই দিন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কি গেয়েছিলাম জানিনা তবে আমাকে লাইন থেকে সরিয়ে রাখা হলো। তারপর লাইনের সমস্ত মানুষকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হলো, বেঁচে রইলাম আমি সাক্ষী হয়ে। এরপর আমাকে পাক বাহিনী ছেড়ে দিলো... ধরা পড়ার পর ওদের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের কষ্ট, মনে মৃত্যু ভয় সেই নিয়ে ওখান থেকে কোনোমতে দিঘলিয়ায় এসে আমার এক আত্মীয় ডাঃ আইনুলের বাসায় এসে পৌঁছাই, এবং তার পরেই অজ্ঞান হয়ে পরি, তিন দিন পর উনার চিকিৎসা ও সেবায় জ্ঞান ফিরে পাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে সেই দিন রক্ষা করেছিলেন বলেই আজ আমি আপনাদের কাদেরি কিবরিয়া।

৮। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পেরেছিলাম বলে আমি চিরকালই গর্বিত। স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে লাখো মুক্তিযোদ্ধা, কণ্ঠযোদ্ধা, সহায়তা প্রদানকারীদের মতো আমিও আমার ক্ষুদ্র অবদান রাখতে পেরেছি।

স্বাধীনতা অর্জন বিষয়টি মূল্যায়ন এক কথায় করা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা এসেছিলো বলেই আজ আমি কাদেরি কিবরিয়া, স্বাধীনতা এসেছিলো বলেই আজ এই দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন বাঙালি, রাষ্ট্রপ্রধান একজন বাঙালি, সচিবগণ সবাই বাঙালি, সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সহ অন্যান্য সকল সদস্যরা বাঙালি, এক কথায় সবাই বাঙালি। আজ বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ, ক্রিকেট নিয়ে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে, আজ বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা বিশ্ব অর্থনীতি, রাজনীতি সহ বহু ক্ষেত্রে দাপটের সাথে পাল্লা দিয়ে এগুচ্ছে। এই অর্জন গুলো ৪৬ বছরে খুব কম কিন্তু নয়, স্বাধীনতা না আসলে এর কিছুই আয়ত্তে আসতো না বাঙালিদের হাতে। আমি আশাবাদী মানুষ আশা নিয়ে বাঁচতে চাই, বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে প্রথম সারির দেশ হিসাবে একদিন অবশ্যই গণ্য হবে।

৯। সেই সময় স্বাধীন বাংলা বেতারে মহাম্মদ আব্দুল জাব্বার, আপেল মাহমুদ, সর্দার আলাউদ্দিন, রথিন্দ্রনাথ রায়, আহমেদ শাহ বাঙালি, মঞ্জুর আহমেদ, মান্না হক, অরূপ রতন চৌধুরি, কামাল উদ্দিন, মনোওয়ার হোসেন, আঙ্গুর, সমর দাশ, অজিত রায়, সুজেয় শ্যাম, গোপী বল্লভ (তবলা) সুবল দাশ (ভায়োলিন), অরুণ গোস্বামী, সুনীল গোস্বামী (তবলা)। এ ছাড়া মহিলা শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন রুপা খান, মালা খান, নমিতা ঘোষ, রমা সাহা, সপ্না রায়, কল্যাণী ঘোষ, উমা খান। আরও কয়েকজন ছিলেন যাদের নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।

আমারই মতো তারাও এই দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য জীবন বাজী রেখে মাতৃভূমি ছেড়ে স্বাধীন বাংলা বেতারে যুক্ত হয়েছিলেন।

তিমির নন্দী

১. মা গান গাইতেন, এ স্রাজ বাজাতেন। বোনেরা গান গাইতো, নাচতো। বাসায় বিভিন্ন শিল্পীদের আনাগোনা ছিল, গানের আসর বসতো। সাড়ে তিন বছর বয়সে তবলা বাজানো শুরু করি কোন ওস্তাদ ছাড়াই। তার বছর দুই পরে নিজে নিজে হারমোনিয়াম বাজানো শুরু করি। ক্লাস থ্রীতে পড়াকালীন সময়ে বেঞ্জো বাজানো শিখি। অর্থাৎ একই সময়ে তিনটি বাদ্য যন্ত্র বাজানো এবং পাশাপাশি সঙ্গীত পরিবেশন করা। ততদিনে অনেক গোল্ড মেডেল ও কাপ অর্জন করি।

বাবার চাকুরি সূত্রে বাগেরহাটে ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় এক অনুষ্ঠানে আমার কণ্ঠে খেয়াল এবং নজরুল সঙ্গীত শুনে শহীদ আলতাফ মাহমুদ ছুটে এসে আমাকে কোলে তুলে আদর করে ঢাকা চলে আসতে বলেন। উনার সাথে আরো ছিলেন প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী, গণসঙ্গীত সুরকার শেখ লুৎফুর রহমান এবং বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী শবনম মুস্তারী। সঙ্গীতে আমার আসার একদম শুরুটা এমনই ছিল।

২. ১৯৬৯ সালে ঢাকায় ইস্ট পাকিস্তান মিউজিক কম্পিটিশনে আধুনিক গানে প্রথম হয়ে স্বর্ণ পদক এবং পল্লীগীতিতে দ্বিতীয় হয়ে রৌপ্য পদক অর্জন করি। এই কম্পিটিশনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও প্রতিযোগীরা এসেছিল। এ বছর থেকেই রেডিও পাকিস্তান ও পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশন থেকে গান গাওয়া শুরু করি। আমাদের দেশি শিল্পীদের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তান-এর শিল্পীদের আধিক্য বেশি ছিল। তবে আমাদের অনুষ্ঠানগুলি বাঙালি কর্মকর্তারাই পরিচালনা ও প্রযোজনা করতেন। আমাদের মধ্যে সবার খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল। ছিল শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং স্নেহ। তাই কোন সমস্যা আমি তখন দেখিনি।

৩. আমি সঙ্গীত বিষয়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়াশুনা করেছি। সেখানে আমি প্রতিটি অনুষ্ঠানে রাশিয়ান, ইংলিশ, স্প্যানিশ গানের পাশাপাশি বাংলা গান পরিবেশন করেছি এবং বাংলা গান গাইবার আগে তার মর্মার্থ বলে দিতাম। অর্থাৎ আমি যেখানে যে পরিবেশেই থাকিনা কেন বাংলা গানকে ঘিরেই ছিল আমার অনুষ্ঠান। আর তাইতো বাইরের কোন দেশে থেকে যাওয়া অথবা চলে যাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি নিজ দেশে ফিরে আসি এবং এখনও পর্যন্ত একজন বাঙালি, একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে বাঙালি ঐতিহ্য এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে বুকে ধারণ করে চলেছি।

* ৪ নং প্রশ্নের উত্তর ২নং প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে।

৫. আমি ও আমাদের পরিবার ২৫শে মার্চ ১৯৭১ কাল রাত্রির আগেই আমার মেজো ভাইয়ের সদ্য বিবাহ সূত্রে তাঁর শ্বশুর বাড়ি কুড়িগ্রামে ছিলাম। মেজো ভাই তখন ঢাকাতে একা।

পরবর্তীতে ওখানে পাকিস্তান আর্মি পৌঁছে যাওয়ায় আমরা কুড়িগ্রাম থেকে বারো মাইল দূরে বাগুয়া নামক একটি অজপাড়া গাঁয় সরে যাই। সন্ধ্যা ৭টায় গ্রামের সবাই খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লে আমরা রেডিও অন্ করে ভলিয়্যুম কমিয়ে কান পেতে বিবিস, ভয়েস অব এ্যমেরিকা, আকাশবাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতাম। পরে ওখানে সারারাত লাঠি হাতে গ্রাম পাহারা দিতাম। তখন থেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার কথা ভাবি। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও পরবর্তীতে আমার মা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করতে বললে মায়ের কথা মেনে নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করি।

৬. বলার অপেক্ষা রাখেনা যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিলো মুক্তিযুদ্ধের প্রথম তৎপরতা। সেখান থেকে প্রচারিত প্রতিটি অনুষ্ঠান যেমন, খবর, কথিকা, এম. আর. আখতার মুকুলের রম্য রচনা ‘চরমপত্র’, নাটক ‘জল্লাদের দরবার’, গান, প্রতিটি বিষয়ই মুক্তিযোদ্ধাদের এবং বাংলাদেশে আটকে পড়া বাঙালিদের প্রচুর সাহস যোগাতো, উজ্জীবিত করতো। উক্ত বেতার কেন্দ্রের এক এতটি শ্লোগান এবং গান ছিল এক একটি বুলেটের মতো। অনেক মুক্তিযোদ্ধাই আমাদের গান শুনে উজ্জীবিত হয়ে অসীম সাহসে বলিয়ান হয়ে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মিদের সফলতার সাথে মোকাবেলা করেছে। কোন কারণে বেতার কেন্দ্রটি কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে অথবা অধিবেশন শেষ হয়ে গেলে মুক্তিযোদ্ধা এবং বাঙালিরা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। আশায় বুক বাঁধতেন, অপেক্ষা করতেন, কখন আবার বেতার কেন্দ্রটি চালু হবে! আমি নিজেও বাগুয়া গ্রামে থাকাকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অধিবেশন শেষ হয়ে গেলে বিমর্ষ হয়ে পড়তাম, কেন শেষ হয়ে গেল? কেন আরো কিছুক্ষণ অনুষ্ঠান প্রচার করা গেলনা ইত্যাদি।

৭. ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। সকাল থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে একটি গানের মহড়া চলছে। স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটা নাগাদ খবর এলো ঢাকা স্যারেন্ডার করেছে! উল্লাসিত হয়ে পড়লাম আমরা সবাই! ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র! রাস্তায় ভারতীয়রাও বাংলাদেশী পতাকা হাতে ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানে রাজপথ মুখরিত করলো! আমরা একে অপরকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। আজ থেকে দেশ স্বাধীন হয়েছে! এতদিনের কষ্ট আজ সফল হয়েছে! আমরা বিশ্বে নতুন এক মানচিত্র পেয়েছি, স্বাধীন দেশের একটি পতাকা পেয়েছি, পেয়েছি স্বাধীনতা!

গীতিকার শহীদুল ইসলাম গান লিখলেন, ‘বিজয় নিশান উড়ছে ঐ।’ সুরকার সুজেয় শ্যাম সুর করলেন এবং সঙ্গীত পরিচালক অজিত রায়কে বললেন গানটি লিড্ করতে। আমরা সবাই মিলে গান রেকর্ড করলাম। সবশেষে ঘরে ফেরার পথে সদ্য রেকর্ড করা গানটি রেডিওতে শুনতে পেলাম, ঠিক তখনই ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে পাকস্তানি জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় জেনারেল অরোরার কাছে ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করছে।

৮. আমার খুব ইচ্ছে ছিল অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার। তাই আমি এখানে কিছুটা অতৃপ্ত। তবে কণ্ঠ দিয়ে যুদ্ধ করে সেই দিনগুলিতে মুক্তিযোদ্ধা এবং বাঙালিদের পাশে থাকতে পেরেছি, অনুপ্রেরণা যোগাতে পেরেছি, উজ্জীবিত করতে পেরেছি, তাঁদের শক্তি সঞ্চয়ে সহায়তা করতে পেরেছি, এ সব কথা ভাবলে অনেক পুলকিত হই। ত্রিশ লাখ শহীদ ও ২ লাখ বা তারও অধিক মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের লাল-সবুজ জাতীয় পতাকা দেখলে গর্বে বুক ভরে ওঠে যে, এই পতাকা অর্জনের জন্য আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙালি কতই না ত্যাগ স্বীকার করেছি! আর ঐ পতাকার জন্য একটু হলেও আমার অবদান আছে! আমি গর্বিত!

৯. *সূত্র: 'একাত্তরের রণাঙ্গণ'— শামসুল হুদা চৌধুরী

দ্বাদশ পরিচ্ছদ— স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নিবেদিত রচনাবলী

পৃষ্ঠা ৪১৩ দ্রষ্টব্য

সঙ্গীতশিল্পী এম, এ মান্নান

১। ছোট বেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে নানান কিছু করেছি। গলাটা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত। আমার ফুপাত ভাই সোহরাব হোসেন বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী। ভাইয়ের গান শুনে আমার গানের জগতে আসা। বাবা-মাকে হারিয়ে ফুফুর কাছে বড় হয়েছি। দর্শনা চিনিকলে ছোট খাটো একটি কাজ করতাম। ওখানে খুব গান বাজনা হতো। রাজশাহী বেতারের শিল্পী জনাব হাশমত আলী চৌধুরীর কাছে অনেক দিন তালিম নিয়েছি। আমার জন্ম পশ্চিম বাংলার নদীয়া জেলার আইশতলা গ্রামে। ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে দর্শনা থেকে রাজশাহী চলে আসি এবং ১৯৬৫ সালের প্রথম দিকে রাজশাহী বেতারে অনুষ্ঠান শুরু করি। ১৯৬৮ সালে ঢাকায় চলে আসি, গান গাওয়ার সাথে গান শিখাও শুরু করি। ১৯৬৬ সাল থেকে টেলিভিশনে গান গাওয়া শুরু করি।

২। অন্যান্য শিল্পীদের কোনো অসুবিধা হয়েছিল কিনা জানিনা কিন্তু আমার কোনো অসুবিধা হয় নি। আমিতো ঢাকায় আসি এবং একটি কাজে জড়িয়ে পড়ি। ১৯৬৯ সাল থেকে অসহযোগ আন্দোলনে আমরা বেশ কিছু শিল্পী জড়িত ছিলাম। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের সময় আমিও একটি লাঠি নিয়ে সবার সাথে বসে ছিলাম। এর পরে বাড়িতে যাই মানে দর্শনায়। এরপর ঢাকাতে আর ফিরতে পারিনি। এপ্রিলের শেষের দিকে কিম্বা মে মাসের দিকে জানতে পারি পশ্চিম বাংলার নদীয়া জেলার মাজদিয়াতে মুক্তিবাহিনী অভ্যর্থনা ক্যাম্প হয়েছে। আমি ঐ মাজদিয়া মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে চলে যাই। সম্ভবত জুন মাসের মাঝামাঝি আমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যাই। আমি ক্যাম্পেই থাকতাম। প্রতিদিন সকালে আমার একটি কাজ ছিল সেটা হলো মুক্তিযোদ্ধারা শারীরিক কসরত করে সবাই দাঁড়িয়ে থাকত আমি খালি গলায় 'কারার ঐ লৌহকপাট, দূর্গমগীরি, এই শিকল পরা ছল, মোরা ঝঞ্জার মত উদ্দ্যাম গানগুলি গাইতাম, এরপরে কোলকাতার বালিগঞ্জে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে চলে যেতাম। বেতার কেন্দ্রে গান করতাম এবং সঙ্গীত পরিচালনাও করতাম।

শিল্পী আজাদ রহমান

১। মুক্তিযুদ্ধ ২৫ মার্চ রাতে শুরু হয়েছে তাতো নয়। এই ভূ-খণ্ডের বাংলাভাষী মানুষ বহুকাল ধরে তাদের জীবন সংগ্রাম চালিয়েছে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৯৪৭ সালেও এই দেশের মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অধিকার হীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রাণ দিয়েছে।

শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্বের গুণে, তার ত্যাগ, তার স্বপ্ন বাঙালির মাঝে তিনি সফলভাবে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। সবাই তার নেতৃত্বে পাকিস্তানের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। তাঁর পূর্বে এমনভাবে বাঙালিকে কেউ ঐক্যবদধ করতে পারে নাই।

২। বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশের পরিবেশ ছিল না। বাংলা ভাষার উপর আঘাত করা হয়েছিল বাঙালিকে সংস্কৃতিগতভাবে পিছিয়ে দেয়ার জন্য। আমরা তখন থেকেই সোচ্চার ছিলাম বাংলা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে। বাঙালি চাপিয়ে দেয়া সংস্কৃতিকে মেনে নেয়নি।

৩। বাংলা ভাষাকে ভালোবাসার কারণেই আমি বাংলা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাই। অনেক সময়েই বাংলা সংস্কৃতির বিকাশকে সরকারি হস্তক্ষেপে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বাঙালি তা মেনে নেয় নাই।

৪। কিছুটা বিরূপ পরিবেশ আমাদের স্বাভাবিক পথ চলাকে কিছুটা তো বাধা দিতই। সেটাকে কাটিয়ে আমরা আমাদের মতো কাজ করতে চেষ্টা করেছি।

৫। পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে শিল্পীদের মাঠের যুদ্ধ শুরু হয়েছে ২৫ মার্চের অনেক আগেই। অনেক গান লিখেছি সেই সময়ে। শিল্পীদের কণ্ঠের সেই সকল গান উত্তাল জোয়ার এনেছিল। বাঙালি শিল্পীরা সেই সকল গানে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে সাধারণ বাঙালিকে সচেতন করেছে, প্রতিবাদী করেছে।

৬। অনেক অনুপ্রাণিত করতো। অনেক গান লিখেছি আমরা, সুর দিয়েছি। প্রতিবাদের কথা আর সুরের সেই গানের জন্য আমাদের প্রতি প্রশাসন নাখোশ ছিল। সরকারি চাকুরে হিসেবে ভয়ও ছিল। তারপরও আমরা গানের আন্দোলন চালিয়ে যাই। তখনকার অত্যন্ত জনপ্রিয় গান (১) সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম, (২) পুবের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে আলোকে আলোকময়, (৩) জন্ম আমরা ধন্য হলো মাগো। আমি এ সকল গানের সুরকার ছিলাম বলে অনেক বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। (৪) রক্তেই যদি ফোটে জীবনের

ফুল, (৫) কেঁদোনা মাগো আর কেঁদোনা, তাহের সুলতান সেই সকল রেকর্ড করা গান কোলকাতায় নিয়ে গেছে। ১নং গানটি টেলিভিশনে বার বার প্রচার করে ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস পালন না করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল শিল্পী ও কলাকুশলীরা।

৭। ২৫ মার্চের পর দুইবার পাক বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে পেরেছিলাম। একবার দেশ ছেড়ে পালাতে গিয়ে গাড়িতে কোন 'সীট' না পেয়ে আমি সোহরাব হোসেন, বেদারউদ্দীন মন খারাপ করে বসে থাকা অবস্থায় শুনতে পাই ১ম বাসটির সকল যাত্রীকে মেরে ফেলা হয়েছে। তখন সিদ্ধান্ত নিলাম কোথাও যাব না, দেশেই থাকবো, যা হাবার হবে। মরতে হলে দেশে থেকেই মরবো।

আরেক বার ধরা পড়লাম আমি। ধীর আলী মিয়াসহ আরো ২/৩ জনকে একসাথে ধরে নিয়ে যায়। 'জন্ম আমার ধন্য হলো' গানটির জন্য। অনেক মিথ্যা কথা বলে বাঁচতে পেরেছিলাম। গানটি রেকর্ড হয়েছিল করাচিতে। আমরা যারা অবরুদ্ধ বাংলাদেশে ছিলাম তারা এভাবেই মিথ্যা বলেছি বাঁচার জন্য কিন্তু আমরা সবাই দেশের জন্য কাজ করেছি।

৮। বঙ্গবন্ধুর বিশাল ব্যক্তিত্ব আর তার মতো একজন যোগ্য নেতার নেতৃত্ব পেয়েছিল বলেই দেশ এত কম সময়ে স্বাধীন হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন তাহলে এই দেশ অন্য পর্যায়ে চলে যেত। আমরাই তাকে বাঁচাতে পারি নাই। আমরা দেশপ্রেমের নামে অনেক সময় দেশের ক্ষতি করে ফেলি। আমাদের সবকিছুর উপরে থাকবে দেশপ্রেম। বর্তমান সরকারের সঙ্গীতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া এবং প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের শিক্ষক নিয়োগ দান, তাদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যা শিল্পীর জীবনের নিশ্চিয়তা দিয়েছে এই বিষয়টা আমি অনেক গুরুত্ব দিয়ে অনুভব করি। সরকার প্রশংসা পাওয়ার মতো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা ইতিপূর্বে হয় নাই। মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীদের অবদান নিয়ে তুমি কাজ করছ, এটা কখনই সম্ভব হতো না সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এই উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে। বাংলাদেশ এভাবেই এগিয়ে যাবে।

গীতিকার/সুরকারদের জন্য প্রশ্নমালা

১. সঙ্গীতের জগতে আসার শুরুটা কবে ও কিভাবে হয়?

২. পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি সুরকার/গীতিকার হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

৩. ঐ সময়ে কোনো বিরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন কি?

৪. সঙ্গীত জগতে বা আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনি কতটা স্বাধীন ছিলেন?

৫. বাঙালি সংস্কৃতি আপনার কাজে কতটা প্রভাব ফেলেছিল?

৬. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা পেলেন কিভাবে?

৭. ঐ সময়ে সঙ্গীত রচনা ও সুরারোপ করার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেত?

৮. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সেই গানগুলো মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে কিভাবে শক্তি যোগাতো, অনুপ্রাণিত করতো?

৯. মুক্তিযুদ্ধকালীন কোনো স্মৃতির কথা উল্লেখ করুন?

১০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাধীনতা অর্জন- বিষয়টিকে আপনি কিভাবে অনুভব করেন ও মূল্যায়ন করেন?

সুজেয় শ্যাম

- গীতিকার

১. আমার জ্যাঠামশাই শ্রি নরেশচন্দ্র শ্যাম এর উৎসাহে। তাঁর উৎসাহে বাড়িতে কীর্তন, আউল, বাউল গান এর অনুষ্ঠান প্রায়ই হতো। ৪-৫ বছর বয়সে আমি সেই আমার মন্দীরা নিয়ে বসে পড়তাম। সেখান থেকেই সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসাটা গড়ে ওঠে। বাবা-মাও সঙ্গীতের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। আমার বড়বোন প্রভাতী শ্যাম ঢাকার রেডিওতে গান করতেন। এমন একটা পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণেই আমার সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ তৈরি হয়।

২. সমর দাস, রবীন ঘোষ মারা গেলেন, আবদুল আহাদ যাদের বিরাট ভূমিকা ছিল আমার উত্তরসুরীদের মধ্যে। তাদের যে অবদান বাংলা গানের ক্ষেত্রে কিন্তু মৃত্যুর পর জাতি তাদের প্রতি সেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারে নাই। যেমন আমাদের সঙ্গীত জগতের মানুষ গুলোর আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৭ এর পরপরই। তখন পাকিস্তান রেডিও থেকে 'এলান' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হত। ম্যাগাজিনের পেছনে অনুষ্ঠানসূচি দেয়া থাকতো। তখন সুর ঝংকার বা অনুরোধের আসর বলে একটা প্রোগ্রাম হতো, যখন সেখানে পূর্ব বাংলার শিল্পী, সুরকার, গীতিকার যেমন কে জি মুস্তফা, আজিজুর রহমান, আবদুল লতিফ প্রমুখদের লিখা ও সুরারোপিত এবং পূর্ববাংলার শিল্পীদের গান বাজতো তখন বিশাল উৎসাহবোধ করতাম। তাদের সেই অনুপ্রেরণায় আমরা বাঙালি হিসেবে দারুণ আনন্দিত ও উদ্দীপিত হতাম। আধুনিক গানের পাশাপাশি তারা দেশের গানও গেয়েছেন, সুর করেছেন ও লিখেছেন। সেগুলোও আমাদের উৎসাহ যোগাতো। ১৯৬৪ সালের থেকেই রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র শুরু করে যার কারণে সনজিদা খাতুন ও ফাহমিদা খাতুন ক্ষুব্ধ হয়ে ১৯৬৪-৬৫ সালে তারা রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন নাই। নিষেধাজ্ঞা যতদিন ছিল ততদিন তারা অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন। কলিম শরাফী এমন একজন মানুষ যিনি সঙ্গীত জগতে ত্যাগ ও অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু তাদের মতো শিল্পীদের মূল্যায়ন সেখানে হয় নাই। সঙ্গীতের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা দেখে অনুপ্রাণীত হয়ে ১৯৬৪ সালে আমি চট্টগ্রাম রেডিওতে (পূর্ব পাকিস্তান) গীটার বাদক হিসেবে (ক্যাজুয়াল) যোগদান করি।

৩. ১৯৬৭ সালে বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। আরো ৩৪ জন সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করা হয়।

তখন রেডিওতে অবাঙালি কিছু যন্ত্রী ছিল। ৩/৪ জন অফিসারও ছিল অবাঙালি। ওরা অনেক সময় আমাকে হিন্দু বলে আজে-বাজে কথা বলতো কিন্তু আমি গায়ে মাখতাম না কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যখন কটু কথা বলতো তখন আমি তা সহ্য করতে পারতাম না। ঝগড়া লেগে যেতো। আমি ১৯৬৮ সালে ঢাকা রেডিওতে যোগদান করি। পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধু, বাংলা ও পূর্ব-বাংলা নিয়ে অনেক বিরূপ মন্তব্য করতো যা সহ্য করতে পারতাম না।

৪. ঢাকায় আসার পর ছোটদের আসরের সঙ্গীত পরিচালনা করতাম। মাঝে মাঝে বড়দের গানে সুর করতে বলা হলে সেটাও করতাম। তখন ঢাকা রেডিওতে যারা বাঙালি অফিসার ছিলেন তারা সকলে একমত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ব্যাপারে এবং পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যায় ও অন্যায্য শোষণের ব্যাপারে। তখন আমি ঢাকায় এসে বড় বড় সঙ্গীত পরিচালকদের কর্মসঙ্গী হিসেবে পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। তাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল আহাদ, ধীর আলী মিয়া, সুবল দাস প্রমুখদের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। আমি ভাগ্যবান ছিলাম বলতে হয় তখন সঙ্গীত পরিচালক রাজা হোসেন খান এর সাথে আমার আলাপ হয়। উনার সাথে এতটাই আন্তরিক মিল ও সম্পর্ক ছিল যে আমরা রাজা ও শ্যাম নাম দিয়ে ছবিতে কাজ শুরু করি। ঢেউয়ের পরে ঢেউ ছবিটা ছিল আমাদের প্রথম ছবি। তারপর মেঘের পরে মেঘ। গান লিখার ক্ষেত্রে আমাদের উপর অনেক বিধি-নিষেধ আরোপ করা হতো। যার ফলে আত্ম-তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হতাম। এমনও হয়েছে অনেক গান লিখেছি কিন্তু তারা সেটা প্রচার হতে দেয় নাই।

৫. বাঙালি সংস্কৃতি পরিমণ্ডলে আমি বেড়ে উঠেছি। গাছের মূল যেমন, আমার গানের মূলও তেমন যা ছিল আমার বাড়ির সেই গানের পরিবেশ। পারিবারিক পরিবেশটাই ছিল সঙ্গীতময়। সিলেট জেলায় সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে আমিনুর রশিদ চৌধুরী ছিলেন সঙ্গীতের বিরাট অনুরাগী। পাকিস্তান আর্মীর টর্চার সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে বাংলা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। আমরা ছোটবেলা থেকেই ধর্ম নিরপেক্ষ পরিবেশে বেড়ে উঠেছি। আমাদের কাছে ধর্ম বলতে একটাই বিশ্বাস ছিল তা হলো মানব ধর্ম। আমাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম কোনো ভেদাভেদ ছিল না। পাড়ার সকল ঘর ছিল আমাদের সকলের, সবার আত্মীয় ছিল আমাদের সবার আত্মীয়। যেকোনো ধর্মের যে কোনো উৎসব-পার্বন, সবাই তাতে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতাম, উপভোগ করতাম। কর্মক্ষেত্রেও তা বিশাল প্রভাব ফেলেছিল।

৬. আমি তখন ঢাকা রেডিওতে কাজ করি। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিবেন জানতাম। সিলেটের বিভিন্ন শহরে যখন বড় বড় নেতা আসতেন, সেই ছোটবেলা থেকেই তাদের সভা-সমাবেশে যেতাম এবং আগ্রহ নিয়ে তাদের বক্তব্য শুনতাম। সেই থেকেই একটা সচেতনতা গড়ে উঠেছিল আমার মধ্যে। তারা যেভাবে বলতেন আমার কাছে বাস্তবতার নিরিখে সেটাকে সত্য বলে মনে হত। পরবর্তীতে ৭ মার্চের ভাষণ মাঠের উপস্থিতিতে আমি অবাক বিস্ময়ে

শুনেছি। তার অঙ্গুলি নির্দেশে উপস্থিত দর্শক বসতে বলার সাথে সাথে বসে পড়লেন। মনে হলো তার আঙ্গুলের নির্দেশে সবাই বসে পড়েছে। সেটা দেখতে একেবারেই সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তরঙ্গ করে বসে পড়ল। এর পূর্ব থেকেই শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলনে আমরা সহযোগিতা করা শুরু করেছি। তখনকার রেডিও'র RD (Regional Director) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আশরাফুজ্জামান। তারা প্রতিবাদ স্বরূপ ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পুরোটাই গোপনে Record করে ফেলেছিলেন আন-অফিশিয়ালি। তখনই আমরা বুঝে গিয়েছিলাম যে দেশে এই ভাষণের পর একটা যুদ্ধ হবে। ১৫ মার্চ ১৯৭১ আমি সিলেট চলে যাই। ২৫ মার্চ নিরালা হোটেলে আমরা ২/৩ জন বন্ধু বসে আলাপ করছিলাম আমাদের আর দেখা হবে কিনা ! ওখানে শুনলাম ঢাকায় পাকিস্তান আর্মী রেইড করেছে। তাড়াতাড়ি বাসায় যেয়ে খবর দিলাম। সকলে স্তব্ধ হয়ে গেলো। ২৮ মার্চ '৭১ Radio ঘুরাতেই On behalf of our great leader Sheikh Mujibur Rahman মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণা শুনলাম। এটা শোনার পর তখন থেকেই মনে মনে ঠিক করে ফেললাম আমাকে যেতে হবে। ৭ এপ্রিল সাতটি পরিবার নিয়ে সিলেট শহরের মধ্যে নিজেদের বাড়ি ছেড়ে দুই-আড়াই মাইল দূরে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। একরাত থাকার পর সিলেট থেকে একটু দূরে (২০/২৫ মাইল) একটা গ্রাম ঢাকা দক্ষিণ নামে গ্রামের জমিদার বাড়িতে আশ্রয় নেই। পূর্ব থেকেই ২৫/৩০টা পরিবার সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। এই বাড়ি থেকে ২০ মাইল দূরে ভারতীয় বর্ডার (কাছার বর্ডার বা করিমগঞ্জ) এর কাছে আশ্রয় নেই। সবসময়ই ভাবছিলাম আমার অবস্থান থেকে আমি কোথায় এবং কিভাবে কাজ করতে পারি। ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ সহ আরো অনেক শিল্পী আগরতলায় গেছেন। আরো কিছু আওয়ামী লীগ নেতারা সেখানে আছেন। করিমগঞ্জ থেকে বাবা-মাকে নিয়ে, আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে হাইলাকান্দি গেলাম। ওখানকার কংগ্রেস সরকারের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর সাথে দেখা করে বাবা-মায়ের অসুস্থতার কথা বলায় তারা আমাকে কয়েকটি অনুষ্ঠান করে দেয়ার মাধ্যমে শরণার্থীদের জন্য অর্থসংগ্রহের কথা বলেন। তারা বাবা-মায়ের জন্য বাড়ির ব্যবস্থা কররেন যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তারপর আমি গেলাম শিলং। তারপর গো-হাটি, তারপর কোলকাতা, কোলকাতার বাংলাদেশ হাইকমিশনে যখন গেলাম শিল্পীদের খোঁজে-সেখানকার একজন পূর্ব পরিচিত বললেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা, কিন্তু ঠিকানা জানাতে পারলেন না। জনৈক আত্মীয়ের সূত্রে ঠিকানা পেয়ে সুচিত্রা সেনের বাড়ির পাশে বালিগঞ্জে ৫৮/১, ৪ জুন তারিখে খুঁজে পেলাম। সুচিত্রা সেনের বাড়ির পাশে ছিল বলে অল্পতেই তা খুঁজে পেয়েছিলাম। সেখানে পরিচিত সবার সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। তাহের সুলতান ও আশফাকুর রহমান বললেন তোমাকে গান করতে হবে। 'আয়রে চাষী মজুর কুলি, মেথর কুমার-কামার' স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রথম আমার সুর করা গান। আমি দশটি গানে সুর করেছিলাম।

১. আয়রে চাষী মজুর কুলি- কথা : কবি দেলোয়ার।

২. রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি- কথা : আবুল কাশেম, সন্দ্বিপ

৩. আহা ধন্য আমার জন্মভূমি- কথা : বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, শিল্পী কল্যাণী ঘোষ, প্রবাল চৌধুরী।

৪. মুক্তির একই পথ সংগ্রাম- কথা : শহিদুল ইসলাম।

৫. আজ রণ সাজে সাজিয়ে বিষাণ- কথা : বিশ্বপ্রিয়।

৬. রক্ত চাই, রক্ত চাই- কথা : মনে করা সম্ভব হয় নাই।

৭. হাজার ভাইয়ের বিয়োগ ব্যথায় ”

৮. ওরে শোনরে তোরা শোন ”

৯. মনে করতে পারছি না -

১০. বিজয় নিশান উড়ছে ঐ- কথা : শহিদুল ইসলাম।

শেষ গানটির ব্যাপারে বলবো- ১৬ ডিসেম্বর আদেশ পেলাম বিজয়ের গান লিখতে হবে। সবাই চুপচাপ। কারো কাছেই কিছু শুনতে পাচ্ছি না। গুন গুন করে শহিদুল ইসলাম গানটি লিখে দিলো। শুরু হলো গুন গুন। সুর দেয়া থেকে রেকর্ড করা পর্যন্ত সময় লেগেছিল দেড় থেকে দুই ঘণ্টা। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম রেডিওতে ঘোষণা দিলেন; আমরা আজ থেকে স্বাধীন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান আসলেন। চারদিকে পটকা ফুটছিল, সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরছে। গানটি বাজছে, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। স্বর্গীয় আনন্দ-উচ্ছাস। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে আমার এই গানও ততদিন থাকবে। এ আমার জীবনের বিশাল পাওয়া, বিশাল এক স্মৃতি।

৭. গানের বাণী ও সুর দিয়ে কিভাবে জনগণকে /বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করতে পারি তাই ভেবে সুর করতাম।

৮. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কোথায় ছিল- তা কেউ জানতো না। কিন্তু আমরা সবসময় চিঠি পেতাম। এই গানটা খুব ভালো। এমন সুরের আরো গান করেন। এই ধরনের চিঠি আমাদের দারুন উৎসাহিত করতো। একই সাথে অবাক হতাম, মানুষ আমাদের ঠিকানা কোথায় পেলো? চাঁদ তুমি ফিরে যাও, এই দুর্দিনে আমরা তোমাকে চাই না’- ঈদের দিন এই গানটি বেজেছিল। এতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন রূপা ফরহাদ। বাঙালি ঈদ করবেনা সেই দুর্দিনে এটাই ছিল গীতিনকশার উপজীব্য।

৯. একটা কথা বলি ৪৪/৪৫ বছর আগে যে স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম কোনো রাজনৈতিক কর্মী না হওয়া সত্ত্বেও। কি হিন্দু, কি মুসলিম কোনো ভেদাভেদ তখন ছিল না। কিন্তু আজ এতদিন পর এসে আমরা কি দেখছি। আজ সেই হৃদ্যতা নেই, কোনোভাবেই তা মিলাতে পারি না। এটা আমার জন্য বড় কষ্টের, বড় বেদনার, যা আমাদের আহত করে। আমার ঐ

নয়টি মাস যে দিনগুলোতে আমরা সত্যিকার বাঙালি ছিলাম, সেই সময়টি আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমার যা কিছু আছে সব আমি দিয়ে দেব তার বিনিময়ে। বঙ্গবন্ধুর সেই প্রত্যাশিত স্বাধীনতা ছিল, তার স্বাদ পেয়েছি শত কষ্টের মাঝেও সেই নয়টি মাসে। আমাদের স্বাধীনতার উপলব্ধির সেই নয়টি মাস-তার স্বাদ আজো খুঁজে ফিরি।

১০. আমি যেদিন অজানার উদ্দেশ্যে পরিবার নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি। সেদিন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হই নাই, পরিবারের নিরাপত্তার জন্য বেড়িয়ে ছিলাম। তারপর যখন স্বাধীন বাংলা বেতারের কথা শুনতে পেলাম তখন আমি ঘরে থাকতে পারলাম না। আমি স্বাধীন বাংলা বেতারের খোঁজে বেড়িয়ে পড়ি। তারপর ঠিকানা খুঁজে পেয়ে আমার কাজে লেগে যাই। স্বাধীনতার পরে যখন দেশে ফিরে আসি, গ্রামে গঞ্জেও মানুষের ভালোবাসা কি পরিমাণ পেয়েছিলাম- সেটা জীবনেও ভুলবো না। আমি নিজেকে প্রশ্ন করি- আমি কি করেছি? তারা আমাকে এতো ভালোবাসে কেন? হোস্টেলে খেতে গেলে পয়সা নেবে না। গাড়িতে ভাড়া দিতে গেলে পয়সা নেবে না। ১৯৭৫ এর পরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর দেশকে মনে হলো একটা স্বপ্নের রাজ্য থেকে ছিটকে আরেকটা জগতে এসে পড়লাম যেখানে ভালো কিছু খুঁজে পাই না। সে কষ্ট কোনো কিছুর সাথে তুলনা করার নয়। এত বিভক্তি দেখি আমাদের মাঝে যা বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশাতেই কিছুটা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে তা আরো প্রকট আকার ধারণ করে। রাজাকার যারা চিহ্নিত ছিল- তারাতো তাদের অবস্থান ঠিকই ধরে রেখেছে কিন্তু আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম তাদের মধ্যে কেন এতো বিভক্তি এর কোনো সদুত্তর খুঁজে পাই না। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা যারা পথভ্রষ্ট তাদের জন্যই জাতির আজ দুর্দিন।

আমাকে অনেকেই বলেন, আপনি কোনো পদক পান নাই? মানুষের ভালোবাসার চেয়ে বড় পদক আমার দরকার নেই। দেশ ভালো থাকুক মানুষ ভালো থাকুক- আমি শুধু এটুকুই চাই। সরকার সব কাজ করে দেবে- এই ভরসা না করে নিজের দায়িত্বটুকু নিজে পালন করলে আমাদের এই দুর্দশা হতো না। আমরা সেই চেতনায় ফিরে যেতে চাই যেখানে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার চেতনায় আবার আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিরে যেতে পারবো।

অনুপ ভট্টাচার্য

**[একাধিক জনপ্রিয় আধুনিক গানের স্রষ্টা আর গানের সবকটি শাখাতেই তার বিচরণ।
অনেক শিল্পী তৈরি করে বাংলা গানের মূল ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন এই শিল্পী।]**

১। পারিবারিক পরিবেশ ছিল গানের অনুকূল। বাড়িতে হারমোনিয়াম ছিল। গ্রামোফোন রেকর্ড ছিল। পৈতৃক ভিটা সিলেট। সেখানেই জন্মগ্রহণ করি। বড় হওয়া, বেড়ে ওঠা রাজশাহীতে। সরকারি চাকরীজীবী বাবা বদলি সূত্রে কোলকাতা থেকে রাজশাহী আসেন। বাড়িতে গানের চর্চা থাকার কারণে রবীন্দ্র সঙ্গীত শিখেছি।

২। প্রতিকূল পরিবেশে আমরা গান করেছি। আমি চাকরি করেছি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী হওয়ার কারণে আমাকে দুই বছরের জন্য বদলী করা হয় করাচীতে। পরবর্তীতে সেই ব্যাংকই ন্যাশনাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ, তারপর হয়েছে সোনালী ব্যাংক।

৩। ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্র সঙ্গীত বন্ধ করে দেয় খাজা শাহাবুদ্দীন। তিনি তখন কালচারাল মিনিষ্টার ছিলেন। দুই বছর রবীন্দ্র সঙ্গীত বন্ধ ছিল। শিল্পীদের আন্দোলনের কারণে পাকিস্তান সরকার তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এমনকি ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শত বার্ষিকী উদযাপন করতে বাধা দেয়। আমি তখন রাজশাহী সরকারি কলেজে H.S.C পরছিলাম। এর প্রতিবাদে মিছিল করেছি, আন্দোলন করেছি।

৪। সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে আমি লালন, হাসন, রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের উত্তরসুরী। আমাকে বাংলা সংস্কৃতি আকৃষ্ট করবে নাতো কোন সংস্কৃতি আকৃষ্ট করবে? বহু পূর্বে জমিদারদের শেরেস্তাদার ও সাধক কবি রামপ্রসাদ লিখে গেছেন

‘মনরে কৃষিকাজ জানোনা ...
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা’ !

এমন কথা লিখার মতো বাঙালি যেখানে আছে সেই বাঙালিত্ব আমাকে আকৃষ্ঠ না করে অন্য কোন সংস্কৃতি আকৃষ্ট করার প্রশ্নই আসে না।

৫। আমি বাঙালি। বাংলা সংস্কৃতির ওপর ১৯৪৭ সালের পর থেকে একটার পর একটা আঘাত করতে থাকে বিজাতীয় শাসক। শিল্পীদের প্রতিবাদ শুরু হয় তখন থেকেই। বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা আর বাঙালিকে হেয় করার ষড়যন্ত্র বাঙালি মেনে নেয় নাই। আমার

সচেতন অবস্থান সব সময়ই ছিল আমার দেশ, আমার ভাষা, আমার কৃষ্টি, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের প্রতি। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের নির্দেশের পর আমি কর্মক্ষেত্রে আর ফিরে যাই নাই। সোচ্চার কণ্ঠে গানে গানে প্রতিবাদ করেছি। বিখ্যাত গীতিকার রফিকুজ্জামান এর একটা পঙক্তি উদ্ধৃত করছি,

> ‘দেশের জন্য প্রেম নেই যার, নেই বুক ভরা শ্রদ্ধা,
>
> মিছেই খুঁজে সে বেথলেহেম অজন্তা।’

প্রথম ভালোবাসা দেশকে। আমার বাবা হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়েও জন্মভূমিকে ভালোবেসে এ দেশে এসেছেন। আমি উত্তরাধীকারসূত্রে সেই রক্ত বহন করি।

৬। আমাদের গান সবাইকে কতটা অনুপ্রাণীত করেছে সেটা আমি বলতে চাই না। তোমরা সেটা বুঝে মূল্যায়ন করে নিও। আজও সেই গান এই প্রজন্মকে কতটা অনুপ্রাণীত করছে তা দেখলেই সেটা অনুভব করা যাবে।

৭। ২৫ মার্চ রাতের অপারেশনের সময় আমি ঢাকার গ্রীন রোডে থাকতাম। সেদিন পাকিস্তান আর্মি ঢাকা দখল করে নিয়েছিল। ২৭ তারিখ কার্ফিউ প্রত্যাহার করলে ঢাকা শহরের ঘটে যাওয়া গণহত্যার চিত্র দেখার জন্য বের হই। লাশ আর লাশ। ৩০ মার্চের দিকে জিঞ্জিরা কিলিং হয় যখন, তখন আমি সেখানে ছিলাম। কাতারে কাতারে মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পরতে থাকে। আমি দৌড়ে পালিয়ে কোনো রকমে প্রাণ বাঁচাই। এর পরবর্তীতে আমি তখন এ্যালিফেন্ট রোডে থাকতাম। খুব ভালো উর্দু বলতে পারতাম। আমাকে দেখলেই পাক সেনারা প্রশ্ন করতো, তুমি কি মুসলমান! আমি জবাব দিতাম উর্দূতে যে, তুমি একজন মুসলমান হয়ে আরেকজন মুসলমানকে কিভাবে প্রশ্ন করো মুসলমান কিনা। ওরা আর কথা বলতো না। অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষ সেই নয় মাস কিভাবে বেঁচেছে যারা তখন দেশে ছিল তারা তা বলতে পারবে। প্রতিটি মুহূর্ত ছিল মৃত্যু আশংকায়। মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা অভিনয় করে তাদের জীবন বাঁচাতে হয়েছে। অনেক বাড়িতে লিখা থাকতো আমরা মুসলমান সাইনবোর্ড। যে ভয়াবহ তাণ্ডব ঘটিয়েছিল ঢাকার মানুষের উপর তা স্বচক্ষে দেখেছি হাতির পুলের সেন্ট্রাল রোড থেকে। পরবর্তীতে চলে যাই এ্যালিফেন্ট রোড। প্রতি মূহুর্ত হাঁটা চলার মাঝে শরীরের পিছনে একটা ‘শিতল স্পর্শ’ অনুভব করতাম। মনে হতো এই বুঝি গুলি এসে লাগলো। এরই মাঝে মানুষ বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছে। যাদের সুযোগ ছিল তারা পালিয়েছে। আর যারা পালাতে পারে নাই। শত্রুর সাথে যাদের প্রতি মুহূর্ত বসবাস করতে হয়েছে তারা দেশে না থাকলে পাক বাহিনীর উদ্দেশ্য সফল হতো। আমরা তখনই নিজভূমি থেকে উৎখাত হতাম। আর পাক বাহিনী দখল করে নিতো আমাদের মাতৃভূমি।

মে মাসের ২৫ তারিখে শুরু হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। খুব ভয়ে ভয়ে শুনতে হতো। আমার বন্ধু বান্ধবরা সেখানে অনুষ্ঠান করছে। শুনে খুব উদ্বুদ্ধ হলাম। আমিও যাবার পথ

খুঁজলাম। জুনের ২ তারিখে আমি ঢাকা ত্যাগ করি। মুজিব বাবুল নামে একজন ভক্তের সাহায্যে বর্ডার ক্রস করি।

স্বাধীন বাংলা বেতারে আমি দুটি গানে সুর করেছি। ১। সাড়ে সাতকোটি সোচ্চার স্বর, সংগ্রাম সংগ্রাম। ২। ছুটরে সবাই বাঁধ ভাঙ্গা বাঁধ। গানগুলি কোরাস কণ্ঠে যারা গেয়েছেন তাদের মধ্যে বিপুল ভট্টাচার্য, কাদেরী কিবরিয়া, মঞ্জুর হোসেন, রমা ভৌমিক, তিমির নন্দী, শাহ আলী সরকার, মোকসেদ আলী সাঁই, নওয়াজেশ আহমেদ, আবু নওশের, রফিকুল আলম প্রমুখ শিল্পী গণ। সেখানে জার্মানির গ্রুনডিক কোম্পানির একটা টেপরেকর্ডার ছিল। উপরে একটা মাইক্রোফোন সেট করা থাকতো। আমরা গোল হয়ে গান করতাম। আর ছিল তবলা, বাঁশি, হারমোনিয়াম, দোতরা। এর মধ্যেই আমরা গান করতাম।

আমরা 'শরণার্থী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী' নামে একটা গ্রুপ করেছিলাম। কোলকাতায় নারকেল ডাঙ্গার ফুল বাগানে আমাদের একটা কার্যালয় ছিল। সেখানেই থাকতাম। সেখানই মহরাসহ অন্যান্য কাজ করতাম। আমরা একটা স্ক্রীপট করেছিলাম 'এক পথিকের গল্প।' বঙ্গবন্ধুর জীবনের উপর ভিত্তি করে সেটা তৈরি করেছিলাম। সেখানে মিতালী মুখার্জী, শ্যামলী মুখার্জি, দীপক মুখার্জি (তবলা), অবিনাশ শীল, ফকির আলমগীর (বাঁশি), বিপুল ভট্টাচার্য, তিমির নন্দী গান করেছেন। আমরা 'মহাজাতি সদনে' পর পর দুদিন অনুষ্ঠান করেছি। এভাবে ফান্ড কালেকশন করা সহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালানো ছিল আমাদের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য। আমাদের স্ক্রীপট লিখেছিলেন বিপ্লব দাস। মহাজাতি সদন কোলকাতার বিখ্যাত হল। ভারত সরকার বিনা পয়সায় আমাদের সেখানে অনুষ্ঠান করতে দিয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন রফিকুল আলম আর আমি ছিলাম নির্দেশক।

আমরা মুর্শিদাবাদ গিয়েছি। আমাদের টিমে ছিলেন রফিকুল আলম, সারোয়ার জাহানসহ সকলে। নকশালরা আমাদের যুদ্ধকে সমর্থন করে নাই। তারা এর বিরোধীতা করতো। আমরা অনুষ্ঠান করার জন্য সকলে মুর্শিদাবাদে গিয়ে একটা স্কুলে উঠি। নকশালরা জানিয়ে দেয় তারা আমাদের অনুষ্ঠান করতে দিবে না। মন খারাপ করে বসে থাকি। সন্ধায় একজন এসে নকশালদের পক্ষে জানতে চায় এখানে অনুপ ভট্টাচার্য নামে কে আছেন ! সে আমাকে তার নেতার কাছে নিয়ে যায়। তাদের নেতা 'যুগল কিশোর চক্রবতী' আমাকে বলে, 'আমাকে চিনিস? আমি তোর রাজশাহীর বন্ধু। এক সাথে এক ক্লাসে পড়তাম।' তারপর সে আমাকে কথা দিলো আমরা অনুষ্ঠান করলে তারা কোনো সমস্যা করবে না। তারপর আমরা ভালোভাবে অনুষ্ঠানটা শেষ করতে পেরেছিলাম। আমরা শরণার্থী জীবনে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত 'জয় বাংলার' মানুষ বলে বিনা ভাড়ায় সর্বত্র ভ্রমণ করতাম। October এর পর থেকে আমাদের আর সে সুযোগ ছিল না। তারা বলতো তোমরা young man যাও মাঠে গিয়ে যুদ্ধ করো। মূলতঃ সেপ্টেম্বর থেকে মূল যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে ভারত সরকার তাদের পোষ্টকার্ডে পাঁচ পয়সার ষ্ট্যাম্প লাগিয়েছিল বাংলাদেশের পক্ষে তহবিল সংগ্রহের

জন্য। ভারতের বিখ্যাত শিল্পীরা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অংশুমান রায়, বাপ্পি লাহিড়ী, শ্যামল মিত্রসহ সবাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গান গেয়েছিলেন। শ্যামল মিত্র যার বিখ্যাত গান—

পদ্মা নদীর পাড়ে আমরা ছোট্ট সবুজ গাঁ
আছে মনে সেই সে গাঁয়ের নাম
সেথায় মাঝির গান আমরা জুড়িয়ে দিত প্রানে
ফিরে কি পাবনা তারে ... ...

গানটি লিখেছেন গৌরী প্রসন্ন মজুমদার। সবাই গান গেয়েছিলেন আমাদের জন্য। আমাদের শিল্পী নওশেরকে যুগ যুগ এই গানটির মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গৌরীদা ওর নামটি জুড়ে দিয়েছিলেন গানটিতে। বিখ্যাত সকল ভারতীয় শিল্পীরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাথে একাত্ম হয়েছিল। তারা অসংখ্য গান করেছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে।

৬ ডিসেম্বর থেকেই আমরা জানতে পেরেছিলাম বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কর্তৃপক্ষ বললেন এর কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে। এরপর থেকে অনুষ্ঠান চলেছে কিন্ত নতুন গান আর তৈরি হয় নাই, রের্কডও হয় নাই। ১৬ ডিসেম্বর সকালে তৈরি হয়েছিল একটি নতুন গান। গানটির গীতিকার শহীদুল ইসলাম আর সুরকার সুজেয় শ্যাম।

আমি দেশের মুক্তির জন্য আমার কণ্ঠটাকে কাজে লাগাতে পেরেছি। এর চেয়ে বড় গর্বের আর কিছু নাই আমার কাছে। আমি ধন্য। আমার জীবন ধন্য দেশের এতটুকু কাজে নিজেকে লাগাতে পেরেছি বলে। অনেক শিল্পীই আজ দাবি করে তারা মুক্তিযুদ্ধে গান গেয়েছে। কিন্তু সত্যিকথা বলতে গেলে তাদের অনেকেই সঠিক কথাটা বলছেন না। তারা আদৌ সেখানে গান করেন নাই। আমাদের শিল্পীদের এই আচরণ পরিহার করা উচিত।

পরিশিষ্ট-২

বাঙালির মুক্তির সংগ্রামের গান
ও
মুক্তিযুদ্ধের গানের তালিকা

১। সোনায় মোরানো বাংলা মোদের শ্মশান করেছে কে
কথা : মোকসেদ আলী সাঁই, সুর : মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

২। রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম
কথা : আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, সুর : সুজেয় শ্যাম

৩। ও বগিলারে ক্যান বা আলু বাংলাদেশে মাছের আশা নিয়া
কথা : ভবানন্দ, সুর : সমর দাস

৪। ভেব নাগো মা তোমার ছেলেরা
কথা : মোস্তাফিজুর রহমান গামা, সুর : সমর দাস

৫। ছোটদের বড়দের সকলের
কথা : আলী মহসিন রেজা, সুর : রথীন্দ্রনাথ রায়

৬। বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান
কথা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, সুর : শ্যামল মিত্র

৭। শোন একটি মুজিবরের থেকে
কথা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, সুর : অংশুমান রায়

৮। মোরা একটি ফুলকে বাচাঁবো বলে যুদ্ধ করি
কথা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, সুর : আপেল মাহমুদ

৯। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
কথা : গোবিন্দ হালদার, সুর : সমর দাস

১০। বিজয় নিশান উড়ছে ঐ
কথা : শহিদুল ইসলাম, সুর : সুজেয় শ্যাম

১১। সালাম সালাম হাজার সালাম
কথা : ফজল এ খোদা, সুর : মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

১২। জয় জয় নবজাত বাংলাদেশ, জয় মুক্তিবাহিনী
কথা ও সুর : ভুপেন হাজারিকা

১৩। এই সূর্যদয়ের ভোরে এসো আজ
কথা : সলিল চৌধুরী, সুর : সমর দাস

১৪। তারা এ দেশের সবুজ ধানের শীষে
কথা : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুর : সমর দাস

১৫। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
কথা : গোবিন্দ হালদার, সুর : আপেল মাহমুদ

১৬। মাগো ভাবনা কেন
কথা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়[১]

১৭। সোনা সোনা সোনা, লোকে বলে সোনা
কথা ও সুর : আবদুল লতিফ

১৮। আমার দেশের মাটির গন্ধে
কথা : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুর : আবদুল আহাদ

১৯। জয় বাংলা, বাংলার জয়
কথা : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুর : আনোয়ার পারভেজ

২০। সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম
কথা : ফজল-এ-খোদা, সুর : আজাদ রহমান

২১। মুক্তির গানে দোদুল দোলে সারা নিখিল
কথা : ফজল-এ-খোদা, সুর : মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

২২। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি
কথা : জীবনানন্দ দাস, সুর : অজিত রায়[২]

২৩। আমার নেতা শেখ মুজিব
কথা ও সুর : হাফিজুর রহমান

২৪। ওরে ও বাঙালি রে
কথা, সুর ও কণ্ঠ : শাহ আলী সরকার

২৫। নোঙ্গর তোল তোল
কথা : নঈম গওহর

---

১. ১-১৬ নং গানের উৎস : ফজল এ খোদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
২. ১৭-২২ নং গানের উৎস : আবদুশ শাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭, ১৩১-১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

২৬। মুজিব বাইয়া যাওরে
কথা : সরদার আলাউদ্দিন

২৭। আমার নেতা শেখ মুজিব
কথা ও সুর : হাফিজুর রহমান

২৮। সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ
কথা ও সুর : সারওয়ার জাহান

২৯। তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর
কথা ও সুর : আপেল মাহমুদ

৩০। রক্তে যদি ফুটে জীবনের ফুল
কথা : সৈয়দ শামসুল হুদা, সুর : আজাদ রহমান

৩১। মোদের ফসল কেড়ে নিল রে
কথা ও সুর: শাহ আলী সরকার

৩২। জগৎবাসী একবার আসিয়া
কথা : শহিদুল ইসলাম, সুর : সরদার আলাউদ্দিন

৩৩। মুক্তি ভাই ঝমঝম করে
কথা, সুর ও কণ্ঠ : তোরাব আলী শাহ

৩৪। জনপথ প্রান্তরে, সাগরের বন্দরে
কথা : মোস্তাফিজুর রহমান, সুর : আবদুল আজিজ বাচ্চু

৩৫। পথে যেতে যেতে জন্ম হলো
কথা, সুর ও কণ্ঠ : আপেল মাহমুদ

৩৬। মুক্তির একই পথ সংগ্রাম
কথা: শহিদুল ইসলাম, সুর : সুজেয় শ্যাম

৩৭। হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার
কথা ও সুর : আপেল মাহমুদ

৩৮। অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা
কথা : টি এইচ শিকদার, সুর ও শিল্পী : আবদুল জব্বার

৩৯। গেরিলা আমরা, আমরা গেরিলা
কথা ও সুর : গনেশ ভৌমিক

৪০। আমার মুক্তি বাহিনী ভাইরা
কথা, সুর ও কণ্ঠ : তোরাব আলী শাহ

Dhaka University Institutional Repository

৪১। অবাক পৃথিবী দেখো
কথা: নুর আলম সিদ্দিকী, কণ্ঠ : কামরুল হাসান

৪২। ওরে আমার দেশের মানিক
কথা ও সুর : শাহ্ আলী সরকার

৪৩। এ ঘর দূর্গ ও ঘর দূর্গ
গীতিনকশা রচয়িতা : শাহজাহান ফারুক, সঙ্গীত : সুজেয় শ্যাম, বর্ণনা : আশরাফুল আলম

৪৪। বাংলা থেকে দুশমনদের
কথা ও সুর : সরদার আলাউদ্দিন

৪৫। বলো বীর সৈনিক
কথা, সুর ও কণ্ঠ : আপেল মাহমুদ

৪৬। শেখ মুজিবর সত্য যুগের
কথা, সুর ও কণ্ঠ : তোরাব আলী শাহ

৪৭। পথের আঁধার আর নাই
কথা ও সুর : লাকী আখন্দ

৪৮। রক্ত চাই
গীতি নকশা, সঙ্গীত : সুজেয় শ্যাম

৪৯। আমরা সবাই মুক্তিবাহিনী
কথা, সুর ও কণ্ঠ : আব্দুল হালিম বয়াতি

৫০। জনগণ চায়না যারে সে কেমনে থাকতে চায়
কথা, সুর ও কণ্ঠ : আব্দুল হালিম বয়াতি

৫১। এক পৃথিবী চাই আমরা নতুন পৃথিবী
কথা: শহীদুল ইসলাম

৫২। শোন শোন বন্ধু তোমরা সবাই শোন
কথা : শহীদুল ইসলাম

৫৩। চাঁদ তুমি ফিরে যাও
কথা : শহীদুল ইসলাম

৫৪। আমি আজ ক্রুদ্ধ হৃদয়ে তুমুল ঝড়
কথা : শহীদুল ইসলাম

৫৫। মহাসত্যব্রত মহাজনতার জয় চিরন্তন
কথা : শহীদুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

৫৬। জ্বলছে জ্বলছে জ্বলছে প্রাণ আর দেশ আমার জ্বলছে
কথা : শহীদুল ইসলাম

৫৭। নাই ঈদ আজ নাই ঈদ এই বাংলাদেশে
কথা : শহীদুল ইসলাম

৫৮। বাংলার বুকে এল ফিরে আজ খুশির খেয়ালি ঈদ
কথা : মোস্তাফিজুর রহমান

৫৯। আমি শুনেছি শুনেছি আমার মায়ের কান্না
কথা : ফজল-এ-খোদা

৬০। ভাইরে ভাইরে ভাই হিন্দু মুসলমান
কথা : কার্তিক কর্মকার

৬১। দুশমন আজ বাড়ায়েছে হাত
কথা : কার্তিক কর্মকার

৬২। আমরা ছারবো না ছারবো না
কথা : মোহাম্মদ শাহ বাঙালি

৬৩। এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো
কথা : শেখ লুতফর রহমান

৬৪। রক্ত দিয়ে গড়া মোদের সোনার বাংলাদেশ
কথা : মোহাম্মদ শাহ বাঙালি

৬৫। বলো স্বাধীন বাংলা মোদের মাতৃভূমির জয়
কথা : শাহ আব্দুল করিম

৬৬। কে কে যাবি আয়রে, চল যাইরে
কথা, সুর ও কণ্ঠ : ইন্দ্র মোহন রাজবংশী

৬৭। যে জীবন দিয়ে জীবন গড়ে
কথা : শহীদুল ইসলাম

৬৮। আগুন আগুন আমরা আগুন, মৃত্যু পথযাত্রী
কথা : শহীদুল ইসলাম

৬৯। আমি এক বাংলার মুক্তিসেনা
কথা : নেওয়াজিশ হোসেন

৭০। এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো বাংলার বীর সেনানী
কথা : রেজাউল করিম চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

৭১। চলছে মিছিল চলবে মিছিল
কথা : কবি দিলওয়ার

৭২। বাংলার নামে আজ শপথ নিলাম
কথা : মুস্তাফিজুর রহমান

৭৩। সংগ্রাম আজ শুধু সংগ্রাম
কথা : মুস্তাফিজুর রহমান

৭৪। আ্মরা অগনিত মুক্তিসেনা
কথা : রেজাউল করিম চৌধুরী

৭৫। সাত কোটি মোরা করেছি অঙ্গিকার
কথা : রেজাউল করিম চৌধুরী

৭৬। হুঁশিয়ার!! হুঁশিয়ার!! হুঁশিয়ার!!
কথা: আবুল কাশেম স্বন্দীপ

৭৭। রক্ত চাই রক্ত চাই অত্যাচারির রক্ত চাই
কথা: আবুল কাশেম স্বন্দীপ

৭৮। হৈ হৈ হৈ হৈ-য়া মুক্তির শপথ লইয়া
কথা : এস এম আবদুল গনি বোখারী

৭৯। চল্ বাঙালি চল্ তোরা ঝড়ের মতো চল্
কথা : এস এম আবদুল গনি বোখারী

৮০। ওগো মুক্ত পথের মুক্তি সেনা
কথা : গণেশ ভৌমিক

৮১। এসো এসো ভাই সকলে দাঁড়াই জয় বাংলার পতাকার তলে
কথা : জারিয়াল মোসলেম উদ্দিন

৮২। জাগো বঙ্গবীর, জাগো বঙ্গবীর জয় হবে, জয় হবে জয়
কথা : জারিয়াল মোসলেম উদ্দিন

৮৩। বাজাও বাঁশি বঙ্গবাসী বিজয়ের ধ্বনি
কথা : জারিয়াল মোসলেম উদ্দিন

৮৪। বারোটা বাজিয়া গেছে ঘড়িতে
কথা : জারিয়াল মোসলেম উদ্দিন

৮৫। বাংলাদেশের নাগরিক আমরা, আজাদী সন্তান
কথা : জারিয়াল মোসলেম উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

৮৬। চল্ বাঙালি চল সমরেতে চল্
কথা : জারিয়াল মোসলেম উদ্দিন

৮৭। আলালের দল ধ্বংস করা চাইরে গেরিলা ভাই
কথা, সুর ও কণ্ঠ : বিচার গানের শিল্পী আবুদল হালিম বয়াতি

৮৮। আমরা সবাই মুক্তি বাহিনী
কথা, সুর ও কণ্ঠ : বিচার গানের শিল্পী আবুদল হালিম বয়াতি

৮৯। রক্ত দিয়া ধৌত করব, এই যে সোনার বাংলাদেশ
কথা, সুর ও কণ্ঠ : বিচার গানের শিল্পী আবুদল হালিম বয়াতি

৯০। জাগো জাগো বাঙালি সন্তান
কথা, সুর ও কণ্ঠ : বিচার গানের শিল্পী আবুদল হালিম বয়াতি

৯১। ধন্য মোদের মুক্তিবাহিনী
কথা, সুর ও কণ্ঠ : বিচার গানের শিল্পী আবুদল হালিম বয়াতি

৯২। শোন শোন ভাই মুক্তিসেনার দল
কথা, সুর ও কণ্ঠ : বিচার গানের শিল্পী আবুদল হালিম বয়াতি

৯৩। মুজিব এই বাংলার উন্নতশিরে
কথা: শহীদুল ইসলাম

৯৪। সাড়ে সাত কোটি মানুষের আর একটি নাম মুজিবর
কথা : শ্যামল গুপ্ত

৯৫। শোন ঐ শোন বাংলাদেশের শিকল ভাঙ্গার গান
কথা: কার্তিক কর্মকার

৯৬। দিনের শোভা সুরুজ রে ভাই, রাইতের শোভা চান
ওরে বাংলার শোভা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
কথা: আবদুল গনি বোখারী

৯৭। হারে ও আমার বাংলার শেখ মুজিব
কথা: মো: সিরাজুল ইসলাম

৯৮। বাংলাদেশের খাঁটি মানুষ শেখ মুজিবুর জেনো ভাই
কথা: মোকসেদ আলী সাঁই

৯৯। জাতির পিতা মহান নেতা, তারে ছাড়বি কিনা বল্
কথা: কবি আবদুল হালিম

Dhaka University Institutional Repository

১০০। বাংলার স্বাধীনতা আনলো কে
কথা: গণেশ ভৌমিক

১০১। হে মহান! তুমি আদর্শ মানব তুমি পুরুষ প্রধান
কথা: জারিয়াল মোসলেম উদ্দিন

১০২। বাঙালি জাতির পিতা মহান নেতা শেখ মুজিবর
কথা: আবদুল হালিম বয়াতি

১০৩। কোথায় রইলা বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা থুইয়া
কথা: আবদুল হালিম বয়াতি

১০৪। বঙ্গবন্ধুর মহান বাণী আমরা ভুলবো না
কথা: আবদুল হালিম বয়াতি

১০৫। জাতির পিতা মহান নেতা তুমি যে মহান
কথা: আবদুল হালিম বয়াতি

১০৬। মায়ের কান্দনে কান্দে বনের পশু পাখিরে
কথা: আবদুল হালিম বয়াতি

১০৭। ও আমার বাংলাদেশের মাঝি ভাই
রচয়িতা : অজ্ঞাত, শিল্পী : রথীন্দ্রনাথ রায়

১০৮। জয় বাংলা জয় বাংলা বলে আয়রে বাঙালি
কথা : মমতাজ আলী খান, সুর ও শিল্পী : মোস্তফা জামান আব্বাসী

১০৯। বঙ্গবন্ধু ডাকেরে মুজিব ভাই ডাকেরে
কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর ও শিল্পী : নির্মলেন্দু চৌধুরী

১১০। আমার বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ[৩]
কথা : দীপংকর চক্রবর্তী, সুর : দিলীপ মুখোপাধ্যায়

১১১। শহীদের মা কান্দল্যে বটগাছ তলে বই
কথা ও সুর : গফুর হালী

১১২। ফজল কাদের কণ্ডে আছে জাননি খবর[৪]
কথা ও সুর : ফনী বড়ুয়া

১১৩। ও ভাই মোর বাঙালিরে
কথা ও সুর : মরহুম আব্দুল করিম

---

৩. ২৩-১১০ নং গানের উৎস : সাইম রানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮-২৬৭
৪. ১১১ ও ১১২ নং গানের উৎস : কল্যাণী ঘোষ, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ. ৬৫, ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

১১৪। মন মাঝি তোর গানের সাজি
কথা ও সুর : লোকমান হোসেন ফকির

১১৫। ও নাও সাজাইয়া
কথা ও সুর : জসিম উদ্দিন

১১৬। জয় বাংলা জয় বাংলা বলে সব
কথা ও সুর : মমতাজ আলী খান

১১৭। বীর বাঙালি নওজোয়ান
কথা ও সুর : কে এম আলী আজম

১১৮। ভাইরে ভাই কতদিন আর থাকবেন তোমরা
কথা ও সুর : মোস্তফা জামান আব্বাসী

১১৯। কান্দে আমার মনরে
কথা ও সুর : নির্মলেন্দু চৌধুরী ও পুলক বন্দোপাধ্যায়

১২০। আমার বাংলা মাগো তুমি আর কাইন্দোনা
কথা ও সুর : মোস্তফা জামান আব্বাসী

১২১। ও মোর সোনার বাংলারে
কথা ও সুর : মোঃ মোশাদ আলী

১২২। মাগো আমি তো আর ছোট খোকা নই
কথা ও সুর : মোঃ মোশাদ আলী

১২৩। সোনার বাংলা করবো সোনা
কথা ও সুর : মোঃ মোশাদ আলী

১২৪। কিষাণ মজুর তোমার সাথিরে
কথা ও সুর : মোঃ মোশাদ আলী

১২৫। দেখ ভুত পালায়রে কাইচক্যা মাইরের ঠেলায়
কথা ও সুর : মোঃ মোশাদ আলী

১২৬। আনন্দের দিন আইসাছে ভাই
কথা ও সুর : মোঃ মোশাদ আলী

১২৭। শোনেন শোনেন ভাই সবে সত্য ঘটনা
কথা ও সুর : মোঃ মোশাদ আলী

১২৮। ওরে শোন বাঙালি ভাই
কথা ও সুর : মোঃ মোশাদ আলী

Dhaka University Institutional Repository

১২৯। ওরে সবে দলে দলে বাংলাদ্যাশে চলরে
কথা ও সুর : মো: মোশাদ আলী

১৩০। ইয়াহিয়া জঙ্গী সরকার
কথা : মোশাররফ হোসেন

১৩১। ইয়াহিয়ার গৃহ বাস
কথা ও সুর : মমতাজ আলী খান

১৩২। আরে ও দ্যাশের হালুয়া জালুয়া
কথা ও সুর : অজ্ঞাত

১৩৩। তোরা জাগরে জাগ দেশের চাষী মজুর ভাই
কথা : নূর মোহাম্মদ খান

১৩৪। বঙ্গবন্ধুর জয় বাংলার সংগ্রামী গান গাইয়া
কথা : নূর মোহাম্মদ খান

১৩৫। ফান্দে পড়িয়া ইয়াহিয়া কান্দেরে
কথা ও সুর : হরলাল রায়

১৩৬। জয় বাংলা জয় বাংলা বলিয়ারে
কথা ও সুর : হরলাল রায়

১৩৭। ইয়াহিয়া কান্দেরে
কথা : সিরাজুল ইসলাম

১৩৮। মশা মরিলরে বাংলাদেশে ভাই
কথা : সিরাজুল ইসলাম

১৩৯। মায়ের কান্দনে কান্দে বনের পশু পাখিরে
কথা : মো: শুকুর মোড়ল

১৪০। আমার দেশের সম্পদ লুটে বিদেশিদের পাকা বাড়ি
কথা : গোবিন্দ রাজবংশী

১৪১। ক'জনকে তুই দিবি ফাঁসি বন্দি করবি কর
কথা ও সুর : আবদুল লতিফ

১৪২। ওরে মুক্তি সেনার দল
কথা ও সুর : আবদুল লতিফ

১৪৩। আয়রে যাদু দেখরে যাদু
কথা ও সুর : আবদুল লতিফ

Dhaka University Institutional Repository

১৪৪। জাগো জাগো জাগোরে বাঙালি ভাই
কথা ও সুর : আবদুল লতিফ

১৪৫। চলো নৌকা বাইয়া ও বাঙালি নাইয়া
কথা ও সুর : আবদুল লতিফ

১৪৬। ও তোর ভয় নাইরে জোরে মার টান
কথা : রজ্জব আলী দেওয়ান

১৪৭। ওরে আমার মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা রে
কথা : রেজাউল করিম চৌধুরী

১৪৮। হালুয়া ভাইরে ও তুই গোংরে ধরিস
কথা : মহেশ চন্দ্র রায়

১৪৯। হাল বয়া যা হালুয়া ভাইয়ারে
কথা ও সুর : মহেশ চন্দ্র রায়

১৫০। কালুয়া দাদারে ও তোর হালুয়া জোড়া দে
কথা ও সুর : মহেশ চন্দ্র রায়

১৫১। আরে ও রে চাষী ভাই
কথা ও সুর : মহেশ চন্দ্র রায়

১৫২। ধানের গোলায় চোর ঢুইকাছে
কথা ও সুর : লোকমান হোসেন ফকির

১৫৩। পদ্মা মেঘনা পাড়ি দিব
কথা ও সুর : মো: আজিজুল ইসলাম

১৫৪। ওরে বাংলা মায়ের ছেলে
কথা ও সুর : মো: আজিজুল ইসলাম

১৫৫। ওরে ও ওরে মাঝি ভাই
কথা ও সুর : মো: আজিজুল ইসলাম

১৫৬। জাগো বাঙালি জাগোরে
কথা ও সুর : মো: আজিজুল ইসলাম

১৫৭। ও তোরা দেখরে বঙ্গবাসী
কথা ও সুর : মো: আজিজুল ইসলাম

১৫৮। আরে বাংলা মোদের মায়ের ভাষা
কথা ও সুর : গোবিন্দ চন্দ্র রাজবংসী

Dhaka University Institutional Repository

১৫৯। আমার সোনার বাংলা গো
কথা ও সুর : মো: আবুল হাশেম

১৬০। আরে ও ইয়াহিয়া টিক্কা খান
কথা ও সুর : মো: আবুল হাশেম

১৬১। অজানা কোনো পাখিরে আজ:
কথা ও সুর : হাবিবুর রহমান

১৬২। আরে ও প্রাণের লাঙ্গল
কথা ও সুর : হাবিবুর রহমান

১৬৩। খাশা মানুষ প্রাণের চাষীরে
কথা ও সুর : হাবিবুর রহমান

১৬৪। জাগরে চাষী ভাই
কথা ও সুর : হাবিবুর রহমান

১৬৫। ও মুজিব ভাই ভাইরে
কথা ও সুর : কে এম আলী আজম

১৬৬। কি খেলা দেখলাম দেশেতে
কথা ও সুর : মো: সিরাজুল ইসলাম

১৬৭। তোরা আয়রে আয় ওরে শ্রমিক ভাই
কথা ও সুর : মো: সিরাজুল ইসলাম

১৬৮। মরি হায়রে হায় দু:খে পরান যায়:
কথা : মো: সিরাজুল ইসলাম

১৬৯। তোরা দেখবি যদি আয় বঙ্গবন্ধুর নায়
কথা : মো: সিরাজুল ইসলাম

১৭০। হারে ও আমার বাংলার শেখ মুজিব
কথা : মো: সিরাজুল ইসলাম

১৭১। বাংলাদেশের খাঁটি মানুষ
কথা ও সুর : মোকসেদ আলী সাঁই

১৭২। বাঙালিরা জানের জান
কথা : মো: সিরাজুল ইসলাম

১৭৩। জন্মভূমি ওগো বাংলাদেশ
কথা : ড. এনামুল হক

Dhaka University Institutional Repository

১৭৪। হায় বাঙালি হায় বাঙালি
কথা : এনামুল হক

১৭৫। এসো দেশের ভাই একসাথে সবাই
কথা : এনামুল হক

১৭৬। ও আমার বাংলাদেশের মাঝি ভাই
কথা ও সুর : রথীন্দ্রনাথ রায়

১৭৭। বাংলাভূমির প্রেমে আমার
কথা : আবদুল গফফার চৌধুরী

১৭৮। দিনের শোভা সুরুযরে
কথা : আবদুল গনি বোখারী

১৭৯। হৈ হৈ হৈ হৈইয়া মুক্তির শপথ লইয়া
কথা : আবদুল গনি বোখারী[৫]

১৮০। এই দেশ আমার এই মাটি আমারঃ
কথা : রুমী আজনবী

১৮১। আমাদের যাত্রা হলো শুরু এখন, ওগো কর্নধার
কথা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮২। অগ্রপথিক হে সেনাদল, জোর কদম চলরে চল
কথা : কাজী নজরুল ইসলাম

১৮৩। আজি রক্ত নিশি ভোরে একি এ শুনি ওরে[৬]
কথা : কাজী নজরুল ইসলাম

১৮৪। বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি বারে বারে হেলিস নে ভাই
কথা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৫। ওরে নতুন যুগের ভোরে দিসনে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে[৭]
কথা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬। স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে
কথা : আখতার হুসেন

---

৫. ১১৩-১৭৯ নং গানের উৎসঃ স্বাধীনতা দিনের গান, মুস্তফা জামান আব্বাসী সম্পাদিত, বর্তমান সময়, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩-৯৫

৬. ১৮০-১৮৩ নং গানের উৎসঃ মোনায়েম সরকার সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের গান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫০, ৭৩, ৮৪, ৮৭

৭. ১৮৪-১৮৫ নং গানের উৎসঃ রোজিনা কাদের, ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সুবর্ণ, ঢাকা, পৃ. ১৮৮–১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭। আমরা তো ঐক্যের দৃঢ় বলে বলিয়ান
কথা : আখতার হুসেন

১৮৮। আয়রে আমার দামাল ছেলে দুষ্ট
কথা : আখতার হুসেন

১৮৯। ওই পতাকা আমার মায়ের মুখের মত
কথা : কাজী রোজী

১৯০। আমি বাংলার গান গাই
কথা : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

১৯১। মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কথা : মোহিনী চৌধুরী

১৯২। জনতার মুখগুলি আগুনের হলকায়
কথা : রাহাত খান

১৯৩। মাগো তোমার সোনার মানিক
কথা : রাহাত খান

১৯৪। ওরা নাকি আমাদের ক্ষেত
কথা : রাহাত খান

১৯৫। ইতিহাস জানো তুমি আমরা
কথা : রাহাত খান

১৯৬। সকলের পাতে দু'মুঠো অন্ন দেবার জন্য
কথা : শামসুর রহমান

১৯৭। আজ যত যুদ্ধবাজ দেয় হানা হামলাবাজ
কথা : শিবদাস বন্দোপাধ্যায়

১৯৮। তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা
কথা : শিবদাস বন্দোপাধ্যায়

১৯৯। সামনে সাহসে এগিয়ে যাও
কথা : শিবদাস বন্দেপাধ্যায়

২০০। ঝঞ্ঝাঝড় মৃত্যু দুর্বিপাক
কথা : শ্যামল গুহ

২০১। হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে
কথা : শ্যামল গুহ

Dhaka University Institutional Repository

২০২। রক্ত দিয়ে স্বাধীন হলেম
কথা ও সুর : শাহ আবদুল করিম

২০৩। শাল পিয়ালে দোয়েল কোয়েল
কথা : শাহ মো: সিরাজ

২০৪। দূরে দুর্গম সীমান্তের ধারে
কথা : শুভ দাসগুপ্ত

২০৫। ওরে বিষম দইরার ঢেউ উথাল পাথাল করে
কথা : সাধন গুহ

২০৬। যশোর খুলনা বগুড়া পাবনা, ঢাকা বরিশাল নোয়াখালী
কথা : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।[৮]

২০৭। জন্মভূমি বাংলা মাগো একটি কথা শুধাই তোমারে
কথা ও সুর : লাকী আখন্দ

---

৮. ১৮৬-২০৬ নং গানের উৎস: লিয়াকত আলী লাকী সম্পাদিত দ্রোহ ও মুক্তির গান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪২-১৮৪

Dhaka University Institutional Repository